কেরী সাহেবের মুন্সী

প্রমথনাথ বিশী

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ
১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩

প্রথম প্রকাশ, আশ্বিন ১৩৬৫
চতুর্বিংশ মুদ্রণ, শ্রাবণ ১৪১৪

প্রচ্ছদপট :
অঙ্কন—আশু বন্দ্যোপাধ্যায়
মুদ্রণ—চয়নিকা প্রেস

KERI SAHEBER MUNSHI
A socio-historical novel by Pramathanath Bisi.
Published by Mitra & Ghosh Publishers Pvt. Ltd.
of 10 Shyama Charan Dey Street, Kolkata 700 073

মিত্র ও ঘোষ পাব্‌লিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩ হইতে
এস. এন. রায় কর্তৃক প্রকাশিত ও অটোটাইপ, ১৫২ মানিকতলা মেন রোড,
কলকাতা-৭০০ ০৫৪ হইতে তপন সেন কর্তৃক মুদ্রিত

শ্রীদেবেশচন্দ্র রায়

প্রীতিভাজনেষু

লেখকের বক্তব্য

বছর পনেরো আগে রামরাম বসুর জীবন নিয়ে কিছু একটা লিখবার ইচ্ছা হয়, তখন ধারণা ছিল না যে তা ঠিক কি আকার ধারণ করবে। তার পরে বিষয়ের মধ্যে প্রবেশ করে বিস্মিত হয়ে গেলাম। রামরাম বসু প্রসঙ্গে উইলিয়াম কেরীকে পেলাম। বুঝলাম যে যে-সব মহাপ্রাণ ইংরেজ এদেশে এসেছেন, উইলিয়াম কেরী তাঁদের অগ্রগণ্য। কেরীর ধর্মজীবন, ধর্মপ্রচারে আগ্রহ, বাংলা গদ্য সৃষ্টিতে নিষ্ঠা ও অধ্যবসায় অভিভূত করে দিল আমাকে। তখন ধীরে ধীরে কেরী ও রামরাম বসুকে অবলম্বন করে কাহিনীটি রূপ গ্রহণ করে উঠল।

এই কাহিনীকে পাঠক ঐতিহাসিক উপন্যাস বলে গ্রহণ করবেন কিনা জানি না, করলে আমার আপত্তির কারণ নেই। ১৭৯৩ থেকে ১৮১৩ সালের ইতিহাস এর কাঠামো। জ্ঞানত কোথাও ইতিহাসের সত্য থেকে বিচ্যুত হই নি। কেবল একটি বিষয়ে কিছু স্বাধীনতা নিয়েছি, দ্বারকানাথ ঠাকুরের বয়স কিছু বাড়িয়ে দিয়েছি! আর কিছুই নয়, রবীন্দ্রনাথের পিতামহকে কাহিনীর মধ্যে আনবার লোভ সম্বরণ করতে পারি নি।

ইতিহাসের সত্য ও ইতিহাসের সম্ভাবনা ঐতিহাসিক উপন্যাসকারের উপাদান। ইতিহাসের সত্য অবিচল, তাকে বিকৃত করা চলে না। ইতিহাসের সম্ভাবনায় কিছু স্বাধীনতা আছে লেখকের। সত্যের অপব্যবহার করি নি, সম্ভাবনার যথাসাধ্য সদ্ব্যবহার করতে চেষ্টা করেছি।

দুই শ্রেণীর নরনারীর চরিত্র আছে উপন্যাসখানায়. ঐতিহাসিক আর ইতিহাসের সম্ভাবনা-সঞ্জাত। কেরী, রামরাম বসু, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, টমাস, রামমোহন, রাধাকান্ত দেব প্রভৃতি ঐতিহাসিক চরিত্র। রেশমী, টুশকি, ফুলকি, জন স্মিথ, লিজা, মোতি রায় প্রভৃতি ইতিহাসের সম্ভাবনা-সঞ্জাত অর্থাৎ এসব নরনারী তৎকালে এইরকমটি হত বলে বিশ্বাস। এখানে যেমন কিছু স্বাধীনতা আছে, তেমনি ভুলের সম্ভাবনাও বর্তমান। ভুল না করে স্বাধীনতার সুযোগ গ্রহণে লেখকের ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়। এক্ষেত্রে ক্ষমতা কতটা প্রকাশ পেয়েছে জানি না।

পাত্রপাত্রীর উক্তিকে লেখকের মন্তব্য বলে গ্রহণ করা উচিত নয়। সে-সব উক্তি পাত্রপাত্রীর চরিত্রের সীমানার মধ্যেই সত্য, তাদের সত্যের সাধারণ রূপ বলে গ্রহণ করলে লেখকের প্রতি অবিচার করা হয়। বলা বাহুল্য, কোন ধর্ম কোন সম্প্রদায় বা কোন ঐতিহাসিক ব্যক্তিকে আঘাত দেওয়ার উদ্দেশ্য এ গ্রন্থের নয়। তার চেয়ে

উচ্চতর আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে লেখক। একটা সুনির্দিষ্ট ঐতিহাসিক পর্বের কয়েকটি বিশেষ নরনারীর সুখদুঃখের লীলাকে অবলম্বন করে নির্বিশেষ মানবসমাজের সুখদুঃখের লীলাকে অঙ্কন লেখকের উদ্দেশ্য। সে উদ্দেশ্য সফল হয়েছে এমন দাবি করি না—কিন্তু উদ্দেশ্য ও ছাড়া আর কিছু নয়।

আরও একটা কথা বুঝলাম বিষয়ে প্রবেশ করে আর কাহিনীটা লিখতে গিয়ে—কলকাতা শহরের প্রাচীন অংশের প্রত্যেক পথঘাট, অট্টালিকা, উদ্যান, প্রত্যেক ইষ্টকখণ্ড বিচিত্র কাহিনীরসে অভিষিক্ত। এ শহরের একটি বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব আছে যা ভারতের প্রাচীন শহরগুলোর ব্যক্তিত্ব থেকে স্বতন্ত্র। ভারতের প্রাচীন ও নবীন যুগের সীমান্তে অবস্থিত এই শহর। এর অনেক ত্রুটি সত্ত্বেও না ভালবেসে পারা যায় না একে, কারণ এ আমার সমকালীন। সমকালীনতার দাবি এ শহরের সকলের প্রতি। 'কেরী সাহেবের মুন্সী'রও ঐ দাবি—তদধিক কোন ঐশ্বর্য এর আছে মনে হয় না। অলমিতি—

প্র.

৭ই মে, ১৯৫৮

সেকালের পথঘাটের বর্তমান নামধাম

সেকাল		একাল
বেরিয়াল গ্রাউন্ড রোড	ঃঃ	পার্ক স্ট্রীট।
এসপ্লানেড	ঃঃ	বর্তমান ইডেন গার্ডেন।
নঙ্গী তলাও	ঃঃ	পার্ক স্ট্রীট ও চৌরঙ্গীর মোড়ের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণের পুকুর।
ঝাঁঝরি তলাও রোড	ঃঃ	কিড স্ট্রীট।
বিজিতলাও	ঃঃ	লোয়ার সারকুলার রোড ও চৌরঙ্গীর মোড়ের উত্তর-পশ্চিম কোণের পুকুর।
জানবাজার রোড	ঃঃ	সুরেন ব্যানার্জী রোড।
কসাইটোলা স্ট্রীট	ঃঃ	বেন্টিঙ্ক স্ট্রীট।
রোপওয়াক	ঃঃ	মিশন রো।
দি অ্যাভিনিউ	ঃঃ	বহুবাজার স্ট্রীট।
এসপ্লানেড রোড	ঃঃ	গঙ্গার ধার চাঁদপাল ঘাট থেকে শুরু হয়ে সোজা পূর্বদিকে চৌরঙ্গী রোড পর্যন্ত ; বর্তমান রাজভবনের দক্ষিণ-পূর্ব ও পশ্চিমমুখী দুটি প্রধান ফটক পার হয়ে এসপ্লানেড ঈস্ট ও চৌরঙ্গীর সংযোগস্থল পর্যন্ত।
ট্যাঙ্ক স্কোয়ার	ঃঃ	লালদিঘি।
ওল্ড মিশন চার্চ	ঃঃ	লালবাজার স্ট্রীট ও মিশন রোর মোড়ের দক্ষিণে অবস্থিত।
সেন্ট জনস্ চার্চ	ঃঃ	কাউন্সিল হাউস স্ট্রীট ও হেস্টিংস স্ট্রীটের মোড়ের উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত।
ওল্ড ফোর্ট	ঃঃ	বর্তমান পূর্ব রেলওয়ের প্রধান কার্যালয়, কলকাতার কালেক্টরেট ও জি পি ও-র উত্তর দিকের কিছু অংশ জুড়ে পুরাতন কেল্লা অবস্থিত ছিল।

কেরী সাহেবের মুন্সী
প্রথম খণ্ড

১
চাঁদপাল ঘাট

চাঁদপাল ঘাট।

১৭৯৩ সালের ১১ই নভেম্বর।

ও-পারের জনশূন্য বাবলাবনের দিগন্তে হেমন্তের সূর্য ডোববার মুখে।

এতক্ষণ ঘাট প্রায় জনশূন্য ছিল, ক্রমে ক্রমে লোকজন জড়ো হতে লাগল, সেই সঙ্গে গাড়িঘোড়াও।

বিলাতী জাহাজ এসে পৌঁছনো একটা মস্ত ঘটনা। আজ পৌঁছবে দিনেমার জাহাজ প্রিন্সেস মারিয়া।

ক্রমবর্ধমান জনতার একান্তে নিমগাছের তলে দাঁড়িয়ে দুজন লোক। একজন লম্বা ছিপছিপে, দাঁড়ি-গোঁপ কামানো, কথা বলবার সময় কপালে অনেকগুলো রেখা জাগে; অপরজন বেঁটে, শক্ত নিরেট দেহ, ঘাড়ে-গর্দানে এক।

লম্বা লোকটি বলল, পার্বতীভায়া, তোমাকে কেন চটি পায়ে আর নামাবলী গায়ে আসতে বলেছিলাম বুঝতে পারলে কি?

না বসুজা, সত্যি কথা বলতে কি, পারি নি। তুমি বললে তাই এই বেশে এলাম। এ কি ঘাটে আসবার পোশাক! তার পর ভাবলাম, এসব বিষয়ে বসুজা আমার চেয়ে বেশি বোঝে, তাই আর আপত্তি করলাম না।

ভালই করেছ। এই পাদ্রীগুলোর স্বভাব কি জান, যারা দূরে থাকে তাদের উপর বেশি টান। তুমি কোট-পাৎলুন পর, খানা খাও, খ্রীষ্টান হও, দু দিন পরে আর পুঁছবে না। আর তা না করে যদি চটি চাদর নামাবলী শিখা বজায় রাখ, একটু অং বং করে দুটো সংস্কৃত মন্তর আওড়াও, তোমার পিছু পিছু ঘুরে বেড়াবে।

সে তো তোমাকে দেখেই বুঝতে পারছি। চেম্বার্স সাহেবের মুন্সীগিরি করলে কত বছর, তার পর টমাস ডাক্তারের সঙ্গে ঘুরলে আরও কত বছর, কিন্তু না উঠল গায়ে কাটাপোশাক, না খেলে অখাদ্য কুখাদ্য। অথচ তোমার উপরই দেখি সবচেয়ে বেশি টান। কেন এমন হয় বলতে পার?

এ সেই ওদের বাইবেলের নিষিদ্ধ ফলের গল্প আর কি। নিষিদ্ধ বলেই টানের অন্ত নেই। জাহাজঘাটায় পৌঁছবার বিলম্ব সয় না, টমাস সাহেবের চিঠির পর চিঠি—মুন্সীজি, জাহাজঘাটে হাজির থাকবে।

কিন্তু আবার এই বুড়ো পার্বতী ব্রাহ্মণকে কেন?

তোমার ব্রাহ্মণত্বেই যে তোমার দাম। একটা ব্রাহ্মণকে খ্রীষ্টান করতে পারলে হাজারটা শূদ্রকে খ্রীষ্টান করবার ফল পাওয়া যায়।

কিন্তু একটা শূদ্রকেই বা খ্রীষ্টান করতে পারল কই! আচ্ছা বসুজা, খ্রীষ্টান হবার জন্যে তোমার উপর চাপ দেয় না?

দেয় না আবার !

তবে ?

তবে আবার কি ? টমাস সাহেবকে বলি, সাহেব, খ্রীষ্টান হয়ে খ্রীষ্টানধর্ম প্রচার করব এ আর বেশি কি। কিন্তু খ্রীষ্টান নই অথচ খ্রীষ্টানধর্ম প্রচার করছি এর প্রভাবটা একবার ভেবে দেখ। সাহেব বলল, ঠিক হ্যায়।

তখন তুমি কি বললে ?

আমি কিছুই বললাম না, সাহেবকে ডোমতলার এক জুয়োর আড্ডায় নিয়ে গেলাম। পরদিন সর্বস্ব খুইয়ে সাহেব বলল, মুন্সীজি, জুয়োর আড্ডা নরক। আমি বলি, তা আর বলতে ! তার পর সাহেব বলল, টাকাকড়ি হচ্ছে 'ওয়েজেস অব সিন'। আমি বলি, সেইজন্যেই ওগুলো নরকে গিয়েছে। যা হক সাহেব, এখন তো বেশ হাল্কা হয়েছ, এবার স্বর্গে যাও।

একেবারে মরতে বললে ?

আরে না, না। ইশারায় গির্জায় যেতে বললাম। তা ছাড়া, ও যে মরলে স্বর্গে যাবে তা কে বলল ?

মনটি বড় সরল।

শুধু সরল মনের জোরে সবাই যদি স্বর্গে যেতে পারত, তাহলে স্থানাভাবে সেখানে যে অন্ধকূপ হত্যার পালা হত !

এবারে আবার কাকে সঙ্গে আনছে ?

শুনছি কেরী নামে এক পাদ্রীকে।

একা রামে রক্ষা নাই, সুগ্রীব দোসর !

শুধু সুগ্রীব নয়, সঙ্গে কুমার অঙ্গদ, তারা, নীল, নল, অনেকেই আছে।

সপরিবারে ? এ দেশেই থাকবে মনে হচ্ছে !

শুধু থাকবে কেন, বাইবেল তর্জমা করবে, অন্ধকার দূর করবে, প্রভু যীশুর করুণা বৃষ্টি করবে।

অমনি সঙ্গে কিছু রুপোর বৃষ্টি করবে !

অবশ্যই করবে। চেম্বার্স সাহেবকে আমি একসময় বাইবেল তর্জমায় সাহায্য করতাম, সাহেব বেশ দরাজ হাতের লোক।

বসুজা ভায়া, এবারে হুঁশিয়ার হও, এতদিনে খাস পাদ্রীর হাতে পড়বে। চেম্বার্স আদালতে দোভাষী, টমাস জাহাজী ডাক্তার, এ বেটা শুনেছি দীক্ষিত পাদ্রী।

শুধু তাই ? কেরী এক সময়ে জুতো সেলাই করত, এখন চণ্ডীপাঠ করে। না জানে এমন কাজ নেই। টমাস সাহেব খুলে লিখেছে কিনা।

এমন সময়ে তাদের কানে গেল, কে যেন গুন-গুন করে গান করছে—

'কলকাত্তাকা বাবুলোক
করে কাম বেহদ্ ,
দিনমে খাতা গঙ্গাপানি
রাতমে খাতা মদ।'

কে, অ্যাব্রাহাম নাকি ?

সেলাম বোস সাহেব, অ্যাব্রাহামই বটে।

অ্যাব্রাহাম ও রামরাম বসু দুজনেই ডিঙাভাঙা অঞ্চলের অধিবাসী, পরস্পরকে বেশ চেনে। অ্যাব্রাহামের পিতামাতার কোন একজন কোন এক পুরুষে পর্তুগীজ ছিল, কিন্তু কয়েক পুরুষের ধোপে পিতৃমাতৃপরিচয়ের আজ আর কিছু অবশিষ্ট নেই, আছে শুধু ধর্মটি, পোশাকটি আর নামটি।

প্রথম পরিচয়ে সে নিজের নাম বলে, ডন অ্যাব্রাহাম ডি লেসেপ্স। আর ইংরেজি নিয়ে কেউ যদি ঠাট্টা করে বলে, কেমন সাহেব তুমি! অ্যাব্রাহাম বলে, ইংরেজি কি আমার ভাষা? তার পর সগর্বে বলে, ডন অ্যাব্রাহাম ডি লেসেপ্সের ভাষা পর্তুগীজ। আর প্রশ্ন করবার সুযোগ দেয় না, গুন-গুন স্বরে যে কোন একটা গান ধরে, এমন অনেক গানের পুঁজি তার।

রাম বসু শুধাল, তার পর এখানে কি মনে করে?

পার্বতীচরণ বলল, দেশের লোক আসছে দেখতে।

অ্যাব্রাহাম রাগল না, হেসে উঠল, পার্বতীচরণের সঙ্গেও তার পরিচয় ছিল রাম বসুর সূত্রে; তার পরে বলল, দেশের লোক দেখতে ইচ্ছা হয়ই তো। কিন্তু সেজন্যে ঠিক আসি নি, এসেছি ব্যবসার জন্যে।

পার্বতীচরণ শুধাল, তোমার আবার কিসের ব্যবসা?

অ্যাব্রাহাম মুচকি হেসে বলল, কাঁচা চামড়ার ব্যবসা।

দুজনে হো-হো করে হেসে উঠল। বলল, তা বেশ, তা বেশ।

ব্যবসা চলছে কেমন?

কই আর তেমন চলে! এই নতুন জাহাজ পৌছলে যা চলে কয়েকদিন।

শুনলাম কোম্পানি জাহাজী গোরাদের জন্যে 'সেইলরস্ হোম' খুলেছে!

তা গোটা দুই খুলেছে বটে।

তবে তো তোমাদের ব্যবসার সদর দরজাটাই বন্ধ।

কিন্তু খিড়কির দরজাটা? সেটা বন্ধ করে কার সাধ্য?

কি রকম?

আগে ডাঙায় নামলে খদ্দের যোগাড় হত, এখন জাহাজে থেকে করতে হয়, তফাৎ এই। খাটুনি বেড়েছে, ভয় বেড়েছে, তেমনি দরও বেড়েছে। অতিরিক্ত পয়সা দিয়ে মরে গোরা খালাসী, আমার মুনাফায় হাত দেয় কে!

কাঁচা চামড়ার ব্যবসায়ের অন্ধি-সন্ধি জানবার ঔৎসুক্য জানাল দুজনে।

অ্যাব্রাহাম শুরু করল, তবে শুনুন। সেদিন এল 'উইলিয়াম অ্যাণ্ড মেরি' জাহাজ। আগে হলে সরাসরি জাহাজে গিয়ে চড়তাম, কিন্তু এখন তা হবার উপায় নেই, পাস লাগে। কি করি? একখানা ডিঙি নিয়ে গেলাম জাহাজের কাছে। কাপ্তেনকে সেলাম করে শুধালাম, হুজুর, জন টমসন বলে কোন যাত্রী এসেছে? কাপ্তেন বলল, না, ও নামে কোন যাত্রী নেই।

তখন আপন মনেই যেন বললাম, তাই তো, বড় মুশকিল হল, এখন কি করি! তারপর আবার কাপ্তেনকে বললাম, একবার হুকুম হলে জাহাজে উঠে জিজ্ঞাসাবাদ করে দেখি কেউ জন টমসনের পাত্তা জানে কি না। এমন তো হতে পারে জাহাজ ছাড়বার আগে কেউ তাকে দেখেছে।

উত্তর হল, বেশ তো, এসে খোঁজ কর না। দেখো জলে পড়ে যেও না যেন।

অমনি তুড়ুক করে জাহাজে লাফিয়ে উঠে জাহাজী গোরাদের মধ্যে ঢুকে পড়লাম। তার পর, রতনে রতন চেনে। ওদের বুঝিয়ে বললাম, 'সেইলরস্ হোম' এ কত তকলিফ, কত কড়া আইন, রাত নটার পরে বাইরে বেরুতে দেয় না। আর আমার ঠিকানায় যদি যাও, তবে যা চাও তাই পাবে, ধুম ফুর্তি—চার্জ নামমাত্র।

সবাই একসঙ্গে বলে উঠল—তোমার ঠিকানা বল।

ঠিকানা আবার কি ! অ্যাব্রাহামের কুঠি, লালবাজার যা ফ্ল্যাগ স্ট্রীট, বললে কুকুরটা অবধি পথ দেখিয়ে দেবে। খদ্দের ঠিক করে নেমে এলাম।

রামরাম বসু শুধাল, তার পর কি হল বল, ওরা গিয়েছিল তোমার কুঠিতে ?

সে প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে অ্যাব্রাহাম বলে উঠল, ঐ যে জাহাজ দেখা দিয়েছে। চললাম হুজুর, বহুত বহুত সেলাম।

এই বলে সে একখানা ডিঙির উদ্দেশে ছুটল।

রামরাম বসু ও পার্বতী ব্রাহ্মণ দেখল, সত্যই 'প্রিন্সেস মারিয়া' মাঝগঙ্গায় নোঙর করেছে, এবারে পাল গুটোবার আয়োজন করছে, এতক্ষণ কথাবার্তায় মগ্ন ছিল বলে কিছু দেখতে পায় নি।

ঘাটের দিকে তাকিয়ে দেখল, ইতিমধ্যে সমস্ত স্থানটা তাঞ্জাম, পাল্কি, সেড্যানচেয়ার, ল্যাণ্ডো, বগি, ব্রাউনবেরি, ফিটন প্রভৃতি বিচিত্র যানবাহনে ভরে উঠেছে। অধিকাংশ গাড়িই খালি, সওয়ারী ধরতে এসেছে। অনেক সাহেব মেম এসেছে আত্মীয়স্বজনকে অভ্যর্থনা করতে। নানা ভাষার কৌতূহল-গুঞ্জনে ঘাটটা মুখর।

রাম বসু ভাবছে, তাই তো, স্মিথ সাহেব এখনও এল না, ব্যাপারখানা কি ?

২
চাঁদপাল ঘাটে

হ্যালো, মুন্সী !

গুড ইভনিং, মিঃ স্মিথ।

স্মিথ বলল, তোমরা এসেছ ভালই হয়েছে, মিঃ চেম্বার্স তোমাদের ঘাটে উপস্থিত থাকতে বলেছিল। ডাঃ কেরী তোমাকে দেখবার জন্যে খুব ব্যস্ত হয়ে পড়েছে।

রাম বসু বলল, তোমাকে না দেখে আমিও ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলাম।

হ্যাঁ, আমার আর একটু আগে আসা উচিত ছিল।

রাম বসু ইংরেজি পড়তে বলতে লিখতে শিখেছিল, যখন যেমন প্রয়োজন ইংরেজি বা বাংলা ব্যবহার করত। এখন ইংরেজিতেই কথা হল।

মিঃ চেম্বার্স সুপ্রীম কোর্টের ফারসী দোভাষী, কলকাতায় সাহেব মহলে বিখ্যাত। লোকটা টমাসের বন্ধুও বটে, খ্রীষ্টধর্ম প্রচারেও তার অসীম আগ্রহ। স্মিথ ও কেরীর মধ্যে সে যোগাযোগ করে দিয়েছিল, স্থির হয়েছিল যে টমাস ও সপরিবার কেরী স্মিথের আতিথ্য গ্রহণ করবে।

স্মিথ ধনী ব্যবসায়ী, বেরিয়াল গ্রাউণ্ড রোডে বাড়ি।

স্মিথের আসতে বিলম্ব হবার সত্যই কারণ আছে। আজ তার শিকার করতে যাওয়ার কথা। এমন সময়ে তার পিতা জর্জ বলল, জন, শিকারে নাই গেলে, আমি সুস্থ বোধ করছি না, তুমি জাহাজঘাটে গিয়ে মান্য অতিথিদের নিয়ে এস।

জন বলল, সে কি বাবা, শিকারে বেরুব, সব ঠিক, এমন সময়ে—

বুড়ো জর্জ বলল, তাই তো, তাহলে আমাকেই যেতে হচ্ছে দেখছি।

তখন জনের ভগ্নী লিজা বলল, যাও জন যাও, আখেরে ভাল হবে।

কি ভালটা দেখলে ?

চোখ থাকলে তুমিও দেখতে পেতে। কলকাতায় অবিবাহিত যুবকদের গির্জেয় যাওয়ার এত আগ্রহ কেন ?

কেন তুমিই বল।

জান না ? ভাবী বধূ সংগ্রহ !

সে আগ্রহ কি এক-তরফা ?

নিশ্চয়ই নয়, সেই জন্যেই তো আমি কখনও গির্জেয় যেতে ভুলি নে।

কিন্তু জাহাজঘাট তো গির্জে নয়।

তার চেয়েও বেশি। অবিবাহিত যুবতী পাকড়াও করবার আশাতেই ওখানে ভিড় জমে।

আমার সে রকম আগ্রহ নেই।

তবে তোমার ভাগ্যে 'খিদিরপুর অ্যাসাইলাম'-এ যাচাই করা লেখা আছে।

এখন 'খিদিরপুর অ্যাসাইলাম'-এর ভয়েই হক আর কর্তব্যবুদ্ধিতেই হক—জন শিকারে গেল না, জাহাজঘাটে এল। এই তার বিলম্বের আসল কারণ।

রাম বসু বলল, মিঃ জন, এঁর সঙ্গে তোমার পরিচয় নেই, এতক্ষণ পরিচয় করিয়ে দেওয়া উচিত ছিল, এর নাম পার্বতী ব্রাহ্মণ, হিন্দুশাস্ত্রে মহাপণ্ডিত ব্যক্তি, আমার বন্ধু, টমাস ও চেম্বার্সের সঙ্গে এঁর দীর্ঘকাল পরিচয়।

বড় আনন্দের কথা। ঐ ডিঙিখানায় বোধ হয় ওরা আসছে।

এই বলে স্মিথ অগ্রসর হল।

রাম বসু ও পার্বতী দেখল—হ্যাঁ তারাই বটে, সন্দেহ নেই। টমাসকে বেশ চেনা যাচ্ছে—বাকি সকলে সপরিবার কেরী হবে।

ওহে পার্বতী ভায়া, এ যে একগুষ্টি !

দেশে ভাত জোটে না।

আহা, চট কেন ? আমাদের ভাত অমনি খাবে না ; যেমন আমাদের ভাত খাবে তেমনি আলো বিতরণ করবে।

রামভায়া, তুমি কি সত্যিই ওদের পাদ্রীভাবে বিশ্বাস কর ?

পাগল ! রাম বসু কিছুতেই বিশ্বাস করে না, আবার কিছুতেই তার অবিশ্বাস নেই। সমস্ত সংস্কার গুলে পান করে সে নীলকণ্ঠ হয়ে বসে আছে !

নীলকণ্ঠ না বলে লালকণ্ঠ বলাই উচিত, সাধারণত ঐ বস্তুটার রঙ লাল হয়েই থাকে—বলে পার্বতীচরণ।

বাপ রে, কি পেল্লায় টাক ! কোথায় কপালের শেষ আর কোথায় টাকের শুরু ঠিক করে কোন্ শালা !

না ভাই, আমার মনে হচ্ছে ওর কপালটা ঠেলতে ঠেলতে ব্রহ্মতালু অবধি উঠেছে। যাই বল, দরাজ-কপালে ব্যক্তি। হ্যাঁ, অদৃষ্ট পরীক্ষা করতে আসছে, দেখা যাবে কত বড় কপাল !

বলা বাহুল্য, এ কপাল-প্রশস্তির লক্ষ্যস্থল স্বয়ং পাদ্রী কেরী। ডিঙিখানা খুব কাছে এসে পড়েছে।

ঐ বেটীই বোধ হয় কেরীর স্ত্রী ?

একেবারে বুড়ী যে !

পুষিয়ে নিয়েছে ঐ ছুক্‌রিকে দিয়ে, খাসা দেখতে ভায়া !

বোন নাকি ?

বোনই—তবে মনে হচ্ছে গৃহিণীর, নইলে এত যত্নে সাত সমুদ্র পারে নিয়ে আসে না।

বোনই হক আর শালীই হক, স্মিথ দেরি করে এসেও ঠকবে না।

রাম বসু বলল, দেখেছ আমার কথা সত্যি কি না ? স্মিথের একবার আগ্রহ দেখ ! নৌকায় লাফিয়ে উঠবে নাকি ? দেখ দেখ, পড়েছে কাদায় !

সত্যই ভাটার কাদায় স্মিথ খানিকটা লাঞ্ছিত হল।

রামভায়া, চল এগিয়ে যাই।

পাগল নাকি, ঐ সব হাঙ্গামার মধ্যে কখনও যেতে আছে ! আগে শক্ত ডাঙায় পা দিক, তখন গিয়ে সরফরাজি করা যাবে। তা ছাড়া, যারা দশ হাজার মাইল পার হয়ে এল—তারা এই দশ গজও পার হতে পারবে, আমাদের সাহায্যের দরকার হবে না।

ইতিমধ্যে সাহেব বিবির দল শুকনো ডাঙায় এসে নামল। যাদের আত্মীয়স্বজন এসেছে, তারা বাড়ির গাড়িতে রওনা হয়ে গেল। যাদের কেউ নেই, তারা গাড়িতে উঠে বলল—Burra Poachkhanna !

কোচম্যান ও পাল্কি-বাহকের দল শব্দটার সঙ্গে খুব পরিচিত, তারা জানে যে Burra Poachkhanna বললে বড় Hotel-এ নিয়ে যেতে হয়। কোন যুবতীকে অবিবাহিত অর্থাৎ বেওয়ারিশ মনে হওয়া মাত্র যুবকের দল তাকে ছেঁকে ঘিরে ধরছে। একজন যুবক কেরীর ডিঙির দিকে অগ্রসর হচ্ছিল, কিন্তু তার আগেই স্মিথের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে দেখে ফিরে অন্যত্র গেল।

পরিখাবেষ্টিত কলকাতায় শ্বেতাঙ্গসমাজ Ditchers নামে পরিচিত। Ditcher গণের আর কোন অভাব নেই—ঐ একটি অভাব ছাড়া। তারা চিরন্তন 'নারী-মন্বন্তর'-এ অভিশপ্ত। শ্বেতাঙ্গিনীর অভাব শ্যামাঙ্গিনী দিয়ে মিটিয়ে নেওয়া সেকালে একটা অর্ধসামাজিক রীতি বলে স্বীকৃত হয়েছিল। নিজে থেকে অন্দরমহলের কথা না বললে কেউ সে প্রসঙ্গ তুলত না, সেটা ছিল নিষিদ্ধ ফলের জগৎ।

৩
ঘাট থেকে ঘরে

স্মিথের বাড়ির দুখানা প্রকাণ্ড বুহাম গাড়ি বোঝাই হয়ে সবাই ঘাট থেকে ঘরে রওনা হল। সুমুখের গাড়িখানায় একাসনে কেরী ও কেরী-পত্নী, ক্রোড়ে সদ্যোজাত পুত্র জ্যাভেজ ; অন্য আসনে রাম বসু ও টমাস। পিছনের গাড়িতে জন স্মিথ, কেরীর শ্যালিকা ক্যাথারিন প্ল্যাকেট, আর কেরীর দুই পুত্র ফেলিক্স ও পিটার ; ফেলিক্স ও পিটার বালক। পার্বতীচরণ স্বগৃহে ফিরে গেল, বলে গেল আগামীকাল ভোরে গিয়ে দেখা করবে। রাম বসুও যেতে চেয়েছিল, কেরী ছাড়ে নি। দশ হাজার মাইল সমুদ্র সন্তরণ করে এসে কাষ্ঠখণ্ড পেলে কে ছাড়তে চায়! টমাস চাঁদপাল ঘাটেই সকলের সঙ্গে কেরী ও কেরী-পত্নী ডরোথির পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল, এবারে গাড়িতে চেপে বসে আলাপ শুরু হল। আলাপ-আলোচনা চলে মুখ্যত কেরী টমাস আর রাম বসুর মধ্যেই ; ডরোথি নিতান্ত দু-একটি কথা ছাড়া বলে না ; সে অপ্রসন্ন মুখে চুপ করে বসে রইল। তবে রক্ষা এই যে, সন্ধ্যার অন্ধকারে তার মুখের ভাব কেউ তখন দেখতে পেল না।

গাড়ি চাঁদপাল ঘাট থেকে ডাইনে এস্‌প্লানেড, বাঁয়ে কাউন্সিল হাউস ও গভর্নরের কুঠি রেখে এস্‌প্লানেড রো ধরে সোজা পুব দিকে চলেছে। আগে পিছে চলেছে এমন অনেক গাড়ি, অনেক রকমের। প্রত্যেক গাড়ির আগে মশালচি ছুটছে মশালের আলোয় অন্ধকার ঘুচিয়ে, পিছনে হাঁকছে চোপদার 'সামনেওয়ালা ভাগো', 'পিছনেওয়ালা হুঁশিয়ার'। মশালের আলোয় কোচম্যানের বড় বড় চাপরাশগুলো ঝকঝক করে উঠছে। এক সার মশাল ছুটছে পুব দিকে, আর এক সার মশাল ছুটেছে মাঠের মধ্যে দিয়ে দক্ষিণ দিকে। বিশ পঁচিশ পঞ্চাশখানা গাড়ির চাকার ঘড়ঘড়, শ দুই তিন মশালচি ও চোপদারের হুঁশিয়ারি আওয়াজ, অন্ধকার রাত্রি, অপরিচিত দেশ—সমস্ত মিলে নবাগন্তুকদের মনে কি ভাবের সৃষ্টি করল কে বলতে পারে!

কিছুক্ষণ পরে গাড়ি মোড় ঘুরে চৌরঙ্গী রোডে পড়ে দক্ষিণ মুখে চলতে শুরু করল। ঠিক সেই সময়ে ডান দিকের মাঠ-ভরা জঙ্গল থেকে শেয়ালের দল প্রথম প্রহর ঘোষণা করল। হুয়া হুয়া, হুক্কা হুয়া, ক্যাহুয়া ক্যাহুয়া—দূর থেকে দূরান্তরে ছুটে চলে গেল তরঙ্গের পরে তরঙ্গ তুলে।

চকিত কেরী-পত্নী স্বামীকে শুধাল, ও কিসের আওয়াজ ?

কেরী বলল, শেয়ালের।

শেয়াল ? তুমি কি বলতে চাও সত্যিকার শেয়াল ? তুমি নিশ্চিত জান ওগুলো নেকড়ে নয় ?

কেরী হেসে বলল, অত্যন্ত নিশ্চিত। কেরী-পত্নীকে নিশ্চিন্ত করবার উদ্দেশ্যে টমাস বলল, ওগুলো খুব নিরীহ জানোয়ার। কত দেখতে পাবে বেরিয়াল গ্রাউণ্ড রোডে।

হোয়াট, কোথায় ?

টমাস বলল, যেখানে আমরা তোমাকে নিয়ে যাচ্ছি, বেরিয়াল গ্রাউণ্ড—

তার বাক্য সমাপ্ত হবার আগেই ডরোথি চাপা তর্জন করে উঠল, বলল, বিল,

তোমার মনে শেষে এই ছিল ? বিদেশে এনে আমাকে বেরিয়াল গ্রাউণ্ডে নিয়ে চলেছ ?

ডিয়ার, তুমি ব্রাদার টমাসের বাক্য পুরোপুরি না শুনে ভয় পাচ্ছ—বেরিয়াল গ্রাউণ্ড নয়, বেরিয়াল গ্রাউণ্ড রোড, একটা রাস্তার নাম।

টমাস বলল, সেখানে বহু ধনী লোকের বাস, অবশ্য কাছেই একটা বেরিয়াল গ্রাউণ্ড আছে বটে।

তাই বল, তারা সব শয়তানের প্রতিবেশী—এই বলে ডরোথি নিতান্ত অপ্রসন্ন মুখে শালখানা গায়ের উপর টেনে নিয়ে চুপ করে রইল।

পত্নীর ব্যবহারে লজ্জিত কেরী কথার মোড় ঘোরাবার আশায় রাম বসুকে জিজ্ঞাসা করল, মিঃ মুন্সী, এই মশালগুলো বুঝি পথ আলো করবার জন্যেই ?

ঠিক ধরেছ ডাঃ কেরী।

জঙ্গলের ভিতর দিয়ে ঐ যে ওদিকে মশাল চলেছে—ওটা কোন্ দিক ?

ওটা দক্ষিণ দিক।

আমরা কোন্ দিকে যাচ্ছি ?

আমরাও দক্ষিণ দিকে চলেছি। এ দুটো রাস্তা প্রায় সমান্তরাল, মাঝখানে মস্ত একটা মাঠ আর জঙ্গল।

ও রাস্তাটা গিয়েছে কোন্ পাড়ায় ?

ও রাস্তায় প্রথমে পড়ে খিদিরপুর, তার পরে আছে গার্ডেনরীচ, সেটা ঠিক গঙ্গার ধারে—আর ভিতরের দিকে আছে আলিপুর।

আর এ রাস্তাটা ?

ভবানীপুর, রসা পাগলা হয়ে গিয়েছে কালীঘাট।

ক-লি-গট ! মজার নাম। সেখানে কি আছে ?

কালীমাতার মন্দির। জাগ্রত—মানে 'অল-পাওয়ারফুল' গডেস।

রাম বসু পাদ্রীদের একমাত্র ভরসাস্থল। তার মুখে কালীর প্রশংসা কেরীর ভাল লাগল না, বলল, মিঃ মুন্সী, তোমাদের দেশ বড় পৌত্তলিক।

রাম বসু বলল, সাহেব, তোমরা এসেছ আর ভাবনা নেই।

টমাস সোৎসাহে বলল, ঠিক কথা। তার পর কেরীর উদ্দেশে বলল, কেমন, আমি বলেছিলাম না ?

কেরী বলল, তা বটে। মিঃ মুন্সী, ব্রাদার টমাসের মুখে তোমার সব কথা আমি শুনেছি, আমি জানি যে আত্মীয়স্বজনের ভয়েই তুমি সত্যধর্ম গ্রহণে নিরস্ত আছো।

সে কথা আর বলতে ! এবারে দেখ না সাহেব, তুমি ঝাড়ে-বংশে এসেছ, এবারে আমিও ঝাড়ে-বংশে গিয়ে গির্জেয় উঠব।

মনে মনে বলল, মা কালী, কিছু মনে ক'র না। অসুরগুলোর কাছে এ রকম বলতে হয়, তুমিও তো মা অসুরবধের সময় সরলপন্থা অবলম্বন কর নি। যাই হক মা, অপরাধ নিও না, আগামী অমাবস্যায় গিয়ে ভাল পরে পুজো দিয়ে আসব।

কি ভাবছ মুন্সী ?

প্রভু যীশুর সম্বন্ধে একটা গীত রচনা করেছিলাম, সেটা মনে করবার চেষ্টা করছি।

সত্যি ?

এসব বিষয়ে কি মিথ্যা বলা সম্ভব ?

কই, কি গীত ?

কাছে নেই, যত শীঘ্র সম্ভব এনে দেখাব।

মিঃ মুন্সী, তোমাকে না হলে আমার চলবেই না। আজ থেকেই তোমাকে আমার মুন্সী নিযুক্ত করলাম, এখন মাসিক কুড়ি টাকার বেশি দেবার আমার সাধ্য নেই।

রাম বসু বলল, সাহেব, ধর্মকার্যে টাকা তুচ্ছ।

এ তো হিদেনের মত কথা নয়।

সাহেব, কি আর বলব, আমি ইতিমধ্যেই আধা-খ্রীষ্টান হয়ে গিয়েছি।

টমাস বলল, তুমি এ দেশে খ্রীষ্টান-ধর্মের ভোরের পাখী।

রাম বসু মনে মনে বলল—কি, কুঁকড়ো নাকি ?

তিনজনের মধ্যে কথাবার্তা বাংলা ভাষাতেই চলছিল। কেরী বিলাত থেকে আসবার সময় জাহাজে টমাসের কাছে বাংলা পড়তে লিখতে ও বলতে শিখেছিল। তবু এখনও তার মুখের আড় ভাঙে নি, কথাগুলো বেঁকেচুরে যায়, ঠিক শব্দটি ভাবের মুখে আসে না। কুয়াশার মধ্যে যেমন মানুষ দেখা যায় অথচ চেনা যায় না, কেরীর মুখের বাংলা ভাষার চেহারা অনেকটা তেমনি। তবে রাম বসু দীর্ঘকাল সাহেবের মুখের বাংলার সঙ্গে পরিচিত, কেরীর বাংলা বুঝতে তার কষ্ট হল না। টমাস বাংলা পড়তে লিখতে ও বলতে বেশ পারে, প্রায় শিক্ষিত বাঙালীর মতই। কিন্তু সাধারণের পক্ষে কেরীর বাংলা এখন অবোধ্য।

দ্বিতীয় গাড়ির আরোহীদের মধ্যে নিতান্ত বালক ও শিশু বাদে প্রাপ্তবয়স্ক জন স্মিথ ও ক্যাথারিন প্ল্যাকেট। তাদের মধ্যে যে আলাপ চলছিল তা চিত্তাকর্ষক হলেও যে ধর্মসংক্রান্ত নয়, তদ্বিষয়ে একটি তথ্যই যথেষ্ট। মিঃ স্মিথ ও মিস প্ল্যাকেট এখন পরস্পরের কাছে জন ও কেটি। এ-জাতীয় পরিবর্তন এত দ্রুত সচরাচর ঘটে না সত্য, কিন্তু যেখানে ভিড় বেশি, আসন অল্প, সেখানে সাধারণ নিয়ম খাটে না। অনেক সময়েই অশোভন ব্যস্ততায় চেয়ারে রুমাল বেঁধে আপন স্বত্ব চিহ্নিত করে রাখতে হয়।

কেটি বলছিল, জন, তোমাদের রাস্তার নামটি খুব রোমান্টিক—বেরিয়াল গ্রাউণ্ড রোড !

জন বলছিল, আর কাছেই আছে প্রকাণ্ড সুনড্রীবন। কাল বিকেলে তোমাকে বেড়াতে নিয়ে যাব।

কেটি বার দুই জিভ দিয়ে 'সুনড্রী' শব্দটি নেড়েচেড়ে দেখলে—না হল আয়ত্ত শব্দটি, না হল আয়ত্ত অর্থ। সে শুধাল, জন, সুনড্রীবন কি বন, কখনও তো শুনি নি ?

ওর অনুবাদ করলে দাঁড়ায় 'ফরেস্ট অব বিউটিফুল উইমেন'। ও বন এ দেশ ছাড়া নেই।

কৃত্রিম বিস্ময়ের সঙ্গে কেটি বলল, বল কি, এ দেশ ছাড়া নেই ? তাই বুঝি তুমি এ দেশ ছাড়তে চাও না ? সর্বনাশ ! এখন কি আর স্বদেশের কাউকে তোমার মনে ধরবে ?

দেখা যাক। সত্যি কাল যাবে তো ?

সত্যি নিয়ে গেলে সত্যি যাব।

তার পর কেটি আপন মনে গুন-গুন করে গান শুরু করল—

Under the Greenwood tree
Who loves to lie with me...

সে বিষয়ে কি তোমার সন্দেহ আছে, কেটি ?

এমন সময়ে অদূরে একসঙ্গে কতকগুলো বন্দুকের আওয়াজ হল। কেটি শুধাল, ও কি !

বন্দুকের আওয়াজ, নেটিভ পাড়ায় ডাকাত তাড়াচ্ছে।

ডাকাতও আছে নাকি ? তবে তো শেরউড ফরেস্ট হয়ে উঠল !

উঠলই তো। এমন কি, রবিনহুড ও মেড মারিয়ানেরও অভাব হবে না।

মিসেস কেরী শুধাল, ডাঃ টমাস, ও কিসের শব্দ ?

টমাস বুঝেছিল যে ডাকাত বললে মিসেস কেরী এখনই হাঁউমাউ করে উঠবে, তাই সে বলল, ও কিছু নয়। নেটিভ পাড়ায় উৎসব হচ্ছে, তারই ঘটা।

গাড়ি মোড় বেঁকে বেরিয়াল গ্রাউণ্ড রোডে ঢুকল এবং কিছুক্ষণ পরেই জর্জ স্মিথের ফটকওয়ালা বাড়ির প্রকাণ্ড হাতার মধ্যে প্রবেশ কবল।

জর্জ স্মিথ মান্য অতিথিদের অভ্যর্থনার আয়োজনের ত্রুটি করে নি। রোশনাই-এর ব্যবস্থা হয়েছে দরাজ হাতে। বাড়ির গাড়িবারান্দার কাছে দুদিকে সারিবদ্ধ শতাধিক দাসদাসী। খানসামা, সরকার, খিদমতগার, সর্দারবেয়ারা, বাবুর্চি, আব্‌দার, আয়া, দারোযান, সহিস, মালী, মেথর, মেথরানী, ভিস্তি, চাপরাসী, ধোবি, দরজি, চোপদার, হুঁকাবর্দার প্রভৃতি ধোপদুরস্ত পোশাকে সসম্ভ্রমে দণ্ডায়মান। বারান্দার উপরে বৃদ্ধ জর্জ স্মিথ ও কন্যা মিস এলিজাবেথ স্মিথ। জর্জ স্মিথ বিপত্নীক।

গাড়ি থামবামাত্র শতাধিক দাসদাসী আভূমি নত হয়ে সেলাম করল। জর্জ কেরীকে হাত ধরে নামাল, এলিজাবেথ মিসেস কেরীকে নামাল। দ্বিতীয় গাড়ির আরোহীরা নামলে সকলে মিলে ড্রইংরুমে প্রবেশ করল।

রামরাম বসু কলকাতার শ্বেতাঙ্গসমাজের রীতিনীতির সঙ্গে পরিচিত। সে জানে তার মত লোকের অধিকার ঘাট থেকে ঘর পর্যন্ত, ঘরের মধ্যে নয়। সে কেরীকে বলল, ডাঃ কেরী, আমি এখন চললাম, কাল সকালে আসব।

কেরী বলল, মিঃ মুন্সী, অবশ্য আসবে।

অতিথির নিমন্ত্রিত ব্যক্তির প্রতি ভদ্রতা করা উচিত মনে করে জর্জ বলল, মিঃ মুন্সী, অবশ্য আসবে। এরা কাল সকালে যখন নগর-ভ্রমণে বেরোবে তখন তোমাকে সঙ্গে থাকতে হবে। এ নগব সম্বন্ধে তোমার মত ওয়াকিবহাল আমরা নই।

রাম বসু উভয়কে সেলাম করে প্রস্থান করল।

'সাপার' শেষ করে শুতে যাওয়ার আগে জনকে একান্তে পেয়ে এলিজাবেথ বলল— কি জন, ঘাটে না গেলে ঠকতে মনে হচ্ছে !

জন বলল, আমারও তাই মনে হচ্ছে।

দেখলে তো, শিকার কেবল বনেই মেলে না !

না, নদীতেও মেলে।

এটি কি ? গোল্‌ড ফিশ না মারমেড ?

ও দুয়ের কিছুই নয়। এটি হচ্ছে মেড মারিয়ান।

ইতিমধ্যে নামকরণও হয়ে গিয়েছে—ইউ লাকি ডগ !

দুই ভাইবোন হেসে উঠল।

যৌবনে হাসির ঢেউ অকারণে আসে, অযাচিতভাবে আসে, বার্ধক্যে এক-আধটা ঢেউ-এরও দেখা মেলে না কেন? যৌবন বহির্মুখী, বার্ধক্য অন্তর্মুখী—তাই কি?

৪
ওটা কি সত্যকার বাঘ?

অনেক রাতে ঠেলা খেয়ে কেরী সাহেব জেগে উঠল, দেখল যে পত্নী পাশে দাঁড়িয়ে ভয়ে কাঁপছে।

কেরী শুধাল, ডরোথি, কি হয়েছে?

ডরোথি নীরব, দেহ ভয়ে কম্পমান।

হঠাৎ অসুখ-বিসুখ হয়েছে আশঙ্কায় কেরী উঠে দাঁড়িয়ে পত্নীকে চৌকির উপরে বসাল, জিজ্ঞাসা করল, কি হয়েছে বল তো?

কি হয়েছে! শুনতে পাচ্ছ না?—এতক্ষণে ডরোথির বাক্‌স্ফূর্তি হল।

কি শুনব?

ঐ যে বাইরে গর্জন, কি যে ডাকছে!

এবারে কেরী সত্যই শুনতে পেল, বাইরে কোন একটা জন্তুর গর্জন।

ভীত ডরোথি ফিস ফিস স্বরে শুধাল, ওটা কি ডাকে?

কেরী বলল, বাঘের ডাক তো স্বকর্ণে কখনও শুনি নি, তবু যতদূর বুঝতে পারছি বাঘের ডাক বলেই মনে হচ্ছে, জঙ্গুলে দেশ কিনা।

ওটা কি সত্যিকার বাঘ? শুধাল মৃতপ্রায় পত্নী।

কেরী হেসে বলল, ডিয়ার, সত্যি বাঘ ছাড়া এত রাতে আর কি ডাকবে!

যদি আক্রমণ করে?

সামনে পেলে আক্রমণ করে বই কি।

কি সর্বনাশ! তাতে আবার জানালাগুলো সব খোলা!

এই বলে ডরোথি গরাদহীন বড় বড় খোলা জানালাগুলোর দিকে তাকাল।

বাঘ লোকালয়ে কখনও আসে না।

কেমন করে জানলে? তুমি কি বাঘ দেখেছ কখনও? তবে? আমি বই-এ পড়েছি যে, বাঘ পশুর মধ্যে সবচেয়ে হিংস্র। তার হাতে পড়লে আর নিস্তার নেই।

কিন্তু তার হাতে পড়বে কেন?

পড়তে বাধাই বা কি? যেখানে ঘরের পাশে বন, বনের মধ্যে বাঘ!

বন তো ঘরের পাশে নয়।

অবশ্যই পাশে। কেটি বলছিল যে, পাশেই প্রকাণ্ড বন, কাল সেখানে বেড়াতে যাবে!

ডরোথি, তুমি মিছে ভয় পাচ্ছ, তেমন বাঘের ভয় হলে এখানে মানুষ থাকতে পারত না। নাও, তুমি এখন ঘুমোও।

পাশের ঘরে ছেলেরা ঘুমোচ্ছে, তাদের একবার দেখে আসি—বলল ডরোথি।

যাও, কিন্তু জাগিও না।

পাশের ঘরটিতে ফেলিক্স, পিটার, জ্যাভেজ ও ক্যাথারিনের শয়নের ব্যবস্থা হয়েছিল। ডরোথি সেই ঘরের দিকে গেল।

এক মুহূর্ত পরে উর্ধ্বশ্বাসে ফিরে এল ডরোথি।

সর্বনাশ বিল, সর্বনাশ!

আবার কি হল? বলল উদ্বিগ্ন কেরী।

ঘরের মধ্যে প্রকাণ্ড একটা ভ্যাম্পায়ার।

ভ্যাম্পায়ার! অবিশ্বাস ও পরিহাসের মাঝামাঝি স্বরে বলল কেরী। ভ্যাম্পায়ার বলে কোন প্রাণী নেই। তা ছাড়া ও ঘরটা অন্ধকার, কি দেখতে কি দেখেছ!

রাগে দুঃখে জ্বলে উঠে পত্নী বলল, কি দেখতে কি দেখেছি! স্পষ্ট দেখেছি মস্ত পাখাওয়ালা কিম্ভূত পাখী ছেলেদের ঠিক মাথার উপরে নড়ছে।

বল কি! এবারে কেরীর স্বরে বিশ্বাসের আভাস লেগেছে।

চল নিজের চোখে দেখবে।

দাঁড়াও,—এই বলে টেবিলের উপরে রক্ষিত মোমবাতিটা নিয়ে পাশের ঘরের দিকে রওনা হল কেরী, পিছনে ডরোথি। ঘরটার দরজার কাছে গিয়েই কেরী হো হো করে হেসে উঠল, বলল, ঐ দেখ, তোমার ভ্যাম্পায়ার আলোর জাদুতে কাঠের 'পাঙখা'য় পরিণত হয়ে গিয়েছে!

ভুল ভাঙতে ডরোথির বিলম্ব হল না। যদিচ 'পাঙখা' পদার্থটির সঙ্গে কেবল আজই সন্ধ্যায় তার পরিচয়, তবু ও বস্তুটা যে পাঙখা ছাড়া আর কিছু নয়, অনিদ্রা পাঙখা-পুলারের টানে নড়ছে, এ সত্য তাকেও স্বীকার করতে হল। তখন তার এতক্ষণের উপচীয়মান সমস্ত ক্রোধ এসে পড়ল স্বামীর উপর।

ব্রহ্মাস্ত্রের সঙ্গে স্ত্রীজাতির ক্রোধের তফাৎ ঐখানে। নিক্ষিপ্ত ব্রহ্মাস্ত্র স্বর্গ মর্ত্য রসাতল খুঁজে লক্ষ্য না পেলে, ফিরে এসে আঘাত করে অস্ত্রীকে, আর স্ত্রীজাতির লক্ষ্যভ্রষ্ট ক্রোধ এসে পড়ে স্বামীর ঘাড়ে। কিন্তু সত্যই তফাৎ আছে কি? স্বামী-স্ত্রী যে অভিন্ন সত্তা। অভিন্ন সত্তা বটে, কিন্তু ভিন্নমুখ, পত্নী চন্দ্রের চিরোজ্জ্বল মুখ, স্বামীর মুখটা চিরন্তন নিষ্প্রভ।

ডরোথি শয্যায় এসে বসে পড়ল আর সঙ্গে সঙ্গে ক্রোধের বাষ্প প্রভূত অশ্রুতে ঝরতে শুরু হল—

আমার এমনই কপাল যে তোমার মত লোকের হাতে পড়েছিলাম, নইলে এমন দেশে কেউ আসে যেখানে ঘরের পাশে বাঘ ডাকে আর ঘরের মধ্যে ভ্যাম্পায়ার উড়ে বেড়ায়!

কিন্তু ডিয়ার, স্বচক্ষে তো দেখলে ওটা ভ্যাম্পায়ার নয়, 'পাঙখা'!

কিন্তু ধর যদি ভ্যাম্পায়ার হত?

ভ্যাম্পায়ার বলে কিছু নেই।

আমি বলছি অবশ্যই আছে। অপরিচিত দেশের সব রহস্য কি তুমি জান? আর তাছাড়া যে দেশে বাঘের ডাকে ঘুম ভেঙে যায়, সে দেশে জানপ্রাণ কতক্ষণ নিরাপদ? আচ্ছা, ভ্যাম্পায়ার না থাকুক, বাঘ তো আছে!

কে অস্বীকার করছে?

পারলে করতে, বলতে যে শেয়াল ডাকছে!

সে কথা মিথ্যা নয়, শেয়াল আর বাঘ কাছাকাছি থাকে।

তবে?

যেন ঐ 'তবে' বলাতে ডরোথির জয় হল, যেন তর্কটার ওখানে চূড়ান্ত হয়ে গেল। তাই সে এবারে প্রসঙ্গ উল্টে বলল—আগামী মেলেই ছেলেদের আর কেটিকে নিয়ে আমি দেশে চলে যাব, এ হিদেনের দেশে এক দণ্ড থাকব না।

কিন্তু ডিয়ার, ভুলে গেলে কেন যে হিদেনদের সত্যধর্মে দীক্ষিত করবার উদ্দেশ্যেই আমরা এখানে এসেছি!

'আমরা' নয়, বল 'আমি এসেছি'। তুমি সত্যধর্মে দীক্ষা দাও, আমরা ফিরে যাব।

আগে আপত্তি করলে না হয় না আসতাম, কিন্তু এখন তো—

কেরীর বাক্য শেষ হবার আগেই ডরোথি চীৎকার করে উঠল—একশ বার আপত্তি করেছিলাম। তখন আমাকে হাত করতে না পেরে ফেলিক্স, পিটার আর কেটিকে হাত করে নিয়েই তো আসতে বাধ্য করলে।

কেরী মৃদু হেসে বলল, এখন যদি তারা যেতে রাজী না হয় তবে কি করবে?

আমি একাই যাব জ্যাভেজকে নিয়ে। যাক ওরা বাঘের পেটে।

এই বলে আবার সে চোখের ধারা ছেড়ে দিল, কাঁদতে লাগল ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে।

কেরী বুঝল এমন আর কিছুক্ষণ চললে ডরোথির হিস্টিরিয়া রোগটা মাথা চাড়া দিয়ে উঠবে, আর হিস্টিরিয়ার আক্রমণ একবার শুরু হয়ে গেলে বাড়িসুদ্ধ সবাইকে তুলবে অস্থির করে। নূতন জায়গায় প্রথম রাতেই সেটা হবে লজ্জার চরম।

তখন সে নরম হয়ে বলল, ডরোথি ডিয়ার, এখন ঘুমোও, ফেরবার কথা ভেবে দেখব। তুমি যা বললে তার মধ্যে অনেক সার কথা, ভাববার কথা আছে।

স্নেহময় বাক্যে ডরোথির মন অনেকটা নরম হল। ঝড় থামল কিন্তু ঝড়ের দোলা থামতে চায় না। সে শুয়ে পড়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল এবং কখন একসময় নিজের অজ্ঞাতসারে ঘুমিয়ে পড়ল।

কেরী পত্নীকে ভাল ভাবেই চিনত, জানত যে তার চিন্তায় ও কাজে দৃঢ়তা বলে কিছু নেই, সমস্ত বিষয়েই শেষ পর্যন্ত সে স্বামীর উপর নির্ভরশীল। তবে মাঝে মাঝে ঝোঁকের মাথায় ও হিস্টিরিয়ার প্রকোপে এক-একটা সঙ্কট সৃষ্টি করে বসা ডরোথির স্বভাব, কোন রকমে সেটা কাটিয়ে দিতে পারলেই আবার সে এসে পড়ে স্বামীর মুঠোর মধ্যে। কেরী বুঝল দীর্ঘ সমুদ্রযাত্রার অস্বাভাবিক জীবনের প্রতিক্রিয়ায় আজ রাত্রে দেখা দিয়েছিল এইরকম একটা সঙ্কট—তবে সেটা বড় রকম অনর্থ ঘটাবার আগেই গেল কেটে। পত্নীর কাছে তর্কের বেলায় হেরে কাজের বেলায় জেতে যে স্বামী তাকেই বলি বুদ্ধিমান!

৫
কলিকাতা দর্শন

ব্রেকফাস্টের পর সকলে ড্রইংরুমে অপেক্ষা করছে এমন সময় রামরাম বসু ও পার্বতী ব্রাহ্মণ এসে পৌঁছল।

কেরী বলল, মিঃ মুন্সী, তোমাদের জন্যেই আমরা অপেক্ষা করছিলাম, চল শহর দেখতে বের হব।

রামরাম বসু বলল, চলুন, আমরা তৈরি।

গাড়িবারান্দায় দুখানা ব্রুহাম অপেক্ষা করছিল। প্রথমখানায় উঠল কেরী, কেরী-পত্নী, ডাঃ টমাস, রামরাম বসু ও পার্বতী ব্রাহ্মণ। দ্বিতীয়খানায় উঠল মিস প্ল্যাকেট, মিস স্মিথ, ফেলিক্স কেরী ও জন স্মিথ। পিটার ও জ্যাভেজ বাড়িতেই রইল।

প্রথমে এলিজাবেথ যেতে চায় নি, কিন্তু ক্যাথারিন কিছুতে ছাড়ল না, অগত্যা সে রাজী হল।

কেটি বলল, যাবে না কেন? তুমি সঙ্গে থাকলে বেশ কথাবার্তা বলা যাবে।

লিজা বলল, তাতে জন বোধ হয় খুশি হবে না, কি বল জন?

জন বলল, সে কি কথা! তিনজন না হলে কি আলাপ জমে?

লিজা বলল, আলাপ নানা রকমের।

যেমন?

এই ধর, প্রেমালাপ!

ইউ নটি গার্ল!

কথাটা কেটি শুনতে পায় নি, শুধাল, মিঃ স্মিথ কি বলছে?

পাছে এলিজাবেথ একটা অদ্ভুত কিছু বলে বসে তাই জন তাড়াতাড়ি বলে উঠল—না না, এমন কিছু নয়। ও কেন যাবে না তাই জিজ্ঞাসা করছিলাম।

এলিজাবেথ বলল, জন, তুমি যখন বলছ যাচ্ছি, কিন্তু 'ফ্লাই ইন দি অয়েণ্টমেণ্ট' না হয়ে থাকি।

সে দেখা যাবে, এখন চল তো।

গাড়ি দুখানা ফটক থেকে বেরিয়ে বেরিয়াল গ্রাউণ্ড রোড ধরে চৌরঙ্গীর দিকে চলল। যে শহরে জীবনের শ্রেষ্ঠ একচল্লিশ বৎসর কাটবে সেই কলকাতা তার বৈচিত্র্য ও অভিনবত্ব নিয়ে কেরীর চোখে হেমন্তপ্রভাতের স্নিগ্ধ আলোয় এই প্রথম উদ্ভাসিত হল।

বেরিয়াল গ্রাউণ্ড রোডের দুদিকে প্রকাণ্ড হাতাওয়ালা বড় বড় সব বাড়ি, অধিকাংশ বাড়িই একতলা, তবে বাড়ির সংখ্যা বেশি নয়, বড়জোর দশ-বারোটা হবে।

চৌরঙ্গী রোডে গাড়ি পৌঁছতেই মিসেস কেরী সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করল—ও কি, ঐ লোকটা অমন করে রাস্তার উপর গড়াচ্ছে কেন?

সকলে দেখল সত্যই একটা লোক একবার রাস্তার উপর সটান উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ছে আবার উঠে দাঁড়িয়ে কি যেন বিড় বিড় করে বলছে, তার পর আবার আগের মতই উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ে সুমুখে হাত বাড়িয়ে পথের উপর দাগ কাটছে।

কেরী-পত্নী বলল, লোকটা বোধ হয় পাগল, গায়ে তো বস্ত্র নেই দেখছি!

রামরাম বসু বলল, না মিসেস কেরী, লোকটা মোটেই পাগল নয়। ও চলেছে কালীঘাটের মন্দিরে। কোন কারণে এইভাবে কালীমন্দিরে যাওয়ার প্রতিজ্ঞা করেছিল, এখন সেই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করছে।

ও কত দূর থেকে আসছে?

ওর গ্রাম থেকে, হয়তো বিশ-ত্রিশ মাইল হবে, হয়তো আরও বেশি হবে।

এ যদি পাগলামি না হয়, তবে পাগলামি আর কি?

পার্বতী বলল, আমরা ওর আচরণকে ধর্ম বলে মনে করি।

মিসেস কেরী অপ্রসন্ন মুখে বলল, ঘোর কুসংস্কার!

পাদ্রী টমাস বলল, এবারে ডাঃ কেরী এসে পৌঁছেছে, এখন ওসব দূর হয়ে যাবে।

কেরী প্রসঙ্গ ঘুরিয়ে দেবার উদ্দেশ্যে শুধাল, ঐ দিঘিটার নাম কি?

বেরিয়াল গ্রাউণ্ড রোড ও চৌরঙ্গী রোডের মোড়ে একটা বড় দিঘি সবাই দেখল।

টমাস বলল, ওটার এখনও কোন নামকরণ হয় নি, সবে দু বছর তৈরি হয়েছে, সবাই এখনও নিউ ট্যাঙ্ক বা নঈ তলাও বলে। কি বল বসু?

রাম বসু বলল, হাঁ, ঐ নামেই চলছে। আর ঐ যে ছোট রাস্তাটা ডান হাতে বেরিয়ে গিয়েছে ওটার নাম ঝাঁঝরিতলাও রোড।

কেরী বার-দুই উচ্চারণ করল, 'তলাও', 'তলাও'! বলল, আচ্ছা তলাও মানে কি?

তলাও মানে ট্যাঙ্ক, বলল একসঙ্গে পার্বতীচরণ, রাম বসু ও টমাস।

ঐ রাস্তাটার উপরে ঝাঁঝরি বা ল্যাটিস্‌ওয়ার্ক ঘেরা একটা তলাও আছে, তাই থেকে রাস্তাটার নাম হয়েছে ঝাঁঝরিতলাও রোড।

কেরী বলল, রাস্তার পশ্চিমে আগাগোড়া জঙ্গল দেখছি!

রাম বসু বলল, ঐ জঙ্গলের মাঝে মাঝে আছে বড় বড় সব জলা, আর তার চারদিকে নলখাগড়ার বন।

টমাস বলল, এখন তো জঙ্গল প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, দশ বছর আগে যা দেখেছি!

এর চেয়েও বেশি ছিল নাকি?

বেশি? ওয়ারেন হেস্টিংস ওখানে হাতী নিয়ে বাঘ শিকারে আসত।

'বাঘ' শব্দে মিসেস কেরী কান খাড়া করল।

কেরী দেখল, সমূহ বিপদ। সে বুঝেছিল বাঘ জন্তুটার চেয়ে বাঘ শব্দটা কম মারাত্মক হবে না মিসেস্ কেরীর কাছে। প্রসঙ্গান্তরে যাওয়ার আশায় শুধাল, এখানে নিশ্চয়ই নয়?

টমাস বলল, না, ঠিক এখানে নয়, আর একটু দক্ষিণে, বির্জিতলাও বলে সে জায়গাটাকে।

রাম বসু তো কেরীর রাত্রির অভিজ্ঞতা জানে না, পাছে বাঘের আশঙ্কায় ঘাটতি পড়ে দেশের গৌরব কমে, তাই বলল, অতদিনের কথায় কাজ কি, এই সেদিন আমরা দিনের বেলায় খিদিরপুরে নালার কাছে বাঘের মুখে পড়েছিলাম—কেমন না, পার্বতী দাদা?

বাঘ বলে বাঘ! সারা অঙ্গে কালো কালো ডোরা কাটা। মনে পড়লে এখনও গা শিউরে ওঠে—এই বলে পার্বতী একবার নড়ে-চড়ে বসল।

কেরী ভাবল, যেখানে বাঘের ভয়, সেখানেই সন্ধ্যাগম ঘটে!

মিসেস কেরী স্বামীর দিকে তাকিয়ে ধিক্কারের সুরে বলল—ভাল দেশে এনেছ!

এমন সময় একটা হাতী দেখে কেরী ভাবল, যাক, হাতীতে আজ রক্ষা করল বাঘের হাত থেকে।

কেরী বলল, ঐ দেখ।

সকলে দেখতে পেল গজেন্দ্রগমনে প্রকাণ্ড এক হাতী চলেছে, কাঁধের উপরে তার মাহুত, আর পিছনে জন দুই-তিন বর্শাধারী পাইক।

কিন্তু কেরী আজ এত সহজে রক্ষা পাবে না।

মিসেস কেরী উদ্বিগ্নভাবে বলল, বাঘ শিকারে চলেছে বুঝি ?

টমাস ব্যাপারটা অনুমান করতে পেরেছিল, তাই বলল, না না, এদিকে বাঘ কোথায় ? আর দু-চারটে থাকলেও তারা মানুষ খায় না।

কেন, সবাই বাইবেল পড়েছে বুঝি ?—পত্নীর এবম্বিধ অখ্রীষ্টানোচিত উক্তিতে মর্মাহত কেরী প্রমাদ গুনল।

রামরাম বসু মনে মনে বলল—বাঘগুলো এখনও বাইবেল পড়ে নি তাই রক্ষা !

রাস্তার দু পাশে বরাবব কাঁচা নালা, মাঝে মাঝে যেখানে বেশি জল জমেছিল সেখানে এখনও জল শুকোয় নি। জলে অনেকদিনের অনেকরকম আবর্জনা পচে দুর্গন্ধ উঠছে ; যেখানে আবর্জনার স্তূপ বেশি সেখানে কুকুরে শালিখে কাকে টানাটানি শুরু করেছে। এমন সময়ে উৎকট পচা গন্ধে সকলে সচকিত হয়ে উঠল। কিন্তু অধিক সন্ধান করতে হল না—একটা মৃত অর্ধভুক্ত নরদেহ আড়াআড়ি ভাবে রাস্তার উপরে শায়িত, গোটা চার-পাঁচ বীভৎস শকুনি মাংস ছিঁড়ছে। গাড়ির চাকার শব্দে তারা উড়ে নালার ওপারে গিয়ে বসল। এতক্ষণ গোটা দুই কুকুর শকুনের পাখাশাপটের ভয়ে কাছে ঘেঁষতে পারছিল না, সুযোগ বুঝে এবারে তারা মৃতদেহের উপরে গিয়ে পড়ল। ওদিকে স্বত্ব যায় দেখে শকুনিগুলো পাখা ঝাপ্‌টে কর্কশ ধ্বনি শুরু করে দিল।

বাঘের আশঙ্কায় কেরী-পত্নী ভয় পেয়েছিল মাত্র, কিন্তু এ দৃশ্যে তার এমন জুগুপ্সা উপজাত হল যে, নাকে চোখে রুমাল চাপা দিয়ে গাড়ির পিঠদানিতে মুখ গুঁজল, কেবল মাঝে মাঝে বলতে লাগল—মাই গড ! এ যে নরক, এ যে নরক !

সঙ্কীর্ণ কাঁচাপথ, তাতে অসমান। বর্ষার কাদা চক্রচিহ্নে শতধা-বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল, এতদিনে তা শুকিয়েছে বটে, কিন্তু এখনও বন্ধুরতা লোপ পায় নি, তার উপরে ঘটেছে ধুলোর প্রাদুর্ভাব। রোদ বাড়বার সঙ্গে যানবাহনের চলাচল বাড়ল, উড়ল পাঁশুটে রঙের ধুলো। চিত্রবিচিত্র করা পালকি চলেছে বেহারাদের কিম্ভুত সুরের তালে তালে ; ফিটন, বুহাম, ল্যাণ্ডো, বগি, ব্রাউনবেরি চলেছে ঘোড়ার ক্ষুরে ক্ষুরে প্রচুর ধুলো উড়িয়ে ; কখনও বা টাট্টুঘোড়ায় স্বল্পবেশ আরোহী, বাঁক কাঁধে চলেছে গাঁয়ের লোক, প্রকাণ্ড গোলপাতার ছাতা মাথায় পথিক, আর গাড়ি একটু থামবামাত্র এসে জোটে ভিক্ষুকের দল, ছেলে-বুড়ো, স্ত্রীলোক। কেরী ও কেরী-পত্নীর চোখে সবই নূতন। কেরী ভাবে, এই তো সত্যধর্ম প্রচারের উপযুক্ত স্থান ; কেরী-পত্নী ভাবে, একগুঁয়ে স্বামীর হাতে পড়ে সভ্যজগতের বাইরে এসেছি, পাশেই সেই ভয়াবহ স্থান নরক !

ঐ সুন্দর বাড়িটা কার ? শুধায় কেরী।

মিঃ লিণ্ড্‌সে নামে একজন ইংরেজের, আসাম থেকে হাতী আর কমলালেবু চালান দিয়ে বিস্তর টাকা করেছে লোকটা, বলে রামরাম বসু।

চৌরঙ্গী রোডের পুবদিক বরাবর বড় বড় হাতাওয়ালা বাড়ি, পশ্চিমদিকের মাঠে

জলা-জঙ্গল আর নলখাগড়ার বন।

এ রাস্তাটা কোন্ দিকে গেল ?

নেটিভ পল্লীর ভিতর দিয়ে শহরের পুবদিকে জলা পর্যন্ত গিয়েছে।

কি নাম রাস্তাটার ?

জানবাজার রোড, ফেরবার সময় আমরা এই পথেই ফিরব।

প্রশ্নোত্তর চলে কেরী ও টমাসের মধ্যে।

গাড়ি আর একটু এগোতেই হঠাৎ টমাস বলে ওঠে, এই কোচম্যান, রোখো রোখো।

গাড়ি থামে।

টমাস বলে, ডাঃ কেরী, এই চৌমাথার ভূগোল তোমাকে বুঝিয়ে দিই, আশা করি চিত্তাকর্ষক হবে।

এই বলে টমাস শুরু করে—চৌরঙ্গী রোডের এখানে শেষ, এবারে ঐ শুরু হল কসাইটোলা স্ট্রীট। এ রাস্তাটাকে কলকাতার চীপসাইড বলা যেতে পারে। ইওরোপীয, আর্মেনিয়ান, চীনা আর নেটিভদের যত-সব নামকরা বড় বড় দোকান কলকাতার চীপসাইড এই কসাইটোলাতে। খাট-চৌকি-পালঙ থেকে পোশাক-আশাক খাদ্যখানা সব মিলবে এখানে। মিসেস কেরী, তুমি যেন এ রাস্তাটার নাম ভুলো না। কলকাতায় ঘর করতে হলে 'Daintic Davie'-র দোকানে আসতেই হবে। আর কিছু নয়, শুধু একখানা ফর্দ রেখে গেলেই দু' ঘণ্টার মধ্যে সব জিনিস তোমার কুঠিতে পৌঁছিয়ে দেবে।

মিসেস কেরী বিরক্তির সঙ্গে বলল, আমি চৌরঙ্গীর নরক পার হয়ে Daintie Davie কেন, স্বর্গেও যেতে রাজী নই।

তবে তোমার সরকারকে অর্থাৎ নেটিভ স্টুয়ার্ডকে হুকুম করলেই এনে দেবে। কিন্তু সত্য কথা কি জান, নিজে আনাই ভাল।

কেন ?

ওরা টাকার উপর দু আনা দস্তুরি চাপিয়ে বিল করে।

তার মানে, চোর ?

মিসেস কেরী, চোরের দাবী এত বেশি নয়, ওরা ডাকাত !

আর এদের উদ্ধার করবার জন্যেই এসেছে ডাঃ কেরী—বলে রুষ্ট মিসেস কেরী।

ডরোথি, ওদেরই তো আলোর বেশি প্রয়োজন।

তার আগে ওরা তোমার নিজের ঘর অন্ধকার করে ছাড়বে।

কি করে ডিয়ার ?

তোমার তেল চুরি করে।

যখন কেরী, কেরী-পত্নী ও টমাসের মধ্যে এইসব কথাবার্তা হচ্ছিল, রামরাম বসু ও পার্বতী মনে মনে অস্বস্তি অনুভব করছিল, ভাবছিল ওরা আমাদের কোন্ দলের অন্তর্গত ভাবে, চোর না ডাকাত ?

টমাস বলল, আর এই যে রাস্তাটা পুবদিকে গিয়েছে এটার নাম ধর্মতলা। এ রাস্তাটা গিয়েছে দেশী পাড়ায়, অবশ্য কিছু কিছু গরিব ফিরিঙ্গিও বাস করে এদিকে।

কেরী বলল হাঁ, পাড়াটাকে নিতান্ত দীন বলেই মনে হচ্ছে।

মাঝখান দিয়ে সরু কাঁচা রাস্তা, দুদিকে আম কাঁঠাল তেঁতুল বনের মধ্যে গোলপাতার কুঁড়েঘর, কোথাও বা আগাছায় ভরা জলা জমি, আবার কোথাও বা দু-চারখানি পাকা বাড়ি।

মিসেস কেরী বলে উঠল, ওদিকটায় আমি যেতে রাজী নই।

না না, ওদিকে যাব কেন, আমরা যাব পশ্চিমদিকে। এই কোচম্যান, চল এস্‌প্ল্যানেড রো বরাবর—হুকুম করে টমাস।

গাড়ি এস্‌প্লানেড রো ধরে চলে।

টমাস বলে, কাল রাতে আমরা এই পথ দিয়ে এসেছিলাম।

একটু পরে আবার টমাস আরম্ভ করে—এবারে আমরা ওল্ড কোর্ট হাউস স্ট্রীটে এসে পড়েছি। এই রাস্তাটা দক্ষিণদিক বরাবর খিদিরপুর, গার্ডেনরীচ, আলিপুর পর্যন্ত চলে গিয়েছে।

তার পর বিশেষভাবে মিসেস কেরীকে লক্ষ্য করে বলে, একদিন ওদিকে তোমাকে নিয়ে যাব। খুব সুন্দর আর রুচিসঙ্গত সব বাড়িঘর। এদিকটা দেখে তোমার যে অরুচি হয়েছে তার প্রতিকার আছে ঐদিকে।

এমন সময় কেরী বলল, ডরোথি, ঐ প্রকাণ্ড জানোয়ারটা কি বলতে পার?

ডরোথি বলল, কেমন করে জানব, আগে কখনও দেখি নি!

ওটা উট।

উট!

ডরোথি অবাক।

ওর পিছনে ওটা কি?

এবারে টমাস বলল, গাড়ি। এ দেশে উটের গাড়ি চলে। অনেক জায়গায় ও ছাড়া অন্য যানবাহন নেই।

ডরোথির বিস্ময় আরও বাড়ে। তার মনে উটের সঙ্গে সাহারার অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক দাঁড়িয়ে গিয়েছে! এহেন স্থানে সেই উট! পিছনে আবার একটা মস্ত উঁচু গাড়ি জোতা। বিস্ময়ে সে যখন হতবুদ্ধি ও নিস্তব্ধ এমন সময় হঠাৎ চমকে উঠল—

ওগুলো কি? ওগুলো কি পাখী?

গোটাকয়েক হাড়গিলে কোথা থেকে উড়ে এসে মোড়ের মাথায় বড় বাড়িটার আলসের উপর বসল।

মিসেস কেরী শুধায়—প্রকাণ্ড পাখী! ঈগল নাকি?

না, ওগুলোকে বলে হাড়গিলে, Bone-swallower!

কোথায় থাকে?

রামরাম বসু বলল, মাঠের মাঝে যেসব বড় বড় জলা আছে সেখানে ওদের বাস।

এত বড় বাড়িটা খালি পড়ে আছে কেন?—সেই বাড়িটা দেখিয়ে শুধায় কেরী।

ডাঃ কেরী, এত বড় বাড়িতে থাকবে কে? বিশেষ ভিতরটা ভেঙেচুরে গিয়েছে!

নিশ্চয় খুব শৌখিন লোক থাকত?

তোমার অনুমান মিথ্যা নয়, এক সময়ে ওয়ারেন হেস্টিংস বাস করত এখানে। এই যে সামনেই পাশাপাশি গভর্নরের কুঠি আর কাউন্সিল হাউস।

এমন কিছু বড় ব্যাপার নয়।

সেটাই তো এখানকার ইংরেজ সমাজের অভিযোগ। তারা বলে, এর চেয়ে বড় বাড়ি অনেক সওদাগরের আছে।

টমাস বলে চলে—মিসেস কেরী, ঐ যে দূরে চাঁদপাল ঘাট, আর ঐ গঙ্গা—হিন্দুদের

কাছে সবচেয়ে পবিত্র নদী।

মিসেস কেরী অস্পষ্টভাবে কি বলল বোঝা গেল না ; ভালই হল, কারণ খুব সম্ভব সে-কথা উপস্থিত দুইজন হিন্দুর রুচিকর বোধ হত না।

টমাস বলছে—এবারে আমরা কাউন্সিল হাউস স্ট্রীট ধরে উত্তরমুখে ঘুরেছি—আর চলেছি কলকাতার সবচেয়ে পুরনো, ঐতিহাসিক ঘটনাপূর্ণ অংশে। ডাঃ কেরী, এখানকার প্রত্যেক ইষ্টকখণ্ড বিচিত্র ইতিহাসের দ্বারা চিহ্নিত। ঐ যে সুপ্রীম কোর্ট, নেটিভরা বলে—কি বলে মুন্সীজি ?

বড় আদালত।

ঠিক ঠিক। বরা আদালত, অনুবৃত্তি করে টমাস।

ডাঃ কেরী, মিসেস কেরী, এবারে আমাদের নামতে হবে, সুমুখেই সেন্ট জনস্ চার্চ, কলকাতার সবচেয়ে বড় গির্জা, এই সেদিনমাত্র তৈরি হয়েছে। ঐ যে গায়ে তারিখটা স্পষ্ট পড়া যাচ্ছে—'১৭৮৭ অ্যানো ডমিনি'।

৬
পাথুরে গির্জা

গির্জাটি মাত্র বছর কয়েক আগে তৈরি হয়েছে, এখনও সব ঝক্‌ঝক্ তক্‌তক্ করছে, চারদিক ঘিরে ফুলের বাগান।

কেরী ও টমাস গিয়ে গির্জের কাছে নতজানু হয়ে বসল আর প্রার্থনা শুরু করল, পাশে দাঁড়িয়ে রইল রামরাম বসু। মিসেস কেরীর সঙ্গে চলছিল পার্বতী ব্রাহ্মণ। মিসেস কেরী সমস্ত ব্যাপারটার উপরে বীতশ্রদ্ধ হয়ে গিয়েছিল, মুখে চোখে তার ফুটে উঠেছে বিরক্তি। বিনা ভাষায় কিভাবে কেরী-পত্নীর মনোভাব সমর্থন করা যায় তারই চেষ্টা করছিল পার্বতী। কেরী-পত্নী থামে তো পার্বতী থামে, কেরী-পত্নী চলে তো পার্বতী চলে ; কেরী-পত্নী বিরক্তিসূচক 'ইস' বললে পার্বতী অনুরূপ 'ইস' বলে, কেরী-পত্নী আকাশের দিকে তাকালে পার্বতীও একবার আকাশের দিকে তাকায়।

ওদিকে ইতিমধ্যে কেরী ও টমাস উঠে দাঁড়িয়েছে। এতক্ষণে তাদের খেয়াল হয়েছে যে দ্বিতীয় গাড়ি এসে পৌঁছয় নি। কেরী শুধাল—ওরা গেল কোথায় ?

রাম বসু বললে, যাদের বয়স কুড়ির কোঠায়, গির্জা আর গোরস্থান দেখবার আগ্রহ তাদের হবার কথা নয়।

কথাটা টমাসের বড় লাগসই লাগল, সে বলল, মুন্সী, তোমার কথা খুব সত্যি। কুড়ির কোঠায় আমি তো আধখানা শয়তান ছিলাম।

রাম বসু মনে মনে বলল, এখন পুরো শয়তান হয়েছ, জুয়োর আড্ডা তোমার গির্জে, মদের বোতলে তোমার জর্ডানের দীক্ষাবারি। দাঁড়াও না, একদিন টুশকির বাড়ি নিয়ে যাই, তখন পরীক্ষা হবে তোমার খ্রীষ্ট-ভক্তির !

কেরী গির্জার চূড়ার দিকে তাকিয়ে রাম বসুকে বলল, মিঃ মুন্সী, অদূর ভবিষ্যতে পৃথিবীর সব জাতের আশ্রয় হবে প্রভু খ্রীষ্টের এই গির্জা, সব ধর্মের লোক এসে এখানে

হাত মেলাবে।

রাম বসু বলল, ডাঃ কেরী, আপনার কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য, কিন্তু তার জন্যে ভবিষ্যতের আশায় বসে থাকতে হবে না।

রাম বসুর কথায় কেরীর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল, ব্যস্তভাবে শুধাল, কি রকম ?

তবে এ গির্জা তৈরির ইতিহাস শুনুন, বুঝতে পারবেন কত জাত আর কত ধর্মের সমবায়ে এ গির্জা গঠিত।

এই বলে রাম বসু সেণ্ট জন গির্জা তৈরির ইতিহাস বলতে শুরু করল—

একজন হিন্দু রাজার দত্তা জমিতে এর ভিত্তিপত্তন, আর গির্জার পাথর আনা হয়েছে রাজমহল বলে একটা জায়গার নবাবী প্রাসাদ ভেঙে। সেই সুবাদে দেশীয় লোকেরা এটাকে বলে 'পাথুরে গির্জা'। কাজেই দেখতে পাচ্ছেন যে, হিন্দু-মুসলমান ও খ্রীষ্টানের মিলন ইতিমধ্যেই ঘটেছে গির্জা গঠনে !

এখন, কেরী ও টমাস ধর্মবাতিকগ্রস্ত না হয়ে সাধারণ মানুষ হলে রাম বসুর কথা কি ভাবে গ্রহণ করতে হবে বুঝতে পারত, কিন্তু ওরা পারে না, ওরা ভাবে রাম বসু মস্ত একটা ভাবের কথা বলেছে, মুন্সীর প্রতি তাদের ভক্তি বাড়ে। ভক্তি জিনিসটারই ঐ প্রকৃতি ; প্রেম যদি অন্ধ হয়, ভক্তি অবুঝ।

কেরী বলল, শুধু তাই নয়, এমন সময় একদিন আসবে, যখন জগতে যুদ্ধবিগ্রহ থাকবে না, অস্ত্রাগারের উপর গড়ে উঠবে গির্জা।

রাম বসু বলল, পাদ্রী সাহেব, আপনার দিব্যদৃষ্টি না থেকে যায় না। অস্ত্রাগারের উপরেই গড়ে উঠেছে গির্জাটি, তবে ঠিক অস্ত্রাগার নয়, বারুদখানা। এই জায়গায় এক সময়ে কোম্পানির বারুদখানা ছিল।

কেরী সোৎসাহে বলল, মুন্সী, অদ্ভুত তোমার ব্যাখ্যা করবার শক্তি। তোমার মত ব্যাখ্যাতা পেলে এদেশে প্রভুর করুণা বিতরণ করতে বেশি সময় লাগবে না।

বসুজা মনে মনে বললে, প্রভুর করুণার জন্যে আমার বা আমার দেশের লোকের মাথাব্যথা নেই। আগে প্রভুর চেলাদের করুণার বহর বুঝি। কিন্তু ব্যাপার দেখে মনে হচ্ছে মুঠো খুব শক্ত, মাসিক কুড়ি টাকার বেশি করুণা আদায় করতে পারলাম না।

কেরী বলল, মুন্সী, তুমি কি ভাবছ ? বসুজার উত্তর না পেয়ে কেরী বলল, আগামী কালে জগতের শুশ্রূষার স্থান হবে গির্জা।

বসুজা অত্যন্ত বিস্ময় প্রকাশ করে টমাসের উদ্দেশে বলল, ডাঃ টমাস, আজ ডাঃ কেরীর মুখে যে একেবারে ভবিষ্যদ্ভাষণের খই ফুটছে !

টমাস কিছু বুঝল না, তবু এমন কথায় সন্দেহ প্রকাশ অভদ্রতা জ্ঞানে বলল, নিশ্চয়, নিশ্চয়।

এই দেখ না কেন, আর কয়েক গজ উত্তরদিকে এক সময়ে ছিল কোম্পানির আমলের হাসপাতাল— শুশ্রূষার অভাব হচ্ছিল বলেই বোধ করি প্রভুর আদেশে পাশে গড়ে উঠল গির্জা।

টমাস বলে উঠল—চমৎকার।

রাম বসু বলল, কিন্তু চমৎকারের সবটা এখনও বুঝতে পার নি। প্রভু খ্রীষ্টের চেয়ে খ্রীষ্টানদের দূরদৃষ্টিও কিছু কম নয়। দেখ কেমন ব্যবস্থা—কেল্লা, হাসপাতাল আর গোরস্থান কেমন পাশাপাশি তৈরি করেছিল—এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যাতায়াতে বেশি

সময় লাগত না।

কেরী জিজ্ঞাসা করল, কেল্লা তো কাছেই শুনেছি, কিন্তু গোরস্থান?

রাম বসু ও টমাস দুজনে একযোগে বলল—এই জায়গাতেই ছিল খ্রীষ্টানদের প্রাচীনতম গোরস্থান।

বল কি!

টমাস বলল, একটা হিসাবে দেখেছিলাম যে, নূতন বেরিয়াল গ্রাউণ্ড খোলবার আগে এখানে বারো হাজার লোকের সমাধি দেওয়া হয়েছিল।

এইটুকু জায়গায়? তার মানে, একজনের উপরে আর একজনকে সমাধিস্থ করা হয়েছে?

তা হয়েছে বই কি!

রাম বসু বলল, শেষ বিচারের হুড়োহুড়ি পড়ে যাবে, উপরের জন না উঠলে নীচের জনের ওঠবার উপায় থাকবে না।

ঐ সমাধি-স্তম্ভটা কার?

জব চার্নকের। তাকেই বলা যেতে পারে কোম্পানির কলকাতার প্রতিষ্ঠাতা।

চল দেখে আসি।

যখন তারা তিনজন সমাধি-স্তম্ভ দেখবার জন্যে অগ্রসর হল, সেই অবসরে মিসেস কেরী এসে উঠে বসল গাড়িতে, অগত্যা পার্বতীকেও উঠে বসতে হল।

কেরী-পত্নী গায়ের শালখানা খুলে পাশে রাখল। এহেন অবস্থায় কি কর্তব্য স্থির করতে না পেরে বেশ শীত অনুভূত হওয়া সত্ত্বেও পার্বতী বলল, আজ বেশ গরম!

কেরী-পত্নী তার সমর্থন বা প্রতিবাদ কিছুই না করে চুপ করে বসে রইল।

ওদিকে জব চার্নকের সমাধির কাছে গিয়ে আনুপূর্বিক ইতিহাস শুনে সধিক্কারে সবিস্ময়ে কেরী শুধাল—তুমি কি বলতে চাও একজন হিদেন রমণীকে নিয়ে কলকাতায় প্রতিষ্ঠাতা বাস করত? খ্রীষ্টান সমাজ স্বীকার করেছিল এ বিবাহ?

ছেলেমেয়ে হল, খ্রীষ্টান সমাজে তাদের বিয়ে হল, জামাই সরকারী বড় কাজ পেল, এক জামাই গড়ে দিল এই স্মৃতিস্তম্ভ। স্বীকার করা আর কাকে বলে?

কি সর্বনাশ! চল, চল।

বহুকাল পূর্বে মৃত জব চার্নকের অখ্রীষ্টানোচিত কাজের প্রতিবাদেই যেন কেরী দ্রুত স্থানত্যাগ করল।

টমাস বলল, কাছেই আরও দুটো দর্শনীয় বস্তু আছে—পুরাতন কেল্লা আর ট্যাঙ্ক স্কোয়ার।

কেরী বলল, তবে এটুকুর জন্যে আর গাড়ি চড়ে কাজ নেই, চল হেঁটেই যাওয়া যাক।

তার পর স্ত্রীর উদ্দেশে বলল, ডরোথি, এস না, নাম, একটু হাঁটা যাক।

পত্নী বিরক্তির চরম সুরে বলল, আমি নামতেও রাজি নই, হাঁটতেও রাজী নই, কিছু দেখতেও রাজী নই।

তখন টমাস কোচম্যানকে বলল, তুমি গাড়ি নিয়ে গিয়ে লালবাজারে রোপওয়াকের কাছে অপেক্ষা কর আমরা এখুনি আসছি।

গাড়ি ডরোথিকে নিয়ে রওনা হল, সঙ্গে রইল পার্বতী ব্রাহ্মণ।

এদিকে কেরী, টমাস ও রাম বসু পদব্রজে পুরাতন কেল্লার দিকে এগিয়ে চলল।

৭
ওল্ড ফোর্ট

আস্ত দুটো সাহেব দেখে দারোয়ান সেলাম করে গেট খুলে দিল। না খুললেও ক্ষতি ছিল না, প্রাচীর জায়গায় জায়গায় ভেঙে পড়ে চতুষ্পদ ও দ্বিপদের জন্য স্বাভাবিক দরজা সৃষ্টি করে রেখেছে। তবু যখন কেল্লা, হক পুরাতন আর অব্যবহৃত, একটা গেট আছে। আর গেট যখন আছে, অবশ্যই একজন গেটকীপার বা দারোয়ানও আছে।

ভিতরে প্রবেশ করে কেরী, টমাস ও রাম বসু দেখল জনশূন্য ভগ্নপ্রায় বাড়িগুলো নিরর্থক পড়ে আছে, দরজা-জানলার অধিকাংশই ভাঙা।

রাম বসু ও টমাস আগেও দু' একবার এর ভিতরে ঢুকেছে। এবার কেরীকে দেখাবার জন্যেই প্রবেশ, নইলে তাদের কোন আগ্রহ ছিল না।

স্বদেশে থাকতেই 'ব্ল্যাক হোল ট্রাজেডি' বা 'অন্ধকূপ হত্যা'র সংবাদ কেরীর কানে পৌঁছেছিল, তাই সে ঘরটা দেখবার আগ্রহ প্রকাশ করল।

রাম বসু বলল, সেদিকে যাওয়া যাক।

কেরী বলল, ততক্ষণ পুরনো কেল্লার ইতিহাস বল, সব কথাই তোমার জানা থাকবার কথা, মিঃ মুন্সী!

মুন্সী অর্থাৎ রাম বসু বলল, তা আপনি নেহাৎ মিথ্যা বলেন নি। কলকাতা শহরেই আমার বাস, এখানেই আমার জন্ম, আর জন্মসালটাও নাকি ১৭৫৭, যে বছর পলাশীর যুদ্ধে কোম্পানির ফৌজ নবাবকে হারিয়ে দেয়।

তাহলে তুমি নিশ্চয় লর্ড ক্লাইভকে দেখেছ?

লর্ড ক্লাইভ, ওয়ারেন হেস্টিংস, সার ফিলিপ ফ্রান্সিস—কাকে দেখি নি! একদিন সকালবেলায় এদিকে এসেছিলাম চীনাবাজারে। দেখলাম একজন সাহেব ঘোড়ায় চড়ে চলেছেন, সঙ্গে কয়েকজন ফৌজী ঘোড়সওয়ার। জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলাম—জঙ্গী লাট ক্লাইভ। সত্য কথা বলতে কি, দেখে বীরপুরুষ বলে মনে হল না। আরও শুনলাম, গোবিন্দপুরে যে নতুন কেল্লা তৈরী হচ্ছে তাই দেখতে চলেছেন।

টমাস বলল, আরে বীরপুরুষ কি অষ্টপ্রহরই বীরপুরুষ! তা নয়। তারা যুদ্ধক্ষেত্রে বীর, অন্য ক্ষেত্রে আমাদের মতই মানুষ।

আর ওয়ারেন হেস্টিংসকে দেখেছিলাম, ওল্ড পোস্ট অফিস স্ট্রীটের মোড়ের বাড়িটায়, এখন যার পাশে মিসেস ফে নামে এক ইংরেজ রমণী কাপড়ের দোকান খুলেছে। হঠাৎ তাকে দেখে কোন ইংরেজ কেরানী বলে মনে করেছিলাম। পরিচয় জেনে পালিয়ে বাঁচি।

কেরী কৌতূহল বোধ করল, শুধাল, হঠাৎ পালাতে গেলে কেন? লোকটা কি রূঢ় ব্যবহার করত?

না না, এদেশী লোকের সঙ্গে ওয়ারেন হেস্টিংস সর্বদা মিষ্ট ব্যবহার করত। কিন্তু কি জানেন ডাঃ কেরী, বৃদ্ধ চাণক্য রাজপুরুষ থেকে শত হস্ত দূরে থাকতে উপদেশ দিয়েছেন। কোন রাজপুরুষ যদি আজ বলে বসে, বসু, তোমার মুখটি বেশ সুন্দর, তখনই ঘরে গিয়ে মাথা নেড়া করে মুখটা যথাসাধ্য বীভৎস করে তোলবার চেষ্টা করব।

তার কথায় কেরী ও টমাস দুজনে হেসে উঠল। হাসলে কেরীর উপরের পাটিতে দুটি অর্ধভগ্ন দাঁত দেখা যায়।

আর সার ফিলিপকে ? জিজ্ঞাসা করে কেরী।

আদালতে বিচারের সময়ে তাকে দেখবার সুযোগ পেয়েছিলাম।

তিনি কি ছিলেন, জজ না কৌঁসুলী ?

ও দুয়ের কোনটাই নয়। আসামী।

আসামী ! অত বড়লোক ! বিস্ময় প্রকাশ করে কেরী। কি অপরাধ ?

সেসব কথা আপনার মত ধর্মপ্রাণ লোকের শুনে কাজ নেই।

টমাস সব কথাই জানত, সে মুচকে হাসল।

এই যে অন্ধকূপের কাছে এসে পড়েছি—রাম বসু কেরীব মনোযোগ সেদিকে আকর্ষণ করল।

ইতিহাস-কুখ্যাত অন্ধকূপ গৃহ এখন পরিত্যক্ত ও জীর্ণ। দরজা ঠেলে প্রবেশ করতেই একটা ভ্যাপসা গন্ধ তিনজনের নাকে গেল—তার পরেই গোটা দুই বাদুড় পাখা ফড়ফড় করে উড়ে চলে গেল মাথার উপর দিয়ে বাইরের দিকে। চোখ অন্ধকারে অভ্যস্ত হয়ে এলে তিনজনে দেখল এক কোণে স্তূপাকারে পড়ে রয়েছে চুন-সুরকি, কতকগুলো ভাঙা লোহা-লক্কড়।

টমাস বলল, ঘরটা এখন গুদামে পরিণত হয়েছে।

ঐ গরাদে-দেওয়া উঁচু জানলা দিয়ে নবাবের সেপাই বন্দীদের জল দিয়েছিল।

এই বলে জানলাটার দিকে তাকিয়েই রাম বসু বলল—ইস্, সর্বনাশ ! আসুন, বাইরে আসুন।

এই বলে কেরীকে হাত ধরে টেনে বাইরে নিয়ে এল—সঙ্গে সঙ্গে টমাসও বাইরে এল।

কি হল ?

প্রকাণ্ড মৌচাক। আমাদের সাড়া পেয়ে গুনগুন শুরু করেছে—তাড়া করলে আর রক্ষা নেই, দ্বিতীয় অন্ধকূপ হত্যা ঘটিয়ে ছাড়বে।

রাম বসু বলল, তার চেয়ে আসুন বাইরে যেতে যেতে পুরনো কেল্লার ইতিহাস যতটুকু জানি বলি।—

এই শতাব্দীর গোড়ার দিকে এই কেল্লার পত্তন হয়। সমস্তটাই ইটের তৈরী। একদিকে ঐ দিঘি, আর একদিকে গঙ্গা—যদিচ এখন গঙ্গাকে ঠেলে অনেকটা দূরে সরিয়ে দিয়ে সে জায়গায় রাস্তাঘাট আর বাড়ি তৈরি হয়েছে। তখনকার দিনে কোম্পানির যাবতীয় অফিস, গুদাম, ফ্যাক্টরি আর কেরানীদের থাকবার জায়গা এর মধ্যেই ছিল। আর খোদ গভর্নর সাহেবও এখানে থাকতেন, যদিচ নামে মাত্র।

কেন, নামে মাত্র কেন ?

কার্যত তিনি কেল্লার বাইরে দক্ষিণ-পশ্চিম কোণের বড় বাড়িটায় থাকতেন, এখন সেখানে কাস্টম বিভাগের আপিস।

সে আবার শুরু করল—ডাঃ কেরী, ঐ যে বড় হল-ঘরটা দেখছেন, সেণ্ট জন চার্চ তৈরি হওয়ার আগে ওটা প্রেয়ার-হল রূপে ব্যবহৃত হত।

টমাস বলল, ওখানে মেয়েদের পালকি থেকে নামতে বড় অসুবিধা হত। একদিন—

সেদিন বৃষ্টি হচ্ছিল—গভর্নরের পত্নী এলেন পালকিতে। তিনি নামতে যাবেন, কখন স্কার্ট বেধে গিয়েছে একটা কাঁটায়—সবসুদ্ধ সে এক লজ্জাকর বীভৎস ব্যাপার। সেই দিনই স্থির হল—না, এমন করে চলে না, শহরের যোগ্যতা মাফিক গির্জা গড়তে হবে। উপাসনার শেষেই চাঁদার আবেদন জানানো হল।

কথা বলতে বলতে তিনজন কেল্লার বাইরে এসে পৌঁছল—আর রাস্তাটুকু পার হয়ে ট্যাঙ্ক স্কোয়ারে ঢুকল।

৮
ট্যাঙ্ক স্কোয়ার বা লালদিঘি

রামরাম বসু বলল, ডাঃ টমাস, একবার ছেলেবেলায় এখানে কমলালেবু চুরি করতে এসে বারওয়েল সাহেবের চাপরাসীর তাড়া খেয়েছিলাম। ধরা পড়ি আর কি! আমি তো ছুটে পালালাম। কিন্তু পার্বতী ভায়ার দুরবস্থার একশেষ। সে বরাবরই একটু মোটা—পালাবার অন্য উপায় না দেখে জলে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে ঐদিকে উঠে পালাল।

কেরী বিস্ময়ের সঙ্গে শুধাল, এখানে কমলালেবু গাছ ছিল নাকি?

ছিল বই কি। সিলেট থেকে কমলালেবুর চারা এনে পুঁতেছিল। আরও কত ফলের ও ফুলের গাছ ছিল।

কেরী শুধায়, তবে এখন এমন লক্ষ্মীছাড়া দশা কেন?

তখন অর্থাৎ কোম্পানির রাজত্বের প্রথম আমলে এই ট্যাঙ্ক স্কোয়ারটাই ছিল সাহেব-মেমদের হাওয়া খাওয়ার একমাত্র স্থান—তাই জায়গাটাকে সুন্দর করে সাজিয়েছিল। পলাশীর যুদ্ধের পরে সাহেব-সুবোরা শহরের মধ্যে চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে, চাঁদপাল ঘাটের কাছে যেখানে জলা আর জঙ্গল ছিল, সেখানে সুন্দর এস্‌প্ল্যানেড গড়ে তুলেছে। তাই এ জায়গাটার উপর আর তেমন লক্ষ্য নেই।

টমাস বলল—শুধু হাওয়া খাওয়ার একমাত্র জায়গা ছিল না, জল পানেরও একমাত্র পুকুর ছিল।

কিন্তু তা এখনও আছে।

কেরী শুধাল, এই কি পানীয় জল?

পানীয় জল বই কি। সাহেবপাড়ার সমস্ত পানীয় জল এখানে থেকে সরবরাহ হয়।

কেরী বলে—বল কি! ঐ তো দেখছি দুটো কুকুর নেমেছে জলে!

শুধু কুকুর? সুযোগ পেলে লালবাজারের কোচম্যানের দল এখানে ঘোড়া এনে স্নান করিয়ে নেয়। ঐ দেখুন ভিস্তি করে জল নিয়ে যাচ্ছে সাহেববাড়ির জন্যে।

তিনজনে দেখল, পুবদিকের ঘাটে নরনারী স্নান করছে, ভিস্তিওয়ালা ভিস্তি ভরছে। তারা সুরকি-ঢালা পথ ধরে লালদিঘির উত্তরদিক দিয়ে পুবমুখে চলল।

কেরী বলল, শুনেছি এটার নাম লালদিঘি, রেড ট্যাঙ্ক। নামটার অর্থ কি?

টমাস বলল—ঠিক অর্থ কেউ জানে না, নানা লোকের নানা অনুমান। কেউ কেউ বলে, এক সময় পুরনো কেল্লার প্রাচীরের লাল রঙ দিঘির জলে প্রতিফলিত হয় তাই

নাম হয়েছিল লালদিঘি।

কেরী জিজ্ঞাসা করে, উত্তরদিকের ঐ লম্বা বাড়িটা কি?

ওটার নাম রাইটার্স বিল্ডিং। নীচের তলায় কোম্পানির আপিস। দোতলায় নবাগন্তুক রাইটারদের বাসস্থান। আর ঐ পুবদিকে দেখা যাচ্ছে—ওল্ড মিশন চার্চ।

ওটাই কি শহরের সবচেয়ে পুরনো গির্জা?

সবচেয়ে পুরনো গির্জাটা মুর্গীহাটা নামে এক জায়গায়। সেটাকে বলে আর্মেনিয়ান গীর্জা। আর একটা পুরনো গির্জা ছিল রাইটার্স বিল্ডিঙের ঐ পশ্চিম-উত্তর কোণে। নাম ছিল সেণ্ট অ্যানস্ চার্চ। এ পাড়ায় ওটাই ছিল একমাত্র গির্জা—কেল্লার ঠিক সামনেই।

সেটা গেল কোথায়?

সিরাজদ্দৌল্লা যখন কলকাতা আক্রমণ করে তখন কামানের গোলায় ভেঙে যায়, অনেককাল ভাঙা অবস্থায় পড়ে ছিল, তার পর সরিয়ে ফেলে জায়গাটা পরিষ্কার করা হয়েছে।

আর ওটা?

ওটা সেণ্ট অ্যান্ড্রুজ চার্চ, এই গত বছর মাত্র তৈরি শেষ হয়েছে।

তার আগে ওখানে কি ছিল?

ওখানে ছিল মেয়রের আপিস আর আদালত, ঐ আদালতেই মহারাজা নন্দকুমারের বিচার হয়েছিল।

কেরী বলল, দেখ টমাস, প্রভু খৃষ্টের কি মহিমা, আদালতের উপরে উঠল গির্জার চূড়া।

টমাস বলল, রাইটার্স বিল্ডিঙের উত্তরে একটা বড় বাড়িতে থাকত লর্ড ক্লাইভ, সেটা এখনও খালি পড়ে আছে। তারই কাছে ছিল পুরনো থিয়েটার আর সার ফিলিপ ফ্রান্সিসের প্রথম বাসস্থান। যাবে ওদিকে?

কেরী বলল, আজ আর যাব না, চল ফেরা যাক—মিসেস কেরী অনেকক্ষণ একলা আছে।

তখন তিনজনে ওল্ড কোর্ট হাউস স্ট্রীট পেরিয়ে এসে রোপওয়াকের মোড়ে গাড়িখানা দেখতে পেল। গাড়িতে উঠলে মিসেস কেরী স্বামীকে বলল—তবু ভাল যে ফিরেছ। এত কি দেখবার ছিল?

প্রভুর মহিমা দেখছিলাম, চারদিকে গির্জা উঠছে।

প্রভুর মহিমা গাড়িতে বসেও দেখতে পারতে। ভবিষ্যতে যখন প্রভুর মহিমা দেখতে বেরুবে আমাকে বাড়িতে রেখে বেরিও।

গাড়ি চলল।

টমাস বলল—ডানদিকে ছিল পুরনো জেলখানা, এখন উঠে গিয়েছে টালির নালার কাছে।

কেরী শুধাল, এ রাস্তাটার নাম কি?

এটা দি অ্যাভিনিউ, সবচেয়ে পুরনো রাস্তা। কেল্লার গেট থেকে বেরিয়ে বরাবর সিধে চলে গিয়েছে বৈঠকখানার বড় বটগাছটা পর্যন্ত, তার নীচেই বিখ্যাত মারহাট্টা ডিচ। তার পরেই আরম্ভ হল—বাদা—মানে মার্শল্যাণ্ড।

বাঁয়ে চিৎপুর রোড, ডাইনে কসাইটোলা রেখে গাড়ি চলে দি অ্যাভিনিউ ধরে।

৯
বিয়ার বোতলের লড়াই

জন স্মিথদের গাড়ি গঙ্গার ধার দিয়ে ঘুরে নূতন কেল্লা ও এস্‌প্ল্যানেড হয়ে যখন সেণ্ট জন গির্জার কাছে পৌঁছল তখন তারা দেখল যে, সেখানে কেরীদের গাড়ি নেই। জন ভেবেছিল এখানে কেরীদের পাবে, আর একসঙ্গে ফিরবে। তখন দু-একজন লোককে জিজ্ঞাসাবাদ করে জানল যে, একখানা গাড়ি অনেকক্ষণ আগে এসেছিল বটে, কিন্তু কিছুক্ষণ হল চলে গিয়েছে। শুনে জন কোচম্যানকে হুকুম করল পুরনো কেল্লা হয়ে অ্যাভিনিউ-র দিকে চলতে।

গাড়িখানা যখন লালদিঘির উত্তরদিকে এসে পৌঁছেছে তখন গাড়ির আরোহীরা দেখতে পেল, রাইটার্স বিল্ডিঙের দোতলায় কয়েকজন শ্বেতাঙ্গ যুবক রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে পথের লোকচলাচল দেখছে।

জন কেটির উদ্দেশে বলল, এরা সব বাচ্চা নবাব।

কেটি বলল, তার মানে?

কোম্পানির রাইটার, সবে ইংল্যাণ্ড থেকে এসে পৌঁছেছে। এখনও এদের নবাবীর ট্রেনিং সম্পূর্ণ হয় নি, হলেই পুরোদস্তুর নবাব হয়ে দেশ শাসন শুরু করে দেবে।

তার পর নিজের মনেই যেন আক্ষেপ করে বলল, এদের আচরণের ফলে এ দেশে ইংল্যাণ্ডের সুনাম ক্ষুণ্ণ হচ্ছে।

কেটি শুধাল—এরা এখানে কেন?

দোতলায় এদের বাসস্থান, নীচের তলায় অফিস।

কেটি বলল, এখনও রাত-পোশাক ছাড়ে নি দেখছি।

তা না হলে আর নবাব বলছি কেন! ওরা এই পোশাকেই আপিসে যাবে, পোশাক বদলাবে ডিনারের আগে। ওদের কাছে ওটাই হচ্ছে গিয়ে দিবসের শ্রেষ্ঠ কর্তব্য।

ইতিমধ্যে শ্বেতাঙ্গ যুবকগণ গাড়ির আরোহীদের দেখতে পেল। প্রথমে এ ওকে ইশারায় গাড়িখানা দেখাল, তার পর সকলে একযোগে উল্লাসের হল্লা করে উঠল। সে রকম হল্লা কুড়ির নীচে ও পঁচিশের উপর কারও পক্ষে করা সম্ভব নয়। তাদের উল্লাসের যথেষ্ট কারণ ছিল। শ্বেতাঙ্গিনী দুর্ভিক্ষের বাজারে একসঙ্গে দুটি শ্বেতাঙ্গিনী সুন্দরীর অকস্মাৎ একবারে বাড়ির দরজায় আবির্ভাবে খুশি হয়ে না ওঠে এমন যুবকের অস্তিত্ব ইংলিশ চ্যানেলের পশ্চিমদিককার দ্বীপটিতে সম্ভব নয়। সতীর্থদের হল্লায় আরও জনকয়েক ঘর থেকে বেরিয়ে এল—এবারে সংখ্যা হল পনেরোর কাছাকাছি! কেটি ও লিজার উদ্দেশে চীৎকার করে উঠল 'সুইটি', কেউ চীৎকার করে বলল 'ডারলিং'।

কেটি ও লিজা মনে মনে কৌতুক ও কৌতূহল অনুভব করল—জনেরও মন্দ লাগছিল না।

কেটি ভাবছিল, তারা দুটি যুবতী পাশাপাশি থাকলেও যুবকমন সৌন্দর্যের অর্ঘ্য নিবেদন করে তারই উদ্দেশে। অবশ্য লিজাও নীরবে ঠিক ঐ কথাই ভাবছিল—ভাবছিল, কেটি নিতান্তই উপলক্ষ্য, আসল লক্ষ্য সে নিজে।

এমন সময় একটি যুবক ইশারা ও হাসির আশ্রয় ছেড়ে কবিতার আশ্রয় গ্রহণ করল, সে গেয়ে উঠল—

"There's no lady in the land
Half so sweet as Sally ;
She is the darling of my heart,
And she lives in our alley."

বন্ধুরা বিপুল হাস্যে তাকে সমর্থন জানাল, তখন সে আবার গাইল—

"But when my seven long years are out,
O then I'll marry Sally.
O then we'll wed, and then we'll bed,
But not in our alley."

গানের তাৎপর্যের সঙ্গে তাদের শিক্ষানবিশী জীবনের তাৎপর্য মিলে গেল দেখে বন্ধুরা মহা কলরবে হেসে উঠল।

কিন্তু গানের তাৎপর্য দিল জনকে চটিযে, সে পা-দানির উপর দাঁড়িয়ে উঠে যুবকদের ইঙ্গিতে শাসাল। এতে ফল হল ঠিক বিপরীত। তাদের গান তো থামলই না, বরঞ্চ ভিন্নতর খাতে প্রবাহিত হল, যার এক কূলে ব্যঙ্গ, অন্য কূলে প্রচ্ছন্ন লালসা।

একজন যুবক যথোচিত ভঙ্গী ও মুদ্রা করে শুরু করল—

"O lovely Sue.
How sweet art thou.
Than sugar thou art sweeter,
Thou dost as far
Excel sugar
As sugar does saltpetre."...

এই অপ্রত্যাশিত ও সময়োচিত কাব্যস্ফূর্তিতে বড় হাসির হররা পড়ে গেল—সকলে সমস্বরে গেয়ে উঠল—'As sugar does saltpetre!'

তখন জন আস্ত জনবুল-মূর্তি ধারণ করে ইঙ্গিতে কিল ঘুষি ছুঁড়তে লাগল। আর ওদিক থেকে অপরপক্ষ ইশারায় চুম্বন ছুঁড়ে দেওয়া শুরু করল—সঙ্গে সঙ্গে,

"One for the master. one for the dame,
One for the lame man who lives by the lane."

কেটি ও লিজা অপ্রস্তুত হয়ে গিয়েছিল, তারা নিতান্ত অপরাধীর মত চুপ করে বসে রইল। কিন্তু মনটা চুপ করে ছিল না। কেটি ও লিজা দুজনেই মনে মনে যাবতীয় দায়িত্ব পরস্পরের ও জনের ঘাড়ে চাপাচ্ছিল, যুবকদের কেউ একবারের জন্যেও দায়ী করল না। এরকম না হলে আর রমণীকে বিশ্বাসহন্ত্রী ইভের বংশধারিণী বলেছে কেন?

ইশারায় চুম্বনবৃষ্টি কমাবার উদ্দেশ্যে জন এক পাটি জুতো খুলে নিয়ে দোতলা লক্ষ্য করে ছুঁড়ল—আর তার প্রত্যুত্তরে গোটা দুই বিয়ারের বোতল এসে পড়ল গাড়ির আশেপাশে। তখন কোচম্যান সমাধানের ভার নিজের হাতে তুলে নিয়ে ঘোড়ার পিঠে চাবুক মারল। গাড়ি জোরে ছুটল। অপস্রিয়মাণ গাড়ির আরোহীদের কানে যুবকদের সম্মিলিত কণ্ঠস্বর প্রবেশ করল—

"Return again fair Lesley,
Return to Loll Digie !
That we may brag we hae a ass,
There's none again sae bonnie."

রাগে অপমানে জন ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল, সে বসে বসে গজরাতে লাগল। বালক ফেলিক্সের কাছে সবটাই একটা মস্ত তামাসা বলে মনে হল। কেটি ও লিজাও ক্ষুব্ধ, জনের প্রতি সমবেদনাপরায়ণ ও কৃতজ্ঞ। কিন্তু.....কিন্তু তৎসত্ত্বেও অস্তিত্বের গভীরতম কেন্দ্রে কেমন একটুখানি তীব্র সুখের মতন অভিজ্ঞতা তারা অনুভব করছিল। যুবকদের আচরণ অবশ্যই অভদ্র, কিন্তু তার মূলে তাদের দীর্ঘ উপবাসজনিত বুভুক্ষা ; বুভুক্ষুর আর্তনাদে বিরক্ত হলে চলবে কেন, তাদের ক্ষুধার মূল্য দাও। কিসের ক্ষুধা ? নারীর। কে সে নারী ?

কেটি ভাবছিল, আর যেই হক, লিজা নয়। লিজাও ঠিক ঐ কথাই ভাবছিল, আর যেই হক, কেটি নয়।

নারীসমাজে নারী নির্বান্ধব, কারণ সংসারের যাবতীয় নারী তার প্রতিদ্বন্দ্বিনী—হক সে কন্যা, হক সে মাতা, হক সে শ্বশ্রু। পুরুষসমাজেও সে নির্বান্ধব, কারণ সে কখনও পুরুষকে বন্ধুরূপে অর্থাৎ সমানে সমানে পাওয়ার কল্পনায় তৃপ্তি পায় না। আলিঙ্গনাবদ্ধ নারীকে পুরুষ জিজ্ঞাসা করে—'তুমি আমার ?' নারীজীবনের গভীরতম অভিজ্ঞতার প্রেরণায় সে বলে—'আমি তোমার।'

এতক্ষণ একদল ছোকরা ট্যাঙ্ক স্কোয়ারের মধ্যে দাঁড়িয়ে নিরাপদ দূরত্ব রক্ষা করে সাহেবদের কাণ্ড দেখছিল। এবারে পলায়নপর গাড়িখানা খানিকটা দূরে যেতেই তারা উচ্চৈঃস্বরে ছড়াকাটা শুরু করল—

হাতীপর হাওদা, ঘোড়াপর জিন,
জলদি যাও জলদি যাও, ওয়ারেন আস্তিন।

গাড়িখানা কসাইটোলা-চিৎপুরের মোড়ে পৌঁছতেই লিজা বলল, জন, এবার ফেরা যাক।

জন কোচম্যানকে সেইরকম হুকুম করলে গাড়ি কসাইটোলা ধরে চলল চৌরঙ্গীর দিকে। গাড়ি Davies Daintie দোকানের কাছে আসতেই লিজা বলল—কোচম্যান, রোখো।

গাড়ি থামলে সে বলল, কিছু কেকের অর্ডার দিয়ে যেতে হবে। নাম না মিস্ প্ল্যাকেট, দোকানটা দেখে যাও, পরে কাজে লাগবে।

তখন কেটি ও ফেলিক্স লিজাকে অনুসরণ করে নেমে দোকানে ঢুকল।

অনেক অনুরোধ সত্ত্বেও জন নামল না, সে যেমন বসে ছিল তেমনি চুপ করে বসে রইল।

১০
দি অ্যাভিনিউ

কেরীর গাড়ি কসাইটোলার মোড়ে পৌঁছতেই কেরী বিস্ময়ে বলে উঠল— এ কি!

টমাস বলল, পরশুদিন দুজন ফিরিঙ্গির ফাঁসি হয়েছিল, তাদেরই দেহ ঝুলছে।

এমনভাবে কদিন থাকবে?

আরও চার-পাঁচ দিন থাকবে, তার পর পচতে শুরু করে দুর্গন্ধ ছাড়তে শুরু করলেই সরিয়ে ফেলা হবে।

কেরী অনেকটা যেন আপন মনেই বলল, এভাবে প্রকাশ্যে ফাঁসি দেওয়া মানবোচিত কার্য নয়।

অপ্রত্যাশিত উষ্মায় মিসেস কেরী চীৎকার করে বলল—কি এমন অন্যায়টা হয়েছে? তারা খুন জখম করবে প্রকাশ্যে, আর তাদের ফাঁসি দেওয়া হবে গোপনে! তাহলে লোকশিক্ষা হবে কি উপায়ে?

কেরী বলল,—দু পক্ষেই অনেক কিছু বলবার আছে সত্য, কিন্তু এ খ্রীষ্টানোচিত নয়।

রাখ তোমার ধর্মোপদেশ! ডাঃ টমাস, এ খুব স্বাস্থ্যকর প্রথা। এর পর ফাঁসি হবে খবর শুনলে আমাকে জানিও, আমি অবশ্য দেখতে আসব।

গাড়ি অ্যাভিনিউ সড়ক ধরে চলেছে। দুদিকে বড় বড় বাড়ি, অধিকাংশই দোতলা, একতলার সংখ্যাও কম নয়। অধিকাংশ বাড়িই শ্বেতাঙ্গগণের।

কেরী বলল, রাস্তাটাকে ফ্যাশনেবল পাড়া বলে মনে হয়।

টমাস বলল—হাঁ, চৌরঙ্গীর পরে এটা শৌখিন পাড়া। অবশ্য গার্ডেনরীচ ও আলিপুরের কথা আলাদা। ও দুটো হচ্ছে কাঞ্চন-কৌলীন্যের স্বর্গ।

কেরীরা দেখতে পেল তখনও অত বেলাতেও দোতলার অধিবাসীরা রাত-পোশাক ছাড়ে নি, অনেকে বারান্দায় দ্রুত পায়চারি করে ঘুমের জের কাটাবার চেষ্টা করছে।

রাস্তার দু-পাশেই যে টানা বাড়ির শ্রেণী এমন নয়, মাঝে মাঝে জলা ও আগাছার জঙ্গল আর পতিত জমি। ডানদিকে এমনি একখণ্ড স্থান দেখে কেরী বলে উঠল—এখানে দিব্য একটি গির্জা গড়া যেতে পারে।

মিসেস কেরী বলল, আগে আমাকে বাসায় পৌঁছে দাও, তার পর বসে বসে যত খুশি গির্জা গড়িও।

কেরী বলল, বাসাতেই তো ফিরছি।

গাড়ি যতই পুবদিকে চলতে লাগল ততই বাড়ির সংখ্যা কমে পতিত জমির আয়তন বাড়তে লাগল।

এমন সময়ে একটা শেয়াল পথটা অতিক্রম করে অন্যদিকে চলে গেল।

মিসেস কেরী বলে উঠল—দেখ দেখ, একটা নেকড়ে বাঘ!

কেরী বলল—না ডিয়ার, এটা একটা শেয়াল।

নিশ্চয়ই শেয়াল নয়, নেকড়ে; তুমি আমাকে বৃথা আশ্বাস দিচ্ছ।

তখন টমাস, রাম বসু ও পার্বতী একযোগে সাক্ষ্য দিল, বলল, না, ওটা শেয়াল ছাড়া কিছু নয়।

কিন্তু এত সহজে সমস্যার সমাধান হল না ; মিসেস কেরী বলে উঠল, তবে তো এখনই বাঘ বেরুবে, কারণ আমি বই-এ পড়েছি শেয়াল হচ্ছে বাঘের অগ্রদূত। —এই কোচম্যান, গাড়ি জোরে হাঁকাও।

অল্পক্ষণের মধ্যেই গাড়ি মারহাট্টা ডিচের প্রান্তে এসে পড়ল—সেই বৃহৎ বটগাছটার তলায়।

টমাস বলল, ডাঃ কেরী, এই সেই বিখ্যাত মারহাট্টা ডিচ।

মারহাট্টাদের ভয়ে খনন করা হয়েছিল বুঝি ?

হাঁ, ঠিক তাই।

এ খাল কি কলকাতাকে পরিবেষ্টিত করেছে ?

সেইরকমই কথা ছিল, কিন্তু এর মধ্যে মারহাট্টা হাঙ্গামা থেমে গেল—তাই খালটাও জানবাজার রোড পর্যন্ত এসে থেমে গেল।

আর এই রাস্তাটা ?

টমাস বলল—খালের পশ্চিমদিক বরাবর চলেছে, খালের মাটি তুলে তৈরি। সকালে বিকালে হাওয়াখোরের দল এখানে ভিড় করে।

বাপ রে, কি প্রকাণ্ড গাছ ! বলে কেরী।

এ হচ্ছে গিয়ে ভারতের বিখ্যাত বেনিয়ান ট্রি। কলকাতা অভিযানের সময়ে এই গাছটার তলাতে বসে নবাব সিরাজদ্দৌল্লা কেল্লা আক্রমণ দেখেছিল—ঐ দেখ, কেল্লার ফটক দেখা যাচ্ছে।

সকলেই দেখল—হাঁ, দি অ্যাভিনিউ বরাবর কেল্লার ফটক দেখা যাচ্ছে বটে। বটগাছটা ও কেল্লার ফটক সমসূত্রে স্থাপিত।

টমাস বলল, ডাঃ কেরী, এবারে ফেরা যাক্, মিসেস কেরী বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন।

কেরী বলল, আমি তাই বলব ভাবছিলাম, এখন ফিরে যাওয়াই ভাল।

তখন গাড়ি আর একটু দক্ষিণে গিয়ে জানবাজার রোড দিয়ে চৌরঙ্গীর মুখে ফিরল।

কিন্তু আমি ভাবছি, জনদের গাড়ি গেল কোথায় ?

মিসেস কেরী বলল, তারা তো খ্রীষ্টীয় প্রচারক নয়, এতক্ষণ নিশ্চয় বাড়ি ফিরে গিয়েছে।

সকলেই বুঝল—যে কারণেই হক, মিসেস কেরীর মেজাজ আজ ভাল নেই, তাই কেউ আর আলাপের কোন প্রসঙ্গ তুলল না। গাড়ি জানবাজার রোড ধরে, গোপী বসুর বাজারের পাশ দিয়ে যখন চৌরঙ্গী রোডে পড়ল তখন সবাই দেখল—

১১
কেরীর আবিষ্কার

চাকাওয়ালা একটা প্রকাণ্ড কাঠের খাঁচা দেশী আর ফিরিঙ্গি পুলিসে মিলে চৌরঙ্গী রোড বরাবর দক্ষিণদিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে, পিছনে চলেছে এক ঢুলি, সে মাঝে মাঝে ডুগ্ ডুগ্ করে ঢোলে বাড়ি দিচ্ছে—আর সঙ্গে জুটে গিয়েছে নানা বয়সের একদল লোক, পথে যেমন সর্বত্র জুটে থাকে।

কেরীরা আরও দেখল খাঁচার মধ্যে দশ-বারো বছর বয়সের একটি বালক উপবিষ্ট, জীর্ণ তার পোশাক, মলিন তার চেহারা—কিন্তু মুখে বেশ সপ্রতিভ ভাব। তার মুখ দেখলে মনে হয়, তার জন্যেই এত আয়োজন হওয়ায় সে যেন বেশ একটু গৌরব বোধ করছে—কৌতুক, কৌতূহল আর গৌরববোধ একসঙ্গে ফুটে উঠেছে তার মুখে চোখে।

কেরী শুধাল, ব্যাপার কি ?

টমাস বলল, লোকটা আসামী, কোন অপরাধের জন্য ওকে দণ্ড দেওয়া হচ্ছে।

এ কি রকম দণ্ড ? আর ওর অপরাধটাই বা কি ?

রাম বসু বলল, হয়তো কিছু চুরি করেছে ; হযতো কোন সাহেবের ক্রীতদাস, পালিয়েছিল, এখন ধরা পড়ে দণ্ড ভোগ করছে।

কেরী বলল, জানবার উপায় নেই কি ? আমি বড় কৌতূহল অনুভব করছি।

খুব জানা যায়, বলে রাম বসু ঢুলিকে ডাকল। সাহেব দেখে ঢুলি তাড়াতাড়ি এল আর লম্বা সেলাম করে দাঁড়াল।

রাম বসু বলল, সাহেব জানতে চাইছেন, ছেলেটার কি অপরাধ ?

ঢুলি সাহেবের উদ্দেশে রাম বসুকে বললে, হুজুর, ছোঁড়াটা মার্তুনি সাহেবের 'সিলেভ'—

রাম বসু বুঝিয়ে দিল—'স্লেভ', ক্রীতদাস।

ঢুলি বলে চলল, মার্তুনি সাহেব কুড়ি টাকা দিয়ে ওটাকে কিনেছিল। কিন্তু কুড়ি পয়সার কাজ করবার আগেই ছোঁড়া কদিন আগে পালিয়েছিল। ধরা পড়েছে কাল।

এখন ? সাহেবের হয়ে শুধায় রাম বসু।

এখন যা দেখছেন তাই। তামাম শহর ঘোরানো হবে, তার পর ওর পিঠে পড়বে পঁচিশ ঘা চাবুক, তার পর ওকে আবার হাওলা করে দেওয়া হবে মার্তুনি সাহেবের সর্দার-খানসামার কাছে।

তার পর ?

তার পর ব্যস্, চুকে গেল।

সমস্ত ব্যাপারটা শুনে কেরীর চোখ ছলছল করে এল। সে বলল, ব্রাদার টমাস, কি ভয়ানক অবস্থা !

টমাস এ রকম অবস্থার সঙ্গে দীর্ঘকাল পরিচিত। সে বলল, এমন তো চলছে দীর্ঘকাল ধরে।

আর একদিনও চলতে দেওয়া উচিত নয়।

টমাস বলল, খ্রীষ্টধর্ম প্রচার হলেই এসব নৃশংসতা ক্রমে কমে আসবে।

কিন্তু তার অনেক আগেই যে ওর পিঠে পড়বে পঁচিশ ঘা চাবুক।

অবশ্যই পড়বে, ওরা সব ক্ষুদে শয়তান—বলল মিসেস কেরী।

বল কি ডরোথি, ঐ কোমল পিঠে কড়া চাবুক পড়লে কি থাকবে?

শয়তানি ছাড়া আর সবই থাকবে।

তুমি বড় নিষ্ঠুর ডরোথি।

তার কারণ সংসারে শয়তান অগণিত। যাই হক, এখন পথের মধ্যে দাঁড়িয়ে ধর্মতত্ত্ব আলোচনার স্পৃহা আমার নেই, তাড়াতাড়ি ফিরে চল।

কেরী বলল, না না, ছেলেটার একটা ব্যবস্থা না করে ফিরতে পারি না। আচ্ছা মিঃ মুন্সী, কেউ যদি কুড়ি টাকা দেয় তবে ওকে পেতে পারে না কি?

টমাস, পার্বতী, রাম বসু সবাই দেশের রীতি জানত, একযোগে বলল, অবশ্যই পারে।

তবে দেখ ছেলেটাকে পাওয়া যায় কিনা।

ঢুলির সঙ্গে একজন পেটি পুলিস অফিসার ছিল, সমস্ত শুনে বলল, আপনি কুড়ি টাকা দিলে এখনই আপনি ছেলেটার possession পেতে পারেন।

কিন্তু ওর মালিকের অনুমতি আবশ্যক হবে না কি?

পুলিস অফিসার বলল, মার্টিন সাহেবের অনুমতি দেওয়াই আছে, তিনি ছেলেটাকে রাখতে চান না।

ঢুলি সমর্থনে বলল, হুজুর, ছোঁড়া ভারি বজ্জাত। অমন কাজও করবেন না। ওর জ্বালায় আপনার হাড় একদিকে মাস একদিকে হবে।

কেরী বিচলিত না হয়ে যখন টাকা বের করতে উদ্যত হল তখন মিসেস কেরী যুগপৎ বিস্ময়ে ক্রোধে বিরক্তিতে তর্জন করে উঠে বলল—তুমি কি সত্যি ওটাকে কিনছ নাকি?

ডরোথি, ছেলেটাকে কিনছি বলা উচিত নয়, মানুষ সম্বন্ধে কেনাবেচা শব্দ প্রয়োগ করা খ্রীষ্টানোচিত নয়, আমি ওর মুক্তির ব্যবস্থা করছি।

বেশ তো, মুক্তি দাও, কিন্তু দয়া করে ঘরে নিয়ে যেও না।

ঘরে না নিলে থাকবে কোথায়?

কিন্তু কোন্ ঘরে নেবে ভেবে দেখেছ? তোমার নিজেরই তো ঘর নেই।

আজ নেই কাল হবে।

সে ঘরে ও ছেলেটা স্থান পেলে আমি সে ঘরে প্রবেশ করব না, এ তুমি নিশ্চয় জেনো।

কেন বল তো?

ও তো একটা আস্ত জানোয়ার। আমার জ্যাভেজকে খেয়ে ফেলতে ওর বাধা কি!

আচ্ছা সেসব পরে বিচার করব—এই বলে কেরী পুলিস অফিসারটির হাতে কুড়ি টাকা দিল, পুলিস অফিসার একখানি রসিদ লিখে দিয়ে ছেলেটাকে ছেড়ে দেবার হুকুম দিল।

খাঁচার দরজা খোলা পাওয়ামাত্র, এতক্ষণ এত কাণ্ডের মূলস্বরূপ সেই ছেলেটি একলম্ফে বাইরে এসে দাঁড়াল—এবং

'কড়ি দিয়ে কিনলাম, মাকু দিয়ে বাঁধলাম, একবার ভ্যা কর তো বাপু'—বলে তারস্বরে বারকয়েক ভ্যা ভ্যা করে চিৎকার করল।

তার ভাবভঙ্গী ও চীৎকারে জনতা হো হো করে হেসে উঠল।

ছেলেটা বুঝে নিয়েছিল যে এখন সে হাত বদলিয়ে মার্তুনি সাহেবের 'সিলেভ' থেকে এই নতুন সাহেবের 'সিলেভ'-এ পরিণত হল। সে কেরীর সম্মুখে এসে দাঁড়িয়ে লম্বা এক সেলাম করে বলল, বান্দা হাজির হ্যায়, হুজুর, কুচ ফরমাইয়ে।

তার পর কোন ফরমাশের অপেক্ষা না করেই আপন মনে গান ধরল—

"কে মা রথ এলি ?
সর্বাঙ্গে পেরেক মারা চাকা ঘুর ঘুর ঘুরালি !
তোর সামনে দুটো কেটো ঘোড়া,
চূড়োর উপর মুখপোড়া,
চাঁদ চামরে ঘণ্টা নাড়া, মধ্যে বনমালী।
মা তোর চৌদিকে দেবতা আঁকা,
লোকের টানে চলছে চাকা,
আগে পাছে ছাতা পাখা, বেহদ্দ-ছেনালি।"

হঠাৎ গানের মাঝখানে সে বলে উঠল, না, বসে বসে পা দুটো ধরে গিয়েছে, একটু খেলিয়ে নিই।

এই বলে নাচতে শুরু করল। সুযোগ বুঝে ঢুলিও যোগ দিল, কাজেই নৃত্য গীত ও বাদ্য কিছুরই অভাব হল না। আর রথযাত্রার অভাবিত পরিণামে জনতাও খুশি হয়ে উঠে 'বাঃ ভাই বেশ', 'ঘুরে ফিরে,' 'রসে বাজাও ভাই, ঢুলি,' 'বাহাদুর ছোকরা' প্রভৃতি বাক্যে উৎসাহ প্রদান করতে লাগল।

গান থামলে কেরী বলল, ছেলেটি খুব স্মার্ট।

টমাস বলল, একবারে বাচ্চা ফলস্টাফ।

মিসেস কেরী অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে রইল, কোনক্রমেই এ ব্যাপারে সহযোগিতা করবে না এই যেন তার প্রতিজ্ঞা।

রাম বসু জিজ্ঞাসা করল—এই ছোঁড়া, তোর নাম কি ?

দাদা, তোমার চেহারা দেখে তোমাকে বুঝলাম বলে মনে হয়েছিল। নাম ধাম সব খুলে বললাম তবু বুঝতে পারলে না ?

কেমন ?

তোমার সামনে দুটো কেটো ঘোড়া, মানে ঐ সেপাই দুটো। চূড়োর উপর মুখপোড়া—ঐ যে কোম্পানির নিশানটা, আর চাঁদ চামরে ঘণ্টা নাড়া মধ্যে বনমালী—বলে দেখিয়ে দিল নিজেকে।

তা হলে তোর নাম বনমালী, কেমন ?

যতক্ষণ রথের উপর ছিলাম তাই ছিল, এখন যা খুশি বলে ডাক। কোম্পানির কাছে নালিশ করব না।

বাড়ি কোথায় ?

এতক্ষণ ছিল ঐ রথের মধ্যে, তার আগে মার্তুনি সাহেবের বাড়িতে, এখন পথের উপর—এর পরে বুঝি এই সাহেবের বাড়িতে হবে।

তার মানে, তোর বাড়িঘর নেই ?

দাদা, এত যার বাড়িঘর, তার বাড়িঘর নেই ? কি যে বল !

কেরী তাদের কথোপকথন বুঝতে পারে নি, তাই রাম বসুকে শুধাল, কি বলছে ?

বলছে ওর নামও নেই, বাড়িঘরও নেই।

কেরী বলল, ওর নাম দিলাম ফ্রাইডে, আজ তো ফ্রাইডে বটে, আজ ওকে পেলাম। আর বাড়ি ? আমার বাড়িতে।

কেরীর স্পষ্টোক্তি শুনে মিসেস কেরী স্পষ্টতর উক্তি প্রয়োগ করল, তাহলে ওকে নিয়েই থাক। আমি ঐ আস্ত জন্তুটার সঙ্গে থাকতে রাজী নই।

কেরী-দম্পতির গৃহবিপ্লব শুরু হয় দেখে রাম বসু বলল—আচ্ছা সেজন্য আপনারা ভাববেন না, আমি ওকে আমার বাড়িতে রাখব।

একটি জটিল সমস্যার এত সহজে সমাধান দেখে কেরী সকৃতজ্ঞ ভাবে বলল, মিঃ মুন্সী, তোমাকে ধন্যবাদ।

রাম বসু বলল, বেলা অনেক হল, তাহলে আমি ওকে নিয়ে বাড়ি যাই। কি বল পার্বতীদা ? তুমিও চল।

পার্বতীচরণের বড় অস্বস্তি বোধ হচ্ছিল, সে বলল, নিশ্চয়।

তখন রাম বসু, পার্বতীচরণ ও ছোকরা—তিনজনে প্রস্থান করল। কেরী-দম্পতি চলল বেরিয়াল গ্রাউণ্ড রোডে স্মিথদের বাড়ির দিকে।

১২
রামরাম বসুর সংসার

রামরাম বসুর নিবাস ডিঙিভাঙা অঞ্চলে, পার্বতীচরণের নিবাস কলিঙ্গা বাজারের কাছে। তাদের প্রতিবেশী বললেই চলে।

রাম বসুর জন্ম খুব সম্ভব ১৭৫৭ সালে। 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্রে'র ভূমিকায় সে লিখেছে—"আমি তাঁহারদিগের (প্রতাপাদিত্যের) স্বশ্রেণী, একই জাতি", কাজেই তাকে বঙ্গজ কায়স্থ গণ্য করা যায়। "তাছাড়া প্রচলিত জীবনকাহিনীতে তার জন্মস্থান চুঁচুড়া ও শিক্ষাস্থল ২৪-পরগণার নিমতা গ্রাম বলে উল্লিখিত আছে।"

বর্তমানে তার নিবাস কলকাতা শহরে। সেকালে ইংরেজের মুন্সীগিরি করে অনেকে ধন মান ও সামাজিক প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন। মহারাজা নবকৃষ্ণ বাহাদুর বোধ করি তার প্রকৃষ্টতম দৃষ্টান্ত। তিনি অল্পবয়সে ওয়ারেন হেস্টিংসের মুন্সী হন, তারপর ক্লাইভের। এই দুই সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠাতা ধুরন্ধরের আনুকূল্যে ও নিজের বুদ্ধিবলে মুন্সী নবকৃষ্ণ শেষ পর্যন্ত মহারাজারূপে কলকাতা সমাজের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি পরিগণিত হয়েছিলেন।

রাম বসুও অল্প বয়সে ইংরেজের মুন্সীগিরি লাভ করেছিল, কিন্তু জমিদারি বা পদবী তার ভাগ্যে ঘটে নি। ওসব বস্তুতে তার যে আগ্রহের অভাব ছিল এমন নয়, আসল কারণ সে যাদের মুন্সী হল, তারা কেউ রাজপুরুষ ছিল না, কাজেই রাম বসুরও রাজগী লাভ ঘটল না। মূল বনস্পতির উচ্চতার উপরেই পরগাছার উচ্চতা নির্ভর করে।

রাম বসুর রাজগী লাভ ঘটে নি সত্য, কিন্তু অন্য রকম খ্যাতি ও অমরত্ব সে লাভ করে গিয়েছে—এই কাহিনী তার প্রমাণ। বসুর ফারসী ও বাংলা ভাষায় বেশ দখল ছিল। ১৭৮৩ সালে টমাস নামে একজন মিশনারী এদেশে আসে। দেশের অবস্থা দেখে তার মনে হল, এদেশে খ্রীষ্টধর্ম প্রচার করা উচিত। তখন সে দেশে ফিরে যায় এবং ১৭৮৬ সালে এদেশে ঐ উদ্দেশ্য নিয়ে আসে। কিন্তু ধর্মপ্রচার করতে গিয়ে সে বুঝল, প্রধান অন্তরায় ভাষা। ওই সময় উইলিয়াম চেম্বার্স ছিল সুপ্রীম কোর্টের ফারসী দো-ভাষী। চেম্বার্স রাম বসুর সঙ্গে টমাসের যোগাযোগ সাধন করে দিল—তখন ১৭৮৭ সাল। এই বছর থেকে রাম বসুর মৃত্যুর ১৮১৩ সাল পর্যন্ত সে কোন-না-কোন মিশনারীর সঙ্গে কাটিয়েছে। এবার বুঝতে পারা যাবে, দীর্ঘকাল সাহেবের মুন্সীগিরি করেও কেন বসুর ধন, মান ও সামাজিক প্রতিষ্ঠা লাভ ঘটে নি। মিশনারীগণ ধনমানের সন্ধানে আসে নি, কাজেই তাদের সঙ্গীরও ও-বস্তু প্রাপ্তি ঘটে নি।

এই সময় থেকে রাম বসুর ইতিহাস মিশনারীদের ইতিহাস, রাম বসুর পথ ও গতিবিধি মিশনারীদের পথ ও গতিবিধি—আর সে ইতিহাস রাম বসুর মৃত্যুতে অবসিত হল না, উত্তরপুরুষে গিয়ে বর্তাল।

১৭৮৭ সালে হিতাকাঙ্ক্ষীদের পরামর্শে টমাস গেল মালদহে। সেখানে কোম্পানির রেশম কুঠির কমার্শিয়াল রেসিডেণ্ট জর্জ উডনী। তারও খ্রীষ্টধর্ম প্রচারে আগ্রহ। টমাস তার বাড়িতে থাকে, বসুর কাছে বাংলা ও ফারসী শেখে, অবসর সময়ে খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে বক্তৃতা করে ঘুরে বেড়ায়, রাম বসুকে সঙ্গে সঙ্গে ঘুরতে হয়।

রাম বসুর সান্নিধ্যে বাস করে টমাসের ধারণা হল, লোকটি কেবল বিদ্বান্ নয়, তার মনটাও যেন ক্রমে সত্যধর্মের দিকে ঝুঁকে পড়ছে। বসু কথায়-বার্তায় সদা-সর্বদা বাইবেলের উল্লেখ করে, খ্রীষ্ট-মহিমার গুণগান করে। টমাস ভাবল, আর একটু হলেই প্রথম খ্রীষ্টান করবার গৌরব সে লাভ করবে। বলা বাহুল্য, সে-গৌরব কাউকে লাভ করতে হয় নি, বসুজা পৈতৃক ধর্মের কোলেই দেহরক্ষা করেছিল। বসু মাঝে মাঝে বাংলা ভাষায় খ্রীষ্টীয় সংগীত রচনা করে টমাসের আশানল উস্কে দিত, কিন্তু এমনই তার স্বাভাবিক সংযমবোধ যে, আশানলকে কখনও চিতানল করে তোলে নি। পথভ্রষ্ট রাম বসু মিশনারীদের সঙ্গে না জুটে ওয়ারেন হেস্টিংস বা ক্লাইভের দলে ভিড়লে বাংলা দেশের অভিজাত সমাজ আর-একটা রাজা-মহারাজার পদবীগৌরব লাভ করত। কিন্তু প্রতিভা এমন শক্তি যে, পথভ্রষ্ট হলেও পথ কেটে নিতে ভোলে না, রাম বসুর প্রতিভাও পথ কেটে নিয়েছে—বাংলা গদ্য রচনারীতির পথ।

১৭৯২ সালে টমাস ইংল্যাণ্ডে ফিরে গেল কিন্তু একেবারে শূন্য হাতে গেল না, রাম বসু কৃত একটি খ্রীষ্ট-মহিমা-সংগীত হাতে করে গেল। আর সেই সংগীত, রাম বসুর খ্রীষ্টান হব-হব মনোভাব, তার অগাধ পাণ্ডিত্য, ব্রাহ্মণদিগকে তর্কযুদ্ধে ধরাশায়ী করতে তার অসাধারণ নৈপুণ্য প্রভৃতি 'আশার ছলনা'য় সেখানকার একটি মিশনারী সম্প্রদায়কে এমন প্রলুব্ধ করে তুলল যে, তারা অচিরে পাদ্রী উইলিয়াম কেরীকে সপরিবারে এদেশে পাঠাবার সঙ্কল্প করল। সেই প্রস্তাব অনুযায়ী টমাস ও সপরিবার কেরী ১৭৯৩ সালের ১৩ই জুন দিনেমার জাহাজ 'প্রিন্সেস মারিয়া' যোগে যাত্রা করে ১১ই নভেম্বর তারিখে চাঁদপাল ঘাটে এসে নামল।

জানবাজার রোড বরাবর পুবদিকে চলেছে রাম বসু, পার্বতী ও ছোকরাটি ; ছোকরাটি কয়েক ধাপ আগে, পিছনে পাশাপাশি বসুজা ও পার্বতী।

পার্বতী ফিস ফিস করে বলল, বসুজা, নিয়ে তো চললে, তার পর ?

তার পর নিত্য যা হয় তাই হবে।

কিন্তু ঐ ছেলেটার সম্মুখে ?

কার সম্মুখে না হচ্ছে, না হয় আর একটা লোক বেশি জানবে—এই তো ?

তাই বা কেন হবে ? কেন নিতে গেলে ঐ ছেলেটার ভার ?

নইলে যে কেরীর গৃহবিপ্লব শুরু হয়।

তোমারই বা কোন্ গৃহশান্তি ? দেখ এখনও সময় আছে।

না ভায়া, আর সময় নেই, এখন আর ফিরিয়ে দিয়ে আসা চলে না। আর খুব বেশি অশান্তি দেখি তো নিয়ে গিয়ে টুশকির জিম্মা করে দেব।

ঐ অতটুকু ছোঁড়াকে দেবে টুশকির বাড়িতে !

আর কি উপায় আছে বল।

টুশকি রাজী হবে তো ?

টুশকিকে তুমি জান না। এক রাত্রির আকাঙ্ক্ষা নিয়ে যারা ওর কাছে যায়, তাদের প্রতি ওর দারুণ ঘৃণা। এই নিরীহ ছোকরাকে পেয়ে ও বেঁচে যাবে।

যায় ভালই। কিন্তু আমি প্রায়ই তোমার কথা ভাবি, কোন্ সুখে থাক ঘরে।

ঘরে আর থাকি কই ! পাদ্রীদের সঙ্গেই তো দীর্ঘকাল ঘুরে বেড়ালাম। আর যখন একেবারে অসহ্য বোধ হয়, টুশকির কাছে গিয়ে পড়ে থাকি।

কি, একরাত্রির আকাঙ্ক্ষা নিয়ে ?

না ভাই, অনেক রাত্রির আকাঙ্ক্ষা নিয়ে। ও আমার অবস্থা কতক বোঝে !

তাহলে আমি এখন যাই, বলল পার্বতী।

কাল সাহেবের ওখানে আসছ তো ?

না, দিনতিনেকের জন্য বাইরে যাচ্ছি, ফিরে এসে দেখা করব—বলে পার্বতী বিদায় নিল।

তখন রাম বসু ছোকরাটাকে কাছে ডেকে বলল—হ্যাঁ রে, তোকে কি বলে ডাকব ?

সে বলল, ন্যাড়া বলেই ডেকো। মনে পড়ছে খুব ছেলেবেলায় যেন ঐ নাম ছিল।

তার মানে ? ছেলেবেলার কথা কি মনে নেই তোর ?

সে অনেক কথা, আর একদিন বলব। কিন্তু এত বেলায় তো নিয়ে চললে, গিন্নিমা রাগ করবে না তো ?

না রে না, সে রকম লোকই নয়।

না হয়, ভালই। কিন্তু তোমাদের কথাবার্তা কিছু কিছু কানে ঢুকল যে !

শুনেছিস নাকি ? চল্, তবে এবার দেখবি।

দু-চার মিনিট পরেই একধারে ডোবা অন্যধারে বাঁশঝাড় রেখে, মাঝখানের শুঁড়ি পথ ধরে দুজনে এসে দাঁড়াল হোগলাপাতায় ছাওয়া বাড়ির সামনে। রকে বসে খেলছিল চার-পাঁচ বছরের একটি বালক। সে চীৎকার করে উঠল—মা, বাবা এইছে।

ভিতর থেকে উত্তেজিত কাংস্যকণ্ঠে উত্তর এল—এই যে আমিও এইছি, তৈরী হয়েই ছিনু।

মুহূর্ত পরে খাটো মলিন শাড়ি পরা কৃশকায় এক রমণী বের হয়ে এল, হাতে তার এক মুড়ো ঝাঁটা।

কিন্তু একটির বদলে দুটিকে দেখে অভ্যস্ত কার্যে বাধা পড়ল, কাঁসার বাটি খন খন আওয়াজ করে উঠল—'একা রামে রক্ষা নাই, সুগ্রীব দোসর!' আজ আবার সঙ্গে কারপরদাজ আনা হয়েছে! ভাবা হচ্ছে যে, আমি দুজনের সঙ্গে পেরে উঠব না! দেখবি তবে, দেখবি?

এই বলে সে কোমরে কাপড় জড়াতে শুরু করল।

রাম বসু তাকে শান্ত করবার অভিপ্রায়ে বলল, গিন্নি, আগে শোন ছেলেটা কে, তার পর রাগ ক'র।

কাঁসার বাটি উগ্রতর রবে খন খন করে উঠল—বটে বটে, আমি রাগ করেছি! আগে তো ময়লা সাফ করে নিই, রাগ করব তার পরে।

তাকে খুশি করবার ইচ্ছায় ন্যাড়া সাষ্টাঙ্গে প্রণত হয়ে বলল, গিন্নিমা, পেন্নাম হই।

দূর, দূর! ছুঁস নে—বলে বসুপত্নী তিন হাত পিছিয়ে গেল। তার পর স্বামীর উদ্দেশে বলল, নিজে তো খিরিস্তানের সঙ্গে ঘুরে ঘুরে জাতজন্ম খুইয়েছ, আবার সঙ্গে করে আনা হয়েছে একটা আস্ত খিরিস্তানকে!

ভুল করছ গিন্নি, ও খিরিস্তান নয়।

খিরিস্তান্ নয় তো কাটা-পোশাক গায়ে কেন?

কাটা-পোশাক পরলেই কি খিরিস্তান হয়? দাড়ি থাকলেই কি মুসলমান হয়?

এখন বসুর এক শ্যালকের দীর্ঘ শ্মশ্রু ছিল। গিন্নি ভাবল, লক্ষ্যটা তারই প্রতি—

তবে রে ড্যাকরা মিন্সে, যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা—

সম্মার্জনী স্বামীর উদ্দেশে নিক্ষিপ্ত হল।

রাম বসু জানত, ঠিক কোন্‌টির পরে কি ঘটবে, স্বামী-স্ত্রীতে অনেকদিনের পরিচয় কিনা, সে চট করে মাথা নীচু করে নিয়ে অস্ত্রকে লক্ষ্যভ্রষ্ট করল। ভ্রষ্টলক্ষ্য সম্মার্জনীকে লক্ষ্য করে ন্যাড়া হাততালি দিয়ে বলে উঠল—'বো-কাটা'—কিন্তু রাম বসু গীতোক্ত নিষ্কাম পুরুষের ন্যায় যেন কিছুই ঘটে নি এমনভাবে বলল, গিন্নি, বেলা অনেক হল, দুই ঘড়ি বাজে, খেতে দাও।

খেতে দাও! এতবেলা অবধি যেখানে ছিলে সেখানে গিয়ে গেলো গে—এখানে কেন?

এই বলে সদর্পে ঘরের ভিতরে গিয়ে দড়াম করে দরজা বন্ধ করে দিল।

রাম বসু বলল—আস্তে গিন্নি আস্তে, দরজা ভেঙে গেলে চোর-ছ্যাঁচড় ঢুকবে।

ভিতর থেকে আওয়াজ এল—চোর-ছ্যাঁচড় ঢুকবে! কত সাত রাজার ধন মানিক এনে রেখেছ কিনা!

রাম বসু গৃহিণী-চরিত্রের অন্ধি-সন্ধি জানত, বুঝল, আজ এখানে ভাত জোটবার আশা নেই। ন্যাড়ার হাত ধরে টেনে নিয়ে আঙিনার বাইরে এসে দাঁড়াল। বলল, চল্।

কোথায়?

চল্ না! তোর বুঝি খুব খিদে পেয়েছে, মুখ শুকিয়ে গিয়েছে যে!

ন্যাড়া অল্পবয়সে অনেক দেখেছে কিন্তু ঠিক এহেন দৃশ্য তার অভিজ্ঞতার বহির্ভূত। সে বলল, দাদা, আমাকে এনেই এত গোলমালে পড়লে। আমাকে বরঞ্চ ছেড়ে দাও।

দূর বোকা, সে কি হয়, বিশেষ সাহেবের কাছ থেকে ভার নিয়েছি তোকে আশ্রয় দেব।

ও কাজটি পারবে না। আমাকে এ পর্যন্ত কেউ আশ্রয় দিতে পারে নি, না বাপ-মায়ে, না সাহেব-সুবোয়। তুমিও পারবে না, মাঝ থেকে তোমার হেনস্তা হবে!

বসু কোন উত্তর দিল না দেখে ন্যাড়া শুধাল, তা এত বেলায় আবার চললে কার বাড়িতে?

টুশকির বাড়িতে।

সে কে হয় তোমার?

কেউ হয় না।

তবে বোধ হয় আশ্রয় মিলবে—ঐ যে বলে কিনা, আপন চেয়ে পর ভাল, পর চেয়ে বন ভাল।...তা সেখানেও আশ্রয় না মেলে কাছে তো সুন্দরবন রয়েছেই।

চল্।

সে আবার কতদূর?

মদনমোহনতলা।

সে যে অনেক দূর!

হাঁটতে পারবি না?

অপ্রস্তুত হয়ে ন্যাড়া বলল, না না, এমনি বললাম, খুব হাঁটতে পারব, চল।

তখন তারা মদনমোহনতলার দিকে হন হন করে হাঁটতে শুরু করল।

·

বসুপত্নী অন্নদা একটি মূর্তিমতী খাণ্ডারণী। যে সংসারে স্বামী-স্ত্রীতে মনের মিল, সে সংসারে পয়ার ছন্দ। ছত্রে ছত্রে মিলে গিয়ে সংসাররূপ মিত্রাক্ষর দিব্য শান্ত স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, অগ্রসর হবার উদ্দীপনা অনুভব করে না। আর যে সংসারে স্বামী-স্ত্রীতে মনের মিল নেই তা হচ্ছে গিয়ে অমিত্রাক্ষর ছন্দ—ছত্র থেকে ছত্রান্তরে, যতি থেকে যত্যন্তরে, অতৃপ্তির আবেগে কেবলই এগিয়ে চলে, শান্তি না থাকায় কোথাও সমাপ্তির নিষেধ স্বীকার করতে হয় না। রাম বসুর লেখাপড়ার প্রতি আগ্রহ, সাহেব পাদ্রীর প্রতি ঔৎসুক্য, খ্রীষ্টীয় ধর্মে বিশ্বাস প্রভৃতির মূলে সাংসারিক অশান্তি। সাংসারিক শান্তির অভাবেই মানুষের আধ্যাত্মিক উন্নতির প্রেরণা!

১৩
টুশকি

সন্ধ্যাবেলা টুশকি তসরের শাড়ি পরল, হাতে একজোড়া মন্দিরা নিল, ডাকল, ন্যাড়া, আয় আমার সঙ্গে।

রাম বসু শুধাল, কোথায় চললে?

কেন, জান না নাকি? মদনমোহনের আরতি দেখতে।

ন্যাডাকে আবার কেন ?

ও এখানে একলা থেকে কি করবে ? দেখে আসুক। ত'র পর একটু ভেবে বলল, সন্ধ্যাবেলায় দেবদেবী দেখলে মনটা ভাল থাকে। না রে ন্যাডা ?

তা বইকি দিদি। সারাটা দিন অসুরগুলোর সঙ্গে কাটে যে। এ তবু ভাল, দিনের বোঝা দিনে নামে। সাহেবগুলোর সঙ্গে থেকে দেখলাম কিনা—ওরা সাতদিনের বোঝা নামায় একদিনে, রবিবারে।

টুশকি হেসে বলল—সাতদিন বইতে পারে ?

ন্যাড়া বলল, তুমি আমি হলে কি পারতাম, ঘাড় ভেঙে যেত। ওরা যে অসুর। সাতদিনের বোঝা বইবার মত করেই ওদের দেহ তৈরি।

ন্যাড়ার কথায় টুশকি হেসে উঠল। রেড়ির তেলের সেই স্তিমিত আলোতেও রাম বসুর চোখে পড়ল টুশকির নিটোল গালে দুটি টোল।

বসুজার দৃষ্টি টুশকির চোখ এড়াল না, সে বলল, তুমি একা বসে থেকে কি করবে ?

রাম বসু বলল, বসে আর রইলাম কোথায় ! অথৈ সাগরে পড়ে হাবুডুবু খাচ্ছি।

দেখো ডুবে না যাও।

ডোববার চেষ্টাই তো করছি।

কেন, ডোববার এত শখ কেন ?

তলিয়ে দেখি পাতালপুরীর রাজকন্যে মেলে কি না।

তবে তাই দেখ। আমি এখন চললাম। আয় ন্যাড়া। এই বলে ন্যাড়াকে সঙ্গে নিয়ে টুশকি প্রস্থান করল।

ঘণ্টাখানেক পরে টুশকি ফিরে এল। টুশকি দেখল যে, প্রদীপের কাছে বসে বসুজা নিবিষ্ট মনে লিখছে, ওদের আগমন টের পেল না। টুশকিই প্রথম কথা কইল—কি কায়েৎ দাদা, কি লেখা হচ্ছে ?

ওঃ, তোমরা ফিরলে ? কিছু না, একটা গীত রচনা করলাম।

গীত ! কি গীত ? সেই পাতালপুরীর রূপবর্ণনা নাকি ?

না ভাই, ঠিক উল্টো। সাগর পার করবার জন্যে ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা।

কেন, পার হতে যাবে কেন ? ডুবে মরবার শখ যে হয়েছিল !

এখনও আছে। কিন্তু সাহেবের ইচ্ছা অন্যরকম।

এর মধ্যে সাহেব আবার এল কোত্থেকে ?

খাস বিলেত থেকে, কেরী সাহেব। যার কথা ওবেলা বলেছি।

সাহেবের ইচ্ছাটা কি ?

যীশু সম্বন্ধে একটা গীত লিখি।

আর তুমি লিখে ফেললে ? কোথাকার মেলেচ্ছ, তাদের দেবতার বিষয়ে অমনি গীত রচনা করলে ! কায়েৎ দাদা, কিছুই তোমার অসাধ্য নয় !

সাধ্য কি অসাধ্য শোন না একবার।

দাঁড়াও কাপড়টা ছেড়ে আসি, অমনি ন্যাড়াকেও খেতে দিয়ে আসি, ছেলেটার ঘুম পেয়েছে।

কিছুক্ষণ পরে টুশকি ফিরে এলে, বাতিটা কাঠি দিয়ে উস্কে দিয়ে রাম বসু সুর করে পড়তে শুরু করল—

"কে আর তারিতে পারে
লর্ড জিজছ ক্রাইস্ট বিনা গো,
পাতকসাগর ঘোর
লর্ড জিজছ ক্রাইস্ট বিনা গো।
সেই মহাশয় ঈশ্বর তনয়
পাপীর ত্রাণের হেতু!
তাঁরে যেই জন করয়ে ভজন
পার হবে ভবসেতু।
এই পৃথিবীতে নাহি কোন জন
নিষ্পাপী ও কলেবর।
জগতের ত্রাণকর্তা সেই মহাশয়
জিজছও নাম তাঁহার।
ঈশ্বর আপনি জন্মিল অবনী
উদ্ধারিতে পাপী জন।
যেই পাপী হয় ভজয়ে তাঁহার
সেই পাবে পরিত্রাণ।
আকার নিকার ধর্ম অবতার
সেই জগতের নাথ।
তাঁহার বিহনে স্বর্গের ভুবনে
গমন দুর্গম পথ।
সে বদন বাণী শুন সব প্রাণী
যে কেহ তৃষিত হয়।
যে নর আসিবে শুদ্ধ বারি পাবে
আমি দিব সে তাহায়।
অতএব মন কর রে ভজন
তাঁহাকে জানিয়া সার।
তাঁহার বিহনে পাতকিতারণে
কোন জন নাহি আর।"

পড়া শেষ করে বসু জিজ্ঞাসা করল, কেমন লাগল?

টুশকি মনে দিয়ে শুনছিল, বলল, খুব সুন্দর, শুনলে জ্ঞান হয়, কেবল ঐ জিজছ না কি বললে না, ঐটি ছাড়া।

আরে ঐটিই তো আসল, আর কিছু না থাকলেও চলত। আমাদের ভক্ত বৈষ্ণব বাবাজীরা যেমন কৃষ্ণ-র 'ক' শুনলেই মূর্ছা যায়, পাদ্রীদেরও প্রায় সেই দশা।

তোমার দশা দেখছি আরও খারাপ—ঐ নাম শুনে লম্বা গীত রচনা করে ফেললে, এর চেয়ে যে মূর্ছা হলে ভাল ছিল।

এক এক সময়ে আমিও তাই ভাবি। কিন্তু মূর্ছা যাওয়ার উপায় কি? কেরী সাহেব দেখা হলেই গীতটার জন্যে তাগিদ দেয়।

তাই বল, সেই তাগিদে লিখলে! তবু ভাল, আমি ভাবলাম, কি জানি, হয়তো

বা এবারে জিজছ ভজবে।

পাগলি! পাগলি! আমার কাছে কৃষ্ট আর খৃষ্ট দুই-ই সমান। আসলে আমি যার ভক্ত তার নাম শুনবে?

না না, সে পাপ নাম মুখে এনো না; তাছাড়া হাজারবার তো শুনেছি।

এই বলে টুশকি হাসল, গালে দেখা দিল টোল।

বসুজা বলল—ঐ কালিয়দহে যে ডুবে মরেছে তাকে টেনে তোলবার সাধ্য গোকুলের কেষ্ট কি ফিলিস্তানের খৃষ্ট—কারও নেই।

কিন্তু ঐ হাসি দেখেই কি পেট ভরবে? খেতে হবে না?

তারপর একটু থেমে বলল—পাদ্রীগুলোর সঙ্গে মিশে তোমার এইটুকু উন্নতি হয়েছে যে, আমার হাতে ভাত খাও, নইলে শুধু কেষ্টর সাধ্য ছিল না আমার ছোঁওয়া খাওয়ায়।

তবে দেখ খৃষ্টের মহিমা!

না না, কথা শোন কায়েৎ দাদা, হিন্দু দেবদেবীর সম্বন্ধে গীত লেখ।

আরে পাগলি, হিন্দু দেবদেবী কি মাসিক কুড়ি টাকা বেতন দিতে পারবে?

মাসিক কুড়ি টাকা বেতন পেলে কি তুমি হাঙর কুমিরের স্তব রচনা করতে পার?

অবাক করলে। হাঙরের মুখে হাত ঢুকিয়ে বসে আছি, স্তব রচনা করা তো তুলনায় অনেক সহজ।

পোষা হাঙর হলে সবাই পারে।

হাঙর কুমির কখনও পোষ মানে? আসল কথা কি জান, হঠাৎ কখন বলে ফেলেছিলাম যে, জিজছ সম্বন্ধে গীত রচনা করেছি, তার পর থেকে দেখা হলেই কেরী সাহেব তাগিদ দেয়, কই মুন্সী, গীতটি কোথায়?

আচ্ছা, সাহেব বুঝি খুব ধার্মিক?

না হয়ে উপায় কি, যা খাণ্ডারণী ব্রাহ্মণী! তারপর টুশকির গাল দুটি একটু টিপে দিয়ে বলল, সবারই তো টুশকি নেই যে আশ্রয় দেবে; কাজেই জিজছের শরণ নিতে হয়।

খুব ভাল লোক নিশ্চয়, নইলে সাতসমুদ্দুর পার হয়ে ধর্মপ্রচার করতে আসে! দেখতে ইচ্ছে হয়।

দেখবে? আচ্ছা একদিন টমাস সাহেবকে আনব—টমাস, যার কাছে আগে চাকরি করতাম। কেরীকে পারব না।

সাহেব এসব জায়গায় আসবে?

আরে ওদের দেশে শুঁড়িবাড়ি, বেশ্যাবাড়ি, জুয়োর আড্ডা, বাবুদখানা, গির্জা সব পাশাপাশি—একটা থেকে আর একটায় কেবল এক ধাপের ব্যবধান।

তবে এনো একদিন—কাছাকাছি সাহেব দেখি নি।

খুব কাছাকাছি যাবার ইচ্ছা যেন!

নাও এখন রঙ্গ রাখ। ঐ শোন, শোভাবাজারের রাজবাড়ির ঘড়িতে দশটা বাজল। এখন ওঠ, খাবে।

আজ রাতে শোওয়াটাও এখানে।

বেশ, তাই হবে। নাও এখন চল।

রাম বসু কাগজখানি ভাঁজ করে চাপা দিয়ে রেখে উঠল—রান্নাঘরের দিকে যেতে

যেতে শুধাল, ন্যাড়া কোথায় ?

খেয়ে শুয়েছে ওঘরে।

তার পর বলল, ছেলেটা বেশ।

তবে তোমার কাছেই থাকুক।

ওকে আবার কোথায় নিয়ে যাবে ভাবছ ? এখানেই থাকবে—ওকে পেয়ে আমি বেঁচে গিয়েছি।

টুশকি, যার কেউ নেই তুমি তার আশ্রয়, তুমি লক্ষ্মী।

টুশকি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলল, যে তিন কুলে কালি দিয়েছে সে আবার লক্ষ্মী, সে আবার সরস্বতী! নাও ব'স।

বসুজা খেতে বসলে টুশকি পরিবেষণ শুরু করল।

১৪
পাদ্রী ও মুন্সী

পূর্বোক্ত ঘটনার পরে পাঁচ-সাত দিন অতিবাহিত। এ কয়দিন রাম বসু কেরীর সঙ্গে দেখা করতে আসতে পারে নি। বসিরহাটে তার কিছু পৈতৃক জমি-জমা ছিল, হঠাৎ খবর পেয়ে সেখানে যেতে বাধ্য হয়েছিল। নতুবা নবাগত কেরীকে ছেড়ে দূরে থাকা তার স্বভাব নয়। পার্বতীকে সে বলল, ভায়া হে, একটি কথা মনে রেখ, দুধের ভাঁড় আর পাদ্রী সাহেব এ দুটো বস্তুকে ছাড়া রাখতে নেই, যে পারবে এসে মুখ দেবে। কিন্তু এত সতর্কতা সত্ত্বেও মাঝখানে কদিনের জন্য পাদ্রী সাহেবকে ছাড়া রাখতে সে বাধ্য হয়েছিল। ফিরে এসে দেখলে যে, না, দুধের ভাঁড় যেমন ছিল তেমনি আছে, কেউ মুখ দেয় নি।

আজ দুপুরবেলা স্মিথদের বাড়ির বাগানে একটি আমগাছের ছায়ায় বসে কেরী, টমাস ও রাম বসুর মধ্যে আলোচনা হচ্ছিল। তখনকার দিনে দুপুরে কলকাতা শহরে রাতের নিষুতি নামত। দেশীয় সমাজের আদর্শে নবাগত বিদেশীগণও বাংলাদেশের নিদ্রাভরা দ্বিপ্রহরের কাছে নতিস্বীকার করেছিল। কাজেই স্মিথদের বাড়িতেও নিষুতি। কিন্তু কেরী আনকোরা নবাগন্তুক, তাই দিবানিদ্রায় অভ্যস্ত নয়, আর তার উৎসাহের ধাক্কাতে টমাস ও রাম বসুর ঘুমোবার উপায় ছিল না।

শীতের মধ্যাহ্ন। অদূরশায়ী সুন্দরবনে উত্তুরে হাওয়ার মরমর সরসর রব—একটা ঘুঘু অকারণে করুণ সুরে ডেকেই চলেছে।

কেরী বলল, মিঃ মুন্সী, এই দিনটির জন্য আমি বাল্যকাল থেকে অপেক্ষা করে ছিলাম।

রাম বসু বলল, ডাঃ কেরী, এসব লক্ষণ সাধারণত বাল্যকালেই দেখা দিয়ে থাকে। আমাদের শাস্ত্রে আছে যে, প্রহ্লাদ বাল্যকালেই ভক্তির লক্ষণ দেখিয়েছিল।

তার উক্তির অনুমোদনে টমাস মাথা নাড়ল, ভাবটা এই যে, এসব কথা তার অজানা নয়।

নিজের সমধর্মা একজনের উল্লেখে আহ্লাদিত কেরী 'প্রহ্লাদ' শব্দটা উচ্চারণ করতে চেষ্টা করল কিন্তু বার দুই 'পেল্ল' 'প্রলা' করেই ক্ষান্ত হল, বিজাতীয় শব্দটা তার জিহ্বার পক্ষে গুরুভার। টমাস তাকে সাহায্য করতে উদ্যত হল কিন্তু ততক্ষণে অসহায় কেরী প্রসঙ্গান্তরে পৌঁছেছে। কেরী বলল, বাল্যকালে পলার্সপিউরি গ্রামে একটি হিদেন বালককে দেখে প্রথম আমার মনে হিদেন সমাজে খ্রীষ্টধর্ম প্রচার করার বাসনা জাগ্রত হয়।

বিস্মিত রাম বসু সাগ্রহে বলে উঠল, কি আশ্চর্য ডাঃ কেরী, আপনার জীবনবৃত্তান্তের প্রত্যেকটি ঘটনার সঙ্গে আমাদের শাস্ত্রের কেমন গাঁঠে গাঁঠে মিল! গৌতম বুদ্ধের মনেও প্রথমে একটি সন্ন্যাসীকে দেখে সংসার ত্যাগের ইচ্ছা জেগেছিল।

এবারে বুদ্ধ নামোচ্চারণে কেরী সগর্বে উত্তীর্ণ হল, বললে, ইয়েস, বুঢা, তার কথা আমি পড়েছি।

টমাস মাথা নাড়ল—ভাবটা, আমরা বিশ্বাস করেছি।

তার পর কাপ্তেন কুকের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত পড়ে জানলাম, জগতে হিদেনের সংখ্যা অজস্র। তখন মনে হল, হায়, সত্যধর্মে দীক্ষিত না হয়ে মরলে এরা যে অনন্ত নরক ভোগ করতে বাধ্য হবে। তখনই স্থির করলাম, যাব হিদেনদের দেশে, সত্যনাম দিয়ে দূর করব তাদের নরকভোগ। এমন সময়ে—দেখ মুন্সী, করুণাময় ভগবানের কি দিব্য অভিপ্রায়—এমন সময়ে ব্রাদার টমাসের সঙ্গে পরিচয় ব্যাপটিস্টমণ্ডলীর এক সভায়।

রাম বসু স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বলে উঠল, যাক বাঁচলাম।

টমাসের সঙ্গে কেরীর পরিচয়, কেরীর বাক্য-সমাপ্তি, অথবা অনন্ত নরক ভোগের আশঙ্কা থেকে মুক্তির সম্ভাবনা—ঠিক কোন্ অর্থটি প্রযোজ্য রাম বসুর উক্তি সম্বন্ধে সেটা ঠিক বোঝা না গেলেও টমাস ও কেরী শেষোক্ত অর্থেই রাম বসুর উক্তিকে গ্রহণ করল। আদর্শবাদিতা ও নির্বুদ্ধিতা নিকটতম প্রতিবেশী।

রাম বসু বলল, সত্যধর্ম এদেশে প্রচার করতেই হবে, নইলে আমরা অনন্ত নরকে দগ্ধাব—কিন্তু আসল প্রশ্ন হচ্ছে, প্রচারকার্যের কেন্দ্র কোথায় হবে, কলকাতায় না মফস্বলে?

বলা বাহুল্য, রাম বসুর মনোগত অভিপ্রায় এই যে, প্রচারকার্যটা কলকাতাতেই চলুক, তা হলে সকল দিক রক্ষা পায়। কিন্তু কথাটা অত সহজে বলা চলে না, একটু ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলাই রীতি। যে-মাছ নিশ্চিত বঁড়শি গিলেছে তাকেও খেলিয়ে তবে টেনে তুলতে হয়।

টমাস বাংলা দেশের অনেক স্থানে ঘুরেছে, কাজেই তার বিশ্বাস, এ বিষয়ে সে একজন বিশেষজ্ঞ, তাই সে বলল, ব্রাদার কেরী, কলকাতায় ধর্মপ্রচার নিরর্থক। এখানে তবু কিছু প্রকৃত খ্রীষ্টান আছে, হিদেনগণ সদাসর্বদা খ্রীষ্টধর্মাবলম্বীদের মুখ দেখছে, কাজেই তাদের অবস্থা একেবারে শোচনীয় নয়। কিন্তু এখানে বসে থাকলে আমাদের চলবে না, যেতে হবে বাংলা দেশের আলোকবর্জিত সেই সব অঞ্চলে যেখানে এখনও প্রভুর নাম প্রতিধ্বনিতেও বহন করে নিয়ে যায় নি। সেসব স্থান আমি দেখে এসেছি ডাঃ কেরী, ভয়ানক সেসব স্থানের অবস্থা। সেখানকার অধিবাসীরা দিবারাত্রি নরকানলে দগ্ধ হচ্ছে—চল ব্রাদার, অবিলম্বে সেখানে যাই।

রাম বসু দেখল যে, টমাসের বাগ্মিতা যেমন চার পা তুলে ছুটেছে, কি ঘটে বলা যায় না; হয়তো বা সপরিবারে কেরীকে লেজে বেঁধে নিয়ে এখনই দেবে ছুট আলোকবর্জিত

সেই সব অঞ্চলে।

তাই টমাসের ধাবমান বাক্‌তুরঙ্গের গতিকে কতক পরিমাণে শ্লথ করবার উদ্দেশে রাম বসু বলল—কথা ঠিক, কিন্তু সেসব স্থান অতি দুর্গম, খাদ্যদ্রব্যের সেখানে অভাব, তার উপর আবার মারাত্মক ব্যাধি ও শ্বাপদের বড় উপদ্রব।

টমাস বলল, মুন্সী ঠিক কথাই বলেছে, কিন্তু প্রকৃত খ্রীষ্টানের সেজন্য ভয় পেলে চলে না—কারণ তার শক্তি অজেয়।

এই বলে সে তন্ময়ভাবে উঠে দাঁড়িয়ে অর্ধনিমীলিত নেত্রে করজোড়ে আবেগকম্পিত কণ্ঠে বলতে শুরু করল—

"প্রভু আমার পাথর, আমার কিল্লা, আমার পরিত্রাতা ; প্রভু আমার তাগৎ, যাহাতে আমার বিশ্বাস, আমার বর্ম, আমার মুক্তির শৃঙ্গ, আমার উচ্চ মিনার।"

কেরী ও টমাস সমস্বরে বলে উঠল, আমেন।

রাম বসু ভাবল, কি আপদ ! আমি থাকতে টমাস করবে রঙ্গমঞ্চ অধিকার ! দেখা যাক কে কত বড় অভিনেতা !

এবারে সে প্রকাশ্যে বলল, ভাল কথা, মিঃ টমাসের স্তোত্র আবৃত্তি শুনে মনে পড়ল যে, আমিও প্রভুর বিষয়ে একটা গীত লিখেছিলাম।

কই, সঙ্গে এনেছ নাকি ? বলে লাফিয়ে উঠল টমাস।

কেরী স্থিরভাবে অথচ আগ্রহের সঙ্গে শুধায়, সঙ্গে আছে ?

রাম বসু এই কদিনের মধ্যেই কেরী ও টমাসের চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ও পার্থক্য লক্ষ্য করেছে। বসুজার মতে কেরী ও টমাস দুজনেই ভক্ত, কিন্তু দুয়ের ভক্তির প্রকৃতিতে প্রভেদ আছে। কেরী ভক্তির খোয়া ক্ষীর, অটল অচল। আর টমাস ভক্তির পাতক্ষীর, ঢেলে দেবামাত্র নীচের দিকে প্রবাহিত হয়ে যায়। কত নীচে যায়, তার সাক্ষী স্বয়ং রাম বসু, জুয়ার আড্ডা পর্যন্ত যেতে দেখেছে, এবারে দেখবে বেশ্যাবাড়িতেও ভক্তিপ্রবাহের ঢেউ গিয়ে ধাক্কা মারে কি না।

বসু বলল, সে গীত কি কাগজে লেখা আছে, লেখা আছে এই এখানে—বলে দেখিয়ে দিল নিজের হৃদয়টা।

উৎসাহের আধিক্যে টমাস লাফিয়ে এক ধাপ কাছে এল রাম বসুর—ভাবটা, একবার হৃদয়ের মধ্যে উঁকি মেরে দেখবে কোন্ অক্ষরে গীতটি লিখিত—স্বর্ণাক্ষরে না রক্তাক্ষরে।

হঠাৎ সংযত হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে মুদ্রিত নেত্রে যুক্তকরে যথাযোগ্য আবেগকম্পিত কণ্ঠে রাম বসু পূর্বোল্লিখিত গীতটি রামায়ণপাঠের ভঙ্গীতে ও সুরে আবৃত্তি শুরু করে দিল।

ক্রমে তার দেহে স্বেদ অশ্রু কম্প পুলক প্রভৃতি সাত্ত্বিক লক্ষণ দেখা দিতে শুরু করল, আর ঝড়ের নাবিক যেমন আশাভরা আগ্রহে চাপমান যন্ত্রটার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে, তেমনিভাবে কেরী ও টমাস রাম বসুর মুখমণ্ডলের দিকে তাকিয়ে রইল। টমাস ভাবল, আহা, আমার কবে এমন তন্ময় অবস্থা হবে ; কেরী ভাবল, এ লোকটা সত্যধর্ম গ্রহণ করলে অনেক কাজ হয়।

কবিতা আবৃত্তি শেষ করে বসু বসল, তখনও তার ভক্তির ঘোর কাটে নি, তাই নির্বাক হয়ে রইল, আর গড়াতে লাগল তার চোখের কোণে জল।

কেরী শুধাল, মুন্সীজী, তুমি কেন সত্যধর্ম গ্রহণে বিলম্ব করছ ?

মুন্সী কপালে হাত ঠেকিয়ে বলল, নসিব, পাদ্রী সাহেব, নসিব! কতবার রাত্রে স্বপ্ন দেখেছি প্রভু যীশুখ্রীষ্ট এসে আদেশ করছেন—ওরে আমার মেষশিশু, আমার পালে এসে ভর্তি হ।

তবে কেন বিলম্ব?

সেই সঙ্গে তিনি অন্য একটি আদেশও যে করেছেন, কালীঘাটের ঐ পৌত্তলিক মন্দিরের পাশে আমার শ্রীগির্জা গড়ে তোল্—সেখানে হবে তোর দীক্ষা।

কেরী ও টমাস ঠিক এমন একটি কঠিন আদেশের জন্য প্রস্তুত ছিল না, তবু বিশ্বাস না করে উপায় নেই, কারণ একে শ্রীমুখের স্বপ্নাদেশ, দ্বিতীয়ত আদিষ্ট ব্যক্তির চোখের কোণে এখনও যে জলের রেখা।

তা ছাড়া, মুন্সী বলে, আমার ধর্মান্ধ পৌত্তলিক আত্মীয়স্বজনের অত্যাচার।

তোমাকে মারপিঠ করে নাকি?

করে না আবার! এই দেখ—বলে পিঠে একটা ক্ষতচিহ্ন দেখায় বসু।

কিছুদিন আগে ফোড়া হয়েছিল, তারই দাগ।

কেরী বলে, তুমি নালিশ কর না কেন?

কি বলছেন পাদ্রীসাহেব! আমার প্রভু কি তাঁর হত্যাকারীদের বিরুদ্ধে নালিশ করেছিলেন? আমি সেই দিব্য মেষপালকের পদাঙ্ক অনুসরণ করে কেবল বলি—পিতা ওদের ক্ষমা কর, ওরা জানে না ওরা কি করেছে।

নিজেদের হঠকারিতায় কেরী ও টমাস অনুতপ্ত হয়ে বলে, পিতা, আমাদের ক্ষমা কর।

তার পর কেরী শুধাল, এখন তাহলে কর্তব্য কি?

টমাস বলে, কর্তব্য তো প্রভু কর্তৃক নির্দিষ্ট, অন্যরূপ করবার সাধ্য কি আমাদের!

তবে সেই কথাই ঠিক—কলকাতা শহরেই কেন্দ্র করব ধর্মপ্রচারের, আর একটু স্থির হয়ে বসতে পারলেই মুন্সীর কাছে ফারসী ও বাংলা ভাষা শিখতে শুরু করব।

বসু বলে—বাসস্থানের কথাটাও আমি ভেবে দেখেছি। শহরেই মানিকতলা বলে একটা পাড়া আছে। সেখানে নীলু দত্ত নামে আছে আমার এক ব্যবসায়ী বন্ধু। লোকটা ঘোরতর পৌত্তলিকতাবিরোধী, তার উপর আবার আমার মতই প্রায়ই প্রভুর কাছে স্বপ্নাদেশ পেয়ে থাকে। সেদিন আপনার জন্য বাড়ি ঠিক করবার উদ্দেশে তার কাছে গিয়ে শুনলাম যে. সে রাত্রিবেলাতে স্বপ্ন দেখেছে প্রভু যেন বলছেন, ওরে বাছা, মাঠের মধ্যে হারিয়ে ফেলেছি আমার এক অবোধ মেষ-শিশু, শীগগির তাকে খুঁজে বাড়িতে নিয়ে আয়। এই স্বপ্নাদেশের অর্থ সে খুঁজে পাচ্ছিল না, এমন সময় আমি আপনার জন্য বাড়ির প্রসঙ্গ তুললাম, অমনি সে বলে উঠল—এই তো পাওয়া গেছে স্বপ্নের অর্থ! তবে পাদ্রী কেরী সাহেবই হচ্ছে সেই হারানো মেষ-শিশু! অবশ্য নিয়ে আসতে হবে তাকে আমার ঘরে।

তখন নীলু বলল—বলে চলে রাম বসু—মানিকতলায় আমার একটি বাড়ি আছে, সেটিতে নিয়ে এসে রাখ ডাঃ কেরীকে।

ভাড়া?

সর্বনাশ! প্রভু যাকে আদেশ দিয়ে পাঠিয়েছেন, তার কাছ থেকে নেব ভ'ড়া!—এই বলে সে কাট্‌স হিজ টাং—কি না, জিভ কাটে।

কেরী আঁতকে উঠে বলে—কাট্স হিজ টাং—! কেন? অ্যাণ্ড অল ফর নথিং!

টমাস বুঝিয়ে দেয় বাংলা ইডিয়মের অর্থ, বলে, ওর মধ্যে কাটাকাটি রক্তপাত কিছুই নেই।

কেরী আশ্বস্ত হয়, বলে—তবে সেই কথাই ভাল, একদিন ভক্ত নীলুকে নিয়ে এস, বাড়ির ব্যাপারটা শীঘ্র স্থির করে ফেলা যাক—কারণ তোমাদের যখন সকলের ইচ্ছা—

টমাস মনে করিয়ে দেয়—আর প্রভুরও যখন আদেশ—

কেরী বাক্য শেষ করে—কলকাতা শহরেই ধর্মপ্রচারের কেন্দ্র স্থাপন করা যাক।

রাম বসু বলে ওঠে, প্রভু, তোমার কৃপায় এখানে নতুন জেরুজালেম প্রতিষ্ঠিত হবে।

মনে মনে বলে, মা কালী, তোমার আশীর্বাদে ওদের খ্রীষ্ট আর খৃষ্টানির নিকুচি করে ছাড়ব! তুমি একটু সবুর করে দেখ না মা, কি হেনস্তা ওদের করে ছাড়ি!

কলকাতায় প্রচারকেন্দ্র করবার আরও কত সুবিধা যখন সে বোঝাতে উদ্যত হবে, তখন হঠাৎ ফেলিক্স ছুটে এসে বলল, বাবা, শীগগির এস, মা মূর্ছা গিয়েছে।

মূর্ছা গিয়েছে! তিনজনে চমকে উঠে দাঁড়ায়।

কেরী ও টমাস ব্যস্তসমস্ত হয়ে বাড়ির ভিতরে প্রবেশ করে।

রাম বসু ভিতরে গেল না, বাগানের মধ্যেই পায়চারি করতে করতে মনে মনে বলতে লাগল, মা, বেটীর মূর্ছা আর ভাঙিও না মা, ঐ বেটীই যত 'কু'-এর গোড়া, ওরই টানে কেরীর মন কলকাতা ছাড়বার জন্যে উসখুস করছে। দোহাই মা, মূর্ছা পর্যন্ত যখন নিয়েছ, আর একটু টেনে নিয়ে যাও, সকল ল্যাঠা সমূলে চুকে যাক।

এমনি কত কি বলতে বলতে সে একাকী পায়চারি করতে লাগল।

১৫
কেটির কি হল?

কেরী ও টমাস ঘরে ঢুকে দেখল যে, ডরোথি কৌচের উপর মূর্ছিত হয়ে পড়ে আছে, লিজা তার নাকের কাছে ধরে রয়েছে স্মেলিং সল্ট-এর শিশি, আয়া প্রকাণ্ড একখানা পাখা দিয়ে মাথায় বাতাস করছে। আর জন অদূরে চেয়ারের উপর মাথায় হাত দিয়ে বিষণ্ণ মুখে উপবিষ্ট। বুড়ো জর্জ স্মিথ হতবুদ্ধি হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল, কেরীকে দেখবামাত্র দৌড়ে এসে বলল, ডাঃ কেরী, আমি নিতান্ত দুঃখিত যে এমন অঘটন ঘটল।

কেরী বলল, আপনি দুঃখিত হবেন না, ডরোথির মাঝে মাঝে এমন হয়ে থাকে, এখনই সব ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু কেটিকে দেখছি না কেন? তার উচিত ছিল এসে সেবা করা, সে জানে এ রকম সময়ে কি করতে হয়।

কেটির নাম শুনে জন উঠে নীরবে কক্ষ পরিত্যাগ করে বেরিয়ে গেল। জর্জ স্মিথ বলল, তারই জন্যে এ বিপদটি ঘটেছে। আপনি পাশের ঘরে আসুন, সব বলছি।

বিস্মিত কেরী ও টমাস জর্জকে অনুসরণ করে পাশের ঘরে গেল। কেরী বলল—আমি খুব বিস্মিত ও উদ্বিগ্ন, কি হয়েছে খুলে বলুন।

কেটি ও জন চাঁদপাল ঘাটেই পরস্পরকে আপনার বলে চিহ্নিত করে নিয়েছিল আর তার পর থেকে দিবারাত্রির অনেকটা সময় একত্র যাপন করত। ঘাট থেকে ঘরে আসবার পথে জন প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যে, কেটিকে নিয়ে সুন্দরবনে বেড়াতে যাবে আর সুন্দরী গাছের বনের অনুবাদ করে জন তাকে শুনিয়েছিল যে 'ফরেস্ট অব বিউটিফুল উইমেন'। জন প্রতিশ্রুতি ভোলে নি। প্রত্যহ সকালে ব্রেকফাস্টের পরে দুজনে ঘোড়ায় চেপে বনের ভিতরে ঢুকে পড়ত, ফিরত সন্ধ্যার আগে, সঙ্গে নিত ডিনারের জন্য কিছু খাদ্য আর আত্মরক্ষার জন্য বন্দুক।

লিজা বলত, কি জন, বনটা কেমন লাগছে? জন বলত, প্রায় ইডেন উদ্যানের মত। কৃত্রিম বিস্ময়ে লিজা বলে উঠল, কি সর্বনাশ।

সর্বনাশ কেন?

সেই ইডেন উদ্যান, সেই আদম ও ইভ, এখন বাকিটুকু না মিলে যায়!

কি আর বাকি থাকল?

সর্পরূপী শয়তান।

বাঃ, তা না থাকলে আর মজা কিসের?

বল কি, মজা? আদম আর ইভকে যে ইডেন উদ্যান পরিত্যাগ করে পৃথিবীতে আসতে হয়েছিল!

সেই জন্যেই তো পৃথিবীতে তোমার মত সুন্দরী ভগ্নী পাওয়া গেল।

'সুন্দরী ভগ্নী' কথাটা সত্য, কিন্তু সেটা কেবল মিসেস কেরীর ভগ্নী সম্বন্ধেই প্রযোজ্য, অন্তত এক্ষেত্রে—বলে এলিজাবেথ।

কৃত্রিম কোপে তর্জন করে জন বলল, লিজা, তুমি বড় মুখরা। কিন্তু আমিও মূক নই, তবে এখন সময় অল্প, আমি চললাম, কেটি বাইরে অপেক্ষা করছে।

কেটির অপ্রত্যাশিত সৌভাগ্যে লিজার বুকে দীর্ঘশ্বাস ফুলে ফুলে উঠল, কিন্তু সহোদরের সৌভাগ্য বলে তা পুঞ্জীভূতরূপে বাইরে না এসে মনের মধ্যেই যেত বিলীন হয়ে; সে বলত, যাও, কিন্তু সাবধানে যাতায়াত ক'র।

ভয়টা কিসের? শয়তানরূপী সাপের?

শুধু সাপটাই বা কি কম ভয়ঙ্কর?

এইসব হাস্যপরিহাসের সময়ে কেউ জানত না যে, লিজার ঠাট্টা মর্মান্তিক বাস্তব রূপ গ্রহণ করবে। সুন্দরবন ইডেন উদ্যান না হতে পারে—তাই বলে এখানে শয়তানরূপী সর্প থাকবে না এমন কোন কথা নেই।

জন ও কেটি বনের মধ্যে দূর-দূরান্তে চলে যায়—বড় বড় গাছ, কালো কালো ছায়া, সরু সুঁড়িপথ—দুজনের ঘোড়া যথেচ্ছ চলে; ওরা পথ দেখে না, গল্পে তন্ময় হয়ে থাকে। ভ্রমণ যেখানে উপলক্ষ্য, লক্ষ্য স্থির রাখবার সেখানে কি প্রয়োজন? যখন বেলা বাড়ে, খিদে পায়, ঘোড়া বেঁধে রেখে দুজনে ঘাসের উপর বসে, এক পাত্র থেকে খাদ্য ভাগ করে নিয়ে খায়, একটু বিশ্রাম করে, সারাদিন বনে বনে কাটিয়ে সন্ধ্যায় ফিরে আসে।

লিজা শুধায়—জন, তোমাদের ক্লান্তি বোধ হয় না?

ক্লান্তি বলে একটা শব্দ অভিধানে থাকলেও প্রেমিকের অভিজ্ঞতায় একবারেই নেই। তাই ঐ শব্দটা শুনে জন চমকে উঠল—যেন শব্দটা প্রথম শুনল, কিছু বলতে হয় তাই বলল, কই না তো!

একদিন জন ও কেটি উপস্থিত হল দুর্গাপুর বলে ছোট এক গ্রামে। সেখানে পরিচয় ঘটল মশিয়ে দুবোয়া বলে এক ফরাসী ভদ্রলোকের সঙ্গে। লোকটা সভ্যতার প্রান্তে বনের মধ্যে অনেককাল বাসা বেঁধেছে। সুন্দরবনের মোম, মধু, হরিণের চামড়া প্রভৃতি পণ্য কেনে, শহরে চালান দেয়—ঐ তার ব্যবসা।

দুবোয়া তাদের দুজনকে সাদরে অভ্যর্থনা করল, দুপুরবেলা ডিনারে ভুরিভোজন করাল আর পুনরায় আসবে প্রতিশ্রুতি আদায় করে নিল তাদের কাছে। দুবোয়া অবিবাহিত।

জনের সাংসারিক ভূয়োদর্শিতা যথোচিত হলে এমন লোকের বাড়িতে কেটিকে নিয়ে দ্বিতীয়বার পদার্পণ করত না। কিন্তু জন অভিজ্ঞতায় কিশোর, বয়সে তরুণ, প্রেমে যুবক, তাই অন্ধ। তার বোঝা উচিত ছিল দুবোয়া-ও তার মতই নারীদুর্ভিক্ষ-জগতের মানুষ ; দিব্যদৃষ্টি থাকলে বুঝতে বিলম্ব হত না যে, ইংরেজ যুবকের জন্য মাঝবয়সী ফরাসীর আকস্মিক আকর্ষণের কারণ তৃতীয় কোন বস্তুতে নিহিত, সেটি দুর্ভিক্ষের অন্নপিণ্ড। আর 'বুভুক্ষিতঃ কিং ন করোতি পাপম্।'

এমন পর পর তিনদিন দুবোয়ার আতিথ্য গ্রহণ চলল। জন অবশ্য প্রসঙ্গত লিজাকে দুবোয়ার আতিথ্যের কথা জানিয়েছিল, কিন্তু সেটা এমনি অবান্তরভাবে বলেছিল যে, বিষয়ের গুরুত্ব লিজার মনে ওঠে নি। তাছাড়া, কেটিকে প্রশ্ন করেও কিছু জানতে পারে নি, জন যদিবা দু-চার কথা বলল, কেটি ও প্রসঙ্গে একেবারেই নীরব। তাই লিজা মনের মধ্যে দুবোয়া-প্রসঙ্গকে মোটেই আমল দেয় নি।

চতুর্থদিন দুপুরবেলা দুবোয়ার গৃহে ডিনার যথাবিধি সমাপ্ত হল, পাশের ঘরে কেটি গেল বিশ্রাম করতে, জন ও দুবোয়া ড্রইংরুমে বসে পান ও গল্পগুজব করতে থাকল। তার পর বিকেলবেলা ফেরবার সময় হলে জন বলল, মশিয়ে দুবোয়া, এবারে কেটিকে খবর দাও, এখনই বেরুতে হবে, আর বিলম্ব হলে ফিরতে অন্ধকার হয়ে যাবে, আজ চাঁদ উঠবে অনেক রাতে।

দুবোয়া বলল, তুমি অপেক্ষা কর, আমি খবর পাঠাচ্ছি—

এই বলে সে ভিতরে গেল, জন গেল বাইরে যেখানে ঘোড়া দুটি অপেক্ষা করছিল।

কিছুক্ষণ পরে দুবোয়া একাকী বেরিয়ে এল।

জন শুধাল, কেটি কোথায় ?

দুবোয়া বলল, মিস প্ল্যাকেট বলে পাঠাল যে, সে তোমার সঙ্গে যাবে না, এখানেই থাকবে।

বিস্মিত জন বললে, মশিয়ে দুবোয়া, এ পরিহাস আদৌ সময়োচিত নয়।

দুবোয়া বলল, এটা সময়োচিত, এবং আদৌ পরিহাস নয়।

তার মানে ?

সর্পবৎ মসৃণ, শয়তানবৎ স্মিতমুখ দুবোয়া বলল—তার মানে মিস প্ল্যাকেট স্থির করেছে যে আমার ঘরণী হয়ে আমাকে কৃতার্থ করবে।

জন গর্জন করে উঠল—মিথ্যা কথা ! তুমি তাকে গুম করেছ, আমি ভিতরে যাব।

সে ভিতরে প্রবেশ করতে উদ্যত হলে দুবোয়া দ্বার রোধ করে দাঁড়াল, বলল, নিতান্ত দুঃখিত যে, অতিথিকে বাধা দিতে হল।

নিরুপায় জন বলে উঠল, মশিয়ে দুবোয়া, আই ডিমাণ্ড স্যাটিসফ্যাকশন !

ওর অলঙ্কারচ্যুত অর্থ—জন দুবোয়ার সঙ্গে ডুএল লড়তে চায়।

দুবোয়া মৃদু হেসে বলল, আবার দুঃখিত মিঃ জন, আমি তোমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ করতে পারলাম না।

কেন, শুনতে পারি কি ?

অবশ্যই, মশিয়ে ভলতেয়ার বলেছেন, ডুএল ছেলেমানুষী ব্যাপার।

তোমার মশিয়ে ভলতেয়ার চুলোয় যাক।

কেউ কেউ সন্দেহ করে যে, তার চেয়েও অনেক বেশি তপ্ত জায়গায় মশিয়ে ভলতেয়ার গিয়েছে।

এত উত্তেজনার মধ্যেও দুবোয়ার মৃদু হাসিটি অবিকল থাকে, লোপ পায় না। ঐ হাসি দেখে জনের গা আরও বেশি জ্বালা করে, সে বলে ওঠে, তুমি কাপুরুষ।

আবার মশিয়ে ভলতেয়ারের কথার উত্তর দিতে হল, ষোল টাকা মাইনের সেপাইগুলোকে যদি সেকেন্দার শা মনে করে বীরপুরুষ ভাব তবে স্বীকার করছি যে আমি সত্যি সে দলের নই।

তুমি সেই দলের যারা মরতে ভয় পায।

ও-কথাটাও মিথ্যা নয়। মিস প্ল্যাকেটের সৌন্দর্য ও প্রেমের স্বাদ গ্রহণ না করে আমি, মরতে কেন, স্বর্গে যেতেই রাজী নই।

ব্যঙ্গের সুরে জন শুধাল, এটাও কি তোমার মশিয়ে ভলতেয়ারের কথা ?

প্রত্যেক কাঁণ্ডজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিই তাঁর উক্তির প্রতিধ্বনি করছে, করছে না কেবল প্রেমমুগ্ধ, ছেলেমানুষ ও জনবুল।

তোমা ভলতেয়ারকে পাঠিয়ে দেব শয়তানের কাছে।

তার প্রয়োজন হবে না মিঃ স্মিথ, মশিয়ে নিজেই শয়তানকে পাঠিয়ে দিয়েছে তোমার কাছে।

কই ?

তোমার সম্মুখে সশরীরে উপস্থিত এই দীন ভৃত্য দুবোয়া—ফরাসী প্রথায় কায়দা-মাফিক 'বাউ' করল।

আচ্ছা, আজ চললাম, কিন্তু এবারে ফিরে আসব সসৈন্যে, নিয়ে যাব মিস প্ল্যাকেটকে।

সেটুকু কষ্ট স্বীকার করবার আবশ্যক হবে না, শীগগির তোমাদের সঙ্গে গিয়ে আমরা দেখা করব—মশিয়ে ও মাদাম দুবোয়া।

তুমি জাহান্নমে যাও।

মিঃ স্মিথ, তুমি আমার অতিথি, তা ছাড়া তোমার কৃপাতেই মিস প্ল্যাকেটকে পেলাম। তোমাকে অভিশাপ দিতে চাই না, কাজেই শুভকামনা জানাচ্ছি—মিস প্ল্যাকেট-হীন স্বর্গে গিয়ে তুমি যেন নিরাপদে পৌঁছতে পার।

জন বুঝল আর কথা-কাটাকাটি বাহুল্য, সে ঘোড়ায় চড়ে রওনা হয়ে গেল।

দুবোয়া চীৎকার করে বলল, আর একটা ঘোড়া পড়ে রইল যে!

ওটা দিয়ে গেলাম, মিস প্ল্যাকেটের dowry—ঘোড়ার পিঠে চাবুক মারতে মারতে মুখ ফিরিয়ে বলল জন।

ফরাসীসুলভ মুদ্রাদোষে দুই কাঁধে ঝাঁকুনি দিয়ে দুবোয়া বলে উঠল—Tre bein!

জন বাড়ি ফিরে সমস্ত ঘটনা বলল। জর্জ বলল, এ যে লজ্জার একশেষ!

লিজা বলল, কেটি নিতান্ত ছেলেমানুষ নয়, ভিতরে ভিতরে তার ইচ্ছা না থাকলে এমনটি ঘটতে পারে না।

মিসেস কেরী কিছুই বলল না, নরম একটি কৌচ বেছে নিয়ে মূর্ছিত হয়ে পড়ল।

তখন ডাক পড়ল কেরী ও টমাসের।

পাশের ঘরে গিয়ে জর্জ কেরীকে আনুপূর্বিক সব বলল।

কেরী সব কথা শুনে বলল, কেটির এভাবে একাধিক দিন অপরিচিত ব্যক্তির বাড়িতে যাওয়া উচিত হয় নি।

জর্জ বলল, কেটির চেয়ে বেশি দোষ জনের, সে কেন কেটিকে নিয়ে এমনভাবে আত্মীয়তা করতে গেল?

সেজন্য দণ্ডও সে পাচ্ছে।

দোষের তুলনায় দণ্ড কিছুই নয়।

এমন সময় লিজা এসে খবর দিল যে, মিসেস কেরীর মূর্ছাভঙ্গ হয়েছে, তোমাদের ডাকছে।

কেরী ও জর্জ মিসেস কেরীর কাছে গিয়ে উপস্থিত হল।

স্বামীকে দেখে সখেদে সে বলে উঠল, কি দেশেই না এনেছ! কেটিকে হরণ করেছে, এবারে আমাকে হরণ করবার পালা।

কিন্তু স্বামীর মুখেচোখে সমর্থন বা আশঙ্কার ছাপ না দেখে বলে উঠল, পাষাণের হাতে পড়েছি।

তার পর বলল, মাথাটা আবার কেমন করছে। লিজা ডার্লিং, আমার স্মেলিং সল্টের শিশিটা নাকের কাছে ধর তো।

বলে একটা বালিস জুৎ করে নিয়ে মিসেস কেরী পুনরায় মূর্ছিত হয়ে পড়ল।

মিসেস কেরীর অপহৃত হওয়ার আশঙ্কায় এত দুঃখের মধ্যে টমাসের হাসি পেল। সে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গিয়ে উপস্থিত হল রাম বসুর কাছে। তাকে সব খবর দিল, দিয়ে জিজ্ঞাসা করল, মুন্সী, কিছুক্ষণ আগে আমাদের উক্তিটির সঙ্গে তোমাদের পৌরাণিক ঘটনার সাদৃশ্য দেখাচ্ছিলে, কেটি হরণের অনুরূপ তোমাদের পুরাণে কিছু আছে কি?

আছে বই কি। রুক্মিণীহরণ!

সেটা আবার কি?

আর একদিন বুঝিয়ে বলব।

আর মিসেস কেরীর আশঙ্কা?

ও বেটী তো যমের অরুচি, মানে death's dislike. ওকে হরণ করবে কার এমন বুকের পাটা!

তার কথায় টমাস হেসে উঠল। রাম বসু বলল, তাহলে আজ যাই।

টমাস চাপা গলায় বলল, সেই যে কোথায় নিয়ে যাবে বলেছিলে সে কথাটা ভুলো না।

রাম বসু বলল, ডাঃ টমাস, তোমাকে তো যেখানে-সেখানে নিয়ে যেতে পারি না। নিকি বাইজী নামে লখনউ নগরের এক ডান্‌সিং গার্ল-এর আসবার কথা আছে, সে এসে পৌঁছলে তোমাকে অবশ্যই নিয়ে যাব।

কিন্তু কথাটা যেন ডাঃ কেরীর কানে না ওঠে।

আরে রাম! এ বস কাজে গোপনীয়তা রক্ষা করতে হয় তা কি আমি জানি নে?

রাম বসু বিদায় হয়ে গেলে টমাস আবার ভিতরে গেল।

সে রাত্রে জন কিছুই আহার করল না, কেটির সংবাদ দেওয়া ছাড়া অন্য কথাও বলে নি, অভুক্ত অবস্থাতেই সে শয়ন করল।

লিজা শুয়ে শুয়ে মনটাকে বিশ্লেষণ করছিল। কেটির সংবাদে অবশ্যই সে দুঃখিত হয়েছিল, কারণ এ ক-দিনে কেটির সঙ্গে তার সৌহার্দ্য জন্মেছে। কিন্তু এখন মনটাকে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে দেখল যে, সেখানে অমিশ্র দুঃখ নেই। জলের নীচে পদ্মের ছোট্ট কুঁড়িটির মুখটি যেমন এতটুকু দেখা যায়, তেমনি তার মনের মধ্যেও যেন কেমন একটি আনন্দের প্রকটপ্রায় অস্তিত্ব। সে ভাবল, ব্যাপার কি? কেটির সঙ্গে জনের বিয়ে হলে সে খুশি হত সন্দেহ নেই। কিন্তু এখন বুঝল সেইটুকুই তো সব নয়। তবে কি এই অনুভূতির মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে ঈর্ষা ছিল? কেন? কেন নয়! কোথাকার কোন্ কেটি উড়ে এসে এই বাড়িঘর, পিতার স্নেহ, ভ্রাতার প্রেম দখল করে বসবে—আর সে নিস্ফল উল্কার মত অসার্থকতার স্তূপে গিয়ে পড়ে আবর্জনার রাশি বাড়াবে! না, এমন আদৌ সম্ভব নয়। সে ভাবল, বেশ হয়েছে, এমনটি হওয়াই উচিত ছিল। সে সিদ্ধান্ত করল কেটি বড় সহজ মেয়ে নয়, হয়তো ভাল মেয়েও নয়, নতুবা অমনি দুদিনের সাক্ষাতেই একটা বাউণ্ডুলে ফরাসীর সঙ্গে জুটে পড়ত না। তার মনে হল, খুব ফাঁড়া কেটে গেল জনের। ঐ মেয়েটাকে বিঁয়ে করলে জনের দুঃখের এবং শেষ পর্যন্ত লাঞ্ছনার অবধি থাকত না। লিজা যখন জনের সম্ভাবিত মুক্তির আনন্দে নিজেকে জনকে ও আত্মীয়স্বজনকে অভিনন্দিত করছিল তখন বিনিদ্র জন নিজেকে পৃথিবীর হতভাগ্যতম ব্যক্তি বলে মনে করে বালিসে মুখ গুঁজে পড়ে ছিল।

এমন সময় বৃদ্ধ জর্জ মোমবাতির আলো হাতে তার ঘরে প্রবেশ করল, স্নিগ্ধ কণ্ঠে বলল, জন, কালকেই আমি নিজেই পুলিস নিয়ে যাব কেটিকে উদ্ধার করে আনতে, তুমি নিশ্চিন্ত থাক।

যথাসাধ্য নিজেকে দৃঢ় করে জন বলল, না বাবা, ও রকম কিছু করতে যেও না। তাতে আমার দুঃখ বাড়বে বই কমবে না।...আর তাছাড়া আমি একটুও দুঃখিত হই নি।

এই বলে পিতাকে সান্ত্বনা দেওয়ার উদ্দেশে মুখে হাসি ফোটাতে চেষ্টা করল, কিন্তু এই প্রচেষ্টার উদ্যমে এতক্ষণের নিরুদ্ধ অশ্রু হঠাৎ বাঁধ ভেঙে নির্বারিত ধারায় নেমে এল তার দুই গাল বেয়ে।

বৃদ্ধ জর্জ এক ফুঁ-এ আলো নিভিয়ে দিয়ে প্রস্থান করল। পুত্রের অশ্রু দর্শনে ভূয়োদর্শী পিতার মন হাল্কা হয়ে গেল।

পুরুষ বিধাতার সৃষ্টি, নারী শয়তানের। পুরুষ ও নারীকে অবলম্বন করে সংসারে আজও দেবদানবের যুদ্ধ সক্রিয়।

১৬
মানিকতলার নীলু দত্ত

পাড়াপড়শীরা বলে, ব্যাপার কি হে নীলু দত্ত, হাতের আঙুল দিয়ে এক ফোঁটা জল গলে না, আর অতবড় বাড়িটা সাহেবকে বিনা ভাড়ায় থাকতে দিলে, বলি মতলবটা কি ?

নীলু দত্ত লোকটা স্বল্পভাষী, আর অধিকাংশ স্বল্পভাষী লোকের মত আত্মগোপনপ্রয়াসী। অনেকের অনেক জিজ্ঞাসাবাদের পর একদিন উত্তর দিল, আরে ভাই, একে বিদেশী তাতে আবার গরিব পাদ্রী, না হয় দিলাম দুদিন থাকতে, পড়েই আছে তো বাড়িটা।

পড়শীরা বলে, ওহে দত্ত, অনেক মোহর পড়েই তো আছে তোমার সিন্দুকে, কই দাও দেখি দুদিনের জন্যে আমাদের ?

তাদের কথা শুনে নীলু নীরবে হাসে।

নীলু দত্ত হঠাৎ-ধনী। কোম্পানির প্রথম আমলে ব্যবসা করে হঠাৎ কিছু টাকা করে ফেলে। ঐটুকুতে তার শ্রম ও বুদ্ধির আবশ্যক হয়েছিল। তার পর সে রইল, নিষ্ক্রিয়, তার টাকা হয়ে উঠল সক্রিয়। নদীস্রোত ও টাকার স্রোত একই নিয়মের অধীন। গোড়ায় মূল গতিবেগটা একবার সঞ্চার করে দিতে পারলে নিত্য নূতন ধারা সংগ্রহ করে নিয়ে বর্ধিততর বেগে স্ফীততর দেহে চলতে থাকে নদী ও অর্থপ্রবাহ। নীলু দত্ত একসময়ে দেখতে পায় যে তার সাধের তরণী স্রোতের প্রবল ঠেলায় কখন অজ্ঞাতসারে সার্থকতার সমুদ্রসঙ্গমে উপনীতপ্রায়। পাড়ার সকলে বলাবলি করে, এবারে একটা ডুব দিয়ে উঠলেই নীলু দত্তর জীবন্মুক্তি। এমন অবস্থায় মাথা ঘূর্ণিত হওয়াই স্বাভাবিক, কিন্তু এক্ষেত্রে তেমন অঘটন ঘটল না, নীলু দত্ত তৃণাদপি সুনীচ হয়েই থাকল। এখন তার একমাত্র খেদ এই যে, তার অর্থ আছে অথচ কৌলীন্য নেই ; ঐ যে ঘোষেদের বাড়ির ইটগুলো খসে পড়েছে, ওর কৌলীন্য নীলুর চেয়ে অনেক বেশি। তখন সে কৌলীন্য সংগ্রহে মনোনিবেশ করল। তখনকার দিনে সাহেব-সান্নিধ্য ছিল কৌলীন্য অর্জনের সহজতম পন্থা লোক বলত, যেমন-তেমন সাহেব লাট সাহেব। তাই রাম বসু কেরীকে আশ্রয় দানের প্রস্তাব করবামাত্র লাফিয়ে উঠে সে রাজী হল।

একটা অন্ধকারাচ্ছন্ন হিদেন জাতিকে আলোকদানের আশায় সপরিবারে কেরী কলকাতায় আসেন, আদর্শের আতিশয্যে পূর্বাপর ভালরূপে চিন্তা করবার সুযোগ পান নি, সঙ্গে ছিল ভাববাতিকগ্রস্ত টমাসের প্ররোচনা। টমাস তাকে বুঝিয়েছিল গ্রাসাচ্ছাদন ও আশ্রয়ের চিন্তা করবার প্রয়োজন নেই, জাহাজঘাটাতে উপস্থিত হলেই দেখতে পাবে যে হাজার হাজার হিদেন নরনারী তোমার মত 'প্রেরিত পুরুষ'কে মাথায় বহন করে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত। বলা বাহুল্য, কেরীর এ কয়দিনের অভিজ্ঞতায় টমাসের উক্তি সমর্থিত হয় নি। কেরী দেখল যে এই বৃহৎ নগরে আলোপ্রাপ্তীচ্ছু 'হিদেন' যদি কেউ বা থাকে তবে সে এখনও পর্যন্ত একান্ত গোপনেই আছে। আর, আশ্রয় ? সে তো দিয়েছে জর্জ স্মিথ। কিন্তু এখানে তো অনির্দিষ্টকাল থাকা চলে না। তার উপরে কেটির অন্তর্ধান, ডরোথির উন্মাদবৎ অবস্থা কেরীকে আরও বিব্রত করে তুলল। সে স্থির করল অবিলম্বে

অন্যত্র যাওয়া কর্তব্য। তাই রাম বসু নীলু দত্তর বাড়িতে গিয়ে বাস করবার প্রস্তাব করামাত্র কেরী সম্মত হল। কেরী মনে মনে আয়ের দিকটা হিসাব করে দেখতে পেল—হাতে আছে কেটারিঙের মিশন কর্তৃক স্বীকৃত মাসোহারা ষাট টাকা, দি হোলি বাইবেল ও মনের অদম্য আকাঙ্ক্ষা। আর ব্যয়ের দিকটা হিসাব করে দেখল—নিত্য ও নৈমিত্তিক অসংখ্যপ্রকার খরচ। তদুপরি ডরোথির হিস্টিরিয়া আর টমাসের অব্যবস্থিতচিত্ততা। এবম্প্রকার বাজেট সন্দর্শনে সাধারণ লোকের মূর্চ্ছা যাওয়ার কথা। কিন্তু একথা একশ বার স্বীকার্য যে, কেরী সাধারণ লোক ছিল না। সে ঈষৎ কুণ্ঠার সঙ্গে বাড়ি-ভাড়ার প্রসঙ্গ তুলতেই রাম বসু বলে উঠল—ও কথা মুখে আনবেন না, 'ডোণ্ট ব্রিং টু মাউথ।'

সে জানাল নীলু দত্ত একজন ভক্ত লোক।

কিন্তু সে ত হিঁদেন!

রাম বসু বলল, হিঁদেন হলে কি হয়, মনে মনে খাঁটি খ্রীষ্টান। কৃষ্ণ কৃষ্ণ জপ করতে করতে খ্রীষ্ট খ্রীষ্ট বলে ফেলে। ডাঃ কেরী, আপনার শুভাগমন সংবাদ আমার মুখে শুনে বলল,—ভায়া, পাদ্রী-বাবাকে বল যে, দয়া করে এসে আমার বাড়িতে পায়ের ধুলো অর্থাৎ 'ডাস্ট অব দি ফীট' দিয়ে বাস করুন।

তার পর সে বলল, এখন তার বাড়িতে গিয়ে বাস না করলে খুব দুর্নাম, কি না ব্যাড নেম হবে। যে-সব হিঁদেন এখন কৃষ্ণ বলতে খ্রীষ্ট বলে ফেলে তাদের সবারই আবার কৃষ্ণপ্রাপ্তি ঘটবে। ওখানে যেতেই হবে।

কেরী দেখল এমন অনুনয়ের পরে রাজী না হবার আর কারণ থাকতে পারে না। পরদিন কেরী ও টমাসকে নিয়ে রাম বসু নীলু দত্তর মানিকতলার বাড়ি দেখিয়ে আনল। মারহাট্টা খালের ঠিক ধারেই বাড়িটি—বেশ বড়, ভিতরে অনেকটা জায়গা, কেরীর পছন্দ হল।

রাম বসু ভাবে, এবার কেরীকে শক্ত করে বাঁধা গেল, এমন সুন্দর বৃহৎ বাড়ি ছেড়ে আর সে অনিশ্চয়ের মুখে ভাসবে না, আর জালি বোটের মত তাকেও পিছনে পিছনে ভেসে চলতে হবে না। সে আরও ভাবে যে, এ হল ভাল, কলকাতাতেও থাকা হবে আবার মাসিক কুড়ি টাকা বেতনও মিলবে। গাছের ও তলার ফল দুই-ই হবে তার করায়ত্ত। ভয় ছিল তার কেরীকে, এ কয়দিনেই বুঝেছিল যে কেরী ও টমাস এক উপাদানে গঠিত নয়। টমাস যত শক্তই হক, তবু ধাতুময়, আঘাতে বাঁকে, উত্তাপে গলে, কিন্তু কেরী গঠিত নিরেট পাথরে, আঘাতে ভাঙতে পারে কিন্তু উত্তাপে গলবার নয়। সেই কেরী এত সহজে স্থায়ী হল দেখে সে নিশ্চিত হল, চিন্তা ছিল না টমাসের জন্যে, কারণ তাকে আগেই বেঁধে ফেলেছিল।

সেদিনটা ছিল রবিবার। সেণ্ট জন্‌স গির্জায় উপাসনায় যোগ দিয়ে টমাসের ফিরতে প্রায় মধ্যাহ্ন হয়েছিল। বাড়ি এসে দেখে রাম বসু অপেক্ষা করছে। কি ব্যাপার?

একবার দেখা করতে এলাম।

বেশ বেশ, চল না আজ সন্ধ্যায় শহরটা একবার ঘুরে দেখে আসি।

শহরটা বলতে কতখানি কি বোঝায় জানবার উদ্দেশ্যে বসু বলে ওঠে, অমনি ডাঃ কেরীকে সঙ্গে নিলে হত না?

টমাস শিউরে উঠে বলে, আরে না না, তাকে আর বিরক্ত করা কেন, তুমি আমি দুজনেই যথেষ্ট।

বসুজা খেলোয়াড় লোক, মরা পাখীকে খেলিয়ে তবে আয়ত্ত করে। বলে, বেশ বেশ, চলুন শহরের গির্জাগুলো দেখে আসি, দেখলেও মনটা পবিত্র হয়।

বসু তুমিও দেখছি ধর্মবাতিকগ্রস্ত হয়ে পড়লে। দেখ, ধর্ম খুব উত্তম, কিন্তু জীবনের অন্য অঙ্গও তো নিন্দনীয় নয়।

বসু নিতান্ত জিজ্ঞাসুর মত শুধায়, এবিষয়ে প্রভু যীশুখ্রীষ্ট কি বলেন ?

"Give unto Caesar what is Caesar's", তবে দেখেছ যে, সীজারের সম্পত্তি প্রভু অস্বীকার করেন না।

রাম বসু ছাড়ে না ; বলে, প্রভু স্বীকার করলেও ডাঃ কেরী বোধ হয় স্বীকার করবেন না।

আরে তাকে একসঙ্গে ধর্মের শেয়ালে আর জ্ঞানের বাঘে আক্রমণ করেছে। শেয়ালের হাত থেকে যদি রক্ষা করা যায়, বাঘের হাত থেকে রক্ষা করবে কে ? সারাদিন অভিধান ব্যাকরণ প্রভৃতি নিয়ে মশগুল হয়ে পড়ে আছে। সারাদিন কি ঐ সব ভাল লাগে, তুমিই বল না। মানুষেরা তো একটু স্ফূর্তি করতেও চায়।

চাই বই কি ডাঃ টমাস।

তবে চল আজ সন্ধ্যায় ঘুরে আসা যাক।

সন্ধ্যাবেলা রাম বসু টমাসকে এক জুয়ার আড্ডায় নিয়ে গেল। দুজনে যখন বেরিয়ে এল—টমাস একেবারে গজভুক্তকপিত্থবৎ শূন্য।

টমাস কপাল চাপড়ে বলে উঠল—বসু, আমি নিঃস্ব হলাম।

বসু বলল, ক্ষতি কি ! স্বয়ং প্রভু যে নির্দেশ দিয়েছেন—"Give unto Caesar what is Caesar's!" ও ছাই গিয়েছে ভালই হয়েছে।

টমাস প্রভুর নির্দেশনায় খুব বেশি সান্ত্বনা পায় না। বলে, প্রভুর পক্ষে বলা সহজ, তিনি ছিলেন সন্ন্যাসী, আমি যে গৃহী।

গৃহ নেই, গৃহিণী নেই ; কেমন গৃহী ?

বসু, গৃহ আর গৃহিণী দুই-ই মনে, চালচুলো না থাকলেও, জরু গরু না থাকলেও অধিকাংশ মানুষই গৃহী।

তার পরে একটু থেমে থেকে শুধায়, তোমার জানা কোন money-lender আছে ?

রাম বসুর মধ্যস্থতায় গঙ্গারাম সবকাব মাত্র শতকরা পঁচিশ টাকা সুদে টমাসকে টাকা ধার দেয়। সে আভূমিনত সেলাম করে জানায যে, সরকারী কর্মচারী হলে সুদটা কিছু কম হত, কিন্তু—

কিন্তু, বলে টমাস, আমরা যে আরও বড় সরকারের কর্মচারী, পাদ্রী, প্রভুর প্রেরিত—

এবারে গঙ্গারাম আকাশের দিকে তাকিয়ে একটা নমস্কার করে, বোধ করি পূর্বোক্ত প্রভুর উদ্দেশেই, তার পরে বলে, পাদ্রী সাহেবের কথা যথার্থ, কিন্তু কি জানেন, এসব বৈষয়িক ব্যাপারে প্রভুর কর্মচারীর চেয়ে কোম্পানির কর্মচারীর গুরুত্ব বেশি।

তার পর টমাসকে খুশি করবার আশায় বলে, কোনরকম জামিন না রেখে যে আপনাকে টাকা দিলাম, তার কারণ আপনার সাদা চামড়া।

রাম বসু বলে, ওর চেয়ে বড় জামিন আর কি হতে পারে, ওটা যে আস্ত একটা

রুপোর খনি, কি না silver mine!

টমাসের ধারণা হল যে, মস্ত একটা রসিকতা হয়ে গেল, তাই একবার হাসবার চেষ্টা করল, কিন্তু শতকরা পঁচিশ টাকা মনের মধ্যে খোঁচা দিতে থাকায় হাসিটি তেমন প্রকট হল না।

একটিমাত্র শর্ত রইল যে, টাকা শোধ না হওয়া পর্যন্ত টমাস কলকাতা ছাড়তে পারবে না।

সেকালে ইংরেজরা, বিশেষ কোম্পানির ইংরেজ চাকরেরা দেশী মহাজনদের কাছে এমনভাবে বাঁধা পড়ত যে, তাদের নড়বার-চড়বার শক্তি থাকত না। নবাগত তরুণ writer (পরবর্তীকালের সিভিলিয়ান)-গণ পিতৃশাসনের কূপোদক থেকে এখানে এসে পড়ত যথেচ্ছচারিতার মহাসমুদ্রে, এদেশের মাটিতে পা দিয়েই উচ্ছৃঙ্খলতার চৌঘুড়ি হাঁকাতে শুরু করত। কিন্তু টাকা? কোম্পানির তন্‌খায় গ্রাসাচ্ছাদন চলাই দায়, অতিরিক্ত খরচ যোগায় কে? যোগাত এইসব মহাজন। কিন্তু মহাজনদের টাকা শুধত কে? Writer-গণই শুধত। কলকাতায় শিক্ষানবিশি পর্ব সমাধা করে জেলার ভার নিয়ে মফস্বলে যেতেই বেরুত তাদের অতিরিক্ত খানকতক হাত। উৎকোচ, প্রজাপীড়ন, দুর্বিচার প্রভৃতির মূল এখানে। অল্পকালের মধ্যে দেনা শোধ করে দিয়ে মহাপ্রভুরা প্রভূত অর্থ সঞ্চয় করে স্বদেশে ফিরে যেত, ভারতীয় জাদুদণ্ডের স্পর্শে জুড়িগাড়ি, বাড়িঘর, লাটঘরানা পত্নী ও পার্লামেণ্টের আসন প্রভৃতি জুটতে বিলম্ব হত না। এরাই তৎকালে ইংরেজ সমাজে 'Nabob' নামে পরিচিত। মুসলমানী নবাবী শাসনের সুযোগ্য উত্তরাধিকারী ফিরিঙ্গি নবাব।

অবশ্য এই ক্রমে ব্যতিক্রম টমাস। টমাসের মত ব্যক্তি সর্বযুগে সর্বসমাজে সর্বদেশেই ব্যতিক্রম।

নীলু দত্ত বলে, ভায়া, এবারে বড় বজরাখানা ঘাটে ভিড়িয়েছি, আর ভয় নেই।

রাম বসু উত্তর দেয়, কিন্তু ঐ ডিঙি নৌকোখানাকে একেবারে অবহেলা ক'র না। সংসারে বজরা আর ডিঙি দুয়েরই প্রয়োজন হয়।

সে কি আর আমি জানি নে! তুমি তো তাকে এরই মধ্যে গঙ্গারামী কাছিতে বেঁধে ফেলেছ।

কিন্তু আর একটা উপরি বাঁধন দিতে দোষ কি?

কি করতে চাও শুনি।

তখন রাম বসু আরম্ভ করে, অনেককাল টমাসের সঙ্গ করছি, দেখছি যে, প্রভু যীশুখ্রীষ্টের উপরে ওর যত টান, মেরি ম্যাগলেনের উপর টান তার চেয়ে কিছু বেশি।

নীলু দত্ত শুধায়, সে বেটী আবার কে?

গোড়ায় ছিল খানকী, পরে প্রভুর কৃপায় হল মস্ত তপস্বিনী।

সব খানকীরই দেখছি এক ধারা। তা তুমি এত কথা জানলে কোথায়?

বাইবেল পড়ে। পড় পড় দত্ত মশাই, বইটা পড়। জাত যাবে না, অনেক কেচ্ছা জানতে পাবে।

এইসব কেচ্ছা আছে নাকি বইখানায়? তবে যে ধর্মগ্রন্থ তাতে আর সন্দ নেই।

ওর পুরনো অংশে অনেক লচ্ছেদার কেচ্ছা আছে, কিন্তু সত্যি বলতে কি, আমাদের রামায়ণ-মহাভারতের কাছে কেউ নয়।

তখন নীলু দত্তের বেনিয়ান-আচ্ছাদিত লোমশ বক্ষে হঠাৎ আর্যগৌরব উদ্বেল হয়ে উঠল—সে দুই হাত মাথায় ঠেকিয়ে বলল, ভায়া, ওসব আর্যঋষিদের সৃষ্টি, হবে না ?

তার পর একটু থেমে বলল, তা এমন একখানা ভাল বই, বাংলা তর্জমা হলে যে পড়া যেত।

সে আশা শীগগিরই মিটবে—ঐ কাজ করবে বলেই তো কেরী এ দেশে এসেছে।

বেশ বেশ, সাত-শীগগির করে ফেলুক, দুপুরবেলা পড়া যাবে। কিন্তু টমাসের কথা কি বলছিলে ?

ওকে নারীঘটিত বাঁধন পরিয়ে দিতে পারলে নিশ্চিন্ত হওয়া যেত।

এই কথা ! এ আর কঠিন কি ? পরশুদিন আমার বাগানবাড়িতে নিকি বাইজীর নাচ হবে, অনেক সাহেব-সুবো আসবে। টমাসকে নিয়ে এস না।

সে কথা আভাসে একরকম তাকে জানিয়ে রেখেছি, এখন কেরী জানতে পেরে না গোলমাল ঘটায়।

তা ও বেটাকেও আন না কেন ?

সে বড় কঠিন ঠাঁই !

তবে সহজটাকেই নিয়ে এস। কিন্তু নিকির মত বনেদী বাইজী কি ঐ বুড়ো পাদ্রীর উপর নেকনজর দেবে ?

রাম বসু বলে, ভয় ক'র না, সে কাজ আমি অন্য লোককে দিয়ে করিয়ে নেব—টুশকিকে নিয়ে আসব।

নিজেদের প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের গৌরবে স্ফীত নীলু বলে, এবারে দেখা যাক ও বেটারাই আমাদের খিরিস্তান করে, না আমরাই ওদের জেণ্টু করি।

রাম বসু বলে, দত্তমশাই, আর দেরি করব না, তাড়াতাড়ি গিয়ে শুভ সংবাদটা টমাসকে শুনিয়ে আসি।

নীলু বলল, পরশু সন্ধ্যাবেলা, শনিবার !

রাম বসু দূর থেকে হাত নেড়ে ইশারায় জানায় যে সমস্ত তার মনে আছে।

১৭
নিকি বাইজী (?)

দোতলার হল-ঘরটায় নাচ চলছে। বারান্দার এক কোণে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে নীলু দত্ত ও রাম বসু কথা বলছিল।

রাম বসু বলে, দত্তমশাই, টুশকিকে যে নিকি বলে চালিয়ে দিলে, যদি ধরা পড়ে যায় ?

পাগল হলে ভায়া ? মদের এমন ঢালাও বন্দোবস্ত করেছি যে টুশকি-নিকিতে তফাৎ বোঝা দূরে থাক, মোহর-সিকিতে তফাৎ করবার ক্ষমতাও আর ওদের নেই। ঐ শোন—

একটা নাচের অন্তে বিজাতীয় কণ্ঠে উল্লাস-হুঙ্কার উঠল—

ব্রেভো, ক্যাটালিনি অব দি ঈস্ট !

নীলু দত্ত বলল, দেখলে তো কাণ্ডখানা। ওদের কি আর হুঁশ আছে! ঐ যে মাথায় ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে নিকি বাইজী, ব্যস, এখন যদি পাড়ার ক্ষেন্তি বুড়িও এসে নাচে তবু সে নিকি!

ব্রেভো নিকি, মাই ডারলিং।

যাক, তোমারও কম সুবিধে হয় নি। নিকি না আসাতে অনেক টাকা বেঁচে গেল।

ভায়া, সে গুড়ে বালি।

কেমন?

নিকি আসতে পারবে না শুনেই মদের বরাদ্দ বাড়িয়ে দিতে হল। নিকির রূপের অভাব মদের প্রভাবে ঢেকে দিতে হবে তো, নইলে যে বেটারা কুরুক্ষেত্র কাণ্ড করে বসবে।

কেমন, শুনি।

আগে ভেবেছিলাম ম্যাসওয়ানস বিয়ার আনব, কোয়ার্ট বোতল সাড়ে তিন টাকা ডজন। নিকি না আসাতে স্টোনস বাস বিয়ার আনাতে হল, কোয়ার্ট বোতল সাড়ে পাঁচ টাকা ডজন। তার পর দেখ, ন্যাশনাল মার্কা ব্রাণ্ডি চৌদ্দ টাকা বোতলের বদলে আনতে হল বী-হাইভ বাইশ টাকা বোতল, ডেনিস মুনি চব্বিশ টাকা বোতল, হেনেসি সাতাশ টাকা বোতল। সবসুদ্ধ মিলে নিকির খরচের উপর দিয়ে গেল।

রাম বসু শুধায়, দু-এক ফোঁটা প্রসাদ পাওয়া যায় না?

পাগল হয়েছ নাকি ভায়া! তলানিসুদ্ধ না খেয়ে বেটারা যাবে না।

যাই হক, বোতল বিক্রি করেও কিছু খরচা উঠবে। বিলিতি মদের বোতলের চড়া দাম, চার টাকা ডজন।

বসু, তুমি দেখছি এতকাল সাহেবের সঙ্গ করেও এদের স্বভাব জান না।

কেন, কেন?

যাওয়ার আগে বেটারা মাতাল হয়ে বোতল নিয়ে গদাযুদ্ধ আরম্ভ করবে—ঝাড়লণ্ঠন ভেঙে, কৌচ-চেয়ার গুঁড়িয়ে তবে বিদায় নেবে।

তবে এই কাণ্ড ফি বছর করতে যাও কেন?

কর্মফল! পাড়ায় খাতির বাড়বে, বনেদী ধনী ঘোষেদের উপর টেক্কা দিতে হবে।

তার পর সে একটা লম্বা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে—জানাম্যধর্মং ন চ মে নিবৃত্তিঃ।

গীতার মহদুক্তির পটভূমিতে হলঘরের মধ্য হতে ধ্বনিত হয়—

বিগিন ডারলিং বিগিন,
ক্যাটালিনি অব মাই হার্ট।

একটি মদমত্ত কণ্ঠ সুরা ও সুর-বিজড়িত স্বরে গেয়ে ওঠে—

You're quite all right inside the bar,
But khubarder, the Caviare!

রাম বসু বলে, নাঃ, একেবারে পাষণ্ড, গীতার মাহাত্ম্য বোঝে না, সব মাটি করে দিল।

নীলু দত্ত বলে, গীতার মাহাত্ম্য না বুঝলেও মহাভারতের অমর্যাদা করবে না।

ঠিক সেই মুহূর্তেই হলঘরে হাসির খিলখিল বেলোয়ারী আওয়াজ উঠল।

নাও, ঐ বোধ হয় সভাপর্বের অভিনয় শুরু হল। এখন দুর্যোধন দুঃশাসন—এক শ ভাই মিলে এক দ্রৌপদীকে নিয়ে টানাটানি শুরু করলে এখানেই না দ্রৌপদীপতন ঘটে।

সেই আশঙ্কাতেই তো রহিমাবিবি, হাফ কালী আর প্রমদাকে সঙ্গে নিয়ে এসেছি।

উচ্ছ্বসিত হাসি, ঘুঙুরের রব, গেলাসের টুংটাং, মদ্যবিজড়িত প্রণয়হুঙ্কার, হিন্দী ইংরেজী গানের দু-একটা ছিন্ন কলি আসতেই থাকে।

ওরা বলে ওঠে, কেলেঙ্কারির একশেষ।

নীলু বলে, মেয়েমানুষগুলোকে খুন-জখম না করে যায়।

রাম বসু পরামর্শ দেয়, মদের এত খরচা করলে, ঐ সঙ্গে একটা ডাক্তার যদি এনে রাখতে!

তাতে মাতালের সংখ্যা আর একটা বাড়ত বই তো নয়। এর পরে মেয়েমানুষগুলোকে খেসারত দিতে হবে, তারপরে আছে কসাইটোলা বাজারের ইউনিয়ন ট্যাভার্নের বিল শোধ। জেরবার হয়ে গেলাম ভাই, জেরবার হয়ে গেলাম।

নিকি এলে বোধ করি এত হাঙ্গামা হত না।

নীলু বলে, কে জানে! কিন্তু সে আসবে কেন, মহারাজা নবকৃষ্ণের বাড়ির বায়না ফেলে মানিকতলার নীলু দত্তর বাড়িতে আসতে যাবে কেন? ওকথা মনে করিয়ে আর দুঃখ দিও না। ও সব থাক।

প্রসঙ্গ পালটিয়ে শুরু করে, তোমার বিলম্ব দেখে ভাবলাম যে, টমাসকে বুঝি আনতে পারলে না।

প্রায় সেই রকম ব্যাপার দাঁড়িয়েছিল। হঠাৎ কেরী বলে বসল, না না, টমাস গেলে চলবে কেন, আজ সন্ধ্যায় দুজনে বসব বাইবেল তর্জমা করতে। শোন একবার কথা! কেরীর কথা শুনে টমাসের তো গেল মুখ শুকিয়ে—আমার দিকে ফ্যাল-ফ্যাল করে তাকায়। তখন আমি কেরীকে লম্বা এক সেলাম করে বললাম, মানিকতলার এক মুদি খ্রীষ্টান হবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছে। তাকে জানিয়েছি যে, সাঁচ্চা এক পাদ্রী নিয়ে এসে প্রভু খ্রীষ্টের মহিমা শোনাব। এখন ডাঃ টমাস না গেলে লোকটা কি ভাববে! বুঝলে দত্তমশাই, আমার কথা শোনবামাত্র কেরী আর টমাসের মুখ আশায় উজ্জ্বল হয়ে উঠল। পাছে বেটা কেরীও সঙ্গে আসতে চায়, টমাসকে নিয়েই দিলাম ছুট।

এখন টমাসে আর টুশকিতে ভেট করিয়ে দিতে হয়।

সেটা মহাপ্রস্থানিক পর্বের আগে—স্ত্রীপর্বে।

টুশকিকে সব শিখিয়ে পড়িয়ে এনেছ তো?

টুশকিকে শেখাতে হয় না, সে তোমাকে আমাকে সকলকে শেখাতে পারে।

চল তবে একবার খানার ঘরটা দেখে আসি, সব ঠিক আছে কি না।

হাঁ, দেবতার ভোগে ত্রুটি হওয়া কিছু নয়।

দেবতাকে ভয় না করলেও চলে, এরা যে ব্রহ্মদত্যি, একটু কোথাও ভুলচুক হলে ঘাড় মটকে সর্বনাশ করে দেবে।

তবে এগুলোকে ডাক কেন?

লোকে বেতালসিদ্ধ হতে চায় কেন?

দুজনে খানার ব্যবস্থা পরিদর্শনের উদ্দেশে প্রস্থান করল।

সেকালে নীলু দত্তর মত অভাজনের বাড়িতে সুপ্রচুর খানাপিনার লোভেও ইংরেজ পদার্পণ করত না। তবে এরা কারা? কলকাতার ইংরেজ সমাজের প্রত্যন্ততম প্রান্তে কোট-প্যাণ্ট-হ্যাট-ধারী ইংরেজীভাষী যে এক মিশ্র ফিরিঙ্গি সমাজ গড়ে উঠেছিল—এরা

তাদেরই সুযোগ্য প্রতিনিধি। ইংলন্ডের সঙ্গে এদের অধিকাংশেরই সম্বন্ধ জনশ্রুতিযোগে। দু-চারজন খাঁটি ইংরেজও আছে। দেউলিয়া হওয়া বা ঐ-জাতীয় কারণে খাঁটি স্বদেশী সমাজে অপাঙ্‌ক্তেয় হয়ে তারা এখন এদের গোষ্ঠীভুক্ত হয়েছে। টমাসকেই একমাত্র খাস ইংরেজ বলা চলে। মোট কথা, নীলু দত্ত ভারতীয় সমাজের যে-স্তরভুক্ত তার অতিথিরাও ইংরেজ সমাজে প্রায় সেই স্তরের। এইখানেই ভগবানের সমদর্শিতা। তিনি ভক্ত ও ভক্তির পাত্র এক ছাঁচে ঢালাই করে থাকেন, যাতে ভক্তির পাত্র না বলতে পারে ভক্ত পেলাম না, আবার ভক্ত না বলতে পারে ভক্তির পাত্র জুটল না। ভগবান যখন নিতান্ত কুৎসিত কালো মেয়ে গড়েন তখন সেই সঙ্গেই অনুরূপ রুচি দিয়ে একটি পুরুষ গড়তেও ভোলেন না। কেবল কালো কুৎসিত বলে কোন মেয়ের বিয়ে হল না, এমন তো শুনি নি। বাজারে টাটকা মাছ ও পচা দুই-ই আমদানি হয়, বাজার শেষ হয়ে গেলে দেখা যায়, দুই-ই উঠে গেছে। এই সব দৃষ্টান্তের পরে ভগবানকে আর কখনই একদেশদর্শী অপবাদ দেওয়া উচিত নয়।

গভীর রাত্রে মদোন্মত্ত নিমন্ত্রিতের দল বিদায় হয়ে গেল। বলা বাহুল্য সকলকেই লোকের সাহায্যে ঠেলেঠুলে গাড়ি, পালকি, তাঞ্জাম প্রভৃতি যানবাহনে তুলে দিতে হল। নীলু দত্ত মদের বরাদ্দ এমন সুপ্রচুর করেছিল যে ঝাড়লণ্ঠন ভাঙবার শক্তি আর তাদের অবশিষ্ট ছিল না—ভাঙাচোরার পালা গেলাস ও বোতলের উপর দিয়েই গেল। নীলু বলল, মদের খরচা বাড়িয়ে ঝাড়লণ্ঠনের খরচা বাঁচালাম।

বাকি রইল কেবল টমাস—তাকে নিয়ে যাবে রাম বসু। এই ব্যবস্থার কারণ স্বতন্ত্র, আর শীঘ্রই তা প্রকাশ পেল।

হলঘরটায় একটা কৌচের উপর হেলায়িত দেহে আসীন ছিল টমাস। হঠাৎ টুশকি কাছে গিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরে করুণভাবে বলে উঠল—টমাস সাহেব, তুমি আমার খসম, তুমি নাকি আমাকে ছেড়ে যাবে?

টমাস এই রকম ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত ছিল না। নাচের সময়ে আর সকলের মত সে-ও টুশকিকে সুপ্রসিদ্ধ নিকি মনে করে বাহবা দিয়েছিল, ঘাঘরা-ওড়নার রহস্যাবৃত সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়েছিল, তার সুরাস্খলিত পা দুখানার তালে তালে নিজেকে নর্তিত করেছিল, কিন্তু সেই নিকি (?) যে তাকে হঠাৎ এমন আপন মনে করেছে তা কল্পনায় আসে নি। টুশকির কথায় হঠাৎ কি উত্তর দেবে ভেবে পেল না।

টুশকি তার গলা জড়িয়ে ধরে বলে উঠল, তুমি চলে গেলে আমার জান বেরিয়ে যাবে, তুমি জানানা বধের পাপে পড়বে।

এবার আর কিছু না বললে চলে না, তাই টমাস বলল, না না, আমি কোথায় যাব।

টুশকি এবারে অঝোরে চোখের জল ছেড়ে দিল, বলল, মানিক আমার, মানিকতলায় থাকবে যেন, মদনমোহনতলায় আমার বাড়ি কি নেই? এস এস, আমার আর একটু কাছে এস।

এই বলে একটু টান দিতেই পাকা ফলটির মত টমাস ধপ করে মেঝেতে পড়ে গেল। টমাস দেখল টুশকির চোখে জল, সে তার ওড়না দিয়ে চোখের জল মুছিয়ে দিয়ে বলল, নিকি ডিয়ার, তোমার বাড়িতেই থাকবার ইচ্ছা, কিন্তু ঐ কেরীর জন্য তা সম্ভব হবে না।

কেরী তোমার কে ? সেই মুখপোড়া অর্থাৎ burnt-face তোমার কে ?

টুশকি রাম বসুর কৃপায় দু-চারটে ইংরেজী কথা শিখেছিল।

টুশকির প্রেমাতিশয্যে টমাস এবারে ভেঙে পড়ল, রুদ্ধ আবেগে বলে উঠল, কেউ নয়, কেউ নয়, নিকি, তুমি আমার সব।

তবে তিন সত্যি কর—অর্থাৎ three truth বল যে আমাকে ছেড়ে যাবে না ?

টমাস বলল, না, কখনই যাব না।

তবে চল আমার ও ঘরে।

কি কর্তব্য বুঝতে না পেরে টমাস যখন ইতস্তত করছে এমন সময়ে রহিমা বিবি ছুটে এসে বলল, এ কি তোর ব্যাভার ছুঁড়ি, আমার খসমকে বাগাবার চেষ্টা করছিস !

টুশকি বলল, চালাকি রাখ। টমুকে দেখে অবধি আমি পাগল হয়েছি।

আর তোর টমু যে আমাকে দেখে অবধি পাগল হয়েছে তার খোঁজ রাখিস ? নাচের সময় আমার দিকে তাকিয়ে এমনিভাবে সে চোখ মারছিল—

বলে সলোল দৃষ্টি নিক্ষেপের অভিনয় করে দেখাল।

যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা—বলে টুশকি মারল রহিমাকে এক ধাক্কা। তার ফলে রহিমা এসে জড়িয়ে ধরল টমাসকে। রহিমা ও টুশকির মধ্যে টমাসকে নিয়ে টানাটানির প্রতিযোগিতা পড়ে গেল।

তখন সেই বিষম সঙ্কটকালে টমাসের মনে পড়ে গেল অগতির গতি, অনাথের নাথ ভগবানকে। সে নতজানু হয়ে করজোড়ে আবৃত্তি শুরু করল—"প্রভু, আমার প্রার্থনা শ্রবণ কর ; শত্রুর কবল হইতে আমার জীবন রক্ষা কর। দুষ্টের মন্ত্রণা হইতে আমাকে রক্ষা কর—অন্যায়কারিগণের আক্রমণ হইতে আমাকে রক্ষা কর।"

টমাস বাংলা ভাষাতেই আবৃত্তি করছিল, বোধ করি 'শত্রু' ও 'অন্যায়কারিগণের মনে বিবেক জাগ্রত করবার আশাতেই।

নতজানু যুক্তকর টমাস প্রার্থনা করে, আর রহিমা ও টুশকি সেই প্রার্থনার তালে তালে তার দুই গালে চুম্বন করে—পাপের আক্রমণ ও সেই পাপনিরোধপ্রচেষ্টার এমন উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত জগতের ধর্মসাহিত্যে অসম্ভব না হলেও নিতান্ত বিরল।

টমাস গদ্‌গদকণ্ঠে আবৃত্তি করে—

"তোমার ভর্ৎসনায় তাহারা পালাইল, তোমার বজ্রের আদেশে তাহারা প্রস্থান করিল। তাহারা পাহাড়ের চূড়ায় উঠিল, তাহারা গভীর উপত্যকায় নামিয়া বিধি-নির্দিষ্ট স্থানে চলিয়া গেল।"

শেষোক্ত প্রার্থনা শুনে টুশকি বলে উঠল—দুঃখ কেন খসম আমার ! আমার সঙ্গে চল—এমন পাহাড়ের চূড়া দেখাব যার চেয়ে উঁচু নেই, এমন গভীর উপত্যকা দেখাব যার চেয়ে নীচু নেই—আর সেই স্থানে নিয়ে যাব যা একমাত্র তোমার জন্যেই বিধি-নির্দিষ্ট। কি লো ছুঁড়ি, পারবি তুই ?

শেষোক্ত বাক্য রহিমার উদ্দেশে।

টমাস টুশকি দুজনেই দেখল যে প্রচণ্ড হাসির আবেগে রহিমা ঘরময় লুটোচ্ছে।

টুশকি বলল, দেখলে তো টমাস সাহেব—পারবে না বলে এখন সরে পড়েছে।

বটে রে, সরে পড়েছি !

এই বলে রহিমা ওড়নাখানা কোমরে জড়িয়ে 'রণং দেহী' মূর্তিতে উঠে দাঁড়াল।

টুশকিও পশ্চাৎপদ হবার নয়, সে-ও ওড়না কোমরে জড়িয়ে বলল, আয় দেখি!

সেই যুযুধানদ্বয়ের ভীমবল্লভ মূর্তির দিকে তাকিয়ে টমাস দেখল দুজনেই পর্বতচূড়ার অধিকারিণী। ভয়ে তার প্রাণ উড়ে গেল।

হঠাৎ সে লাফিয়ে উঠে 'মুন্সী' 'মুন্সী' বলে রাম বসুর উদ্দেশে সবেগে প্রস্থান করল।

টুশকি ও রহিমা 'মেরি জান, কোথায় যাও', 'খসম আমার, পালাও কেন' —চীৎকার করতে করতে ছুটল স্খলিতপদ পলায়নপর টমাসের পিছু পিছু।

নাঃ, বোসজার সঙ্গে পালিয়েছে—বলতে বলতে তারা ফিরে এল।

এবারে রহিমা শুধাল, হাঁরে টুশকি, ব্যাপারটা কি?

রহিমা ষড়যন্ত্রের কিছু জানত না, টুশকি বুঝিয়ে বলতে সে আর এক দফা হেসে উঠল।

তার পরে শুধাল, কিন্তু সত্যি থাকবে কি? না নেশা কাটলেই সাহেবও শিকলি কাটবে?

কাটবে না বলেই মনে হচ্ছে, দেখা যাক কতদূর কি হয়।

এমন সময়ে রহিমা বিবি সবিস্ময়ে চীৎকার করে উঠল, ও আবার কি ঢং রে প্রমদা?

হাম প্রমদা নেই হ্যায়, হাম কর্নেল জবরজঙ্গ প্রিংলি সাহেব হ্যায়।

দুজনে দেখে প্রমদা কোথা থেকে একটা পুরনো জঙ্গী কোর্তা সংগ্রহ করে পরেছে, মাথায় দিয়েছে পালক-গোঁজা জঙ্গী টুপি, পরেছে আঁট প্যাণ্টলুন, আর মুখ রাঙিয়ে নিয়েছে সাদায়-লালে মেশানো রঙে।

দুজনে একসঙ্গে শুধায়, ও আবার কি ছিরি!

ছিরি-বিচ্ছিরি মৎ বোল। আও বিবিলোগ, কর্নেল সাহেবকো সাথ বলডান্স করনে পড়েগা।

এতক্ষণে তারা বুঝল যে আজকের পালা শেষ হয়নি, এবারে সাহেবী নাচের নকলে নাচ চলবে। এতে তারা মোটেই বিস্মিত হল না। কেননা, তখনকার দিনে বাইনাচের অন্তে সাহেব-বিবিগণ প্রস্থান করলে নর্তকীগণ নিজেদের মধ্যে সাহেবী নাচের অনুকরণ দেখিয়ে কৌতুক অনুভব করত।

প্রমদা রহিমাকে লক্ষ্য করে বলল, আও বিবি, তুমহারা সাথ ডান্স করেগা।

রহিমা বলল, তবে দাঁড়াও কর্নেল সাহেব, আমি আগে বিবি সেজে নিই।

এই বলে যথাসাধ্য ফিরিঙ্গি রমণীর সাজে সজ্জিত হয়ে সে গিয়ে দাঁড়াল প্রমদার কাছে। অমনি প্রমদা তার কোমর জড়িয়ে ধরে পূর্ণোদ্যমে ঘুরপাক খেয়ে শুরু করে দিল বলডান্সের প্রবল অনুকরণ।

তবলচি ও বাজিয়েরা অনেকক্ষণ চলে গিয়েছিল, তাই টুশকি বলে উঠল, বাজনা না হলে কি ভাই নাচ জমে!

কিন্তু শীঘ্রই সে দুঃখ দূর হল। ঘরের ভিতর কি চলছে দেখবার জন্যে চাকর-বাকরের দল প্রবেশ করে সোল্লাসে চীৎকার করে উঠল—'বাঃ বিবিসাহেব বেশ', 'খাসা', 'খুবসুরত', 'আর ছুরি মারিসনে পাগলি', 'কেটে দে মা বদরক্ত বেরিয়ে যাক'!

টুশকি বললে, শুধু বাহবা দিলেই হয় না, বাজনার যোগাড় কর।

অমনি তারা হাতের কাছে যা পেল—বোতল, গেলাস, প্লেট, চেয়ারের হাতল, টেবিলের পাটাতন—বাজাতে শুরু করল।

ক্রমে নাচ জমে উঠল। তখন একজন বলে উঠল, একটা গান হলে বেশ জমত। টুশকি বলল, জমত তো গাও না কেন, মিছে ষাঁড়ের মত চেঁচাচ্ছ কেন? ঠিক বলেছ প্রাণ আমার! বলে সে ধরল—

"দেখো মেরি জান
কোম্পানি নিশান।
বিবি গিয়া দমদম
উড়া হ্যায় নিশান।
বড়া সাহেব ছোটা সাহেব
বাঁকা কাপতান,
দেখো মেরি জান
লিয়া হ্যায় নিশান।"

এবারে আর কোন অঙ্গের অভাব রইল না—নৃত্য, বাদ্য, গীত সবেগে সরবে সোৎসাহে চলল—মদের গন্ধ ও পোড়া মোমের গন্ধে ঠাসা সেই অর্ধস্তিমিত নাচঘরের অর্ধরাত্রির প্রহরে। এখানেই এ পালার সমাপ্তি ঘটলে যথেষ্ট হল বলা চলত, কিন্তু না, কৌতুকময় জাদুকরের টুপির মধ্যে আরও কিছু কৌতুক সঞ্চিত ছিল।

ক্ষণিক নাচের বিশ্রামের অবকাশে রহিমা ও প্রমদা সাহেবী কণ্ঠের অনুকরণ শুরু করল—

আব্‌দা পেগ লাও।
নেহি নেহি ছোটা পেগ নেহি,
বড়া পেগ।
একদম ওয়ারেন হস্তিনকা হস্তিনীকা মাফিক বড়া পেগ।

তাদের দৃষ্টান্তে সকলেই যথাসাধ্য সাহেব বিবির জীবনযাত্রার অনুকরণ শুরু করে দিল—আর প্রত্যেক উক্তির শেষে হাসির হররায় ছাদের কড়িকাঠগুলো কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল।

এমন সময় গর্জন উঠল—কৌন হ্যায় রে বদমাশ!

সকলে সচকিত হয়ে ভাবল, এ তো নকল সাহেবী কণ্ঠ নয়, একবারে খাঁটি বিলিতি জিনিস!

শীঘ্রই তাদের সন্দেহ সমূলে দূর করে কৌচের অন্তরাল থেকে মাথা তুলল মিঃ জনসন। হেনেসি ব্রাণ্ডির কৃপায় কৌচের আড়ালে ধরাশায়ী মিঃ জনসন এতক্ষণ কারও চোখে পড়ে নি।

জনসনের রসভঙ্গকব আবির্ভাবে সকলে সন্ত্রস্ত হয়ে যথাসম্ভব বিনীতভাবে দাঁড়াল।

কিন্তু তাতে জনবুলী উষ্মা কমবার লক্ষণ দেখা গেল না। তিন-চার বার চেষ্টার পর সে পদস্থ হয়ে দাঁড়িয়ে সাচ্চা জনবুলী কণ্ঠ ও ভাষা ছুটিয়ে দিল—You bastards, you blackies, you rascals! You insult Britons! But…but—

একটা শূন্য মদের বোতল কুড়িয়ে নিয়ে ফুসফুসের তাবৎ প্রশ্বাস প্রয়োগে গর্জন করে উঠল—Rule Britannia, Britannia rules the waves!

আর সেই সঙ্গে শূন্য মদের বোতল গদার মত ঘোরাতে ঘোরাতে ব্রিটনসন্তান গণের অপমানকারীদের উদ্দেশে সে ছুটল—But, but, Britons never shall....

কিন্তু ব্রিটনগণের সঙ্কল্প প্রকাশের সুযোগ হল না, তৎপূর্বেই জনসন সশব্দে মেঝেতে পড়ল, বোতলটা শতখণ্ড হয়ে দর্শকদের গায়ে এসে লাগল। মহৎ সঙ্কল্পের এমন আকস্মিক পতন কদাচিৎ দৃষ্ট হয়।

খুন হল, খুন হল—বলে সবাই হল্লা করে উঠল।

শব্দে আকৃষ্ট হয়ে নীলু দত্ত ঘরে ঢুকে বলল, তাই বল, জনসন সাহেব এখানে! যাও সবাই মিলে ওকে গাড়িতে তুলে দাও, ওর কোচম্যান বড় ভাবিত হয়ে উঠেছে।

তখন নীলু দত্তর অনুচরগণ সমুদ্রশাসনদক্ষ ব্রিটন-সন্তানকে ধরাধরি করে গাড়ির উদ্দেশে নিয়ে চলল।

১৮
ডিনার ও ডুএল

কেরীদের মানিকতলার বাড়িতে যাওয়ার সঙ্কল্প জানতে পেরে জর্জ স্মিথ স্থির করল যে বিদায়ের আগে একদিন বড় রকমের একটি ভোগের অনুষ্ঠান করবে। জন ও এলিজাবেথ পিতাকে সমর্থন করল, বলল, এই উপলক্ষে আমাদের পরিবারের বন্ধু-বান্ধবদের নিমন্ত্রণ করা যাবে, তাদের সঙ্গে কেরী-পরিবারের পরিচয় করিয়ে দেবার এ সুযোগ ছাড়া যায় না। কাজেই পিতা পুত্র ও কন্যা তিনজনে আসন্ন ভোজের আয়োজনে লেগে গেল এবং কেরীদের কথাটা জানিয়ে দিল। কেরী বলল, আপনাদের অযাচিত বন্ধুত্বের ফলেই আমাদের বিদেশ-বাসের প্রথম পর্বটা সুসহ হয়েছে, আপনাদের কোন সঙ্কল্পে আমি বাধা দিতে চাই নে।

কিন্তু সঙ্কট বাধিয়ে দিল মিসেস কেরী। সে জেদ ধরে বসল, ভোজে কেটি ও তার স্বামীকে নিমন্ত্রণ করতে হবে।

বিস্মিত কেরী বলল, সে কি করে সম্ভব!

কেন সম্ভব নয়? ওদের তো রীতিমত বিয়ে হয়েছে। শুধু তাই নয়, মিঃ দুবোয়া খুব ভদ্রলোক, পাছে আমাদের মনে সন্দেহ থেকে যায় তাই সে বিবাহের রেজিস্ট্রিপত্রের যথাযথ নকল পাঠিয়ে দিয়েছে। এখন আর তাদের অপাঙ্ক্তেয় করে রাখবার কি কারণ থাকতে পারে?

ডরোথি, মনে রেখো যে ভোজের আয়োজন করেছে স্মিথ পরিবার। নিমন্ত্রিত বাছবার ভার তাদের উপরে, তুমি আমি পরামর্শ দেবার কে?

তুমি কেউ নও জানি, কিন্তু আমি নিশ্চয়ই পরামর্শ দেব, কারণ কেটি আমার বোন আর মিঃ দুবোয়া এখন আমার ডিয়ার ব্রাদার-ইন্-ল।

কেরী মহাবিপদে পড়ল। কেটি জনকে প্রত্যাখ্যান করেছে, এ তথ্য ডরোথি জানত না, আর জানলেও কিছু বুঝত কিনা সন্দেহ। তবু শেষ চেষ্টা হিসাবে বিষয়টি উত্থাপন করতেই ডরোথি কেরীর পিতামাতা সম্বন্ধে যে সব উক্তি প্রয়োগ শুরু করল তা ডরোথির মুখেও নূতন বটে। তাতেও কেরীকে নিরুত্তর দেখে শেষ অস্ত্র প্রয়োগে কৃতসঙ্কল্প হল—নরম দেখে গোটা দুই বালিস টেনে নিয়ে ডরোথি বলল, আমার গা কেমন করছে।

কেরী বলল, তুমি শান্ত হও, আমি যাচ্ছি।

ডরোথির অভিপ্রায় কানা-ঘুষায় স্মিথ পরিবারের কানে উঠতে লিজা চাপা তর্জনে বলল, না, তা কখনও সম্ভব নয়।

পিতা একবার মেয়ের একবার পুত্রের মুখের দিকে তাকিয়ে চুপ করে রইল।

জন বলে উঠল, কেন সম্ভব নয় লিজা ? ওঁরা পিতার অতিথি, ওঁদের অসম্মান হলে পিতার অপমান ; নিশ্চয়ই নিমন্ত্রণ করতে হবে মিঃ ও মিসেস দুবোয়াকে।

কৃতজ্ঞ পিতা জনের করমর্দন করে বলল, থ্যাঙ্ক্‌স জন ! ইউ আর এ ব্রেভ ফেলো।

ওদের নিমন্ত্রণ করাই স্থির হল।

লিজা চাপা স্বরে বলল, ডাইনী বুড়িটা ! মরেও না !

সেকালের কলকাতার শ্বেতাঙ্গ সমাজে মোটের উপর তিনটি জাত ছিল। উৎসব ব্যসন উপলক্ষে গভর্নরের কুঠিতে যারা নিমন্ত্রণ পেত—এই বিচিত্র বর্ণাশ্রমসমাজের তারা উচ্চতম থাক। যাদের উৎসব ব্যসনের অনুষ্ঠান হত টাউন হলে অর্থাৎ মেয়রের আদালত নামে পরিচিত অট্টালিকায়·· তারা মাঝারি থাক। আর একেবারে নিম্নতম থাকের উৎসবাদির নির্দিষ্ট কোন স্থান ছিল না। অল্প মাশুলের কোন ট্যাভার্নে তারা মিলিত হত। সামাজিক ব্যাপারে শেষোক্তদের উচ্চতম ও মাঝারি থাকে প্রবেশ ছিল নিষিদ্ধ। প্রয়োজন হলে অর্থাৎ নিমন্ত্রণস্থলে এরা সামাজিক মর্যাদাহীন ধনী নেটিভদের বাড়িতেও পদার্পণ করত।

নীলু দত্তর বাগানবাড়িতে এদেরই আমরা দেখেছিলাম। উচ্চতম থাকের শ্বেতাঙ্গগণ উচ্চতম থাকের 'নেটিভ'দের বাড়িতে যেত। ক্লাইভ, ওয়ারেন হেস্টিংস প্রভৃতি সকলেই মহারাজা নবকৃষ্ণ বাহাদুরের বাড়িতে পদধূলি দিয়েছে।

স্মিথ পরিবার মাঝারি থাকের শ্বেতাঙ্গ, তাদের আত্মীয়স্বজন, বন্ধু-বান্ধবও মাঝারি থাকভুক্ত, স্মিথদের মত অধিকাংশই ব্যবসায়ী। এরাই স্মিথদের নিমন্ত্রিত।

আর নিমন্ত্রণ করে পাঠানো হল মশিয়ে ও মাদাম দুবোয়াকে। স্মিথদের আশা ছিল দুবোয়ারা আসবে না।

জর্জ বলল, তুমি চঞ্চল হয়ো না লিজি, ওরা কখনও আসবে না।

লিজা হেসে বলল, বাবা, তুমি নিতান্ত সেকেলে লোক, কিছু জান না, ওরা নিশ্চয়ই আসবে।

জন বলল, ক্ষতি কি, আসবে আশা করেই তো লোকে নিমন্ত্রণ করে।

লিজা বিরক্ত হয়ে বলল, জন, তুমি চুপ কর। একটা অপরিচিত নবাগন্তুককে নিয়ে মাতামাতি করেই তুমি এই বিপদটি বাধিয়েছ।

কন্যার অভিযোগে পুত্রের ব্যথিত মুখ দেখে পিতার কষ্ট হল, সে বলল, এ তোমার অন্যায় লিজি, কেটিকে তো মন্দ বলে মনে হয় না।

ঝাঁজিয়ে উঠে লিজা বলল, না, মন্দ বলে মনে হয় না ! ও একটি চাপা শয়তান। আমি লক্ষ্য করেছি ব্রুনেট মেয়েগুলো কখ্‌খনো ভাল হয় না।

লিজা নিজে ব্লণ্ড।

অপ্রীতিকর প্রসঙ্গ চাপা দেবার উদ্দেশ্যে পিতা বলল, উচিত মনে করলে আসবে, এলে আমরা শিষ্ট ব্যবহার করতে ভুলব না।

প্রসঙ্গটা এখানেই চাপা পড়ল, কিন্তু লিজা বুঝে নিল যে জনের মনে কেটির আসন

আজও শূন্য হয় নি। ভাবল, এখন ভালয়-ভালয় নিমন্ত্রণ ব্যাপারটা চুকে গেলে হয়।

পুরুষের চোখ সৃষ্টি করেছেন বিধাতা বৃহৎ বস্তু দেখবার উদ্দেশ্যে, মেয়েদের চোখের সৃষ্টি সূক্ষ্ম দর্শনের নিমিত্ত। আদমের চোখ দেখেছিল আস্ত আপেল গাছটাকে, ইভের চোখ পড়ল গিয়ে কিনা তার ঐ ছোট্ট ফলটায়।

বেলা দুটোয় ডিনার। সেদিন কি-একটা ছুটি ছিল তাই ঘণ্টা-দুই আগে থেকে নিমন্ত্রিতদের অভ্যাগম শুরু হল। ক্রমে ফিটন, ব্রুহাম, ব্রাউনবেরি নানা শ্রেণীর শকটে স্মিথদের বাড়ির প্রকাণ্ড হাতা ভরে উঠল। অধিকাংশই এল সস্ত্রীক, যদিচ অবিবাহিত এককের সংখ্যাও অল্প নয়। একক হক আর যুগল হক প্রত্যেকের সঙ্গে এল খানসামা, সরদার, হুঁকোবরদারের ছোট্ট একটি বাহিনী।

জর্জ, জন ও এলিজাবেথ অতিথিদের অভ্যর্থনা করে নিয়ে বসাতে লাগল ড্রয়িংরুমে ; তার পর চলল কেরী পরিবারের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করিয়ে দেবার পালা। টমাস পুরনো বাসিন্দা, প্রায় সকলেরই পরিচিত।

জন ও লিজা যথারীতি অতিথিদের পরিচর্যা করছিল বটে, কিন্তু দুজনারই মনে একটা উগ্র চিন্তা সমস্তক্ষণ ঠেলা মারছিল। সস্ত্রীক দুবোয়া কি সত্যিই আসবে ? লিজা ভাবছিল ভদ্রতার খাতিরে দুবোয়া এলেও আসতে পারে, কিন্তু কেটি নিশ্চয় এমন নির্লজ্জ হবে না যে আসবে! জনের মনেও ঐ চিন্তা ছিল একটু ভিন্ন আকারে। যদি তারা না আসে ? সেটা খুব ভাল হয়, স্বস্তি পাওয়া যায়। কিন্তু তখনই আবার কেমন একটুখানি আশাভঙ্গের খোঁচা অনুভব করে জন। সত্যি কি আসবে না ? কেন, না আসবার কি কারণ ? কিন্তু যদি আসে, কি রকম ব্যবহার সে করবে ওদের সঙ্গে, মানে কেটির সঙ্গে ? লিজা বলেছিল যে, কেটি তার সঙ্গে অত্যন্ত দুর্ব্যবহার করেছে ; কিন্তু সেজন্য কেটিকে দায়ী করতে জনের মন সরে না। ওর কি দোষ ? লিজা বলে, কেটি সোনা ফেলে কাচ বেছে নিয়েছে। কিন্তু সংসারের সহস্র বিভ্রান্তির মধ্যে সোনা ও কাচ বাছা কি সব সময়ে সম্ভব ? কেটির পক্ষে জনের ওকালতিতে লিজা রাগ করে বলে, তুমি কাপুরুষ। জন মুখে না বললেও মনে মনে ভাবে ঐ কাপুরুষের মধ্যেই যে আছে পুরুষ। পুরুষ ভালবাসতে পারে, রাগ করতে পারে, কিন্তু একবারে নির্লিপ্ত হয় কিভাবে ? কেটিকে কখনও কখনও সে মনে মনে দোষ দিয়েছে বটে, কিন্তু পরমুহূর্তেই হয়েছে ঠিক উল্টো প্রতিক্রিয়া—অধিকতর আকর্ষণ অনুভব করেছে তার প্রতি। লিজা বলে, আসল দোষ কেটির—জন বলে, না, দুবোয়ার। লিজা বলে, দুবোয়ার কি দোষ ? বনের মধ্যে থাকে, সাতজন্মে সাদা মেয়ে দেখতে পায় না, যেমনি কেটিকে দেখেছে টুপ করে গিলেছে—তার দোষটা কি। কিন্তু ধন্য ঐ কেটিকে, শেষে কিনা আত্মসমর্পণ করল একটা ফরাসী শয়তানের কাছে।

ফরাসী শয়তান! জন ভাবে অভিধাটা একেবারে নিরর্থক নয়, যে ব্যক্তি শত গঞ্জনাতেও রাগে না, সব অবস্থাতেই মুখে হাসি ফুটিয়ে রাখতে পারে শয়তান ছাড়া সে আর কি ? ফরাসী শয়তান আর তার গুরু মঁ ভলতেয়ার। ভলতেয়ারের একখানা ছবি জন দেখেছিল—মুখমণ্ডলের সমস্তটাই যেন একটা নিশ্চল বিদ্রূপের হাসি। সেই থেকে জনের মনে শয়তান ও হাসিতে একটা নিত্যসম্বন্ধ দাঁড়িয়ে গিয়েছিল—সে ধারণা দৃঢ়তর হল দুবোয়াকে দেখে। ফরাসী শয়তান! শেষে কিনা তারই ভাগে পড়ল ঐ সোনার আপেলটা!

সোনার আপল শুনে লিজা রেগে উঠে বলে—তোমার মাথা খারাপ হয়েছে। মাকাল ফল, মাকাল ফল!

না লিজা, তুমি অবিচার করছ।

এ তর্কের আর শেষ হয় না। এমন সময়ে বাইরে চাকার শব্দ শুনে উঁকি মেরে দেখেই লিজা বলে উঠল—ঐ নাও, তোমার ফরাসী শয়তান এসেছে—

জনের মুখে আশাভঙ্গের পলাতক ছায়া দেখে লিজা বাক্যটা সম্পূর্ণ করল—সঙ্গে তোমার সোনার আপেলটিও এসেছে, ভয় নেই।

আশাভঙ্গের ছায়া অপসারিত হতেই অজ্ঞাত একপ্রকার ভয়ের ছায়ায় জনের মুখ এক লহমার জন্য পাণ্ডুবর্ণ হয়ে গেল, কিন্তু পরমুহূর্তেই জোর করে হাসি টেনে এনে বলল, চল লিজা, অভ্যর্থনা করি গে।

লিজা বলল, চল।

জন দেখল, লিজার মুখে শিষ্ট হাসির মুখোশ। লিজা দেখল, জনের মুখেও মুখোশখানা শিষ্ট হাসির বটে, কিন্তু দু-একটা সাচ্চা মুক্তো যেন চোখের কোণে আভাসিত।

ভাইবোন ছুটে গিয়ে দুবোয়া দম্পতিকে অভ্যর্থনা করে নামাল, বলল— আমাদের পরম সৌভাগ্য যে তোমরা এসেছ।

কেটিকে কিছু বলবার সুযোগ না দিয়ে আগাগোড়া মুখমণ্ডল সলজ্জ বিনম্র জামাতৃসুলভ হাসিতে বিমণ্ডিত করে দুবোয়া বলল, সে কি কথা! আমাদের আগেই আসা উচিত ছিল, তবে কিনা মাদাম দুবোয়াকে নিয়ে সুন্দরবনের দর্শনীয় স্থানগুলো দেখাতে ব্যস্ত ছিলাম। মাদাম বনটা দেখে খুব খুশি হয়েছে, বনটির নতুন নামকরণ করেছে—ফরেস্ট অব বিউটিফুল উইমেন।

জন ও লিজা নিমেষের জন্য পরস্পরের দিকে তাকাল, তার পর একসঙ্গে কেটির দিকে। কেটি চকিতে দৃষ্টি সরিয়ে নিল অন্যদিকে।

লিজাকে প্রশংসা করবার উদ্দেশ্যে দুবোয়া বলল, এখন দেখছি এ শহরটিও সুন্দর শহর হয়ে উঠেছে—টাউন অব বিউটিফুল উওম্যান।

লিজার কানের ডগা লাল হয়ে উঠল—ক্রোধে। সে ভাবল, আমি আদেখলে মেয়ে নই।

মুখ বলল, চল তোমাদের মিসেস কেরীর ঘরে নিয়ে যাই, সে খুব ব্যস্ত হয়ে অপেক্ষা করছে।

মিসেস কেরী নিজ প্রকোষ্ঠের নিভৃতে একাকী বসে প্রাক্‌ডিনার ক্ষুধোদ্রেক-চেষ্টায় খান-দুই চপ ভোজন করছিল, এমন সময়ে তাদের ঘরে ঢুকতে দেখেই 'ও মাই ডারলিং', 'ও মাই ব্রাদার-ইন-ল' বলে সখেদে চীৎকার করে উঠে বিনা ভূমিকায় মূর্ছিত হয়ে পড়ল।

এখন তার ঘন ঘন মূর্ছায় আর কেউ ভয় পায় না, কেটি তো আগে থেকেই অভ্যস্ত। যথাসময়ে মূর্ছাভঙ্গের অপেক্ষায় সকলে বসে রইল।

দুবোয়া বলে উঠল, মিসেস কেরী আমার ডিয়ার সিস্টার-ইন-ল না হলে ভাবতাম চপের ভাগ দেবার আশঙ্কাতেই মূর্ছাটি ঘটল।

কেটি বলল, এমন করে বলা তোমার অন্যায়।

সে হেসে মৃদুস্বরে বলল, আমার সাধ্য কি এমন কৌতুকজনক সত্য কথা বলি—এ হচ্ছে গিয়ে মঁ ভলতেয়ারের উক্তি। তুমি নিশ্চয়ই জান তার নাম? বলে অর্থপূর্ণ

দৃষ্টিতে তাকাল জনের দিকে।

দুবোয়ার গলার স্বরটি বিচিত্র, খুব দামী অথচ ব্যবহৃত রেশমের কাপড়ে বাতাস লাগলে যেমন একপ্রকার মৃদু মসৃণ শব্দ ওঠে, অনেকটা তেমনি।

মিসেস কেরীর মূর্ছা ও মূর্ছাভঙ্গ দুটোই সমান আকস্মিক। যেমন হঠাৎ সে মূর্ছিত হয়ে পড়েছিল তেমনি হঠাৎ তার মূর্ছাভঙ্গ হল—আর উঠে বসেই দুই বাহুতে কেটি ও দুবোয়াকে জড়িয়ে ধরে গদগদ কণ্ঠে 'মাই ডিয়ার সিস্টার' 'মাই ডিয়ার ব্রাদার' বলে অবিরল অশ্রুপাত শুরু করে দিল। কেটি অপ্রস্তুতভাবে নতমুখে বসে রইল, কিন্তু দুবোয়া সংসারে অপ্রস্তুত হওয়ার জন্যে জন্মায় নি, 'mon chere. mon chere' বলতে বলতে সেও অশ্রুধারা খুলে দিল।

পারিবারিক অশ্রুবর্ষণের মধ্যে আর থাকা উচিত নয় মনে করে জন ও লিজা সরে পড়ল। বলল, আমরা খাওয়ার ব্যবস্থা দেখি গে।

বেরিয়ে এসে লিজা বলল, জন, ওরা কি কান্নার জোলাপ খেয়েছে নাকি?

জন বলল, চল দেখি গে ওদিকের কতদূর কি হল।

প্রকাণ্ড ডাইনিংটেবিল ঘিরে অতিথিদের নিয়ে বৃদ্ধ জর্জ স্মিথ ভোজনে বসেছে। মিসেস কেরী দুপাশে বসিয়েছে কেটি আর দুবোয়াকে, মূর্ছাভঙ্গে সে যে ওদের বগলদাবা করেছিল—এখনও ছাড়ে নি, মুহূর্তে অচ্ছেদ্যসঙ্গী করে তুলেছে। জর্জ দুপাশে কেরী ও টমাসকে নিয়ে বসল। দুবোয়া এমনি নির্লজ্জ যে জনের হাজার আপত্তি সত্ত্বেও তাকে পাকড়াও করে পাশে বসাল, বলল, মিঃ স্মিথ, তুমি হচ্ছ শুভসূচনার দূত। জনের ইচ্ছা হল তার নাকে একটা প্রবল ঘুষি বসিয়ে দেয়—কিন্তু অতিথি, তাই 'শুভসূচনার দূত'কে স্বয়ং শয়তানের দূতের পাশে স্থান গ্রহণ করতে হল। কেটি চেষ্টা করেছিল লিজাকে পাশে বসাবে, কিন্তু সে কাজের অছিলা দেখিয়ে ছিটকে গিয়ে মেরিডিথ ও রিংলার নামে দুইজন পরিচিত বন্ধুর মাঝখানে আসন গ্রহণ করল। তার আসন-গ্রহণের তাৎপর্য অনুমান করে কেটি হাসল। লিজা মনে মনে বলল, মাদাম টাইগার, তুমি অধঃপাতে যাও। ইতিমধ্যেই সে মনে মনে সুন্দরবন-নিবাসী দুবোয়া দম্পতির নামকরণ করে ফেলেছে—মশিয়ে ও মাদাম টাইগার।

কেরী বিলাতে থাকতে শুনেছিল যে গ্রীষ্মপ্রধান ভারতে শ্বেতাঙ্গদের ক্ষুধা-তৃষ্ণা একবারে লোপ পায়, তারা কেবল জলবায়ু ও কৃষ্ণাঙ্গদের মঙ্গলসাধন-সঙ্কল্পের উপরে নির্ভর করে জীবনধারণ করে। কিন্তু এ-কয়দিন সে যা দেখেছে ও শুনেছে তাতে ঠিক পূর্বশ্রুতির সমর্থন পায় নি। আর এখন এই ভরদুপুরে গ্রীষ্মমণ্ডলের সূর্য যখন মাথার উপরে তখন এতগুলি শ্বেতাঙ্গ নরনারী টেবিলের উপরে স্তূপীকৃত আহার্য সম্বন্ধে প্রচ্ছন্ন ও প্রকট যে আগ্রহ প্রকাশ করতে লাগল, তাতে কেরীর বুঝতে কষ্ট হল না যে, দ্বৈপায়ন ভ্রাতা-ভগ্নীগণের আভ্যন্তরীণ আর যে শক্তিই হ্রাস পেয়ে থাকুক জঠরেন্দ্রিয় স্ব-মাহাত্ম্যে অটুট আছে। কেরী এক নজরে টেবিলের আগাগোড়া জরিপ করে নিল—খাদ্যের বৈচিত্র্য ও পরিমাণ সত্যই বিস্ময়কর। সুপ, রোস্ট ফাউল, কারি রাইস, মটন পাই, ফোরকোয়ার্টার অব্ ল্যাম্ব, রাইস পুডিং, টার্ট, চীজ, টাটকা মাখন, টাটকা রুটি...

কেরী দেখল তালিকার এখানেই শেষ নয়, অজ্ঞাত ও পরিজ্ঞাতনামা বিচিত্র মৎস্য, আর সর্বোপরি প্রকাণ্ড রজতপাত্রে রক্ষিত শ্বেতাঙ্গ-সমাজের অতি প্রিয় "Burdwan stew"

নামে খাদ্য।

আর সর্বশেষে আছে—কেরী ভাবল, সর্বশেষেই বা কেন, ও বস্তু তো আদিতে অন্তে মধ্যে, সর্বক্ষণ ও সর্বত্র আছে—উঁচু নীচু, ছোট বড়, স্থূল ও সূক্ষ্ম বিচিত্র বোতলাধারে মেডিরা, ক্ল্যারেট, বিয়ার, বী-হাইভ ও হেনেসি ব্রাণ্ডি!

অদূরে দরজার পাশে আর একখানা ছোট টেবিলে সারিবদ্ধ সোডা-ওয়াটারের বোতল, কাছেই উদ্যত ক্ষিপ্রহস্ত চার-পাঁচজন আব্‌দার বিখ্যাত লাল শরাব প্রস্তুত করছে। কেরী শুনেছিল যে, প্রবাস-দুঃখ ভোলবার মস্ত একটা উপায় Loll Shrub পান।

আনুষ্ঠানিক ভোজসভা কেরীর অভিজ্ঞতায় এই প্রথম। এই প্রভূত খাদ্য, অথচ খাদক মাত্র বারো-চৌদ্দজন। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই যখন ক্ষীণাঙ্গী কেটিকে আড়াই পাউণ্ড চপ আত্মসাৎ করতে দেখল, তখন খাদ্যের পরিণাম সম্বন্ধে তার মনে যে বৃথা দুশ্চিন্তা দেখা দিয়েছিল, তা অপগত হল—আর সেই সঙ্গে বুঝল সুন্দরবনের জলহাওয়া স্বাস্থ্যের বিশেষ অনুকূল। কিন্তু তার সব চেয়ে বিস্ময়ের কারণ হল চাকরবাকরদের ব্যবহার। গৃহস্বামী ও অভ্যাগতদের ভৃত্যদের মিলিত সংখ্যা কম পক্ষে শতাধিক। কিন্তু এই একশ লোক কখন যে নীরবে ডাইনিং রুমে ও ডাইনিং রুমের বাইরে স্ব স্ব নির্দিষ্ট স্থান গ্রহণ করেছে, তা সে টেরও পায় নি। এমন শিক্ষা, এমন অভ্যাস, এমন কর্তব্যপরতা সৈন্যবাহিনীতেও দেখা যায় না। কেরী দেখল যে প্রত্যেক ভোক্তার পিছনে জন দুইতিন ভৃত্য দণ্ডায়মান, তন্মধ্যে একজন একখানা চামর দোলাচ্ছে—উদ্দেশ্য মক্ষিকা বিতাড়ন। মক্ষিকার অভাব হলেও প্রথারক্ষা অনিবার্য, নইলে তার চাকুরি থাকবে না।

তার পর বৃদ্ধ জর্জের ইঙ্গিতে ক্ষিপ্রহস্ত নীরবচরণ বাবুর্চির দল চঞ্চল হয়ে উঠল, আব্‌দারগণ কর্তৃক পরিবেশিত Loll Shrub বিস্ময় ও বাহবার উদ্রেক করল, আর সোডার সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে ফেনায়িত সুরা দর্শনে, স্পর্শনে, ঘ্রাণে ও স্বাদে পঞ্চেন্দ্রিয়ের তৃপ্তিসাধনে লেগে গেল। সেই সঙ্গে শুরু হল কাঁটা চামচ ও ছুরির টুংটাং নিক্কণ।

দুবোয়া ও কেটির কাহিনী কলকাতার শ্বেতাঙ্গ সমাজ শুনেছিল, অতিথিরাও জানত ; কাজেই সকলেই মনে মনে অস্বস্তি বোধ করছিল, ভাবছিল কথাবার্তা কোথা থেকে শুরু করা যাবে। এমন সময়ে সকলের সব সমস্যার অবসান ঘটাল স্বয়ং মশিয়ে দুবোয়া। দুবোয়া অতিশয় ধূর্ত, অল্পক্ষণের মধ্যেই অথিতিদের অসাড়তার কারণ সে বুঝে নিয়েছিল—তাই সমস্ত আবহাওয়াটাকে নাড়া দেবার উদ্দেশ্যে আরম্ভ করল—মঁ ভলতেয়ার বলে গেছেন, আবহাওয়া সৃষ্টির দুটো উদ্দেশ্য, একটা হচ্ছে জীবের প্রাণরক্ষা, আর একটা হচ্ছে সামাজিক সৌজন্য রক্ষা।

মেরিডিথ বলল, সে আবার কেমন?

আবহাওয়া তত্ত্ব দিয়ে কথোপকথন শুরু করা যায়।

কেউ কেউ হাসল।

মেরিডিথ আবার বলল, শুনেছি যে তোমার মঁ ভলতেয়ার ভগবান মানে না, তবে আবহাওয়া সৃষ্টি করল কে?

দুবোয়া দুই কাঁধে ঝাঁকুনি দিয়ে স্মিতবিকশিত মুখে অবাধে বলল—The other fellow!

টেবিলসুদ্ধ সবাই বিস্ময়ে ক্রোধে লজ্জায় সমস্বরে বিরক্তিসূচক অব্যক্ত ধ্বনি করল। কেরী ও টমাস বুকে ক্রস-চিহ্ন অঙ্কন করল, কেবল মিসেস কেরী বুঝে উঠল না যে

ব্যাপারটা কি ঘটল—সে মূঢ়ের মত একবার দুবোয়ার একবার কেটির মুখে বৃথা অর্থ সন্ধান করে বুঝল যে এই কঠিন সমস্যার তুলনায় Burdwan stew অনেক বেশি তরল আর অনেক বেশি সুপেয়। সে বেশ খানিকটা নিজের প্লেটে ঢেলে নিল।

জর্জ স্মিথ অবাঞ্ছিত আলাপের প্রসঙ্গ ঘুরিয়ে দেবার উদ্দেশ্যে দুবোয়াকে লক্ষ্য করে বলল, মঁ দুবোয়া, তোমার সঙ্গে এখনও ডাঃ কেরীর পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয় নি। ডাঃ কেরী এসেছেন এদেশে খ্রীষ্টধর্ম প্রচার করবার আশা নিয়ে।

উপবিষ্ট অবস্থায় যতটুকু 'বাউ' করা যায় তেমনি একটা ভঙ্গী কেরীর প্রতি করে দুবোয়া বলল, বিলক্ষণ। যদিও ব্যক্তিগতভাবে ডাঃ কেরীর সঙ্গে আমার এখনও আলাপ হয় নি, কিন্তু ওঁর কথা যথেষ্ট শুনেছি আর ইতিমধ্যেই বুঝে নিয়েছি যে, খ্রীষ্টধর্ম প্রচারে ডাক্তার সফলকাম হবেন।

কেরী কৃতজ্ঞতার সঙ্গে তাকাল দুবোয়ার দিকে। দুবোয়া নিজ উক্তির ভাষ্যস্বরূপ বলল, ডাক্তার কেরী আনীত শান্তির কপোত এসেই বাসা বেঁধেছে আমার গৃহে—এই বলে সে কেটিকে দেখিয়ে দিল।

কেটি স্বামীর বাচালতায় লজ্জিত হয়ে উঠেছিল, এবারে সে ভাব আরও ঘনীভূত হল, সে মাথা হেঁট করল।

দেখ ডাক্তার কেরী, তোমার শান্তিদূত কেমন নীরব ও নম্র।

তার পরে একটু থেমে বলল, কিন্তু রাত্রে বড় ঠোকরায়।

তার অশিষ্ট ইঙ্গিতে সকলে স্তম্ভিত হয়ে গেল।

শেষরক্ষার আশায় জর্জ বলল, ডাঃ কেরী স্থির করেছেন যে কলকাতাতেই স্থায়ী হয়ে বসে হিদেনদের মধ্যে প্রেমধর্ম প্রচার করবেন।

দুবোয়া বলল, ডাঃ কেরী যথার্থই আমার ব্রাদার-ইন-ল। কারণ আমিও অনেক বছর হল সুন্দরবনে প্রেমধর্ম প্রচার করছি, বিশেষ করে হিদেন নারীদের মধ্যে।

এই অসভ্য লোকটির দুঃসাহসে সকলে বিরক্ত হয়ে উঠেছিল, ভাবছিল কেউ যদি একটা সমুচিত উত্তর দেয় তো ভাল হয়।

মেরিডিথ বলল, তবে তো তোমার পক্ষে শান্তি-কপোত বাহুল্য।

স্বভাবসিদ্ধ মৃদুহাস্যে দুবোয়া বলল, আদৌ বাহুল্য নয়, পোষাপাখী দেখিয়ে বুনোপাখী ধরতে হয়, তা কি জান না?

মেরিডিথ বলল, তোমার উক্তি বড় অশিষ্ট।

বিস্ময়ের ভান করে দুবোয়া বলল, কি আশ্চর্য, ডিনার টেবিল তো গির্জের বেদী নয় যে, সদুপদেশ বর্ষিত হবে।

তবু ভুললে চলে না যে, এখানে ভদ্রমহিলা আছে।

নইলে অশিষ্ট কথা বলায় আনন্দ কি? আর তাছাড়া অশিষ্ট কথাই বা কি এমন বলেছি। পড়তে মঁ ভলতেয়ারের Candide বইখানা, দেখতে অশিষ্ট কথা কাকে বলে।

কেরী বলল, তার চেয়ে হোলি বাইবেল কি ভাল নয়?

সোৎসাহে দুবোয়া বলে উঠল, নিশ্চয়, নিশ্চয়। সংস্ অব সলোমন অতি উপাদেয় রচনা—স্বয়ং মঁ ভলতেয়ারও ওর সীমা লঙ্ঘন করতে পারেন নি।

সকলে বুঝল যে এই ফরাসী বাচাল কিছুতেই থামবে না। তাই সকলে আলাপের সূত্র ছেড়ে দিয়ে খাদ্য গ্রহণে অধিকতর মনোনিবেশ করল। নীরব টেবিল কাঁটা-চামচের

নিক্কণে, সোডাবোতল খোলবার সশব্দ উচ্ছ্বাসে, মদ ঢালবার লোভনীয় আওয়াজে মুখর হয়ে উঠল।

একজন আব্‌দারের উদ্দেশ্যে বলল, আউর থোড়া বরিফ।

জর্জ স্মিথ বলল, বরফের প্রসঙ্গে একটা মজার ঘটনা মনে পড়ল, শুনলে তোমরা নিশ্চয় আনন্দ অনুভব করবে। সেদিন আমার হেড খানসামাকে বরফ বলেছিলাম। যতটা বরফ আনতে বলেছিলাম তার অর্ধেক মাত্র নিয়ে আসায় আমি বিস্মিত হলাম। শুধালাম, ব্যাপার কি, এতটুকু কেন ? লোকটা অনেকদিন আমার কাছে আছে, কিছু কিছু ইংরেজী শিখেছে —তার কথাগুলো তার বিচিত্র ইংরেজীতেই বলছি, ও-ইংরেজী একবার শুনলে ভোলবার নয়।

আমি শুধালাম—How is this ?

সে বললে—Master, all make met.

Did you rap it well in the cloth?

No, Sahib, that make ice too muchee warm.

Did you close the basket ?

No, Master, because that make ice more warm.

Then the ice had the full benefit of sun and air. Idiot!

ঘটনাটি শুনে সকলে হো হো করে হেসে উঠল।

হাসল না কেবল দুবোয়া।

মেরিডিথ বলল, মনে হচ্ছে দুবোয়ার কাছে ঘটনাটা বিচিত্র লাগে নি।

দুবোয়া বলল—সত্যি তাই। এ আর এমন বিচিত্র কি ? মেয়েরাও ঐ বরফের মত, খুলে রাখলেও খোয়া যায়, ঢেকে রাখলেও খোয়া যায়। আলো হাওয়া আদায় করে নেয় নিজ নিজ প্রাপ্য, অবশেষে যখন ঘরে এসে পৌঁছয় হতভাগ্য স্বামী আধখানার বেশি পায় না।

কেটি বিরক্ত হয়ে বলে উঠল, তুমি আজ বড় বাড়াবাড়ি কবছ।

কিন্তু ফল হল উল্টো। মিসেস কেরী তাকে ধমক দিয়ে বলল—তুমি একরত্তি মেয়ে, ওকে শাসন করবার কে ? ভদ্রসমাজের উপযুক্ত কথাবার্তা বলতে হবে তো, এ তো পাদ্রীর গৃহকারাগার নয়।

সকলের লজ্জিত নীরবতা।

কেবল দুবোয়া মিসেস কেরীকে লক্ষ্য করে বলে উঠল, mon chére mon chére !

খানা শেষ হয়ে গিয়েছিল, টেবিল পরিষ্কার করে নেওয়া হল। আর সেই সঙ্গে প্রত্যেক হুঁকোবরদার ধূমায়িত ফরসী নিয়ে নিঃশব্দে প্রবেশ করে নিজ নিজ প্রভুর পিছনে দাঁড়াল, মেঝেতে একখণ্ড করে কার্পেট পেতে তার উপরে ফরসীটি স্থাপিত করে কুণ্ডলায়িত নলের রুপোর মুখনলটি প্রভুর হাতে তুলে দিল। তখন ঘরময় কেবল অম্বুরী তামাকের সুগন্ধ আর গদ্‌গদ সুশ্রাব্য শব্দ। মহিলাদের এ ব্যবস্থা ছিল না। খুব সম্ভব তারা ঘরের আবহাওয়া থেকে মৌতাত সংগ্রহ করে।

সেকালে মহিলারা তামাকু সেবন করত না বটে কিন্তু কখনও কোন পুরুষকে আপ্যায়িত করবার ইচ্ছা হলে তার কাছ থেকে নলটি চেয়ে নিয়ে দু-চার টান দিত। কেটি, লিজা ও অন্যান্য মহিলারা সে রকম ইচ্ছা প্রকাশ করল না। কিন্তু মিসেস কেরীর

কথা স্বতন্ত্র। ডিয়ার ব্রাদার-ইন-ল'কে আপ্যায়িত করবার উদ্দেশ্যে মুখনলটি চেয়ে নিয়ে এক টান দিয়েই সে এক কাণ্ড করে বসল। কাসতে কাসতে দম বন্ধ হয়ে মূর্ছিত-প্রায় অবস্থায় সে ঢলে পড়ল দুবোয়ার কাঁধের উপরে। ব্যস্তসমস্ত হয়ে জন ছুটল স্মেলিং সল্ট-এর শিশির উদ্দেশে। যখন শিশিটি নিয়ে সে ফিরল. ডরোথি তখন লব্ধসম্বিৎ। তাড়াতাড়িতে নিজের চেয়ারে বসতে গিয়ে জন ডিঙিয়ে ফেলল দুবোয়ার ফরসীর নল। ব্যাপারটা অনেকেরই চোখে পড়ল, জনের চোখে প্রকাশ পেল লজ্জা ও দুঃখ, দুবোয়ার চোখে রোষ ও বিস্ময়। উপস্থিত সকলে প্রমাদ গনল। কিন্তু কেবল এক পলকের জন্য মাত্র দুবোয়ার ভাবান্তর ঘটেছিল, পলকপাতে তার মুখে ফুটে উঠল অত্যন্ত রেশমী হাসি, চোখে দেখা দিল অভ্যস্ত কৌতুককণিকা। সে জনকে টেনে নিয়ে পাশে বসাল। সকলে ভাবল, যাক, সঙ্কট কেটে গেল।

সেকালে কলকাতার শ্বেতাঙ্গ সমাজের বৈঠকে একজনের ফরসীর নল অপর জন কর্তৃক লঙ্ঘন সামাজিক অশিষ্টাচারের চরম বলে গণ্য হত—এর একমাত্র প্রতিকার ছিল লঙ্ঘিত-নল ও লঙ্ঘনকারীর মধ্যে ডুএল। এমন ডুএল সেকালে অনেক ঘটত। বর্তমান ক্ষেত্রে সেই আশঙ্কাই দেখা দিয়েছিল।

ডিনার শেষ হলে অধিকাংশ নিমন্ত্রিত ব্যক্তি চলে গেল, রইল কেবল মেরিডিথ ও রিংলার। তারা এই পরিবারের ঘনিষ্ঠ বন্ধু, খুব সম্ভব তারা লিজার মধ্যে মধুচক্রের সন্ধান পেয়েছিল। আর রইল কেটি ও দুবোয়া। মিসেস কেরীর নির্বন্ধাতিশয্যে তাদের দু-চার দিন থাকবার জন্যে অনুরোধ করতে বাধ্য হয়েছিল জর্জ স্মিথ।

তখনকার কলকাতায় ডিনারের পরে শ্বেতাঙ্গ সমাজ ঘণ্টা দুয়েকের জন্য ঘুমিয়ে নিত, তখন শ্বেতাঙ্গ পাড়ায় বিরাজ করত মধ্যাহ্নে মধ্যরাত্রির নীরবতা।

সকলে যখন বিশ্রামে মগ্ন, দুবোয়া জনকে নিয়ে এসে দাঁড়াল বাগানের বাদাম গাছটির তলায়। তার পরে স্বভাবসিদ্ধ মৃদু হাস্যে বলল, জন, আজকের ব্যাপারটার জন্যে নিশ্চয় তুমি দুঃখিত। কিন্তু হলে কি হয়, সামাজিক প্রথা বলে একটা জিনিস তো আছে, আমাদের মধ্যে একটা বোঝাপড়া হওয়া আবশ্যক।

জন বুঝলে যে এ হচ্ছে ডুএলের আহ্বান।

তাকে নীরব দেখে দুবোয়া শুধাল, তুমি কি বল জন?

জন বলল, দয়া করে আমাকে মিঃ স্মিথ বল।

বেশ তাই হবে, এখন কি বল?

এতে আর বলবার কি আছে! সামাজিক প্রথা রক্ষা করতে হবে বইকি।

কিন্তু এখানে second বা দোসর পাওয়া যায় কোথায়?

জন বলল, তোমার আপত্তি না থাকলে মেরিডিথ ও রিংলারকে ডাকি।

আপত্তি কি? দুজনেই আমার বন্ধু।

জন ভাবল, বিচিত্র এই ফরাসী জাতটা, সকলেই তার বন্ধু, সব দেশই তার দেশ, সব নারীই তার mon chére!

জন মেরিডিথ ও রিংলারকে ডেকে নিয়ে এল। সব ব্যাপার শুনে মেরিডিথ ও রিংলার সম্মত হল, স্থির হল মেরিডিথ হবে জনের দোসর, রিংলার হবে দুবোয়ার দোসর। আরও স্থির হল যে আগামীকাল খুব ভোরে বির্জিতলার দিঘিটার কাছে নির্জনে দ্বন্দ্বযুদ্ধ হবে, বারো গজ দূর থেকে দুজনে পর পর দুটো পিস্তলের গুলি ছুঁড়বে, জন আগে ছুঁড়বে,

দুবোয়া তার পরে। আর ঘটনার আগে পর্যন্ত সমস্ত ব্যাপারটা গোপন রাখবার প্রতিশ্রুতি দিল সকলে।

দুবোয়া হেসে বলল, বির্জিতলার মস্ত গুণ এই যে কাছেই প্রেসিডেন্সি হাসপাতাল।

মেরিডিথ বলল, আশা করি সেখানে কারও যাওয়ার প্রয়োজন হবে না।

নিশ্চয়ই নয়, নিশ্চয়ই নয়, বলে দুবোয়া চারটে সিগারেট বের করল। জন প্রত্যাখ্যান করে বলল, ধন্যবাদ।

দুবোয়ার এই আচরণের কারণ কি? কেবলই কি সামাজিক প্রথা রক্ষা, না জন ও কেটির যে পূর্ব-সম্বন্ধ কখনও কখনও খচ খচ করে বেঁধে দুবোয়ার বুকে, সেই কাঁটাটি উৎপাটন করে ফেলবার ইচ্ছা? কিন্তু তাই বা কেমন করে বলি? সে তো জানত না যে জন ফরসীর নল লঙ্ঘন করে এমন সুযোগ দেবে। দুবোয়া সেই শ্রেণীর সৌভাগ্যবান, সুযোগ এগিয়ে এসে যাদের কাছে ধরা দেয়। মানুষ সুযোগের সন্ধানে থাকে, আর সুযোগ থাকে শয়তানের সন্ধানে।

ওরা অবশ্য ভাবল যে ঘটনাটি গোপন রাখবে কিন্তু গোপন থাকল না। লিজা নারীসুলভ স্বভাবগত সন্দেহপরায়ণতায় সমস্ত বিষয়টা আঁচে আন্দাজে অনুমান করে নিল। অবশ্য কাউকে সন্দেহের কথা বলল না, একা একা সঙ্কটমোচনের চিন্তায় নিযুক্ত হল।

অনেক রাতে কার স্পর্শে জনের ঘুম ভেঙে গেল, সবিস্ময়ে সে দেখল আলো-আঁধারিতে দাঁড়িয়ে আছে কেটি।

তবু সে শুধাল—কে?

কেটি বলল, চিনতে পারছ না জন? আমি কেটি।

ও, মাদাম দুবোযা!

না জন, আমি কেটি।

এতো রাতে কেন?

তোমার সঙ্গে কথা বলবার সুযোগ পাই নি, তাই।

কি কথা বলবে?

চল আমরা কোথাও পালিয়ে যাই।

এ রকম কথার জন্য জন প্রস্তুত ছিল না, সে চুপ করে রইল।

কেটি আবাব বলল, বুঝলে না? চল এখনই আমরা কোথাও পালিয়ে যাই।

জন এবারে বলল, তা কি করে সম্ভব হয়। তা ছাড়া কাল সকালে আমার একটা কাজ আছে।

কি এমন কাজ?

কাজ যাই হক—কিন্তু ওটা পারব না, তুমি আমাকে মাপ ক'র।

রাতের যে অন্ধকার আকাশের সহস্র অশ্রুবিন্দুকে প্রকাশ করে, সেই অন্ধকারই কেটির সদ্যঃপাতী অশ্রুবিন্দু দুটিকে গোপন করে রাখল।

কিছুক্ষণ দুজনে নীরব থাকবার পর কেটি সহসা তাকে জড়িয়ে ধরে চুম্বন করে বলল, জন, আমি তোমাকে ভালবাসি।

জন নিজেকে বন্ধনমুক্ত করে নিয়ে বলল—কেটি, আমাকে দুর্বল ক'র না, তুমি যাও। এই বলে সে এক রকম জোর করেই তাকে বিদায় করে দিল।

তার পরে তার কি মনে হল জানি না, টেবিলের দেরাজ থেকে পিস্তল বের করে গুলি বের করে নিয়ে খালি পিস্তল রেখে দিয়ে বিছানায় এসে শুয়ে পড়ল, কিছুক্ষণের মধ্যেই পড়ল ঘুমিয়ে। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে সে স্বপ্ন দেখল—দুবোয়ার সঙ্গে তার দ্বন্দ্বযুদ্ধ চলছে। দুবোয়া তাকে লক্ষ্য করে অব্যর্থ গুলি ছুঁড়েছে—এমন সময়ে কোথা থেকে কেটি এসে বুক পেতে দাঁড়াল, গুলি তার বুকে লাগল। সে যেমনি কেটিকে তুলেছে, দেখল কেটি নয়, লিজা। সে ভাবল, লিজা কখন এল!

কিছুক্ষণ পরে লিজা ধীরপথে ঘরে ঢুকল। অতি সন্তর্পণে টেবিলের দেরাজ খুলে পিস্তলটি বের করে নিয়ে দেখল চেম্বার শূন্য, তখন গুলি দিয়ে চেম্বার ভর্তি করে পিস্তলটি যথাস্থানে রেখে দিয়ে যেমন নিঃশব্দে এসেছিল, তেমনি নিঃশব্দে আবার প্রস্থান করল। জন কিছুই জানতে পেল না।

পরদিন খুব ভোরে, তখনও কেউ জাগে নি, জন দুবোয়া মেরিডিথ ও রিংলার পদব্রজে গিয়ে উপস্থিত হল বির্জিতলার দিঘিটার ধারে। চারিদিক নিঃশব্দ, নির্জন। তারা দিঘির ধারে একটা পরিষ্কার জায়গা বেছে নিয়ে দাঁড়াল। মেরিডিথ ও রিংলার বারো ধাপ ব্যবধান চিহ্নিত করে নিয়ে দুবোয়া ও জনকে দাঁড় করিয়ে দিল।

দুবোয়া করমর্দন করবার উদ্দেশে হাত বাড়িয়ে দিল, জন প্রত্যাখ্যান করল।

দুবোয়া হেসে বলল, আশা করি, রুষ্ট হও নি, এ কেবল সামাজিক প্রথা রক্ষা।

জন কোন উত্তর দিল না।

মেরিডিথ দুজনকে সতর্ক করে দিল—মেরিডিথ হাতের রুমাল নিক্ষেপ করে সঙ্কেত জানাল।

জন পিস্তল ছুঁড়ল—গুলি দুবোয়ার কান ঘেঁষে বেরিয়ে গেল।

গুলি এল কোত্থেকে, জনের মনে এই রহস্যময় প্রশ্নের মীমাংসা হওয়ার আগেই রিংলারের রুমাল-সংকেতে দুবোয়া গুলি ছুঁড়ল। গুলি জনের দক্ষিণ বাহু ভেদ করে বিদ্ধ হল, সে নীরবে মাটিতে পড়ে গেল। বিদ্যুৎ-চকিতে তার মনে রাতের স্বপ্নটা খেলে গেল—আর সেই সঙ্গে মনে পড়ল, 'জন, তোমাকে আমি ভালবাসি।'

তিনজনে ছুটে গিয়ে শুধাল—আঘাত কি গুরুতর?

উত্তর না পেয়ে নত হয়ে বসে দেখল জন মূর্ছিত।

তখন তারা তিনজনে জনকে তুলে নিয়ে নিকটবর্তী প্রেসিডেন্সি হাসপাতালের দিকে চলল।

দুবোয়া ক্রমাগত বলতে লাগল—আমি অত্যন্ত দুঃখিত, আমি অত্যন্ত দুঃখিত।

ওটা তার মনের কথা নয় সন্দেহ করে মেরিডিথ বলল, এখন দয়া করে চুপ করবে কি?

নিরুপায় দুবোয়া দুই কাঁধে ঝাঁকুনি দিয়ে বলে উঠল—যেমন তোমার অভিরুচি।

১৯
শয়তানের শহর

দুবোয়া-স্মিথ ডুএলের সংবাদ প্রচারিত হওয়ামাত্র কলকাতার শ্বেতাঙ্গ-সমাজে অপ্রত্যাশিত আলোড়ন দেখা দিল। সকলেরই মুখে এক কথা—এ অত্যন্ত গর্হিত, এ অত্যন্ত বাড়াবাড়ি, কোথায় গেল সেই ফরাসী শয়তানটা ! তখনকার দিনে শ্বেতাঙ্গ-সমাজে এমন ডুএল আকছার ঘটত, কেউ কিছু মনে করত না, এমন কি ওয়ারেন হেস্টিংস ও সার ফিলিপ ফ্রান্সিসের মধ্যে ডুএল ঘটবার পরে ব্যাপারটা একটা ফ্যাশনের জলুস লাভ করেছিল। এ হেন অবস্থায় এ ডুএলে এমন অপ্রত্যাশিত প্রতিক্রিয়া ঘটবার আসল কারণ তখন ইউরোপে ফরাসী দেশ ও ইংলণ্ডে যুদ্ধ বেধে গেছে—সে যুদ্ধও আবার ফরাসী বিপ্লবের ইডিওলজি-ঘটিত। কাজেই কলকাতার শ্বেতাঙ্গ-সমাজের ঘনীভূত ফরাসী-বিদ্বেষ—ফরাসী জাতির ঐ একটিমাত্র প্রতিনিধির উপর গিয়ে পড়ল। ইংরেজে ইংরেজে ডুএল, হাঁ, তার অর্থ বোঝা যায়, কিন্তু ইংরেজ ফরাসীতে, তাতে কিনা আবার ঐ শয়তানটা হল বিজয়ী ! সকলে সন্ধানে নিযুক্ত হল কোথায় গেল সেই ফরাসী শযতানটা !

দুবোয়া শয়তান ঠিক না হতেও পারে কিন্তু প্রেসিডেন্সি হাসপাতালে পৌঁছেই বুঝে নিয়েছিল যে আবহাওয়া প্রতিকূল, ইংরেজ ডাক্তার রোগী প্রভৃতি সকলেরই সুর চড়া। সে বুঝল যে, এখন পলায়নটাই আত্মরক্ষার প্রশস্ততম পথ, সে মনে মনে আলোচনা করে দেখল, এ বিষয়ে মঁ ভলতেয়ারের নির্দেশ অত্যন্ত সুস্পষ্ট। কাজেই সে কেটির উদ্দেশে একখানা চিঠি পাঠিয়ে দিয়ে হাসপাতাল থেকেই সুন্দরবনে যাত্রা করল।

স্মিথ আহত হয়েছে সংবাদ বাড়িতে পৌঁছনো মাত্র লিজা পিতাকে নিয়ে হাসপাতালে রওনা হল, এমন যে ঘটতে পারে সে আগেই জানত।

নিরপরাধ কেটি সমবেদনা জানাতে এলে লিজা সংক্ষেপে বলল, খুকি আর কি, কিচ্ছু জান না ! যাও।

সংক্ষিপ্ত উক্তির সঙ্গে নিক্ষিপ্ত হল ঘৃণা ও ধিক্কারপূর্ণ কটাক্ষ।

হতভম্ব, মর্মাহত কেটি গিয়ে ঘরে দরজা দিল।

গাড়িতে যেতে যেতে লিজা বলল, এ সমস্ত দুর্দৈবের মূলে ঐ বুড়ি শয়তান-মাগীর আব্দার !

জর্জ বলল—সে যাই হক, এমন দুঃসময়ে অযথা ক্রোধে বিদ্বেষে মনকে আর অধিক বিচলিত করে তুলো না।

তুলব না ? কেন তুলব না ? ও বেটীর আব্দারেই তো নিমন্ত্রণ করতে হল ওর ডিয়ার ব্রাদার-ইন-ল'কে। আর তুমি বলছ রাগ করব না ?

জর্জ বলল—আসল কথা কি জান, মিসেস কেরী ঠিক সুস্থমস্তিষ্ক ব্যক্তি নয়।

আর আমার মস্তিষ্কটাই খুব সুস্থ আছে, না ? এই বলে সে কান্নায় ভেঙে পড়ল।

জর্জ নীরবে তার মাথায় হাত বুলোতে লাগল।

জনের আঘাত গুরুতর নয়, ক্রমে সুস্থ হয়ে উঠতে লাগল এবং দিনসাতেকের মধ্যেই হাসপাতাল ত্যাগ করে বাড়িতে ফিরে এল।

কিন্তু রক্তজিহ্ব পিস্তল তার বলি না নিয়ে ফিরল না, আর সে বলিটাও কিনা শেষে সংগ্রহ করল নিতান্ত মর্মান্তিকভাবে।

কেটি ও দুবোয়ার কি হল কেউ খোঁজ করে নি, খোঁজ করবার মত মনের অবস্থা কারও ছিল না—আর খোঁজ করবার ভার তো একমাত্র লিজার উপরে, বাড়ির গিন্নি সে। সে দিবারাত্রি জনকে নিয়ে ব্যস্ত, হাসপাতালেই থাকত, কখনও কখনও এক আধ ঘণ্টার জন্য মাত্র বাড়িতে আসত। দুবোয়া ও কেটিকে না দেখে বাড়ির সবাই ধরে নিয়েছিল যে, ওরা কোন এক সুযোগে সকলের অলক্ষ্যে পালিয়ে গিয়েছে।

এমন সময়ে, ডুএলের তিনদিন পরে, ক্ষণিকের জন্য বাড়ি ফিরে লিজা যখন রিংলার মেরিডিথের সঙ্গে চা পান করছিল—চাকরে এসে খবর দিল যে, নঙ্গী তলাও-এ একটা দেহ ভাসছে। কৌতূহলী হয়ে তারা চলল বেরিয়াল গ্রাউণ্ড রোড ও চৌরঙ্গী রোডের ড় সদ্যখনিত পুকুরটার দিকে। পুকুরের ধারে পৌঁছে দেখল—হাঁ মৃতদেহই বটে, আর সেটা স্ত্রীলোকের। তিনজনের মনে একই সঙ্গে একই সন্দেহের বিদ্যুৎ চমক মেরে গেল। তার পরে পশ্চিম দিকের নলখাগড়া ঝোপের আড়াল থেকে একটা হ্যাণ্ডব্যাগ হাতে করে চাকরটা এসে দাঁড়াল।

কেটি !

হ্যাণ্ডব্যাগ খুলতে বেরুল একখানা চিঠি, দুবোয়া লিখছে কেটিকে।

মেরিডিথ পড়ে দিল রিংলারকে, বলল, পড়ে দেখ, মানুষ কত নৃশংস হতে পারে !

রিংলার পড়ে সংক্ষেপে মন্তব্য করল, হৃদয়হীন পাষণ্ড।

চিঠিখানা পড়তে পড়তে লিজার চোখ ছলছল করে উঠল, বুঝল কেটির প্রতি সে অবিচার করেছিল, বুঝল যে ডুএলের কথা জানত না সে, আরও বুঝল যে কোন উপায়ে জনকে নিহত ও কেটিকে পরিত্যাগ করবার অভিপ্রায়েই নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে কলকাতায় এসেছিল সে, দুবোয়া। দুবোয়া লিখছে—

Mon chére, প্রিয় আমার,

তোমার ভূতপূর্ব প্রণয়ীর এক ছটাক রক্তপাতে এখানকার বেরসিক ইংরেজগুলো বড়ই ক্ষেপে উঠেছে। অথচ দেখ ঠিক এই মুহূর্তে আমার সুন্দর ফরাসী দেশে সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতার নামে হাজার হাজার টন রক্তপাত চলছে, এমন কি সাধারণের লাল রক্তপাতে সন্তুষ্ট না হয়ে সেখানকার লোকে রাজা-রানীর নীল রক্তপাত ঘটিয়েছে। অথচ এখানে কত প্রভেদ! ইংরেজগুলো বড়ই রক্ষণশীল, তারা নিজেদের রক্ত রক্ষা করতে চায়—যদিচ সুবিধা পেলেই আমার দেহে কতটা রক্ত আছে পরীক্ষা করে দেখবে নিশ্চয়। এ রকম ক্ষেত্রে কর্তব্য সম্বন্ধে মঁ ভলতেয়ারের নির্দেশ সুস্পষ্ট—তিনি বলেছেন, বীরত্বের চেয়ে বিচারের মূল্য বেশি। অতএব আমি এখান থেকেই সুন্দরবনে যাত্রা করলাম। তোমাকে কার কাছে রেখে গেলাম ? কেন, রইল তোমার ভূতপূর্ব প্রণয়ী এবং খুব সম্ভব ভাবী স্বামী। দু-চার দিনের মধ্যেই সুস্থ হয়ে উঠে লোকটা বাড়ি যাবে—তখন আর কি, তোমরা দুজনে সুন্দরবনে, 'ফরেস্ট অব বিউটিফুল উইমেন' নামে অরণ্যে স্বাধীন মুগ্ধ কপোত-কপোতীর মত আনন্দের কূজন করে উড়ে বেড়িও। যখন সেই লোকটা তোমাকে বাহুবন্ধনে বদ্ধ করে বিশ্রব্ধ সুরে ডাকবে কিট কেট কেটি, তখন তার দক্ষিণ বাহুমূলে মৎকৃত ক্ষতচিহ্ন দেখে আশা করি আমাকে মনে পড়বে আর সেখানে চুম্বন করবে দু-একবার, সে চুম্বনের স্পর্শ পৌঁছবে আমার নাকের ডগায়—যেটি ছিল তোমার খুব প্রিয়

স্থান। তুমি হয়তো জিজ্ঞাসা করবে যে, কেন তোমাকে ছেড়ে গেলাম? এসব গুরুতর বিষয়ের উত্তর মহাজনবাক্যে দেওয়াই সমীচীন—তাই আমাদের সাহিত্যের অন্যতম মহাজন রশফুকোর ভাষায় বলি—এক খনিতে বুদ্ধিমান ব্যক্তি বেশিদিন নামে না। যদিচ এ-ও নিশ্চয় জানি এমন মণিরত্নে পূর্ণ খনি বেশি দিন খালি থাকবে না, তোমার ভূতপূর্ব প্রণয়ী—তোমার ভাবী স্বামী সাগ্রহে সেখানে অবতরণ করে নিজেকে ধন্য মনে করবে। কাজেই তোমাকে বেঘোরে ফেলে যাচ্ছি এমন অপবাদ নিশ্চয় দেবে না, নিশ্চয় মনে করবে না যে, আমি হৃদয়হীন। অতএব বিদায়, mon chére, বিদায়! চোখের জলে চারিদিক ঝাপসা হয়ে গিয়েছে তাই আর কলম চলছে না, বলবার কথার কি শেষ আছে—অহো, হো। ইতি—

তোমার চিরকালের দুবো।

চিঠি পড়ে তিনজনে অনেকক্ষণ নির্বাক হয়ে বসে রইল। প্রথম কথা বলল লিজা। সে বলল—এই চিঠির পরে কেটি যা করেছে তা ছাড়া করবার আর ছিল কি? আহা, বেচারাকে আমি ভুল বুঝেছিলাম।

মেরিডিথ বলল—এখন ওঠ, পরবর্তী ব্যবস্থার আয়োজন করা যাক।

তাই বটে। সংসারের রথ এক মুহূর্তও নিশ্চল থাকে না, চরম দুঃখ ও পরম আনন্দকে সমান উপেক্ষা করে তার রথচক্র নিত্য ঘর্ঘরিত। হয়তো ঠিক সেইজন্যই মানুষের জীবনধারণ সম্ভব হয়, নতুবা হয়তো মুহূর্তের সুখ-দুঃখই চিরন্তন হয়ে বিরাজ করে, জীবন পড়ত অচল হয়ে। জীবনের যাবতীয় সুখ-দুঃখের সমষ্টির চেয়েও যে জীবনটা অনেক বড়, অনেক বেশি গুরুভার, এই সত্যটির উপলব্ধিতেই হয়তো জীবনের চরিতার্থতা।

পর পর কয়দিনের অতর্কিত আঘাতে স্বভাবত অস্থিরমতি মিসেস কেরী উন্মাদবৎ হয়ে গেল। একাকী ঘণ্টার পর ঘণ্টা সে নীরবে বসে থাকত,—তার পর হঠাৎ ফুকরে উঠত—টাইগার, টাইগার! আর তার পরেই চৌকি, পালঙ্ক, টেবিল প্রভৃতির নীচে উঁকি মেরে দেখত বাঘ লুকিয়ে আছে কি না। স্মিথ পরিবারের পক্ষে সে হয়ে উঠল প্রকাণ্ড একটি সমস্যা!

ডুএলের সংবাদ পাওয়ার পরে ডাঃ কেরী গম্ভীর হয়ে পড়েছিল, তার পর দুবোয়ার পলায়ন ও কেটির মৃত্যুতে সেই গাম্ভীর্য তাকে আত্মজিজ্ঞাসায় নিরত করল। এ কয়দিন কেরী নিতান্ত গতানুগতিক দু-চারটি কথা বলা ছাড়া কারও সঙ্গে বড় বাক্যালাপ করে নি, এমন কি টমাসও তার কাছে ভিড়তে সাহস পেত না। কেটির মৃত্যুর তিন দিন পরে একদিন সকালে টমাসকে সে বলল, ব্রাদার টমাস, কলকাতায় আমাদের বাস করা চলবে না।

এমন আশঙ্কা টমাসের মনে কখনও আসে নি, তাই আকাশ থেকে পড়ার বিস্ময়ে শুধাল—তার মানে! তবে কি দেশে ফিরে যাবে?

দেশে ফেরবার জন্যে এত খরচ করে এতদূরে আসি নি।

টমাস আবার শুধায়—তবে?

বাংলাদেশের অন্যত্র কোথাও গিয়ে বসতে হবে।

কিন্তু এখানে নয় কেন?

কেন যে নয় সেটা আমার চেয়ে তোমার জানবার কথা বেশি! এ শহর সডম

ও গমরার চেয়েও গুরুতর পাপে পূর্ণ, চিকিৎসার অতীত এর অবস্থা।

টমাস কলকাতা ছাড়তে রাজী নয়, তাই সে উল্টো জেরা করে বলল—কিন্তু সেই জন্যেই তো এখানে ধর্মপ্রচারের আবশ্যকতা বেশি।

হতে পারে, কিন্তু সে আমার মত লোকের সাধ্যাতীত, কোন প্রেরিত পুরুষ যদি আসেন তিনি চেষ্টা করবেন।

তার পরে বার দুই পায়চারি করে—গভীর চিন্তার সময়ে পায়চারি করা কেরীর স্বভাব—সে বলল, এখন বুঝতে পারছি ''ইভের মত লোককেও কেন স্বীকার করতে হয়েছিল যে, কলকাতা শয়তানের শহর

টমাস আবার শুধায়—কিন্তু যাবে কোথায় ? সবই যে অনিশ্চিত।

এক বছর আগেও কি নিশ্চিত ছিল যে, কলকাতায় আসতে হবে আমাকে !

তার পর দুই পায়ের উপর সুপ্রতিষ্ঠিতভাবে দাঁড়িয়ে কেরী বলল, ব্রাদার টমাস, আর তর্ক নয়, আমি সিদ্ধান্তে এসেছি, অবিলম্বে আমাদের নিরুদ্দেশ যাত্রা করতে হবে। যাও তুমি গিযে গোছগাছ কর গে—আর মুন্সীকে বল আমার সঙ্গে যেন একবার দেখা করে।

ভগবানের কৃপাতেই হক আর ঘটনাচক্রের আবর্তনেই হক শেষ পর্যন্ত কেরীদের ঠিক নিরুদ্দেশের মুখে যাত্রা করতে হল না।

জর্জ উডনী নামে ধর্মপ্রাণ এক ব্যবসায়ী ছিল। বাংলাদেশের নানাস্থানে তার নীল ও রেশমের কুঠি ছিল। এইসব কুঠির কাজ তদারক করে ঘুরে বেড়াতে হত তাকে। কলকাতায় ফিরে এসে উডনী খবর পেল যে ডাঃ কেরী ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে এসেছে আর কলকাতাতেই আছে। উডনী এসে কেরীর সঙ্গে পরিচয় করে নিল, কেরীর উদ্দেশ্যের প্রতি সহৃদয় সমর্থন জানাল। তার পরে যখন শুনল যে কলকাতা পরিত্যাগ করে পল্লীবঙ্গের কোনস্থানে বসতে কেরী সঙ্কল্পিত, তখন তার উৎসাহ আরও বেড়ে গেল। মালদহ জেলার মদনাবাটিতে এবং দিনাজপুর জেলার মহীপালদিঘিতে উডনীর নীলকুঠি ছিল। তার প্রস্তাবে কেরী মদনাবাটির ও টমাস মহীপালদিঘির নীলকুঠির ম্যানেজারি পদ গ্রহণ করতে সম্মত হল।

উডনী বলল—বেশ ভাল হয়, আমার কাজও হবে, তোমাদের কাজও হবে, ম্যানেজারের দায়িত্ব অল্প, ধর্ম-প্রচারে বাধা হবে না। আর তা ছাড়া, ও দুটো জায়গার মধ্যে ব্যবধান মাত্র ১০/১২ মাইলের, কাজেই তোমাদের দেখাসাক্ষাৎও চলতে পারবে।

টমাস উডনীর কাছে বেতনের কিছু টাকা আগাম চেয়ে নিয়ে মহাজনের দেনা শোধ করে যাত্রার জন্যে প্রস্তুত হতে লাগল।

কলকাতা ছেড়ে মদনাবাটি যেতে হবে, তাও আবার অবিলম্বে, শুনে রাম বসু উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ল। কিন্তু বসুজা সেই শ্রেণীর লোক, হাল ভাঙলেও যারা হাল ছাড়ে না, আর প্রতিকূল বাতাসকে অনুকূলে আনতে হলে কিভাবে পাল খাটাতে হয় সে কৌশল জানে।

পাদ্রীদের সঙ্গে স্বামীকে বিদেশে যেতে হবে শুনে অন্নদা ঝঙ্কার দিয়ে উঠল, বলল, তবে আর কি, এবারে খিরিস্তানগুলোর সঙ্গে মিলে ধিঙ্গিপনা কর গে, বারণ করবার আর কেউ রইল না।

বসুজা বলল, নবুর মা, ধিঙ্গিপনা কাকে বলে জানি নে, জানি কেরী সাহেবকে, একবার পড়া শুরু করলে দুই প্রহরের কমে ছাড়ে না, ধিঙ্গিপনা করবার ফুরসৎ কোথায় ?

সেখানে গিয়ে কি করবে না করবে তা তো আর দেখতে যাব না। পারতাম চোখ-জোড়া সঙ্গে পাঠাতে!

তুমি সঙ্গে না গেলেও ন্যাড়ার চোখ-জোড়া তো সঙ্গেই যাচ্ছে—সে চোখ তো এখন তোমারই চোখ।

অনেক বিবেচনার পরে অন্নদা ন্যাড়াকে আনিয়ে নিয়েছে। অন্নদার চোখে ন্যাড়ার অনেক গুণ ; ন্যাড়া খায় কম, খাটে বেশি আর মন রাখা কথা বলতে তার জুড়ি নেই।

ন্যাডাকে স্বগৃহে ভর্তি করবার আগে উভয়ের মধ্যে নিম্নোক্তরূপ প্রশ্নোত্তর ঘটেছিল।

হ্যাঁরে ন্যাড়া, তোরা তো কায়স্থ, কি বলিস?

তুমিই তো বললে দিদিঠাকরুন, আমি কি আর অন্য কথা বলতে পারি।

এবারে গলা একটু খাটো করে জিজ্ঞাসা করল—হ্যাঁরে, অখাদ্য খাস নি তো?

কি যে বল দিদিঠাকরুন, অখাদ্যের দাম অনেক বেশি, আমার ভোগে জুটবে কেন?

তবে কি খেয়েছিস?

ডাল ভাত আর গঙ্গাজল।

গঙ্গাজল!

অন্নদা বিস্মিত হয়। বলিস কি রে!

গঙ্গাতীরে গঙ্গাজল ছাড়া আর কি জুটবে?

তবে ওতেই সব শুদ্ধ হয়ে গিয়েছে, কি বলিস?

অশুদ্ধ হল কোথায় যে শুদ্ধ হবে!

খুশি হয়ে অন্নদা বলে, বস দেখি এখানে।

তার পরে এক কলসী গঙ্গাজল এনে ন্যাড়ার মাথায় ঢেলে দিয়ে বলে—নে, এবারে গা মুছে এই শুকনো কাপড়-জামা পর।

এইভাবে সংক্ষেপে অথচ পরিপূর্ণরূপে খ্রীষ্টানগৃহবাসের পাপ সংস্কার করে ন্যাড়াকে ঘরে তোলে মনস্বিনী অন্নদা।

জাতি-নাশ সহজ বলেই তার সংশোধনের পথ সুগম।

এখন ন্যাড়া কর্মকুশলতায় ও মধুর বাক্যপ্রয়োগ-গুণে অন্নদার প্রিয় এবং নির্ভরস্থল। পুত্র নরু নেড়ুদা বলতে পাগল।

প্রবাসী স্বামীর তত্ত্বাবধান সম্বন্ধে ন্যাড়াকে রীতিমত তালিম দিতে লেগে গেল অন্নদা।

ন্যাডা বলত—কায়েৎ দাদার জন্যে তুমি ভেবো নি দিদিঠাকরুন। কায়েৎ দাদা অভিধাটি সে টুশকির কাছে শিখেছিল।

কেরী-পরিবারের যাত্রার যাবতীয় ব্যবস্থা করে দিয়ে উডনী টমাসকে নিয়ে রওনা হয়ে গেল।

পাঁচ-সাত দিন পরেই সপরিবারে কেরী রাম বসু, পার্বতী ব্রাহ্মণ ও ন্যাড়াকে নিয়ে নৌকাযোগে মদনাবাটির উদ্দেশে যাত্রা করল।

২০
একটি অবান্তর পরিচ্ছেদ

তবে বাদ না দেওয়াই ভাল

পলাশীর যুদ্ধের পরে নবাবভীতি দূর হওয়ায় কলকাতার শ্বেতাঙ্গ পাড়া পুব দিকে দক্ষিণ দিকে পেখম মেলে দিতে শুরু করল। এতকাল চির-অভাবগ্রস্ত নবাব ও তার উজীর-নাজিরদের ভয়ে সঙ্কুচিতকলাপ হয়ে যে সমাজ বাস করছিল এখন আর তাদের সে ভয়ের কারণ রইল না ; যখন-তখন যে-কোন উপলক্ষে কলাপের চন্দ্রকগুলো ভিন্ন করে নিতে পারত যে পুরুষ বাহু তা এখন নির্বীর্য, কোম্পানি মুখে অন্ন তুলে দিলে তবে তার আহার সম্পন্ন হয়। অতএব আর সঙ্কোচের কারণ কি।

এতাবৎকাল লালদিঘিকে কেন্দ্র করে শ্বেতাঙ্গ শহর নানা দুর্দৈবের মধ্যে কোন রকমে মাটি আঁকড়ে পড়েছিল। গঙ্গার উপরেই কেল্লা, কেল্লার নীচেই ঘাট, ঘাটে জাহাজ, প্রয়োজনকালে পালাবার অসুবিধা নেই। সিরাজদ্দৌলার কলকাতা আক্রমণের সময়ে এইভাবে এই পথে কোম্পানির লোকজন পালিয়ে ফলতায় গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল। যারা পালায় নি, লড়াই করেছিল, তারা হেরেছিল। এ রকম ঘটনা এখন পুনরাবর্তনের অতীত। এতদিন কলকাতা ছিল মুর্শিদাবাদের আশ্রিত, এখন থেকে মুর্শিদাবাদ হল কলকাতার আশ্রিত। অবশ্য দিল্লীতে মুঘল বাদশা এখনও বিরাজমান, কিন্তু কলকাতা থেকে দিল্লীর দূরত্ব যে গ্রহান্তরের দূরত্ব। অতএব নির্ভয়ে চারদিকে হাত পা ছড়িয়ে দাও। হাতে যদি কিছু মূল্যবান ঠেকে সংগ্রহ কর, পায়ে যদি কিছু বাধা বলে মনে হয় পদাঘাত কর। হাত-পা ছড়াবার অনেক সুবিধা।

শ্বেতাঙ্গ-সমাজে যারা প্রবীণ তাদের স্মৃতি অনেক দূর যায়। প্রত্যক্ষ বা অচিরলব্ধ জনশ্রুতিযোগে তারা জানে, মাত্র সত্তর বছর আগে ঘনবর্ষণ প্লাবিত শ্রাবণের এক অপরাহ্ণে খান দুই জাহাজ সুতানুটির ঘাটে এসে ভিড়েছিল। জব চার্নক দলবল নিয়ে ডাঙায় নেমে দেখে যে, আগের বারে তারা যে ঘরবাড়ী তৈরি করেছিল তার চিহ্নমাত্র নেই, না আছে চাল না আছে চুলো। তবু না থেকে উপায় নেই, কারণ ফেরবার পথ রুদ্ধ করে বিরাজমান হুগলির ফৌজদারের অসন্তোষ। জব চার্নক রয়েই গেল। তার পরের ইতিহাস সর্পিল, কুটিল, সংশয় ও সাহসে জড়িত।

বছর পঁচিশ পরে সুতানুটির দক্ষিণে কলকাতা গ্রামে গড়ে ওঠে কোম্পানির কেল্লা। অবশ্য বাদশার অনুমতি নিতে হয়েছিল, ব্যাধি চিকিৎসা নিরাময় প্রভৃতির সঙ্গে সে অনুমতির ইতিহাস জড়িত। কত সন্তর্পণে পদক্ষেপ, কত স্তুতি-বিনম্র ভঙ্গীতে সম্ভাষণ, কত অকাতরে নীরব নির্যাতন বহন। সেদিনকার প্রসাদপ্রার্থীরা আজ প্রসাদ-বিতরণে উদ্যত, সম্মুখে প্রসারিতকর স্বয়ং নবাব—অচিরে বাদশাকেও ভর্তি হতে হবে নবাবের দলে। প্রবীণ শ্বেতাঙ্গগণ তুলনায় দেখত এই দুই যুগের ছবি। কিন্তু বেশি লোকের দেখবার সুযোগ ঘটত না, আবহাওয়া ও ভয়াবহ ব্যাধির কল্যাণে পঞ্চাশ না পার হতেই অধিকাংশকেই সাধনোচিত ধামে প্রস্থান করতে হত।

কলকাতার দক্ষিণে গঙ্গার ধারে গ্রাম গোবিন্দপুর। সেখানে গড়া শুরু হল নূতন কেল্লা, বিলাত থেকে এল কারিগর। নূতন কেল্লার উত্তরে চাঁদপাল ঘাট আর কাঁচাগুড়ি ঘাট বরাবর ফুলের গাছ ও ছায়া-তরুতে সাজিয়ে পত্তন হল এসপ্লানেডের। এতদিন যারা লালদিঘির হাওয়া খেয়ে ক্ষুধাবৃদ্ধি করত এবারে তারা এল নূতন বাগ-বাগিচার প্রশস্ততর ক্ষেত্রে। এসপ্লানেডের উত্তরে পাশাপাশি কাউন্সিল হাউস আর গভর্নরের কুঠি। রনো কেল্লা রইল অকেজো পড়ে, কতক ঘর মালগুদাম, কতক ঘর খালি, একটা বড় ঘর কিছুদিনের জন্য আসর যোগাল রবিবাসরীয় উপাসনার। এমন অদ্ভুত ব্যবস্থা ভক্তির অভাবে নয়, অভাব অর্থের। লালদিঘির উত্তর-পশ্চিম কোণে অবস্থিত সেণ্ট অ্যান্স গির্জা সিরাজদ্দৌলার আক্রমণে ভগ্ন, নূতন গির্জা গড়বার অর্থ কই—কাজেই। এত যে বাড়িঘর পথ হচ্ছে, তবে গির্জা গড়বার পয়সা হয় না কেন ? গির্জার প্রয়োজন একাহমাত্র, কাজেই অগ্রাধিকার ও-সব বস্তুর।

কেল্লার পশ্চিমে গঙ্গাগর্ভ খানিকটা ভরাট করে নিয়ে বের করা হল নূতন রাস্তা। কেল্লার দক্ষিণে হাসপাতাল, হাসপাতালের পাশে কলকাতায় প্রাচীনতম খ্রীষ্টীয় গোরস্থান, কোম্পানির-শহর-প্রতিষ্ঠাতা জব চার্নকের সমাধি তাকে দিয়েছে প্রাচীনত্বের আভিজাত্য। এবারে হাসপাতাল উঠে চলে গেল ডিহি-ভবানীপুরে, কলকাতার তিন-চার মাইল দক্ষিণে—আর নূতন গোরস্থানের পত্তন হল শহরের পূর্ব-দক্ষিণ প্রান্তে, সুন্দরবনের মধ্যে। সেই সুবাদে চৌরঙ্গী রোড থেকে গোরস্থানে যাওয়ার রাস্তার নাম হল বেরিয়াল গ্রাউণ্ড রোড। পরবর্তী কাল মানুষের সুনিশ্চিতপরিণামসূচী কর্ণকটু রাস্তাটার নাম বদলে রাখল পার্ক স্ট্রীট—এক সময়ে সার এলিজা ইম্পের Deer Park বা মৃগদাব ছিল কাছাকাছি। তখনকার দিনে এ জায়গাটা শহর থেকে অতিশয় দূরে গণ্য হওয়ায় বিশেষ রাহা-খরচ দিতে হয় পাদ্রীকে যখন সে যেত সমাধি-সৎকারের জন্য। পুরনো গোরস্থানের পশ্চিম অংশের খানিকটা নূতন রাস্তা-ভুক্ত হয়ে গেল। বাকিটা পড়ে থাকল, পরে উঠবে এখানে সেণ্ট জন্স চার্চ।

লালদিঘির উত্তর দিক বরাবর একটানা তেতলা এক বাড়ি গড়ে উঠল ১৭৮০ সাল তক। এ বাড়ির তৈরির ও পরবর্তীকালের ইতিহাস বড় বিচিত্র। Lyon নামে একজন ইংরেজকে জমির পাট্টা দেওয়া হয় ১৭৭৬ সালে। পরে ওয়ারেন হেস্টিংসের কাউন্সিলের অন্যতম সদস্য বারওয়েল বাড়িটা কিনে নিয়ে গভর্নমেণ্টকে দেয় ভাড়া। কিন্তু সার ফিলিপ ফ্রান্সিসের মতে বাড়িটা গোড়া থেকেই বারওয়েলের, বর্তমান Lyon's Range-এর Lyon ছিল বারওয়েলের বেনামদার। বাড়িটাতে উনিশ প্রস্থ suite বা কক্ষাদি ছিল, ভাড়া প্রতি প্রস্থ মাসিক দুই শত টাকা।

এর আগে কোম্পানির Writerগণ (পরবর্তী পরিভাষায় Civil Service চাকুরে) শহরে বাসা খুঁজে নিয়ে বাস করত, বাসা ভাড়া পেত সরকার থেকে। ১৭৮৫ থেকে সিদ্ধান্ত হল যে তিনশো টাকার কম বেতনের Writerগণ দু-দুটি ঘরের এক প্রস্থ বাসস্থান পাবে এই বাড়িতে, আর সেই সঙ্গে একশো টাকা ভাতা।

বাড়িটার এইরকম ব্যবহার চলল দীর্ঘকাল। তার পরে একসময়ে এর নীচের তলায় বসল প্রসিদ্ধ ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ, তখনও উপরতলায় থাকত পড়ুয়া Writer গণ। তার পরে আবার পালা-বদল হল। Writerগণ আবার নিজ নিজ বাসস্থান খুঁজে নেবার স্বাধীনতা পেল। বাড়িটা কিছুদিন খালি পড়ে থাকল, আবও কিছুদিন সওদাগরী অফিস

হয়ে ভাড়া খাটাল, তার পরে আবার এল ফিরে সরকারী হাতে। অবশেষে পরিবর্ধিত পরিমার্জিত ও গম্বুজসমন্বিত হয়ে পরিণত হল বেঙ্গল সেক্রেটারিয়েটে। এখনও সেই ব্যবহার চলছে।

লালদিঘির দক্ষিণে একফালি জমি, গভর্নরের দেহরক্ষী সৈন্যদের প্যারাড করবার জায়গা, প্রয়োজনকালে শ্বেতাঙ্গ স্বেচ্ছাসেবক সৈন্যরাও এখানে প্যারাড করত। আর পুব দিকের প্রথম সারে বেঙ্গল ক্লাবের প্রকাণ্ড বাড়ি, দ্বিতীয় সারে ওল্ড মিশন চার্চের গির্জা। লালদিঘি বা ট্যাঙ্ক স্কোয়ারের ভিতরে উত্তর-পুব কোণে ছিল বিশাল এক তেঁতুলগাছ, যত রাজ্যের পাখীর বাসা গাছটায়। ১৭৩৭ সালের মহাঝটিকায় গাছটা উপড়ে পড়ে যায় উত্তরদিকের পথ বন্ধ করে। পার্কের বাইরে উত্তর-পুব কোণে আদালত, যেখানে বিচার হয়েছিল নন্দকুমারের। সেই বাড়িটাই টাউন-হল রূপে ব্যবহৃত হত—শ্বেতাঙ্গদের নাচগান খানাপিনার আসর। লালবাজার স্ট্রীটের, বিদেশী নাবিক খালাসী মাল্লাদের ফ্ল্যাগ স্ট্রীটের দক্ষিণে শহরের প্রাচীনতম জেলখানা—এখানেই থাকতে হয়েছিল নন্দকুমারকে। পরে জেলখানা উঠে যায় ময়দানে দক্ষিণতম অংশে—এই হল হরিণবাড়ির জেল। এরই পশ্চিমে টালির নালার কাছে ফাঁসি হল নন্দকুমারের। কসাইটোলা স্ট্রীট পার হয়ে লালবাজার স্ট্রীটের পুব দিকের বাড়তি রাস্তাটা 'দি অ্যাভিনিউ'—দুপাশে গড়ে উঠল শৌখিন সমাজের বাসস্থল। কসাইটোলা, রাধাবাজার আর চীনাবাজারের শ্রেষ্ঠ বিপণি ঠাসা ভর্তি থাকত দেশী বিদেশী পণ্যে।

এই সময়টাকে বলা চলে কলকাতার ট্যাভার্ন বা সরাইখানার যুগ। শহরের সবচেয়ে নামজাদা হারমনিক ট্যাভার্ন লালবাজারে। এখানে শ্বেতাঙ্গ-মহলের হোমরা-চোমরাদের মিলিত হওয়ার আসর। খোদ ওয়ারেন হেস্টিংস পৃষ্ঠপোষক, মিসেস ওয়ারেন হেস্টিংসের সঙ্গে প্রসাদপ্রার্থীরা এখানে সাক্ষাৎ করত। ওয়ারেন হেস্টিংস এদেশ ত্যাগ করবার পরে বন্ধ হয়ে যায় হারমনিক ট্যাভার্ন। ভ্যানসিটার্ট রো-তে লন্ডন ট্যাভার্ন, সেণ্ট জন গির্জার কাছে নিউ ট্যাভার্ন, ৪৫নং কসাইটোলাতে ইউনিয়ন ট্যাভার্ন, বৈঠকখানায় ব্রেড অ্যাণ্ড চীজ বাংলো, ১নং ডেকার্স লেনে পার্‌স ট্যাভার্ন—উৎকৃষ্ট তপসি মাছ ভাজা খাওয়ার লোভে যেখানে খদ্দেরের ভিড় জমত, আর ছিল ক্রাউন অ্যাংকর ট্যাভার্ন নূতন কেল্লার কাছে, যেখানে ২৪ ঘণ্টার চার্জ লাগত চার গিনি।

অষ্টাদশ শতকের শেষ দিকে শ্বেতাঙ্গ-কলকাতা অত্যন্ত দুর্মূল্য স্থান ছিল। ফিলিপ ফ্রান্সিস একটি বাড়ির ভাড়া দিত বছরে বারোশো পাউণ্ড। মধ্যবিত্ত গৃহিণী মিসেস কে দিত দুশো পাউণ্ড, হিকি নামে এক আইন-ব্যবসায়ীকে হাজার পাউণ্ড খরচ করতে হয়েছিল গৃহসজ্জার জন্যে।

১৭৯৩ সালে এক পাউণ্ড চায়ের দাম ছিল সাড়ে চার টাকা, এক ডজন সূতি মোজা প্রায় ন পাউণ্ড, একদিনের গাড়িভাড়া দু-গিনি, এক রাত্রির জন্যে পিয়ানোভাড়া ত্রিশ টাকা, আপেল টাকায় আটটা, আঙুর চার টাকা সের, সোডাওয়াটার ডজন দশ টাকা ; ধোবী খরচ—পুরুষের কাপড় শতকরা তিন টাকা, মেয়েদের কাপড় সাড়ে চার টাকা ; চুল-ছাঁটাই ও কেশ-বিন্যাস বারো টাকা। থিয়েটারের টিকিটের মূল্য অনুরূপ চড়া—চৌরঙ্গী থিয়েটার বক্স সীট বারো সিক্কা টাকা, পিট ছয় সিক্কা টাকা ; ১৫নং সার্কুলার রোডের থিয়েটারে একটা আসন এক মোহর।

এখানেই শেষ নয়। এত খরচ করেও সাহেব-সুবোরা টাকার টানাটানি অনুভব

করত না। ফিলিপ ফ্রান্সিস একরাতের জুয়োখেলায় জিতেছিল কুড়ি হাজার পাউণ্ড, বারওয়েল হেরেছিল চল্লিশ হাজার পাউণ্ড। এমন হার-জিত নিত্য চলত।

তাক লেগে যায় যখন ভাবি এই দরিদ্র দেশে হঠাৎ আলাদিনের প্রদীপ আবিষ্কৃত হল কি-ভাবে। সে-ভাবেই আবিষ্কার হক, আলাদিনের প্রদীপের সোনার-ফসল-বাহী শ্বেতাঙ্গগণ যখন স্বদেশে ফিরে যেত, প্রকট ঘৃণায় আর প্রচ্ছন্ন ঈর্ষায় সকলে তাদের বলত Nabob, কি না—নবাব। শ্বেতাঙ্গ নবাব ইতিহাসের এক বিচিত্র জীব। শ্বেতাঙ্গ নবাবের আদি ও শ্রেষ্ঠ লর্ড ক্লাইভ কলকাতা সম্বন্ধে বলতে বাধ্য হয়েছে—চরাচরের নিকৃষ্টতম স্থান ; দুর্নীতি, লাম্পট্য, বিবেকহীনতা শ্বেতাঙ্গ-মহলকে গভীরভাবে পেয়ে বসেছে আর তার কৃপায় সকলে অল্পকালের মধ্যে ধারণাতীত অর্থগৃধ্নু, অমিতব্যয়ী ও বিত্তশালী হয়ে উঠেছে।

মোট কথা, অষ্টাদশ শতকের কলকাতা কামিনী কাঞ্চনের শ্রীক্ষেত্রে পরিণত হয়েছিল। আবহাওয়া যেমন ছোট-বড় নির্বিশেষে সকলকে প্রভাবিত করে এ বিষয়েও সেই নিয়ম খাটে। প্রথমে সর্বশ্রেষ্ঠের কথাই নেওয়া যাক। ক্লাইভ যখন গভর্নর, বিলাত থেকে কাউন্সিলের নূতন সদস্য এসে পৌঁছলে, দলে ভেড়ানোর উদ্দেশ্যে সোজাসুজি ক্লাইভ জিজ্ঞাসা করত, বলি কত টাকা চাও ?

ওয়ারেন হেস্টিংসের পদ্ধতিটাও ছিল প্রায় একই রকম তবে টাকার পরিমাণ সদস্যের মর্জির উপর না ছেড়ে দিয়ে জনপ্রতি লক্ষ পাউন্ড পর্যন্ত খরচ করতে রাজী ছিল গভর্নর জেনারেল।

ক্লাইভ ও হেস্টিংসের আচরণ এক রকম হলেও, এমন দুটি ভিন্ন জাতের মানুষ কম দৃষ্ট হয়। ক্লাইভ ষোড়শ শতকের ইংরেজ বোম্বেটেগণের সুযোগ্য উত্তরপুরুষ—দুর্ধর্ষ, দুঃসাহসী, ন্যায়নীতিজ্ঞানশূন্য, অসাধারণ কর্মকুশল ও দেশপ্রেমিক। আর ইউরোপীয় ইতিহাসে যে-ভাবসমষ্টিকে অষ্টাদশ-শতকীয় বৈশিষ্ট বলা হয়, ওয়ারেন হেস্টিংসের চরিত্রে তার বিচিত্র ছায়াতাপ পড়েছিল ; সে ছিল পূর্ণভাবে অষ্টাদশ শতকের সন্তান। জ্ঞানের সঙ্গে কর্মের যে অদ্ভুত সংমিশ্রণে অষ্টাদশ শতকের শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি ভলতেয়ার-চরিত্র গঠিত, তারই একটি ক্ষুদ্রতর প্রতিকৃতি যেন ওয়ারেন হেস্টিংস ! সামান্য কুঠিয়ালের পদ থেকে নবজিত সাম্রাজ্যের ক্ষত্রপপ্রধানের পদপ্রাপ্তি কুলকৌলীন্যহীন ব্যক্তির পক্ষে সেকালে সামান্য কৃতিত্ব নয়। এই একটি বাক্যে তার অসাধারণ কর্মকুশলতার পরিচয়। আবার জ্ঞানের প্রতি তার প্রবল আকর্ষণ অষ্টাদশ শতকের বিশুদ্ধ জ্ঞানস্পৃহাকে প্রকাশ করে। প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্য ও ফারসী সাহিত্যের শ্রেষ্ঠত্ব যারা প্রথম স্বীকার করেছিল তাদের মধ্যে হেস্টিংসের নাম অগ্রগণ্য ; নিজের খরচে গীতার প্রথম ইংরেজী অনুবাদ ছাপিয়ে দিয়েছিল যে-ব্যক্তি, আর যাই হক ক্লাইভের মত সে গোঁয়ার ছিল না। লাটিন ও ফারসী সাহিত্যে ছিল তার অসামান্য দখল ; লাটিনে এপিগ্রাম রচনায় বা ফারসীতে রুবাই তৈরিতে সেকালে এদেশে তার জুড়ি ছিল না।

এডমণ্ড বার্কের প্রচণ্ড বাগ্মিতার হাতুড়ির প্রত্যাঘাত করার ক্ষমতা তার ছিল না, কিন্তু অক্ষম রোষে এপিগ্রামের ছোবল মারতে বাধা কি ?

> Oft have I wondered that on Irish ground
> No poisonous reptiles ever yet were found:
> Revealed the secret stands, of Nature's work,
> She saved the venom to create a Burke !

মিতাহারী, মিতাচারী হেস্টিংস পালকির ডাক বসিয়ে চলেছে কাশী ; কুরুপাণ্ডবের বীরত্ব কাহিনীর আকর্ষণে মন উধাও ; কাশীতে নেমে চেৎ সিংকে এক গুঁতো দিয়ে কয়েক লক্ষ টাকা পকেটস্থ করে আবার ফিরল পালকি ; এবার হয়তো শাহ্‌নামার যুদ্ধ বিবরণ। পথে পড়ল এক দেশীয় রাজ্য ; হুম্‌কির হুঙ্কারে কতকগুলো জহরৎ এসে ভর্তি হল আর এক পকেটে ; আবার চলল পালকি, এবারে একমনে ফারসী বয়েৎ রচনার পালা ; দুদিকে হিন্দুস্থানের ধূসর রৌদ্রদীপ্ত দিগন্ত, মাঝখানে হুম্পাহুমা তালে চলেছে পালকি, যার মধ্যে প্রশস্তললাট, কৃশমুখমণ্ডল, ক্ষীণদেহ, অষ্টাদশ-শতকের ব্যক্তিত্ব বিরাজমান। এসব কথা খুব বেশি বদল-সদল না করে ভলতেয়ার সম্বন্ধেও অনায়াসে লেখা যেতে পারত। ক্লাইভ ও হেস্টিংস গায়ে গায়ে সংলগ্ন হওয়া সত্ত্বেও দুজনের মুখ ছিল দুদিকে ; ক্লাইভ অতীত আর হেস্টিংস ভবিষ্যৎ।

বিশুদ্ধ জ্ঞান ও বিশুদ্ধ দস্যুতার মধ্যে এক রকম করে সমন্বয় করেছিল অষ্টাদশ শতক (ভলতেয়ারের প্রভূত বিত্তের অধিকাংশই উপার্জিত হয়েছিল চোরাবাজারে, ঘুষের কড়িতে এবং অনুরূপ পন্থায়), তেমনি বিশুদ্ধ কাম ও বিশুদ্ধ প্রেমের মধ্যেও অপূর্ব সেতুবন্ধ হয়ে গিয়েছিল সে যুগে। হেস্টিংসের দ্বিতীয় পক্ষের পত্নী ভূতপূর্ব ব্যারনেস ইমহফ্‌। প্রথম স্বামীর সঙ্গে বিবাহবিচ্ছেদ এবং হেস্টিংসের সঙ্গে তার বিবাহ যে সম্পূর্ণ আইনানুগ হয় নি এমন কানাকানি তখনকার কালেও (কি কাল !) শোনা গিয়েছিল। হেস্টিংস তবু পদে ছিল, আইনের সূক্ষ্ম পর্দায় অতীতের সর্বকীর্তি প্রচ্ছন্ন না হলেও অতীতের উপরে যবনিকাপাত বলেই লোক ধরে নিয়েছিল। অন্য অনেকে সে পরিশ্রমটুকুও স্বীকার করে নি।

ফিলিপ ফ্রান্সিস, গভর্নরের কাউন্সিলের অন্যতম প্রধান সদস্য, হেস্টিংসের প্রবলতম প্রতিপক্ষ, কলকাতার শ্বেতাঙ্গ-সমাজের ভূষণস্বরূপ, এ হেন ফিলিপ ফ্রান্সিস রাতের অন্ধকারে নিজেকে মিশিয়ে দেবার উদ্দেশ্যে কালো পোশাক পরে একখানা আস্ত মই বগলে নিয়ে রাজপথ দিয়ে চলেছে---পাঁচিল ডিঙিয়ে মঁ গ্রাণ্ডের মাদাম গ্রাণ্ডের সঙ্গে নৈশ সম্ভাষণের আশায়। তার পর হঠাৎ সে নৈশ আলাপে ব্যাঘাত ঘটল, মঁ গ্রাণ্ডের দারোয়ান চাপরাসী ফ্রান্সিসকে আটক করল, ফ্রান্সিস দেয়াল টপকে পালাল, মঁ গ্রাণ্ড মামলায় খেসারত পেল—এ সব তথ্য তখনকার কালেও (কি কাল !) শহরে চাঞ্চল্য এনেছিল। এতে আর যারই ক্ষতি হক—মাদাম গ্রাণ্ডের কোন ক্ষতি হয় নি। বিবাহ-বিচ্ছেদের পরে কিছুকাল ফ্রান্সিসের রক্ষিতা রূপে থাকবার পর অদৃষ্টের দাবা-খেলোয়াড়ের হাত তাকে নিয়ে চলে গেল ফরাসী দেশে। নেপোলিয়নের সর্বশক্তিমান পররাষ্ট্র-মন্ত্রী মঁ ত্যালেরাঁ-র চোখে পড়ল ভূতপূর্ব মাদাম গ্রাণ্ড—আর ক্রমে মাদাম ত্যালেরাঁ ও প্রিন্সেস ত্যালেরাঁ রূপে জীবনাবসান ঘটল এই স্বৈরিণী মনস্বিনী নারীর।

উপরতলায় যেখানে এই অবস্থা, নীচের তলার অবস্থা সেখানে সহজেই অনুমেয়। সেকালের প্রায় প্রত্যেক সিভিলিয়ানের দেশী রক্ষিতা থাকত। ফোর্ট উইলিয়মের এক মেজরের একটি ছোটখাটো হারেম ছিল, বিবির সংখ্যা ষোল জন। কৌতূহলী বন্ধুর 'এতগুলোকে কি করে সামলাও' প্রশ্নের উত্তরে সৌভাগ্যবান মেজর বলেছিল—খুব সহজ। ওদের পেট ভরে খেতে দিই, আর একটু ঘুরে ফিরে বেড়াতে সুযোগ দিই, তবে লক্ষ্য রাখি যাতে বেশি দূরে গিয়ে না পড়ে !

মেজরের উত্তরটা সেকালের অধিকাংশ সিভিলিয়ানের উত্তর। একদিকে অমিতব্যয়ের

দেনা, অন্যদিকে অমিত-বিহারের সন্তান-সন্ততির ভার—দুয়ে মিলে সিভিলিয়ানদের নীচের দিকে টানত, অন্যদিকের পথ বন্ধ।

তবে তাদের একবারে অকৃতজ্ঞ বলা যায় না। কিছুকাল পরে যখন সিভিলিয়ানদের পরিবারের জন্য ভাতার প্রশ্ন উঠল, পুরনো আমলের সিভিলিয়ানগণ জারজ সন্তানদের জন্য ভাতা দাবি করল। নূতন আমলের ছোকরার দল করল ঘোর আপত্তি। পুরনো দল ঠাট্টা করে লিখল—জিতেন্দ্রিয় সাধুপুরুষের দল!

আর ছোকরার দল বুড়োদের ঠাট্টা করে ব্যঙ্গচিত্র আঁকল—বুড়ো সিভিলিয়ানের পিছনে চলেছে এক দেশী রমণী, তার পিছে এক দেশী বালক।

বুড়োর দল হয়তো মনে মনে ভাবল—হায়, যদি একটিমাত্র হত!

আর যে-সব উচ্চাকাঙ্ক্ষী যুবক রীতিমত বিয়ের আশা পোষণ করত, টাকা-কড়ির পেখম মেলে দেওয়া ছাড়া তাদের গত্যন্তর ছিল না। প্রজাপতির প্রধান দৌত্য করত জুড়িগাড়ি।

একবার এক যুবক দামী জুড়িগাড়ি কিনে ঈপ্সিতা তরুণীর মনোহরণ করতে পেরেছে কি না জানবার আশায় জিজ্ঞাসা করেছিল—বলি জন্তুটা কেমন দেখছ?

তরুণী নিরীহের মত শুধিয়েছিল, কোন্‌টা, যেটা টানছে না যেটা হাঁকাচ্ছে?

খিদিরপুরে অনাথ শ্বেতাঙ্গিনী বালিকাদের একটি সংরক্ষণাবাস ছিল। বিবাহেচ্ছু যুবকগণ সেখানে গিয়ে অনেক সময় ভাগ্য-পরীক্ষা করত। আর ভাগ্য-পরীক্ষার ক্ষেত্র ছিল জাহাজঘাটায়, নূতন জাহাজ পৌঁছবার শুভক্ষণে। বেওয়ারিশ তরুণী দেখলে যুবকের দল ছেঁকে ধরত।

সেকালে চাল ডাল ঘি আটা মাছ মাংস প্রভৃতি খাদ্যদ্রব্য শ্বেতাঙ্গ সমাজের আর্থিক সামর্থ্যের অনুপাতে খুব সুলভ ছিল, কিন্তু অধিকাংশ গৃহেই এ সব বস্তু দুর্মূল্য হয়ে পৌঁছত। মিসেস ফে ১৭৮৯ সাল নাগাদ লিখছে যে তার খানসামা বলছে পাঁচ সের দুধ আর তেরোটা ডিম লেগেছে দু ডিশ পুডিং তৈরি করতে; আর জনপিছু দৈনিক বারো আউন্স মাখনের খরচা দেখায় লোকটা!

এখন একটিমাত্র খানসামার হাতটান যদি এমন হয়, তবে যে বাড়িতে ছোটয় বড়য় হরেক নামে তেষট্টিজন চাকরবাকর, সে বাড়িতে চিরদুর্ভিক্ষ তো বিরাজ করবেই: তবু তো মিসেস ফে মধ্যবিত্ত গৃহিণী মাত্র, ধনী পরিবারে চাকরবাকরের সংখ্যা একশো-র অনেক উপরে।

টাকার অভাব? দোকানদাররা পরস্পরের মধ্যে পাল্লা দিয়ে জানিয়ে যেত, হুজুর, আমি তিন হাজার টাকার মাল ধার দেব; মেমসাহেব, আমি দেব পাঁচ হাজার টাকার মাল।

তার পরে যখন টাকা শোধবার অপ্রীতিকর সময় আসত তখন বিপদে মধুসূদন বেশে আসরে অবতীর্ণ হত বাড়ির সরকার।

হুজুর, দত্তরাম চক্রবর্তী আমার দোস্ত, আত্মীয় বললেই হয়, অমন সাধুলোক আর হয় না। হুজুর ইশারা করলেই এখনই টাকার থলি নিয়ে হাজির হয়।

যুগপৎ আশায় ও উদ্বেগে হুজুর শুধায়—সুদ কত নেবে?

হুজুরের কাছে কি বেশি নিতে পারে? মাত্র শতকরা চল্লিশ টাকা।

কিন্তু আইনে যে মাত্র বারো টাকা বলে।

এবারে সরকার এমন একটি স্মিতহাস্য বিকশিত করে, যার ভাষ্য করতে গেলে মহাভারত লিখতে হয়। সে হাসিতে একসঙ্গে আইনের প্রতি আনুগত্য ও অবিশ্বাস ; কোম্পানির প্রতি অশ্রদ্ধা ও হুজুরের প্রতি নির্ভরশীলতা, হুজুরের কল্যাণ ও পাওনাদারের আসন্ন তাগিদের স্মৃতি প্রকাশিত হয়।

তবে হুজুর চক্রবর্তীকে ডেকে পাঠাই ?

সুদূর মাতৃভূমিব দুর্লভ স্মৃতি মনের মধ্যে একবার চেখে নিয়ে প্রচণ্ড একটা দীর্ঘনিশ্বাস চেপে হুজুর বলে—আচ্ছা তাই হক।

আব দা, ব্রাণ্ডি !

গ্রীষ্মের দুপুরে নির্জলা ব্রাণ্ডিতে লিভার পাকে পাকুক, তমসুক পেকে না উঠলেই আপাতত হুজুর খুশি।

হুজুর !

বড়সাহেব মনে মনে ভাবে, বন্দী। মোটের উপর—ঋণে, রক্ষিতায়, জারজ সন্তানে, দুরারোগ্য ব্যাধি ও অকালমৃত্যুতে বিজিত কলকাতা বিজয়ী মিঃ জনকে সম্পূর্ণ কবলিত করে ফেলেছিল।

ক্লাইভ-বর্ণিত শয়তানের শহরের এই হচ্ছে প্রকৃত রূপ। তেমন করে খুঁটিয়ে দেখলে দেখা যাবে যে, শয়তানও একবারে কৃপার অযোগ্য নয়।

দ্বিতীয় খণ্ড

১
আগুনের ফুলকি

বজরা ভেসে চলে, দুদিকের তীরে তীরে নূতন নূতন দৃশ্য উদ্‌ঘাটিত হয়—সকাল বিকাল মধ্যাহ্ন। রাত্রি আসে আকাশের তারা আর পৃথিবীর দীপ সাজিয়ে ; মাঠে মাঠে বেজে ওঠে শিবাধ্বনি, কখনও বা বাঘের গর্জন।

দুখানা বজরা ভাগীরথী বয়ে উজানে ভেসে চলে, সঙ্গে ছোট আর একখানা পানসি। বজরা দুখানার মধ্যে একখানা বড়, একখানা ছোট। বড়খানায় সপরিবারে কেরী। ছোটখানায় রাম বসু, পার্বতী ব্রাহ্মণ, জন দুই খানসামা, বাবুর্চি ; ছোট পানসিখানায় রসুই হয়, খাদ্য ও পানীয় জল থাকে। রাম বসু ও পার্বতীর রান্নার ব্যবস্থা স্বতন্ত্র ; বজরার এক কামরায় পার্বতীচরণ রাঁধে, দুজনে খায়। রাম বসুর হাতের অন্ন পার্বতী খাবে না। জর্জ উডনী খরচের কার্পণ্য করে নি, সপরিবার কেরীর সুখস্বাচ্ছন্দ্য বিধানের জন্য যথাসাধ্য করেছে ; কৃতজ্ঞ কেরী বলে যথাসাধ্যের বেশি ; সে বলে, এত করবার না ছিল প্রয়োজন, না ছিল তার নিজের সাধ্য।

সকাল বেলায় ব্রেকফাস্টের পবে রাম বসু আসে কেরীর বজরায়, সুসজ্জিত কামরায় দুজনে বসে বাইবেল তরজমার তোডজোড করে। বাইবেলের নিগূঢ় রহস্য কেরী কর্তৃক বিবৃত হয, মন দিয়ে শোনে রাম বসু। পাশের কামরায অর্ধোন্মাদ কেরী-পত্নী আপন মনে বকে চলে ; তার পরের কামরায় আয়া সুর করে ছড়া আউড়ে ঘুম পাড়াতে চেষ্টা করে জ্যাভেজকে,--ফেলিক্স আর পিটাব ছাদের উপরে বসে থাকে, না হয় তাদের কৌতূহলের অন্ত, না হয় তাদের তৃপ্তি।

কেরী বলে, মুন্সী, কাজ করবার এমন অবাধ ক্ষেত্র আমাদের দেশে নেই। সেখানে গদ্য পদ্য দুটোই সমৃদ্ধ, নূতন কিছু করা কঠিন। তোমাদের দেশে সুযোগ প্রচুর।

রাম বসু মনে মনে ভাবে, এ যদি সুযোগ হয়, তবে দুর্যোগ না জানি কি। প্রকাশ্যে বলে, ডাঃ কেরী, বাংলা সাহিত্যে গদ্য নেই বটে, তবে পদ্যের সমৃদ্ধি কম নয়।

কেরী বলে, আপাতত প্রয়োজন আমাদের গদ্যে।

কিন্তু না আছে বাংলা ভাষার অভিধান, না আছে ব্যাকরণ, গদ্য গড়ে উঠবে কি ভাবে ?

অসুবিধাটা কি ? ব্যাকরণ লিখব, অভিধান সঙ্কলন করব, তার পরে এ দুয়ের সাহায্যে মুখের ভাষার উপরে বনিয়াদ খাড়া করে গদ্যের ইমারত গেঁথে তুলব। কঠিনটা কি ? এই পথেই সব দেশের গদ্য তৈরি হয়ে উঠেছে।

কাজের সুগমতা স্মরণ করে রাম বসু শিউরে ওঠে।

কেরী বলে চলে, প্রথমে ইংরেজী আর ফারসী থেকে অনুবাদ করে গদ্যের আড় ভাঙতে হবে, তার পর আসবে মৌলিক রচনা।

রাম বসু বলে, খুব ভাল হবে।

হবেই তো, উৎসাহিত হয়ে বলে ওঠে কেরী, তার পরে হিন্দী ভাষায়, ওড়িয়া ভাষায় এবং অন্যান্য ভারতীয় ভাষায় গদ্য সৃষ্টি করবার ভার নেব—আর নিশ্চয় জোনো প্রভুর আশীর্বাদে সাফল্যলাভ করব। কেন না তাঁর মহিমা তাঁর বাণী প্রচারের জন্যই তো এত পরিশ্রম, এত অধ্যবসায়।

রাম বসু স্বীকার করে—অবশ্যাই সাফল্যলাভ হবে, নতুবা তিনি এমন যোগাযোগ ঘটাতেন না।

নিশ্চয়, নিশ্চয়, বলে কেরী বাইবেল খুলে বসে বলে, 'সেন্ট ম্যাথিউ' পরিচ্ছেদটি আজ তোমাকে বুঝিয়ে দিই।

কেরী বোঝায়, অসীম তার উৎসাহ। খুব সম্ভব রাম বসু বোঝে, কেন না অগাধ তার নীরবতা।

অবশেষে পরিশ্রান্ত কেরী শুধায়, মুন্সী, বুঝলে ?

রাম বসু বলে, ডাঃ কেরী, পাণ্ডিত্য ও প্রভুর কৃপা অসাধ্য সাধন করতে পারে, না বুঝে উপায় কি ?

বেলা এগারোটা বাজে। বোটের জানালা দিয়ে গাঁয়ের ঘাট দেখা যায়। দেখা যায় আদুড় গায়ে স্নানার্থী নরনারী, ছেলেরা জলে সাঁতার কাটছে, এক পাশে নৌকোর ভিড়।

কেরীর মানসিক গতিবিধির অস্ফুট পদধ্বনি বাক্যে প্রকাশিত হয়—আহা, কবে এরা প্রভুর গোষ্ঠে এসে সমবেত হবে!

রাম বসু মনে মনে বলে—তাহলে তোমাকে শেষ বিচারের দিন পর্যন্ত অপেক্ষা করে থাকতে হবে, তার আগে নয়। পারবে কি ?

উইলিয়াম কেরী ও রামরাম বসুর মত ভিন্নপ্রকৃতির দুটি লোক কখনও কদাচিৎ মুখোমুখি এসে দাঁড়ায়। দুজন দুই জগতের, দুই যুগের লোক। ঘটনাচক্রের বিচিত্র আবর্তনে দুইজনে এসে একখণ্ড ভূমিতে পাশাপাশি উপস্থাপিত হয়েছে, মিল এইটুকু মাত্র—দুটি মনশ্চেতনার মধ্যে অনন্ত ব্যবধান।

কেরী খ্রীষ্টীয় মধ্যযুগের অধিবাসী, কালভ্রষ্ট হয়ে অষ্টাদশ শতকে অবতীর্ণ। রাম বসু নূতন জগতের মানুষ, স্থানভ্রষ্ট হয়ে বাংলা দেশে আবির্ভূত। কেরীর বিশ্বাস, ধর্ম যাবতীয় সমস্যার সমাধানে সক্ষম। যে জাহাজের সে যাত্রী, তার নাম ধর্ম, তার কাঁটা-কম্পাস নীতি, তার ধ্রুবতারা খ্রীষ্টীয় ভক্তি ; যে দুর্নিরীক্ষ্য উপকূলের অভিমুখে জাহাজের গতি, তার নাম খ্রীষ্টীয় ভক্তিজগৎ।

রাম বসুর বিশ্বাস, জ্ঞান, বিশুদ্ধ জ্ঞান, সব সমস্যার সমাধানে সক্ষম। তার জাহাজের নাম প্রত্যক্ষ জ্ঞান ; নীতি, ধর্ম, বিবেকের পুরাতন কাঁটা-কম্পাস অতলে নিক্ষিপ্ত, ধ্রুবতারার উপরে নেই তার আস্থা, বন্দরের আকর্ষণ অনুভব করে না যাত্রীর দল—জ্ঞানের কি অন্ত আছে! ঐ সমুদ্রের ঢেউগুলো যেমন অসংখ্য, জ্ঞানের ঊর্মির সংখ্যা তার চেয়ে কম হবে কেন ? সমুদ্রের প্রচণ্ড আঘাত, প্রভঞ্জনের কঠিন আলিঙ্গন, লক্ষ লক্ষ তরঙ্গের অট্ট-করতালি, জাহাজের ওঠাপড়ার ছন্দ তার সুপ্ত গুপ্ত ব্যক্তিত্বের ঝুঁটি ধরে নাড়া দিয়ে ঘুম ভাঙিয়ে দেয়—লবণাম্বুসিক্ত উদার আকাশের তলে জেগে উঠে, তার বিস্ময় কৌতুক-কৌতূহল জিজ্ঞাসার আর অন্ত থাকে না।

কেরীর মুখ দিয়ে গতপ্রায় মধ্যযুগ প্রশ্ন করে, জীবনের উদ্দেশ্য কি ? রাম বসুর মুখ দিয়ে নবীন জাগ্রত যুগ প্রশ্ন করে, এসব কেমন করে সৃষ্টি হল ? মধ্যযুগ বলে,

স্রষ্টার সঙ্গে জীবনের অভিপ্রায়কে মিলিয়ে নেব, নবীন যুগ বলে, সৃষ্টির রহস্যচক্র ভেদ করে স্রষ্টার স্থান অধিকার করব। মধ্যযুগের অদম্য সঙ্কল্প, নব্যযুগের অনন্ত জিজ্ঞাসা।

যদি কেউ শুধায়, এই ঘর-কুনো, প্রাচীন প্রথা ও বহু সংস্কারের দ্বারা জীর্ণ বাংলা দেশে এমন মানুষ সম্ভব হল কেমন করে ? কোথায় কোন্ দূর গাঁয়ে লাগা আগুনের ফুলকি, বাতাসের কোন্ খেয়ালে এ পাড়ায় এসে পড়ে কে বলবে ? প্রাচীন গ্রীসের চাপাপড়া জ্ঞানবিজ্ঞান হঠাৎ একদিন জ্বলে উঠেছিল নবীন ইউরোপে—তার স্ফুলিঙ্গের শিখায় জ্বলে উঠল একে একে ইতালী, ফ্রান্স, ইংলণ্ডের মন। দাবানল ছড়িয়ে গেল পাশ্চাত্ত্য দেশে। তার পরে বাতাসের কোন্ খেয়ালে না জানি দু-একটা উড়ো ফুলকি এসে পড়ল বাংলা দেশের আম-কাঁঠাল-নারকেলের শান্ত পরিবেশে। একই জাহাজে চেপে গতপ্রায় মধ্যযুগ আর নবযুগ ভারতের বন্দরে এসে পদার্পণ করল। সেই দিব্য অনলের স্পর্শে জ্বলে উঠল রাম বসুর কল্পনা, মস্তিষ্ক, সমস্ত ব্যক্তিত্ব। নূতন যুগের নূতন মানুষের সূত্রপাত হয়ে গেল।

এমন, এমন দুটি ভিন্ন প্রকৃতির লোক পাশাপাশি এল কোন্ বিধানে ? কেবলই অদৃষ্টের খেয়াল ? তা নয়। নূতন ও পুরাতনের মিলন যে এক সীমান্তে, ছাড়াছাড়ি হতে হতেও একবার হাত মিলিয়ে নেয় তারা। ভিন্ন তাদের প্রকৃতি, বোধ করি সেই কারণেই পরস্পরের প্রতি এমন তাদের আকর্ষণ। সেকালে পাদ্রীর দলের কৌতূহলের অন্ত ছিল না এই লোকটির প্রতি। ঘুরে ঘুরে তারা কাছে টানত রাম বসুকে, তাড়িয়ে দিয়ে আবার ফিরিয়ে নিতে আসত অনুরোধ-উপরোধ করে। আবার রাম বসুও মনের মানুষ পেত বিদেশী বিধর্মী বিভাষী বিচিত্র লোকগুলোর মধ্যে। ঐ তো বলেছি—তাদের মন ছিল এক-সীমান্ত-ঘেঁষা।

কেরী যখন খ্রীষ্টীয় শাস্ত্রকারদের রচনা পড়ে, রাম বসু তখন দি হোলি বাইবেল সম্মুখে রেখে লুকিয়ে লুকিয়ে পড়ে ফিলডিং-এর টম জোন্‌স। কেরীর পায়ের শব্দ শোনবামাত্র বাইবেল দিয়ে চাপা দেয় টম জোন্‌স। কতদিন ধরা পড়তে পড়তে এই উপায়ে রক্ষা পেয়ে গিয়েছে—বাইবেলের উপর গিয়েছে বেড়ে ভক্তি।

কেরী যখন কুসংস্কারে আকণ্ঠনিমগ্ন স্নানার্থী জনতাকে জর্ডান নদীর জলে দীক্ষিত করবার স্বপ্ন দেখে, রাম বসু তখন নদীজলে আকণ্ঠনিমগ্ন স্নানার্থিনীগণের রহস্যোদ্ধারে মনকে নিযুক্ত করে।

সহসা কেরী বলে ওঠে, মুন্সী, আমার ইচ্ছা এদের মধ্যে আমি প্রভুর নাম প্রচার করি !

সুখতন্দ্রা ভেঙে রাম বসু চমকে ওঠে, বলে, বেশ তো, সে খুব ভাল হবে।

তবে তার ব্যবস্থা কর।

রাম বসু বলে, আগামীকাল রবিবার আছে, সকাল বেলা এক গাঁয়ে নৌকো ভিড়িয়ে বক্তৃতা করবেন।

উৎসাহিত কেরী বক্তব্য গুছিয়ে নেবার জন্যে মনোনিবেশ করে।

পাশের কামরায় অর্ধোন্মাদ ডরোথি থেকে থেকে চীৎকার করে ওঠে—টাইগার ! টাইগার !

ঐ শব্দটা মাঝে মাঝে চীৎকার করে ওঠা তার এক বাতিক হয়ে দাঁড়িয়েছে।

বজরা চলে, পালে বাতাস লাগে, দুই তীরের দৃশ্যবৈচিত্র্য অফুরন্ত সৌন্দর্যে একটানা

অবারিত হয়ে যায়, পাশাপাশি গায়ে গায়ে উপবিষ্ট মধ্য-যুগ ও নবীন-যুগ, ভক্তি ও জ্ঞান, ভিন্নমুখে চিন্তাসূত্র বয়ন করে। আর পাশের কামরা থেকে কেরীপত্নী ভীতচকিত চীৎকার করে করে ওঠে—টাইগার! টাইগার!

২
স্রোতের ফুল

বজরা চলে। দিন ও রাত্রি তীরে তীরে বিচিত্র দৃশ্য উদঘাটিত করে। সমস্তই কেরীর চোখে নূতন, সমস্তই কেরীর কানে অভিনব।

অতি প্রত্যুষে নদীব জল থেকে ওঠে কুয়াশার সূক্ষ্ম মলমল, দুই তীর কুয়াশার আড়ালে ঝাপসা, দেখা যায় অথচ বোঝা যায় না, এমন।

কেরী শুধায়, মুন্সী, নদীতীরে অনেক মিন্সেকে স্থির হযে বসে থাকতে যেন দেখতে পাচ্ছি। কি করছে ওরা?

সম্প্রতি ন্যাড়ার কাছে কেরী লোকমুখের ভাষায় পাঠ নিচ্ছে—'মনুষ্যে'র বদলে 'মিন্সে' শব্দটা তার বড পছন্দসই, শেখবার পরে যত্রতত্র ব্যবহার করবার দিকে তার ঝোঁক।

রাম বসু এক মুহূর্তে নিজেকে সামলে নিয়ে বলে—ওরা? রিলিজ্যস পীপল! প্রেয়িং গড।

ভেরি গুড, ভেরি গুড। প্রেয়ার ইজ হেলদি, বলে কেরী।

আচ্ছা মুন্সী, ওরা দিনে ক-বার প্রেয়ার করে?

যার যেমন প্রয়োজন, সাধারণত দিনে দু-তিন বারও করে, কিন্তু অন্তর্দ্বন্দ্ব উপস্থিত হলে—

বাধা দিয়ে কেবী বলে, অন্তর্দ্বন্দ্ব, মানে মানসিক সংগ্রাম, স্পিরিচুয়াল স্ট্রাগ্‌ল্—তার পরে বল—

রাম বসু বলে, তখন আট-দশ বার প্রেয়ার করে থাকে।

পার্বতীর আর বসে থাকা সম্ভব হয় না, সে উঠে অন্যত্র যায়।

ভেরি গুড, ভেরি গুড। আমি দেখেছি কিনা প্রেয়ারের পরে দেহে মনে বেশ শান্তি পাওয়া যায়। কিন্তু ওদের কাছে জলপাত্র আছে বলে যেন মনে হচ্ছে। হোয়াট ফর?

অকুতোভয় রাম বসু বলে, ও আর কিছুই নয়, অফারিং টু অলমাইটি।

এবারে বিষণ্ণ কেরী বলে, ভেরি ব্যাড, ভেরি ব্যাড। ওটা কুসংস্কার। আমাদের দেশে প্রেয়ারের সময়ে জলপাত্রের প্রয়োজন হয় না।

তা বটে, কিন্তু যে দেশে যেমন রীতি।

আবার কেরী বলে, ভেরি ব্যাড, ভেরি ব্যাড। কেরী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ভাবে, এরা বড়ই কুসংস্কারগ্রস্ত।

পার্বতী ফিরে এসে ফিস ফিস স্বরে বলে—ও সব কি বললে ভায়া?

রাম বসু জনান্তিকে বলে—এ ছাড়া আর কি বলব? আসল কথা জানলে যে

আমাদের দেশের লোককে অসভ্য ভাববে। সেটা কি খুব গৌরবের হবে ?

কেরী বলে, মুন্সী, আজ গাঁয়ে বজরা ভেড়াবে—আমি মিন্সেগুলোর মধ্যে প্রভুর নাম প্রচার করব। কাল নামপ্রচার করে বেশ তৃপ্তি পেয়েছি, রাত্রে সুনিদ্রা হয়েছিল।

বেশ তো, সামনেই একটা গ্রাম দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, নৌকো ভেড়ালেই হবে।

নৌকা এগিয়ে চলে, মাঝিরা পাল গুটোবার আয়োজন করে—কেরী যাজকের পোশাক পরে প্রস্তুত হয়—তীর অদূরে। এমন সময় অভাবিত এক কাণ্ড ঘটল।

তীরে কোলাহল উঠল—'গেল গেল, পালাল পালাল, ধর ধর !'

নৌকার আরোহীরা চকিত হয়ে তাকিয়ে দেখে যে তীরে একটি ছোটখাটো জনতা : কিন্তু কে পালাল কাকে ধরতে হবে, সে রহস্য উদ্ধার করবার আগেই তারা দেখল নদীর জলে একটি মেয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে সাঁতার দিয়ে নৌকার দিকে আসছে। সকলে বুঝল তাকে ধরবার উদ্দেশ্যেই কোলাহল। মেয়েটি নৌকার কাছে এসে পড়েছে এমন সময় খান দুই ডিঙি করে জনকয়েক লোক তাকে ধরবার জন্য এগোল। কিন্তু ডিঙি তাকে ধরবার আগেই মেয়েটি কেরীর বজরার কাছে এসে আর্তস্বরে বলে উঠল, বাঁচাও, বাঁচাও ! ওরা পেলে আমায় পুড়িয়ে মারবে।

পরমুহূর্তে কেরীকে লক্ষ্য করে মেয়েটি বলে উঠল—সাহেব, দোহাই তোমার, আমাকে রক্ষা কর !

কেরীর ইঙ্গিতে রাম বসু মেয়েটিকে টেনে তুলে ফেলল নৌকায়।

সকলে দেখলে, বিচিত্র তার বেশ, বিচিত্র তার সজ্জা, বিচিত্র তার রূপ। ভয়ে উদ্বেগে সে রূপ সহস্রগুণ উজ্জ্বল। প্রকৃত সৌন্দর্য দুঃখে সুন্দরতর হয়। ঝড়ের আকাশের চন্দ্রকলা মধুরতর।

তার বেশভূষা দেখে রাম বসু বলে ওঠে, এ যে দেখছি বিয়ের সাজ ! তুমি কি বিয়ের আসর থেকে পালিয়ে এসেছ ?

রক্তিম ঠোঁটের ভঙ্গীতে গোলাপফুল ফুটিয়ে মেয়েটি বলে—বিয়ে কাল রাতে হয়েছে, আজ এনেছিল চিতায় পুড়িয়ে মারতে।

হতবুদ্ধি রাম বসু শুধায়, বর হঠাৎ মারা গেল ?

হঠাৎ নয়, একটা মড়ার সঙ্গে বিয়ে ঠিক করেছিল, এখন বলে কিনা ঐ মড়াটার সঙ্গে আমাকে পুড়ে মরতে হবে !

বহু যুগের সংস্কার রাম বসুর মুখ দিয়ে কথা বলে ওঠে, চিতা থেকে পালাতে গেলে কেন ?

চিরন্তন জীবনাগ্রহ মেয়েটির মুখে কথা বলে ওঠে—আমার মরতে বড় ভয় করে।

তার পরে একবার পিছন ফিরে দেখে কেরীর পায়ের কাছে নতজানু হয়ে বসে ব্যাকুলতায় ভেঙে পড়ে বলে—সাহেব, রক্ষা কর—ওরা একবার ধরলে আর রক্ষা থাকবে না, জ্যান্ত পুড়িয়ে মারবে।

ডিঙির আরোহীদের মধ্যে কৃশকায় একটি লোককে দেখিয়ে বলে—ঐ চণ্ডীখুড়ো সব নষ্টের গোড়া। দোহাই সাহেব, ওর হাতে আমাকে ছেড়ে দিও না, দোহাই তোমার !

সমস্ত ব্যাপার দেখে কেরীর বাক্‌রোধ হয়ে গিয়েছিল, মেয়েটির আর্তব্যাকুলতায় এতক্ষণে তার বাক্‌স্ফূর্তি হল—কেরী বলল, তুমি ডরো মৎ, ঐ মিন্সের হাতে তোমাকে আমি ছাড়ব না।

সংসারে মুখের কথার উপরে মেয়েটির আর ভরসা ছিল না, সবলে সে কেরীর জানু আঁকড়ে পড়ে রইল।

এই রে! ম্লেচ্ছস্পর্শ-দোষ ঘটে গেল। এখন দেখছি চিতায় তোলবার আগে একটা অঙ্গ-প্রায়শ্চিত্ত করিয়ে নিতে হবে। আর এক খরচার মধ্যে পড়া গেল দেখছি।

বক্তা পূর্বকথিত চণ্ডীখুড়ো।

ঐ শোনো সাহেব ওর কথা—কম্পমানা মেয়েটির উক্তি।

চণ্ডীখুড়ো হাঁকল—কালামুখ আর পোড়াস নে, মেলেচ্ছর নৌকো থেকে নেমে আয় বলছি।

মেয়েটি আরও জোরে কেরীর জানু আঁকড়ে ধরে।

রাম বসু শুধায়—কি হয়েছে মশাই?

কি হয়েছে কিছুই বুঝতে পার নি মনে হচ্ছে! ন্যাকা নাকি? ম্লেচ্ছের সঙ্গে থেকে তোমরাও অধঃপাতে গিয়েছ দেখছি।

তার পরে গলার স্বর আর এক পর্দা চড়িয়ে চণ্ডীখুড়ো বলে—ভালয় ভালয় না দাও তো জোর করে ছিনিয়ে নিয়ে যাব, সঙ্গে লোকজন আছে দেখছ তো?

রাম বসু বলে—একবার চেষ্টা করে দেখ না—ওর নাম কেরী সাহেব, বিলেত থেকে সবে আমদানি হয়েছে, কলকাতার চুনোগুলির ফিরিঙ্গ নয়।

আমাকেও চেন না মনে হচ্ছে, আমি জোড়ামউ গাঁয়ের চণ্ডী বক্সী, জীবনে অমন দু শ পাঁচ শ লোক খুন করেছি, তার উপরে না হয় আর একটা খুন হবে।

বটে। একবার সাদা চামড়ায় আঁচড় কেটে দেখ না কি হয়। কোম্পানির তেলিঙ্গি ফৌজ এসে জোড়ামউ কচলে আমপিত্তি রস বের করে দিয়ে যাবে!

তবে তাই হক। ওরে, বাজা রে বাজা!

চণ্ডীখুড়োর হুকুমে অন্য ডিঙিখানায় যে-সব ঢুলী, ঢাকী, কাঁসরওয়ালা প্রভৃতি বাজনদার ছিল, তারা বাজনা শুরু করল, সঙ্গে ধরল গান—

'যম জিনতে যায় রে চূড়া।
যম জিনতে যায়,
জপ তপ কিবা কর
মরতে জানলে হয়।'

অমনি চণ্ডীখুড়ো আর জনকয়েক লোক মেয়েটিকে ছিনিয়ে নেবার উদ্দেশ্যে বজরায় উঠবার উপক্রম করল। কেরী ঐ একবার মাত্র কথা বলেছিল, তার পরে নীরবে সব দেখছিল, এবারে বুঝল আর দেরি করা উচিত নয়, বাধা দেবার সময় উপস্থিত হয়েছে।

সে হাত বাড়িয়ে নৌকাব ভিতর থেকে বন্দুকটা টেনে নিয়ে গর্জন করে উঠল—মিন্সেরা, এখনও সতর্ক হও, আমি ধর্মযাজক কেরী, কিন্তু প্রয়োজন হলে বন্দুক ধারণ করতেও সমর্থ। অতএব শোন, যদি এই মুহূর্তে তোমরা আমার বজরা পরিত্যাগ না কর তবে আমি বন্দুক নিক্ষেপ করতে বাধ্য হব।

কেরীর গর্জনে অবিলম্বে বাঞ্ছিত ফল ফলল। সকলে সুড় সুড় করে নিজ নিজ ডিঙিতে এসে উঠল।

কেরী পুনরায় বন্দুক উঁচিয়ে গর্জন করে উঠল—তোমরা এখনই নৌকা নিয়ে ফিরে যাও, নতুবা আর এক মুহূর্ত পরেই আমি বন্দুক চালনা করতে বাধ্য হব।

এবারেও অবিলম্বে বাঞ্ছিত ফল ফলল। নৌকার আরোহীদের মধ্যে একবার কানাকানি হল, তার পর নৌকার মুখ ফিরল তীরের দিকে। বাজনা অনেক আগেই থেমে গিয়েছিল।

কিন্তু চণ্ডীখুড়ো ভাঙে তবু মচকায় না। সে একবার শেষ চেষ্টা করল, সাহেব, কোম্পানির দোহাই, নবকেষ্ট মুন্সীর দোহাই, আমাদের মেয়ে ফিরিয়ে দিয়ে যাও।

কেরী নীরব প্রত্যুত্তরে বন্দুক উঁচিয়ে ধরল।

রাম বসু চাপা গলায় পার্বতীকে বলল, প্রভুর নাম প্রচারই কর আর যাই কর, জঙ্গী রক্ত যাবে কোথায়? একটু আঁচড়ালেই মিলিটারি।

পার্বতী বলল, সাহেবের আজকের মূর্তি থেকে মনে ভরসা পেলাম।

কেন বল তো?

বুঝলে না ভায়া, বিপদকালে প্রভুর নাম কোন কাজে আসে না: প্রমাণ পেলে হাতে হাতে, যেমনি বন্দুক তোলা সব মামলা ফয়সালা। তাই বলছিলাম সাহেব যে দরকার হলে বন্দুক ধরতে পারে তা জানা ছিল না, জেনে মনটায় জোর পেলাম।

ক্রমশ দূরায়িত ডিঙি থেকে উচ্চকণ্ঠে চণ্ডীখুড়ো বলে উঠল—ভাবিস নে ছুঁড়ি তুই রক্ষা পেয়ে গেলি! আমি যদি জোড়ামউ গাঁয়ের চণ্ডী বক্সী হই, তবে ভূ-ভারতের যেখানেই তুই পালিয়ে থাকিস না কেন, ঝুঁটি ধরে তোকে নিয়ে এসে চিতায় চড়াবই চড়াব! এখনও ধর্ম আছে রে, এখনও চন্দ্রসূর্য উঠছে, মা গঙ্গা মর্ত্যে আছেন, তাই জানিয়ে রাখছি, ম্লেচ্ছের সাধ্য নেই তোকে বাঁচায়। আজকের মত রক্ষা পেলি বলেই চিরকালের মত রক্ষা পেলি তা ভাবিস নে রেশমী, তা ভাবিস নে!

বজরার আরোহীরা জানতে পেল মেয়েটির নাম রেশমী।

৩
বারোয়ারীতলার বিচার

জোড়ামউ গ্রামের বারোয়ারীতলায় বড় ভিড়। গ্রামস্থ প্রধান ও প্রবীণগণ সমবেত, অনেকক্ষণ বিচার-বিতর্কের পরে সভাস্থলে অবসাদের নীরবতা। সভাবসান অনিশ্চিত। বাঙালীর সভা আপনি ভাঙে না, বজ্রপাত বা অগ্নিকাণ্ডের ন্যায় আধিদৈবিক বা আধিভৌতিক দুর্ঘটনার আবশ্যক হয়।

হঠাৎ নীরবতা ভঙ্গ করে চণ্ডী বক্সী লাফিয়ে উঠল, তারস্বরে শুরু করল—যা রয় সয় তাই কর তিনু চক্কোত্তি। এদিকে তো চালচুলো নেই, ওদিকে কথা শুনলে মনে হয় বেদব্যাস নেমে এলেন।

তড়াক করে লাফিয়ে উঠল তিনু চক্কোত্তি, খুড়ো, চালচুলো নেই বলেই সাহসটা অন্তত আছে। তা ছাড়া বেদব্যাসেরই বা কোন্ চালচুলো ছিল?

সে কথা তোমার জানা থাকবার কথা বটে, বেদব্যাসের বাপ কিনা।

ইঙ্গিতটায় অনেকে হেসে উঠল, চক্কোত্তির জেলেনী অপবাদ ছিল।

মুখ সামলে কথা বল বক্সী। আর তাঁতিনীটা কোন্ কুলীন হল?

তবে রে শালা! লাফিয়ে উঠল চণ্ডী বক্সী।

শালা বলল, তোমরা সবাই শুনলে।

কেউ কেউ বলল, খুব হয়েছে এখন থাম।

থামব কেন? বেটা আমাকে শালা বলে কোন্ সুবাদে, একবার জিজ্ঞাসা কর না।

কেউ জিজ্ঞাসা করল না দেখে তিনু বলে উঠল, বেটার বাপ জেলে ছিল কিনা।

জেলেনী অপবাদের সমুচিত প্রত্যুত্তর হয়েছে মনে করে যখন সে স্বস্তি অনুভব করছে সেই মুহূর্তে বক্সী ব্যাঘ্রঝম্পে তার ঘাড়ে এসে পড়ল, যেন একখানা কাঠি আর-একখানা কাঠির উপরে গিয়ে পড়ল। দুইজনেই সমান কৃশ, সমান দীর্ঘ এবং সমান হাঁপানির রুগী। সেইটুকুতেই রক্ষা, কিছুক্ষণের মধ্যেই দুজনে পরিশ্রান্ত হয়ে নিজ নিজ কোটে প্রত্যাবর্তন করে হাঁপাতে লাগল। ভগবান সুবিচারক, বাঘ সিংহ ভালুক প্রভৃতি শ্বাপদকে বীরত্ব দিয়েছেন, কিন্তু বেশিক্ষণ পরিশ্রম করার শক্তি দেন নি। চণ্ডী বক্সী ও তিনু চক্কোত্তির মত বীরপুরুষের বক্ষেও হাঁপানি প্রতিষ্ঠিত করে বীরত্বের সীমা টেনে দিয়েছেন।

এবারে উঠল জগৎ দাস, বাজারের বড় গোলদার, সাধুপুরুষ নির্ঝঞ্ঝাট বলে তার খ্যাতি। লোকটার পেট গোল, মুখ গোল, চোখ গোল ; সব গোলের প্রতিকার তার বাক্যে—শেষটা বড় সরল। সরল তলোয়ার ও সরল বাক্যকে লোকের বড় ভয়।

জগৎ দাস বলল, দেখুন বক্সীমশাই আর চক্কোত্তিমশাই, সকালবেলাতে আমরা এখানে তামাশা দেখতে আসি নি। যদি কাজের কথা থাকে বলুন, না হলে আমরা উঠি।

বক্সী দম ফিরে পেয়েছিল, সে বলে উঠল, আমি তো এতক্ষণ ধরে সেই কথাই বোঝাবার চেষ্টা করছি, মাঝে থেকে ঐ শালা—

আমার জেলেনীর ভাই—বক্তা তিনু চক্কোত্তি।

আবার আরম্ভ হল। তবে আমরা উঠি, বলে সঙ্গে সঙ্গে গাত্রোত্থান করল জগৎ দাস। তাকে উঠতে দেখে অনেকে উঠে পড়ল।

সকালবেলাতেই কেবল জমবার মুখে এমন সরস আসরটি ভেঙে যায় দেখে ঘাড়-বাঁকা পঞ্চানন বলে উঠল, কাজের কথা হক, বসুন দাসমশাই।

কোন অজ্ঞাত বা অপ্রকাশ্য কারণে পঞ্চাননের ঘাড়টা বেঁকে গিয়েছে, তাই সে ঘাড-বাঁকা পঞ্চানন নামে পরিচিত। পঞ্চানন জানে, কাজের কথা আপনি অকাজের কথায় পরিণত হয়, জোয়ার-ভাটা এক নদী-খাতেই খেলে।

তবে তাই হক—বলে বক্সী পুনরায় শুরু করল—এই যে মেয়েটা শাস্ত্রের মাথায় পদাঘাত করে একটা ম্লেচ্ছের সঙ্গে চলে গেল, তার কি হয়?

কোন্ শাস্ত্রে আছে যে, একটা অনাথ মেয়েকে পুড়িয়ে মারতে হবে? শুধায় তিনু চক্কোত্তি।

তোমার কোন্ শাস্ত্রটা পড়া আছে চক্কোত্তি? বলে চণ্ডী বক্সী।

আমার না থাক তোমার তো আছে, তুমিই বল না।

বক্সী জীবনে এমন পরীক্ষায় পড়ে নি, তবু সে মচকাবার পাত্র নয়, বলে, তুমি বামুনের এঁড়ে, তোমার কাছে বলে কি লাভ? বুঝতে পারবে?

আহা-হা, আমি না বুঝি এঁদের কেউ কেউ তো বুঝবেন—বলে চক্কোত্তি সভাস্থ জনতা দেখিয়ে দেয়।

বক্সী সে দিক দিয়ে যায় না, বলে, নিশ্চয় আছে, বিধান নিয়েছি শিরোমণি মশায়ের কাছে।

•যদি কোন শাস্ত্রে অনাথা বালিকাকে পুড়িয়ে মারবার বিধান থাকে, তবে সেই শাস্ত্র ভরে আমি ইয়ে করি—বলে লাফিয়ে উঠে বিশেষ একটা ভঙ্গী করতে উদ্যত হয় তিনু চক্কোত্তি।

ঘাড়-বাঁকা পঞ্চানন চীৎকার করে ওঠে, শাস্ত্রের দোষে এখানে যেন ইয়ে করে বসবেন না—এটা বারোয়ারীতলা, জাগ্রত দেবীর স্থান।

লজ্জিত চক্কোত্তি আসন গ্রহণ করে।

জগৎ দাস বলে, চক্কোত্তিমশায়, আপনি প্রাচীন ব্যক্তি তায় ব্রাহ্মণ বর্ণশ্রেষ্ঠ, আপনার বিবেচনা করে কথা বলা উচিত।

বামনামির নিকুচি করি আমি, এবারে বসে বসেই বলে চক্কোত্তি, ঐ কেষ্ট কবরেজও তো বামুন।

এর মধ্যে কেষ্ট কবরেজ আবার এল কোত্থেকে? শুধায় জগৎ দাস।

ওঃ, তোমরা কিছুই জান না দেখি। তবে শোন। চণ্ডী বক্সী, তুমিও শোন, মিথ্যা বললে ধরিয়ে দিও।

অতঃপর গলা পরিষ্কার করে নিয়ে চক্কোত্তি শুরু করে, ঐ তোমাদের চণ্ডী খুড়ো আজ ছ মাস কেষ্ট কবরেজের কাছে হাঁটাহাঁটি করছিল। কেন জান?—কবরেজ, তোমার হাতে তো অনেক রুগী, এমন একটার সন্ধান দাও যেটা দু-এক মাসের মধ্যেই টাঁসবে।

কবরেজ শুধায়, হঠাৎ তেমন রুগীতে কি প্রয়োজন পড়ল?

শেষে অনেক দরাদরি অনেক কচলাকচলির পরে আসল কথা প্রকাশ করে চণ্ডী বক্সী। রেশমীর সঙ্গে বিয়ে দিতে হবে।

তা রুগী কেন? শুধায় কবরেজ।

যাতে বিয়ের পরে বেশি দিন না টেঁকে।

সে কি কথা!

দরদ দেখিয়ে চণ্ডী বলে, আহা মেয়েটার যে বিয়ে হয় না।

তা ভাল বর খোঁজ না কেন?

ভাল বর জুটবে কেন? আর তা ছাড়া খোঁজেই বা কে?

শেষে কবরেজ মশায় কিছু আদায় করে সন্ধান দিলেন ঐ অম্বিকা রায়ের, তিনকাল-গত বুড়ো, দেড় বছর ভুগছিল ক্ষয়কাশে।

কখ্খনও ক্ষয়কাশ নয়, হাঁপানি, চীৎকার করে বলে চণ্ডী বক্সী। এতক্ষণ সে হতভম্ব হয়ে ভাবছিল, এত কথা চক্কোত্তি জানল কেমন করে?

ঐ রকম হাঁপানি তোর হক, উত্তর দেয় তিনু।

কিন্তু এতে বক্সীমশায়ের লাভ কি? শুধায় জগৎ দাস।

ওহো, তুমি কিছুই জান না দেখছি, আর জানবেই বা কেমন করে—থাক সের-বাটখারা-দাঁড়িপাল্লা নিয়ে! যদি না জান তো শুনে নাও। মেয়েটা বিধবা হলে তাকে তোমাদের হিন্দুশাস্ত্রের দোহাই দিয়ে পুড়িয়ে মারতে পারলেই তার সম্পত্তিটুকু উত্তরাধিকারসূত্রে পাবে। কি, ঠিক বলছি কিনা চণ্ডী বক্সী?

তুমি খিরিস্তানের মত কথা বলছ।

আরে বাবা, খিরিস্তান কাকে বলে এবারে দেখলে তো ! গিয়েছিলে তো একবার, পালিয়ে এলে কেন লেজ গুটিয়ে ? যাও না আবার।

যাবই তো, আমি কি সহজে ছাড়ব ? আর, এক বারে না হয় এক শ বার যাব। নিরানব্বই বার হাতে থেকে যাবে, এক বারেই কাজ ফরসা হবে।

কৌতূহলী হয়ে কেউ কেউ শুধায়, সেটা আবার কেমন ?

গুলি মেরে এফোঁড় ওফোঁড় করে দেবে। নিজের রসিকতায় নিজে হো হো করে হেসে ওঠে চক্কোত্তি। বলে, বাবাঃ, একেই বলে বাঘের উপর টাঘ। রাজকন্যা আর রাজত্ব দুই-ই একসঙ্গে পড়ল গিয়ে সাহেবের হাতে। দেখি এবারে বক্সীর কতদূর কি সাধ্য।

বক্সী মনে মনে বড়ই অস্বস্তি অনুভব করছিল, কারণ কথাগুলোর কোনটাই মিথ্যা নয়। তবু এমন নীরব থাকলে অপকর্মের দায়িত্ব দ্বিগুণ ভারী হবে ভেবে বক্সী বলল, তোমার মত গাঁজিলের কথার প্রতিবাদ করে আমি সময় নষ্ট করতে চাই নে।

ও, তাই বুঝি এখন সময়ের সদ্ব্যবহার করছ পাড়ায় পাড়ায় জোট পাকিয়ে ওর দিদিমাকে একঘরে করবার চেষ্টায় !

কে বলল ?

যে বলল সে ঐ আসছে।

সকলে তাকিয়ে দেখল, মোক্ষদা বুড়ি ধীরে ধীরে আসছে। মোক্ষদা বৃদ্ধা বিধবা, রেশমীর মাতামহী।

বারোয়ারীতলায় প্রবেশ করে মোক্ষদা ডুকরে কেঁদে উঠল, বাপ সকল, আমাকে একঘরে করে সমাজে ঠেলো না।

তিনু চক্কোত্তি এতক্ষণ তার হয়েই মামলা লড়ছিল, কিন্তু এখন তার বড় রাগ হল। ভাবল, বুড়ি তো বড় স্বার্থপর, রেশমীর সর্বনাশের চেয়ে একঘরে হওয়ার ভয়টা হল তার বেশি !

সে বলল, বুড়ি, একঘরে হলে তোমার দুঃখটা কি ? তোমার ঘরে কেউ খাবে না, এই তো ? ভালই তো, তোমার ভাত বেঁচে যাবে।

বুড়ি দ্বিগুণ ডুকরে উঠল, মরলে কেউ কাঁধ দেবে না।

নাও, সব গেল, এখন মরার পরে কি হবে সেই দুশ্চিন্তায় বুড়ির ঘুম নেই !

তুমি তো বাবা নাস্তিক, তোমার ধর্মও নেই পরকালও নেই, কিন্তু বাবা আমরা যে ভগবান মানি।

তবে এখানে কেন ? ভগবানের কাছে গিয়ে কাঁদ।

তাই তো কাঁদছিলাম বাবা। বলছিলাম, ঠাকুর, পোড়ারমুখীর কপালে যা ছিল তা হল, এখন আমার যেন অগতি না হয়।

বেশ তো কাঁদছিলে, তবে আবার এদিকে গতি হল কেন ?

বাবা, একঘরে তো ভগবানে করে না, মানুষে করে—

বাধা দিয়ে চক্কোত্তি বলল—মানুষে করে না, অমানুষে করে।

তার পরে দাঁড়িয়ে উঠে বলল, নাঃ, আমার সহ্য হচ্ছে না, তোমরা জাহান্নমে যাও, আমি চললাম—

এই বলে সে হন হন করে প্রস্থান করল।

তিনু চক্রবর্তী গাঁয়ের একটি সমস্যা। তার বিষয়সম্পত্তি, স্ত্রীপুত্র, বাড়িঘর, স্বাস্থ্য,

বিদ্যা কিছু নেই, কিন্তু বোধ করি সেই কারণেই সবচেয়ে বেশি করে আছে অদম্য সাহস ও অপ্রিয় সত্যভাষণের তেজ। বিষয়-সম্পত্তি প্রভৃতি যার আছে তাকে আয়ত্তে রাখা সহজ, কিন্তু অকিঞ্চনের শক্তিরোধের কি উপায় ? সেইজন্য ঐ নিঃস্ব লোকটা সমস্ত গ্রামের চিরস্থায়ী শিরঃপীড়ারূপে বিদ্যমান। কিন্তু এক্ষেত্রে চক্রবর্তী ভ্রান্ত। যে সমাজে বিচারের চেয়ে আচারের, ধর্মের চেয়ে অনুষ্ঠানের, ইহকালের চেয়ে পরকালের গুরুত্ব বেশি, সেখানে একঘরে হওয়ার ভয় দুর্বিষহ, আর মৃত্যুর পরে মৃতদেহটার অগতি-আশঙ্কা একেবারেই অসহ্য। যে সমাজে যাবতীয় দুষ্কৃতি কপালের উপরে চাপিয়ে নিজেকে দায়মুক্ত অনুভব করবার পথ প্রশস্ত, সেখানে রেশমীর বাস্তব সর্বনাশের তুলনায় তার দিদিমার কাল্পনিক সামাজিক বাধা যে গুরুতর হবে এ তো নিতান্ত সহজবোধ্য ব্যাপার। কাজেই মোক্ষদা বুড়ির দৃষ্টিতে তিনু চক্রবর্তী নাস্তিক ও অধার্মিক। চণ্ডী বক্সীর কাছে নতিস্বীকার করে সে বলল—তোরা যা বলবে বাবা, তাই করব।

চণ্ডী সগর্বে সকলের দিকে তাকিয়ে বলল, দেখলে তো, ধর্মের কল বাতাসে নড়ে কি না।

যে দেশ ধর্মের কল নাড়াবার ভার বাতাসের উপর অর্পণ করে নিশ্চিন্ত থাকে, সে দেশের দুঃখের অন্ত থাকে না।

অবশেষে অনেক বিতর্ক ও বিতণ্ডার পরে মোক্ষদার কাছ থেকে বারোয়ারী কালীমাতার ভোগের জন্য একুশটি সিক্কা টাকা ও সওয়া মণ চাল নিয়ে তার উপর থেকে সামাজিক দণ্ড প্রত্যাহার করা স্থির হল এবং আরও অনেক সলা-পরামর্শের পর সিদ্ধান্ত হল যে কলকাতায় গিয়ে জাত-কাছারির কর্তা মহারাজা নবকৃষ্ণ বাহাদুরকে ধরাও করা আবশ্যক। কোম্পানির উপরে তাঁর প্রভূত প্রভাব। তিনি ইচ্ছা করলে অবশ্যই সাহেবের কবল থেকে রেশমীকে উদ্ধার করার উপায় করে দিতে পারেন।

চণ্ডী বক্সী অবিলম্বে কলকাতা যাত্রার উদ্যোগ শুরু করে দিল।

৪
রেশমী সূত্র

রেশমীর সম্বিৎ ফিরে পেতে পুরো তিনটি দিন লেগে গেল। চতুর্থ দিনে খানিকটা গরম দুধ পান করে সে আবার শুয়ে পড়ল। ছিবুর মা বলল—ও-রকমভাবে না খেয়ে থাকলে যে মরে যাবে, নাও এই সন্দেশ দুটো খাও। কিন্তু কোন সাড়া দিল না রেশমী। ছিবুর মা জ্যাভেজের আয়া।

তন্দ্রায় ঘুমে স্বপ্নে কেটেছে এই কয়দিন রেশমীর। যতক্ষণ পর্যন্ত চণ্ডী বক্সী দলবল নিয়ে শাসাচ্ছিল—সে প্রাণপণ-বলে কেরীর হাঁটু আঁকড়ে পড়েছিল, নিজের শেষবিন্দু শক্তিকে চাবুকে জাগিয়ে রেখেছিল। চণ্ডীর দল অপসারিত হতেই তারও শক্তি নিঃশেষিত হয়ে গেল, ছিন্নমূল লতার মত নিঃশব্দে নেতিয়ে পড়ে গেল কেরীর দুই পায়ের মাঝখানে নৌকার পাটাতনের উপর। রাম বসু ডেকে আনল ছিবুর মাকে। তখন দুজনে ধরাধরি করে নিয়ে চলল তাকে ছিবুর মার কামরায়। সেই যে শুল, ঘুমে তন্দ্রায় স্বপ্নে কেটে

গেল তিন দিন তিন রাত, না গেল মুখে এক বিন্দু জল, না গেল পেটে এক দানা অন্ন।

মেয়েটিকে যখন নিয়ে যাওয়া হচ্ছে ছিরুর মার ঘরে, মিসেস কেরী একবার উঁকি মেরে শুধাল, ওর কি হয়েছে? বাঘে ধরেছে নাকি?

ফেলিক্স বলল, না, অজ্ঞান হয়ে গিয়েছে। মিসেস কেরী তাঁর বাক্য সমাপ্ত করে দিয়ে বলল, বাঘের আক্রমণেই। দেখছ না ওর গা লাল হয়ে গিয়েছে।

ভেজা চেলি লেপটে রয়েছে ওর গায়ে।

দুধটুকু পান করে শুয়ে পড়ল, কিন্তু আর ঘুম এল না। ঘুমেরও একটা সীমা আছে। দেহে নূতন করে বলের সঞ্চার অনুভব করল সে। বল কমতে কমতে শেষ সীমায় পৌঁছে আবার বোধ করি আপনিই বাড়তি মুখে রওনা হয়, অমাবস্যার চন্দ্রের শুক্লা তিথিতে সঞ্চারের মত। নতুবা রেশমীর নতুন করে বল অনুভব করবার কি কারণ থাকতে পারে। বলের সঙ্গে এল আশা, আশার সঙ্গে আবার বাঁচবার ইচ্ছা। সে ভেবেছিল, এখন মরলেই বাঁচি। এবার ভাবতে শুরু করল, আবার বাঁচি না কেন! ভাবল, মরবই যদি তবে চিতা থেকে পালাতে গেলাম কেন? চিতার স্মরণে সর্বাঙ্গে শিউরে উঠল। চেষ্টা করল মনটাকে সেদিক থেকে ফিরিয়ে আনতে। কিন্তু তা আর সম্ভব হল না। একে একে মর্মান্তিক দৃশ্যগুলো ভেসে উঠতে লাগল তার মনশ্চক্ষে। একে একে—কিন্তু ঠিক পরম্পরা রক্ষা করে নয়। গত অষ্টপ্রহরের অগুনতি দৃশ্য হরিরলুটের বাতাসার মত ছিটকে পড়ছে, পূর্বাপর ঠিক থাকছে না।

কয়েকদিন থেকে কানাঘুষায় সে শুনছিল যে, তার বিয়ে আসন্ন। কিন্তু তা যে এত আসন্ন তা কি জানত! সেদিন সন্ধ্যাবেলায় বুঝল আজ রাতেই বিয়ে! ঢোল-সানাইয়ের বাজনা মাঝে মাঝে এখনও যেন কানে এসে বাজছে। চেলি-চন্দনে সেজে হাতে দুগাছা বুলি পরে রওনা হল সে বিবাহমণ্ডপের দিকে। ঐ চণ্ডী-খুড়োরই যেন আগ্রহ বেশি। ঐ কি বর! শরীর যেন বৃষকাঠ। মাথাভরা টাক, চোখ ঢুকে গিয়েছে গর্তের মধ্যে, মুখে একটাও দাঁত নেই! কে যেন চাপা গলায় বলল, অমন সুন্দর মেয়েটাকে দিল ভাসিয়ে। চণ্ডীখুড়ো ভারী গলায় হাঁকল, ওরে, বাজা বাজা, লগ্ন হয়েছে।...বন্দুকের শব্দ কেন? তবে কি বিয়েতে বোম ফাটাবার ব্যবস্থাও ছিল? বাসরঘরেই উঠল বরের শ্বাস। কবরেজ ডাক, ওরে কবরেজ নিয়ে আয়! কে একজন বলে ওঠে—এ বর আমদানি তো কবরেজের কৃপাতেই হয়েছে, আবার তাকে কেন? চণ্ডীখুড়ো তাড়া দেয়, তোমরা এখন যাও দেখি, গোল ক'র না।...নাঃ, শেষ হয়ে গেল! সর্বনাশ হল ছুঁড়িটার। কেষ্ট কবরেজ ধন্বন্তরি বটে, বিয়ে শেষ হবার আগেই বরের শেষ হল। তার পর কি হল ওর ভাল মনে পড়ে না। সব কেমন জট পাকিয়ে যায়। ঢাক-ঢোলের আওয়াজের মধ্যে সবাই ওকে কোথায় নিয়ে চলে। ক্ষুধা-তৃষ্ণা, বিচিত্র অভিজ্ঞতা তাকে এমনি অসাড় করে রেখেছিল যে, এতটুকু ঔৎসুক্য ছিল না তার মনে। সবাই বলল, চল; সে চলল। যখন সংজ্ঞা হল দেখল সম্মুখে চিতা সাজানো, উপরে শায়িত একটা মৃতদেহ। লোকটা কে? ওর সঙ্গে কি তার সম্বন্ধ? ঠিক বটে—এতক্ষণে মনে পড়ে—ঐ লোকটার সঙ্গেই তো তার বিয়ে হয়েছিল। কবে? কাল রাত্রে না পূর্বজন্মে—কিছু মনে পড়ে না। সবাই ওকে স্নান করতে নিয়ে যাচ্ছে কেন? তবে কি— ? বোধ করি তবে তাই। পাড়ার বিন্দু বামনীকে চিতায় উঠতে স্বচক্ষে ও দেখেছে। ওঃ, সে কি কষ্ট মেয়েটার! যতবার লাফিয়ে পড়তে যায়, সবাই মিলে হরিধ্বনির মধ্যে বাঁশ দিয়ে চেপে ধরে।...না না, ও মরতে পারবে না। আর এমন

নির্মম মৃত্যুই যদি তার কপালে শেষ পর্যন্ত অবধারিত ছিল, তবে কেন ও বেঁচে রইল ? ওর বাপ, মা, অন্য দুই ভাইবোনের মত নৌকাডুবি হয়ে কেন মরল না ? না, কিছুতেই না কিছুতেই না ! মরতে ওর বড় ভয়। সে দেখল অবাধ সুযোগরূপে সম্মুখে নদী প্রবাহিত হয়ে যাচ্ছে। পূর্বাপর চিন্তামাত্র না করে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল। প্রথমটা কেউ নজর দেয় নি, শেষে রব উঠল—গেল গেল, ডুবল ডুবল ! না না, ডোবা নয়—পালাল রে পালাল ! আন নৌকা আন ডিঙি ! পিছনে দাঁড়ের ছপ ছপ শব্দ। সম্মুখে কার ঐ বজরা ? বাঁচাও বাঁচাও, পুড়িয়ে মারল আমাকে, শীগগির বাঁচাও !

কে একজন হাত বাড়িয়ে টেনে তোলে। রেশমী জড়িয়ে ধরে কার একজনের হাঁটু। এতক্ষণ এমন বিচিত্র কাজ করবার শক্তি কে যোগাল ওকে ! যতক্ষণ বিপদের আশঙ্কা ছিল—শক্ত ছিল ও। আশঙ্কা দূর হতেই মূর্ছিত হয়ে পড়ল।

রেশমী, রেশমী, ওঠ, কিছু খাও।

এই তো দুধ খেলাম।

ওমা, সে তো কালকে খেয়েছ !

তবে কি এর মধ্যে একটা দিন চলে গেল ?

যাবে না ! দিন কি কখনও মুখ চেয়ে বসে থাকে ?

কি খাব ?

ভাত।

সাহেবের বজরায় খাব না।

ওমা, সাহেবের বজরায় কে খেতে বলছে, সঙ্গে যে হিন্দুর বজরা আছে।

তুমি সেখানে খাও ?

তবে কি খিরিস্তানের বজরায় খেয়ে খিরিস্তান হব !

তবে আমাকে সেখানে নিয়ে চল। কিন্তু তোমাকে কি বলে ডাকব ?

সবাই যা বলে ডাকে—ছিরুর মা।

রাম বসুদের বজরায় এসে চার দিন পরে রেশমী অন্ন গ্রহণ করল।

৫
ন্যাড়া দি গ্রেট

প্রতিদিন বিকালে ন্যাড়ার কাছে কেরী লোকমুখের ভাষায় পাঠ গ্রহণ করে, সকালবেলা যেমন শেখে ফারসী ও সংস্কৃত রাম বসুর কাছে।

রাম বসুকে কেরী বলে, মুন্সী, বাংলা গদ্য গড়ে তুলতে হবে—লোকে যেসব শব্দ সদাসর্বদা ব্যবহার করে তার উপরে।

রাম বসু বলে—তাই করুন না কেন। আমি তো সাহিত্যের ভাষায় কথা বলি নে।

তোমার ভাষায় ফারসী শব্দের আধিক্য, সংস্কৃত শব্দও কম নয়। লোকমুখের ভাষা অবিকৃত ন্যাড়ার মুখে। ও আমাকে খুব সাহায্য করছে। ওর নাম দিয়েছি ন্যাড়া দি গ্রেট।

কিন্তু ও যে একেবারে অশিক্ষিত।

আমার বাইবেলের তর্জমাও যে হবে অশিক্ষিত লোকের জন্য। দেখ, সেদিন ন্যাড়া দি গ্রেট আমাকে শিখিয়েছে 'মিন্সে' শব্দটা। শব্দটার খুব তাকত।

ওটা নিতান্ত গ্রাম্য শব্দ।

অধিকাংশ লোকই যে গ্রাম্য। দেখ মুন্সী, মনুষ্য বল, পুরুষ বল, লোকজন বল—মিন্সের মত কোনটাই এক্সপ্রেসিভ নয়। মিন্সে শব্দটা উচ্চারণ করবামাত্র আস্ত একটা মানুষ সম্মুখে এসে দাঁড়ায়।

রাম বসু বোঝে যে, যে-কারণেই হক, সাহেবের কাঁধে এখন গ্রাম্য ভাষার পেত্নী ভর করেছে, প্রতিবাদ করা বৃথা, প্রতিবাদ করলেও পেত্নী সহসা নামবে না, কাজেই এখন পেত্নীর সমর্থন করাই বুদ্ধির কাজ। সে বলে—আপনি যা বলেছেন। গ্রাম্য শব্দের তাকতই আলাদা।

তবে! বলে একখানি কাগজ টেনে বের করে কেরী।

দেখ, ন্যাড়া দি গ্রেট আরও কতকগুলো চমৎকার শব্দ আমাকে যুগিয়ে গিয়েছে।

এই বলে সে পাঠ করে—কাহিল, ঠাকুরঝি, খানকী, মাগী, বেটা, ফলানা!

তার পরে বলে ওঠে—'ফলানা'—এমন চমৎকার শব্দ না আছে ইংরেজী ভাষায়, না আছে তোমার সংস্কৃত ভাষায়। 'অমুক ব্যক্তি' বা 'দ্যাট ম্যান' 'ফলানা'র কাছে—মদের কাছে জলের মত স্বাদুতাহীন।

তার পরে উৎসাহিত হয়ে উঠে বলে, এর পরে যখন আমি প্রভুর নাম প্রচার করব, সমবেত জনতাকে সম্বোধন করব, হে মাগী, মিন্সে ও অন্যান্য ফলানাগণ! কেমন হবে?

চমৎকার হবে।

রাম বসু মুখে বলে বটে—চমৎকার হবে, কিন্তু মনে মনে ভাবে, আমার কুড়ি টাকা মাইনের চাকরি খতম হবে। সমবেত জনতা তোমাকে দশা পাইয়ে ছাড়বে, দ্বিতীয়বার আর নামপ্রচার করবার সুযোগ দেবে না।

দেখ মুন্সী, আমি স্থির করেছি ন্যাড়ার কাছে গ্রাম্য শব্দ সংগ্রহ করব, আর তোমার কাছে শিখব বাংলা গদ্য রচনার কৌশল। আর কিয়দ্দূর অগ্রসর হলে লোকমুখের ভাষায় গ্রন্থ রচনা করব। আর এক-আধখানা গ্রন্থ রচনা করে কলম দুরস্ত হলে বাইবেলের তর্জমা শুরু করব।

এ অতি উত্তম প্রস্তাব। কোন্ বিষয় অবলম্বন করে লিখবেন কিছু স্থির করেছেন কি?

বিষয় আপনি এসে জুটেছে।

ভাসমান নৌকার উপরে কোথা থেকে বিষয় এসে জুটল—ভেবে পায় না রাম বসু।

কিন্তু বেশিক্ষণ ভাবার আবশ্যক হয় না, কেরী আরম্ভ করল—ন্যাড়া মুখে মুখে ওর জীবনকাহিনী বলে যায়, আমি টুকে রাখি। বিস্ময়কর ওর জীবন! যেন একখানি রোমান্স, তুমি কিছু শুনেছ কি?

আমি এখনও শুধাবার অবকাশ পাই নি।

এক সময়ে বিস্তারিত শুনে নিও—এখন একটু আভাস দিচ্ছি। এই বলে কেরী ন্যাড়ার জীবনকাহিনীর একটা ছক বর্ণনা করে যায়।

ন্যাড়া বলে অতিশয় শৈশবে বাপ মা আর এক বোনের সঙ্গে গঙ্গাসাগরে তীর্থ করতে গিয়েছিল। ফেরবার পথে খেজরীর কাছে বোম্বেটেরা ওদের নৌকা লুট করে নেয়। ওর ধারণা ওর বাপ মা নিহত হয়েছে, বোনের খবর তার পরে পায় নি, খুব সম্ভব সেও নিহত হয়েছে। ও যে কেমন করে ব্যাণ্ডেল গির্জার ক্যাথলিক পাদ্রীদের হাতে এসে পড়ল তা বলতে পারে না।

ক্যাথলিক পাদ্রী! রাম বসু আতঙ্কে শিউরে ওঠে।

মুন্সী, আতঙ্কিত হয়ে উঠলে কেন?

আতঙ্কিত হব না? ক্যাথলিক সম্প্রদায় যে প্রভুর সত্যধর্মের দুশমন!

ঠিক কথা, ঠিক কথা। বলে আনন্দে কেরী রাম বসুর করমর্দন করে।

রাম বসু মনে মনে হাসে।

তোমার প্রভুকে তুমি যত জান আমার কুড়ি টাকার প্রভুকে তার চেয়ে বেশি জানি আমি। কোন্ কথায় তার মন ও টাকার থলি কতখানি বিস্ফারিত হবে তা আমার চেয়ে কেউ বেশি জানে না।

কেরী বলে ওঠে, তোমার মত গুণী লোকের কুড়ি টাকা বেতন অত্যন্ত লজ্জার কথা, এবারে মদনবাটিতে গিয়ে আরও পাঁচ তঙ্কা বাড়িয়ে দেব।

প্রস্তাবটা কানে ঢোকে নি এমনভাবে রাম বসু বলে—ন্যাড়ার জীবনকথা বলুন।

দুশমনদের কাছে পাঁচ-সাত বছর ও থাকে। সেই সময়ে দু-চার কথা ইংরেজী শেখে। একদিন যখন নদীর ধারে ও খেলছিল, ছেলে-ধরার দল ভুলিয়ে নৌকায় তুলে নিয়ে আসে কলকাতায়। সেখানে প্রসিদ্ধ হারমনিক ট্যাভার্নের মালিকের কাছে ওকে দশ টাকায় বিক্রি করে। ও বাসন-কোসন পরিষ্কার করত, ফাই-ফরমাশ খাটত, আর অবসর সময়ে লালদিঘির একটা বড় তেঁতুল গাছের তলায় লুকিয়ে লুকিয়ে সিগারেট খেত। শেষে হারমনিক ট্যাভার্ন উঠে গেলে বাসন-কোসন আসবাবপত্রের সঙ্গে ও বিক্রি হয়ে যায়। মার্টিন সাহেব কিনে নেয় ওকে বিশ টাকায়।

এবারে থেমে কেরী শুধায়, কেমন, বিস্ময়কর নয়?

বিস্ময়কর, কিন্তু এমন অভিনব কিছু নয়, এমন আকছার ঘটছে! দুঃখের কথা বলব কি ডাঃ কেরী, চুরি-করা ছেলেয় কলকাতার সাহেব-সুবোদের চাকর-বাকরের মহল আর চুরি-করা মেয়ের কলকাতার গণিকাপাড়া ভর্তি হয়ে গেল!

রাম বসু চুপ করে থাকে, হয়তো সাধারণভাবে কলকাতার বেশ্যাপল্লীর কথা মনে পড়ে, হয়তো বা বিশেষভাবে টুশকির কথা মনে পড়ে।

তার পরে আবার বলে—এই যে মেয়েটা এসে পড়ল, শেষ পর্যন্ত তারই বা গতি কোন্ মহলে হবে কে বলতে পারে!

কে, রেশমী? কেরী বলে, ওকে এদিক-ওদিক যেতে দেব না। ওর সঙ্গে কাল আমার কথা হয়ে গিয়েছে। ও বলে কিছুতেই ওর সমাজে ফিরবে না।

তা আমি জানি, ফিরে গেলে ওর মৃত্যু অবধারিত।

কেরী বলে, ওর নিজ নামে কিছু বিষয় আছে, ওর মৃত্যু না হওয়া অবধি উত্তরাধিকারিগণ নিশ্চিন্ত হতে পারছে না।

কেরী বলে চলে—রেশমী বলছিল যে, আমার কাছে থাকলে ওকে জোর করে ছিনিয়ে নিয়ে যেতে কেউ সাহস করবে না। মুন্সী, আমি স্থির করেছি, ওকে ইংরেজী শেখাব,

আর কখনও স্বেচ্ছায় যদি সত্যধর্ম গ্রহণ করতে ইচ্ছা প্রকাশ করে তবে ওকে খ্রীষ্টীয়মণ্ডলী-ভুক্ত করে নেব।

প্রস্তাবটা বসুর ভাল লাগে না। মুখে বলে—মন্দ কি!

মিসেস কেরী মেয়েটিকে খুব পছন্দ করেছেন—ওর সঙ্গে গল্পগাছা করেন আর তাতে অনেকটা প্রকৃতিস্থ থাকেন। কিন্তু সবচেয়ে জমেছে ন্যাড়ার সঙ্গে ভাব, দুজন দুজনকে পেলে আর ছাড়তে চায় না, সমবয়স্ক কিনা।

রাম বসু বলে, তা আমি লক্ষ্য করেছি। দুটিতে বজরার ছাদে বসে সারাদিন গল্প করছে। বেশ দেখায়, যেন দুই ভাইবোন।

এমন সময়ে হঠাৎ মাঝিদের কোলাহল শুনে রাম বসু জিজ্ঞাসা করল—কি মাঝি, ব্যাপার কি?

মাঝিদের একজন বলল, ঐ ছিপ নৌকাখানার গতিক ভাল নয়।

রাম বসু তাকিয়ে দেখল, দূরে একখানা ছিপ।

কি মনে হয়?

বোম্বেটেদের নৌকা বলে মনে লাগে।

বোম্বেটেদের নৌকা!

সকলে একসঙ্গে চকিত হয়ে ওঠে।

কি সর্বনাশ!

পাল তুলে দাও, পাল তুলে দাও!

ওরে ওঠ্ ওঠ্, সকলে মিলে হাত লাগা।

রাম বসু বলে উঠল, সমুখে রাত্রি, পিছনে বোম্বেটে, আজ বড় বিপদ।

৬
তিনু চক্রবর্তীর দৌত্য

অনেকগুলো পালে বাতাসের ঠেলায় দুখানা বজরা জল কেটে ছুটছে। কিন্তু বজরা গুরুভার, ছিপ হালকা, দুয়ের ব্যবধান ক্রমেই কমে আসছে।

বজরার ছাদে বন্দুক হস্তে কেরী, পাশে ন্যাড়া ও রাম বসু।

ন্যাড়া বলল, জ্ঞান হওয়ার আগে একবার বোম্বেটে দেখেছিলাম, এবারে সজ্ঞানে দেখব। তার অনন্ত কৌতূহল ও জিজ্ঞাসা।

রাম বসু শুধাল, তোর ভয় করছে না?

ভয় করবে কেন? তা ছাড়া আমিও তো বোম্বেটে!

সে আবার কেমন?

মার্তুনি সাহেব আমার স্বভাব দেখে আমার নাম দিয়েছিল বোম্বেটে।

সে বোম্বেটে নয় রে, এরা আসল বোম্বেটে।

এবারে ছিপ ও বজরার ব্যবধান খুব কমে এসেছে, কথা বললে শোনা যায়। ছিপের আরোহীদের ভয় দেখাবার উদ্দেশ্যে কেরী বন্দুকের আওয়াজ করল।

ছিপ থেকে একজন হেঁকে বলল, সাহেব, মেলা গুলি-টুলি ক'র না, আমরা তোমাদের বন্ধু।

কেরী হেঁকে বলল, আমরা বোম্বেটিয়াদের বন্ধু হতে চাই না।

তবে না হয় আমরাই চাইলাম। কিন্তু আমরা বোম্বেটে-ফোম্বেটে নই।

এমন সময়ে রেশমী মুখ বার করে শুধাল, কে. তিনু দাদা নাকি?

হ্যাঁ রে ছুঁড়ি, হ্যাঁ।

তার পরে বলল, তোর ঐ সাহেব বাবাকে বন্দুক ছুঁড়তে নিষেধ কর। ছেলেবেলায় একবার বাজের আওয়াজে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলাম। সেই থেকে বন্দুকের আওয়াজে বড ভয়। তা ছাড়া বন্দুকের গুলি এমনি বদখেয়ালী যে শরীরটা এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় করে ছাড়ে।

রাম বসু হেসে উঠল, যা বলেছ দাদা, বন্দুকের গুলি আর গিন্নির বচন দুই‌ই মর্মভেদী।

কেরী বুঝল, লোকটা আর যে-ই হক শত্রু নয়, এবং খুব সম্ভব বোম্বেটেও নয়।

ওরে রেশমী, আমার পরিচয়টা এদের দে!

রেশমী রাম বসুকে তিনু চক্রবর্তীর পরিচয় দিল—আর রাম বসু কেরীকে সব বুঝিয়ে দিল।

পরিচয় ও শিষ্ট সম্ভাষণের পালা সাঙ্গ হলে তিনু চক্রবর্তী অতর্কিত আগমনের উদ্দেশ্য বর্ণনা করল।

তিনু বলল, বসুজা, মেয়েটা আগুনের মুখ থেকে বেঁচে গেল বটে কিন্তু পড়েছে এখন বাঘের মুখে। আগুন এক জায়গায় বসে পোড়ায়, বাঘ তাড়া করে শিকার ধরে।

পরে সূত্রটার ভাষ্য করে বলে--ঐ যে চণ্ডী বক্সী—যার একটুখানি পরিচয় পেয়েছ সেদিন, বিস্তারিত পরিচয় দিতে গেলে রাত ভোর হয়ে যাবে, এখন থাক, বরঞ্চ এক সময়ে রয়ে বসে রেশমীর কাছে শুনে নিও।

তার পরে নিজ মনে বলে, ঐটুকু মেয়ে, ও আর কি জানে!

পুনরায় শ্রোতাদের উদ্দেশে বলে চলে, সেই চণ্ডী বক্সী পণ করেছে, যেমন করেই হক ওকে খুঁজে বার করবে।

বসুজা শুধায, বেশ, খুঁজে বের না হয় করল, তার পরে?

তারপরে সমাজরক্ষার নামে মেয়েটাকে পুড়িয়ে মারবে।

ভয়ে রেশমীর গায়ে কাঁটা দেয়।

কিন্তু সমাজরক্ষার নামে ওর এত মাথাব্যথা কেন?

তা জান না বুঝি? রেশমীর নিজের নামে কিছু বিষয় আছে, সেটা ওর স্ত্রীধন। কাজেই রেশমী জীবিত থাকা অবধি নিশ্চিন্তে কেমন করে ভোগ করবে চণ্ডী?

বসুজা বলে ওঠে, তাই বল।

তবু শুধায়--কিন্তু চণ্ডী কি ওর উত্তরাধিকারী?

তিনু চক্রবর্তী বলে, এ অঞ্চলে যাবতীয় বেওয়ারিশ সম্পত্তির উত্তরাধিকারী চণ্ডী।

সকলে হেসে ওঠে।

রাম বসু বলে, এমন দু-একটি লোক বাংলা দেশের প্রায় সমস্ত গ্রামেই আছে।

তার পরে তিনু পুনরায় শুরু করে—বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা, সহজে ছাড়বার পাত্র

নয় চণ্ডী। ভাবলাম যেখানে পাই দিদিকে শুভ সংবাদটা জানিয়ে আসি। তাই জেলেদের কাছ থেকে ছিপখানা চেয়ে নিয়ে ছুটতে ছুটতে এলাম।

রেশমী শুষ্ক কণ্ঠে শুধায়, আমি এখন কি করব তিনু দাদা?

কি করবি নে তাই আগে শোন্। গাঁয়ে কখনও ফিরবি নে।

কোথায় থাকব?

এখন যেখানে আছিস, সাহেবের কাছে, সাহেবকে ভাল লোক বলেই মনে হয়।

কাঁদ-কাঁদ ভাবে বলে রেশমী, খিরিস্তানের কাছে থাকলে যে খিরিস্তান হয়ে যাব।

কেন যাবি রে পাগলী! এই যে বসু মশায় আছেন, তিনি কি খিরিস্তান হয়ে গিয়েছেন?

পুরুষমানুষের কথা আলাদা, বলে রেশমী।

সে প্রসঙ্গে না গিয়ে তিনু বলে—চণ্ডী বক্সীর মত হিঁদু হওয়ার চেয়ে খিরিস্তান হওয়াটা কোন্ খারাপ?

রাম বসু দেখে আশ্চর্য সংস্কারমুক্ত লোকটার মন, বিস্মিতভাবে বলে—তোমার মুখে এমন কথা!

তিনু বলে, আমার মুখেই তো শুনবে, লোকে যে আমাকে নাস্তিক বলে।

তার পরে একটু থেমে পুনরায় বলে, আমি কিন্তু নাস্তিক নই, দেবতা মানি, মানি নে চণ্ডীমণ্ডপের দলকে।

প্রসঙ্গ পাল্‌টে রাম বসু শুধায়, চণ্ডী খুড়ো এখন কি করবে ভাবছ?

ওরা ঠিক করেছে যাবে জাত-কাছারির কর্তা নবকৃষ্ণ বাহাদুরের কাছে, সাহেব-সুবো তার হাতের মুঠোয়। তার পর খুব সম্ভব নবকৃষ্ণ বাহাদুরের ফরমান নিয়ে খুঁজতে বের হবে দিকে দিকে।

কথাটা রাম বসুকে গম্ভীর করে তোলে। তার ভাব লক্ষ্য করে তিনু বলে, বসু মশায়, রেশমীকে কখনও যদি কলকাতায় নিয়ে যাও, খুব সাবধানে রাখবে, চণ্ডী বক্সীর হাজার চোখ।

রেশমী বলে, তিনু দাদা, তোমার তো তিন কুলে কেউ নেই, চল আমাদের সঙ্গে।

তিনু হেসে বলে, না রে পাগলী, তা হয় না, আমাকে ফিরে যেতে হবে গাঁয়ে।

কেন?

আমি থাকলে চণ্ডী খুড়োর দল তবু একটু ঠাণ্ডা থাকে—এই বলে রেশমীর পলায়নের পরবর্তী যাবতীয় ঘটনার বর্ণনা করে।

ব্যাখ্যান শেষ হলে বলল, আজ রাতটা বসু মশায়ের আশ্রয়ে থাকব, তার পরে কাল ভোরবেলা আবার রওনা হবে জোড়ামউ।

তিনু চক্রবর্তী ফিরে যাবে শুনে রেশমী কাঁদতে শুরু করল, বলল, তিনু দাদা, যাবে যদি তবে এলে কেন?

তিনু হেসে বলল, তার মানে না এলেই খুশি হতিস, কি বল্?

রেশমী কোন উত্তর করল না, কাঁদতেই লাগল।

আরও খানিকটা রাত হলে রেশমী উঠে গেল, তিনু চক্রবর্তীকে নিয়ে রাম বসু আহারের জন্য গাত্রোত্থান করল।

রেশমীর আর কিছুতে ঘুম আসে না। ঢেউ-এর ছলছল কলকল শব্দ স্নিগ্ধ মাতৃ-

করতলের মত তার নিদ্রাহারা চিন্তা স্পর্শ করে যায়, ঢেউ-এর দোলায় অনুভব করে সে মাতৃক্রোড়ের আন্দোলন। কখন সে ঘুমিয়ে পড়ল, ঘুমিয়ে পড়ে স্বপ্ন দেখল ; দেখল, নদীতে নৌকো ডুবছে, ডুবছে অসহায় দম্পতি। গেল গেল, সব তলিয়ে গেল ! একটি পদ্মপাতার উপরে দুটি শিশির-কণার মত ঝলমলিয়ে ওঠে দুটি ছোট শিশু-মুখ। এমন সময় কে দেয় তাকে নদীতে ছুঁড়ে, সে পড়ে গিয়ে পদ্মপাতার উপরে। টলমল করে ওঠে পাতা। হঠাৎ শুনতে পায়, কি রেশমী দিদি, চিনতে পার ?

কে রে, ন্যাড়া নাকি ? তাই বল্, আমি ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম।

তোমার একটুতেই ভয়।

ওটা কে রে ?

চিনবে চিনবে, সময়ে চিনবে।

ডুবল কারা রে ?

নিজের বাপ-মাকে চিনতে পার না ?

রেশমী কাঁদতে শুরু করে। ঘুম ভেঙে গিয়ে দেখে বালিস ভিজে গেছে, চোখের কোণ তখনও সজল।

আশ্চর্য স্বপ্ন ! তবে কি সত্যি সে সেই সেদিনকার অতি শৈশবের নৌকাডুবির ইতিবৃত্ত স্বপ্নে দেখল ? ভাই-বোন বেঁচে গিয়েছিল, জনশ্রুতি। তাদেরই কি তবে শিশুমুখ ? তবে একটা মুখ ন্যাড়ার কেন ? আরেকটা তবে কার ? দূর ! স্বপ্ন কি কখনও সত্যি হয় ! হায়, কেন সত্যি হয় না ? ভাবতে ভাবতে আবার সে ঘুমিয়ে পড়ে।

৭
জাত-কাছারির কর্তা

শোভাবাজারে মহারাজা নবকৃষ্ণ বাহাদুরের প্রাসাদে দরবার-কক্ষ ; দরবার ভাঙে-ভাঙে ; অধিকাংশ লোক চলে গিয়েছে, মহারাজা এখনও ওঠেন নি, নিতান্ত অন্তরঙ্গ দু-চারজন পার্ষদের সঙ্গে বিশ্রম্ভালাপে নিযুক্ত আছেন। মহারাজ একাকী উচ্চাসনে উপবিষ্ট, পাশে একটি মখমলের তাকিয়া, কিন্তু সেটি এমন তকতকে নতুন, মনে হয় না যে কখনও রাজ-অঙ্গের স্পর্শ পাওয়ার সৌভাগ্য তার হয়েছে। বস্তুত এই প্রবীণ বয়সেও মহারাজা ঋজুভাবে আসীন, ঠেসান দিয়ে বসা তাঁর অভ্যাস নয়। তাঁর পরনে মলমলের ধুতি, স্কন্ধে মলমলের উত্তরীয়, মুণ্ডিত মস্তকের মধ্যভাগে শিখাসমন্বিত কেশগুচ্ছ ; ললাটে তিলক, গলায় তুলসীর মালা। পায়ের কাছে মাটিতে হাতীর দাঁতের কাজ-করা খড়ম। একদিকে স্বতন্ত্র দুখানি আসনে দুজন প্রবীণ ব্যক্তি ; তাঁদেরও বেশভুষা অনুরূপ, তবে সেগুলি মূল্যবান নয়। একজন প্রসিদ্ধ মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন, মহারাজার সভাপণ্ডিত ; অন্যজন প্রসিদ্ধ কবিগান-রচয়িতা হরেকৃষ্ণ দীর্ঘাঙ্গী বা হরু ঠাকুর, মহারাজার আশ্রিত ও অনুগৃহীত গুণী ব্যক্তি। এই তিনজনের মধ্যে মৃদুস্বরে আলোচনা চলছে, এতক্ষণ দরবারে যে প্রসঙ্গ উঠেছিল তারই জের।

এমন সময় চণ্ডী দু-তিনজন সঙ্গী নিয়ে ঢুকল, মহারাজার পায়ের কাছে রুমালে

করে দুটি আকবরী মোহর নজরানা-স্বরূপ রাখল আর তার পরে সকলে মিলে সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ করল।

চণ্ডী উঠে দাঁড়ালে তাকে ভাল করে দেখে নিয়ে নবকৃষ্ণ বাহাদুর জিজ্ঞাসা করলেন, কে, চণ্ডী বক্সী নাকি? আজকাল চোখে ভাল দেখতে পাই নে!

চণ্ডী বক্সী মহারাজার পরিচিত।

মহারাজার মত লোক চণ্ডীর মত লোককে দেখে চিনতে পেরেছেন, এমন অপ্রত্যাশিত সৌভাগ্যে বিগলিত বিচলিত পুলকিত চণ্ডী সব কয়টি দন্ত বিকশিত করে, বলল, মহারাজের অনুগ্রহে দাসানুদাস চণ্ডীই বটে।

মহারাজার অনুগ্রহের অভাব ঘটলেই চণ্ডীরও যেন রূপান্তর ঘটবে।

তার পর সঙ্গীদের দিকে তাকিয়ে বলল, কেমন, বলেছিলাম না যে আসল বড়লোক ছোটলোককে কখনও ভোলেন না?

চণ্ডী যে অর্থেই কথাগুলো বলুক না কেন, ক্লাইভ-হেস্টিংসের মত ধুরন্ধরদের মাথায় হাত বুলিয়ে যিনি বৈষয়িক সৌভাগ্যের শীর্ষে উঠেছেন, তাঁর পক্ষে কথাগুলো অন্য অর্থে সত্য। ছোটলোক চিনে তাদের ক্ষমতার সদ্ব্যবহার না করতে পারলে হেস্টিংসের মুন্সী মহারাজা নবকৃষ্ণ হতে পারতেন কি?

মহারাজা বললেন, তার পর, কেমন আছ?

গোপীনাথজীর, গোবিন্দজীর কৃপাতে ভালই আছি।

গোপীনাথজী ও গোবিন্দজী মহারাজার কুলদেবতা।

তার পরেই ভ্রমসংশোধন করে নিয়ে চণ্ডী বলল, আর ভাল আছি তাই-বা বলি কেমন করে?

কেন, কি হল আবার?

সে সব অনেক দুঃখের কথা, বলব বলেই মহারাজের চরণাশ্রয়ে এসেছি।

আগে বস, তার পরে সব শুনব।

মহারাজার আদেশে সপার্ষদ চণ্ডী আসন গ্রহণ করল।

কি হয়েছে বল তো? তোমাকে যেন বিচলিত বোধ হচ্ছে!

চণ্ডী জানে যে, হিন্দু ধর্মপ্রাণ জাতি, অর্থাৎ ধর্মটাকে ভাল করে খেলাতে পারলে এই নির্বোধ জাতের কাছ থেকে কাজ আদায় করা সহজ।

তাই সে আরম্ভ করল, মহারাজের আশ্রয়ে ও দৃষ্টান্তে আমরা কেবল ধর্মটুকু অবলম্বন করে কোনরকমে বেঁচে আছি। আর আছেই বা কি আর থাকবেই বা কি।

এই পর্যন্ত বলে একবার আড়চোখে শ্রোতাদের মুখের চেহারা দেখে নিয়ে বুঝল মন্দ নয়, আশাপ্রদ। তার পরে একটি দীর্ঘনিশ্বাস প্রক্ষেপ করল। ঝড়ের সঙ্গে বৃষ্টির মত দীর্ঘনিশ্বাসের সঙ্গে দেখা দিল বিন্দু বিন্দু চোখের জল। একবার কপালে হাত ঠেকিয়ে বলল, এবারে সেই আশ্রয়টুকুও বুঝি যায়। এখন শেষ আশ্রয় থাকল মহারাজের চরণ, তাই সেখানে এসেছি।

সঙ্গীগণ চণ্ডীর বাগ্মিতায় ও অভিনয়-ক্ষমতায় মুগ্ধ হয়ে গেল। কিন্তু নূতন করে তার প্রয়োজন ছিল না, কারণ চণ্ডী শখের যাত্রাদলে শকুনির ভূমিকা গ্রহণ করে!

মহারাজ সংক্ষেপে বললেন, তা বটে।

অর্থাৎ এ এমন একটা বিষয় যে ঐ দুটি শব্দই যথেষ্ট, বেশি বলবার প্রয়োজন হয় না।

এবারে জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন মুখ খুললেন, বললেন, বাপু হে, আমাদের শাস্ত্রে বলেছে, 'ধর্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াম্'—ধর্মের তত্ত্ব গুহাতে নিহিত। কিন্তু তোমার মনটি দেখছি সেই গুহার চেয়েও গোপন। আসল ব্যাপারটা কি বল তো ? শুধু ধর্মের খাতিরে কেউ বিশ ক্রোশ মাটি ছুটে আসে এই প্রথম দেখলাম।

চণ্ডী বক্সী পাকা খেলোয়াড়, টলে তো পড়ে না, বলল, পণ্ডিত মশায়ের কাছে কিছু লুকোবার উপায় নেই। হাঁ, এবার আসল ব্যাপারটা বলি।

তার পরে সময়োচিত পরিবর্তন পরিবর্ধন ও পরিবর্জন করে রেশমী-সংক্রান্ত ঘটনা সে নিবেদন করল। রূপান্তরের ফলে বিষয়টা দাঁড়াল এই রকম—

চণ্ডী বলে, সতীলক্ষ্মী নারী যখন স্বেচ্ছায় আর্যনারীর আদর্শ অনুসরণ করে পতির চিতায় অনুমৃতা হতে উদ্যত হয়েছে সেই সময়ে এক বেটা ম্লেচ্ছ সাহেব (এখানে তার মুখমণ্ডলে আর্য-পুরুষোচিত ঘৃণার ভাব প্রকট হল) একদল লেঠেল নিয়ে এসে ছিনিয়ে নিয়ে গেল মেয়েটাকে।

মহারাজ শুধালেন, কেন, তোমাদের গাঁয়ে কি লাঠি ধরবার লোক ছিল না ?

লাঠি ধরে কি হবে মহারাজ, সাহেবের হাতে যে বন্দুক ছিল।

থাকলই বা। বললেন তর্কপঞ্চানন, ধর্মের জন্য কত আর্যপুরুষ প্রাণ দিয়েছে, তোমরাও দু-চারজন না হয় প্রাণ দিতে।

চণ্ডী বলে, নিশ্চয় নিশ্চয়। কিন্তু বেটা ম্লেচ্ছ প্রাণ নেওয়ার জন্যে অপেক্ষা করল কই। মেয়েটাকে-নিয়েই নৌকোয় চড়ে সরে পড়ল।

তর্কপঞ্চানন বলেন, মেয়েটা যদি ইচ্ছা করে গিয়ে থাকে, তবে—

বাক্য শেষ করতে না দিয়ে চণ্ডী, বলে, সে রকম মেয়ে নয় জোড়ামউ গাঁয়ের। মেয়েটার সে কি আছাড়ি-পিছাড়ি কান্না ! ছেড়ে দাও সাহেব ছেড়ে দাও, ঐ যে আমি পতির আহ্বান শুনতে পাচ্ছি—আমর ইহকাল পরকাল নষ্ট ক'র না সাহেব, দোহাই তোমার !

এতক্ষণ হরু ঠাকুর চুপ করে শুনছিল, এবার সে বলল, তোমাদের গাঁয়ে মেয়ে-মদ্দ সব কি যাত্রাদলে ভর্তি হয়েছে নাকি ?

কেন ?

কেন কি ! পুড়ে মরতে এমন আগ্রহ যাত্রার আসর ছাড়া তো শুনি নি !

এবারে মহারাজা বললেন, তা আমি কি করব ?

মহারাজ জাত-কাছারির কর্তা, ধর্মের রক্ষক, হিন্দুধর্মের ধ্বজা, আপনি এখন না রক্ষা করলে যে হিন্দুধর্ম রসাতলে যায়।

এখানে জাত-কাছারি কথাটার একটু ব্যাখ্যা আবশ্যক। ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির প্রথম আমলে কলকাতায় জাত-কাছারি নামে এক বিচিত্র প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি হয়েছিল। কোম্পানির ধুরন্ধর রাজপুরুষগণ বুঝেছিল যে, জাতের গুমর হচ্ছে হিন্দুর মর্মস্থান। জাত মারলে হিন্দু জীবন্ত অবস্থায় মরে। জাত মারার ভয় ভাত মারার বাড়া এদের কাছে। এই সংস্কারটার উপরে মোচড় দিয়ে অনায়াসে হাঁ-কে না করে নেওয়া যায় হিন্দু সমাজে। তাই জাত-রক্ষার ছলে জাতটাকে হাত করে নেওয়ার উদ্দেশ্যে খাড়া করা হল জাত-কাছারি। আর সেকালে ধনে মানে প্রতিষ্ঠায় কলকাতার হিন্দু সমাজের যিনি শিরোমণি সেই নবকৃষ্ণ বাহাদুরকে করে দেওয়া হল জাত-কাছারির জজ বা কর্তা। এই বিচিত্র উপায়ে

পরোক্ষ মুষ্টিতে কোম্পানি হিন্দু সমাজকে আয়ত্ত করে নিল। হাতের জোরের চেয়ে সাঁড়াশির কামড় সব ক্ষেত্রেই প্রবলতর। কিন্তু আমরা যখনকার কথা বলছি তখন জাত-কাছারির শাসন আলগা হয়ে এসেছে।

চণ্ডীর কথা শুনে মহারাজা বললেন, দেখ বাপু, জাত-কাছারির এলাকা কলকাতার হিন্দু সমাজ। তার বাইরে আমার দণ্ড অচল। তার উপর আবার এর মধ্যে দেখছি এক সাহেব আছে।

চণ্ডী এত সহজে নিবৃত্ত হওয়ার জন্যে এতদূর আসে নি। সে বলল, মহারাজ, কোন্ সাহেবটা আপনাকে ভয় না করে শুনি ? বাঘে গরুতে এক ঘাটে জল খায় আপনার নামে !

এবারে নবকৃষ্ণ বাহাদুর ম্লান হেসে বললেন, সে দিন আর নেই বক্সী। এখনকার নতুন লাট-বেলাটেরা আর আগের মত মানীজনের মান রাখতে জানে না। হত ক্লাইভ কি ওয়ারেন হেস্টিংসের সময়, তোমার মামলা সুরাহা করে দিতাম। তাছাড়া, দেখ, আমি প্রাচীন হয়ে পড়েছি, আগের সে উদ্যম আর নেই।

চণ্ডী বলল, আজ্ঞে, নামে করে কাজ, বয়সে কি আসে যায় !

তাছাড়া, আসামী ধরা পডত বডলাটকে না হয় একবার বলে দেখতাম।

তর্কপঞ্চানন বললেন, কোন্ সাহেব, গেল কোন্‌দিকে তার ঠিক নেই, এহেন অবস্থায় মহারাজ কি করবেন ?

আজ্ঞে, ভাগীরথী বেয়ে উত্তরদিকে গিয়েছে।

আরে বাপু, ভাগীরথী তো একটুখানি নদী নয়, আর উত্তরদিকটাও নাকি প্রকাণ্ড, আসামী ধরা পড়বে কি করে ?

একটা হুকুম পেলেই আসামী খুঁজে বার করি। আর কিছু নয়, শুধু মহারাজের মুখের একটা হুকুম !

বেশ, হুকুম পেলেই যদি আসামী খুঁজে বার করতে পার, না হয় তা-ই দিলাম। কিন্তু দেখো, খুব সাবধান, সাহেবের গায়ে হাত তুলো না।

চণ্ডী শিউরে ওঠে, বলে, সাহেবের গায়ে হাত তুলব, আমি কি বাচ্চা-কাচ্চা নিয়ে ঘর করি নে ! আমি কেবল মহারাজের হুকুম দর্শিয়ে মেয়েটার চুলের ঝুঁটি ধরে টেনে নিয়ে হাজির করে দেব শ্রীচরণের তলায়।

না না, আমার কাছে আনতে হবে না, তোমরা যা হয় ক'র, মানে শাস্ত্রে যা বলে তাই ক'র।

তখন চণ্ডী উঠে দাঁড়িয়ে বুকের উপর হাত দিয়ে বলল, মহারাজার হুকুমে দেহে দশটা হাতীর বল পেলাম, দেখি এবারে ম্লেচ্ছটা কেমন করে সতী নারীকে লুকিয়ে রাখে !

তার পরে সে সঙ্গীদের দিকে তাকিয়ে বলে, দেখলে তো, একটা মুখের কথার কি শক্তি !

আচ্ছা পণ্ডিত মশায়, সতীকে চিতায় আরোহণ করাবার আগে ম্লেচ্ছদোষ দূর করবার জন্যে তো একটা অঙ্গ-প্রায়শ্চিত্ত করিয়ে নেওয়া আবশ্যক—কি বলেন ?

তর্কপঞ্চানন উত্তর দেবার আগে উত্তর দিল হরু ঠাকুর, হাঁ, যেমন বেগুনটা পোড়াবার আগে এক দফা তেল মাখিয়ে নিতে হয়।

ব্যঙ্গে কর্ণপাত না করে চণ্ডী আর-এক প্রস্থ মহারাজার জয়গান করে সাষ্টাঙ্গে

প্রণিপাত অন্তে সদলবলে বিদায় গ্রহণ করল।

তর্কপঞ্চানন ও হরু ঠাকুরকে বিদায় দিয়ে মহারাজা অন্দরমহলে প্রবেশ করলেন।

৮
অপূর্ব নীলকর

দু মাস হল সদলবলে কেরী মদনাবাটিতে এসে উপস্থিত হয়েছে।

মালদা জেলার উত্তরদিকে টাঙন নদীর তীরে ছোট্ট গ্রাম মদনাবাটি। গাঁয়ের বর্তমান অবস্থা ভাল নয়, কিন্তু ইতস্তত ভগ্ন অট্টালিকার স্তূপ, পাথরের টুকরা, মজা দিঘি প্রমাণ করে যে, চিরকাল এমন ছিল না; কোন প্রাচীনকালে সমৃদ্ধি ছিল, হয়তো বা প্রতাপও ছিল গ্রামটির। সেই বিস্মৃত অতীতের প্রেতচ্ছায়ায় পঁচিশ-ত্রিশ ঘর অধিবাসী কায়ক্লেশে দিন যাপন করে। অধিংকাশই নিম্নবর্ণের লোক আর কিছু সাঁওতাল।

গাঁয়ের পশ্চিমদিকে নদীর ধারে জর্জ উডনীর নীলকুঠি। আম কাঁঠাল বট অশ্বত্থের ছায়ায় ঘেরা কুঠিবাড়ি উডনীর তৈরি নয়, পুরাতন ইমারত, খুব সম্ভব প্রাচীন সমৃদ্ধির শেষ জীবন্ত সাক্ষী। নীলের ব্যবসা করার উদ্দেশ্যে উডনী কুঠিবাড়িটা কিনে নিয়েছিল কয়েক বছর আগে। ব্যবসা অবশ্য চলছে, কিন্তু মন্দা তালে, নিজে না দেখলে কোন্ ব্যবসা চলে! কেরী ভার নিয়েছে, উডনীর বিশ্বাস ব্যবসা এবার তেজের সঙ্গে চলবে। দুই নৌকায় পা রেখে চলা দুষ্কর, তবু হয়তো চলে নৌকা যদি এক শ্রেণীর হয়। ধর্মপ্রচার ও নীলের ব্যবসার মত ভিন্ন শ্রেণীর নৌকা অল্পই আছে।

দশ-বারো মাইল দূরে দিনাজপুর জেলা-ভুক্ত মহীপাল দিঘি গ্রাম। সেখানে উডনীর আর একটি নীলকুঠির ভার নিয়ে বসেছে টমাস। সে মাঝে মাঝে টাট্টু ঘোড়ায় চড়ে মদনাবাটিতে এসে উপস্থিত হয়--দু-চার দিন কাটিয়ে যায়।

কুঠির নায়েব, গোমস্তা, কারকুন, পাইক প্রভৃতি নূতন কাজ পেয়েছে। এখন আর তাদের দাদন দেওয়া, নীলের চাষ তদারক, প্রজা-শাসন—এসব কিছুই করতে হয় না। তার বদলে এখন তারা কেরীর বাংলা বিদ্যালয়ের জন্য ছাত্র সংগ্রহ করে বেড়ায়। কেরীর হুকুম, যে বাড়ির ছেলে পড়তে আসবে সে বাড়ির ছ মাসের খাজনা মাপ, দুটি ছেলে পড়তে এলে বরাদ্দ নীলের বদলে টাকা দিলেই চলবে; তবু ছাত্র জুটতে চায় না। লোকে ভাবে, এর চেয়ে নায়েবের জরিমানা, পাইকের লাঠি অনেক ভাল। এ কি নূতন উৎপাত!

ছাত্র জুটতে চায় না সত্য, তবু দু টাকা করে জলপানি দেবার লোভ দেখিয়ে আট-দশটি ছাত্র যোগাড় করেছে কেরী। তারা সকালবেলা এসে তিন-চার ঘণ্টা পড়ে যায়—শিক্ষক রাম বসু, পার্বতী ব্রাহ্মণ। আরও একটি শিক্ষক পাওয়া গিয়েছে, গোলকচরণ শর্মা, সে এই অঞ্চলেরই লোক।

কেরীর বাংলা বিদ্যালয়ের সেরা ছাত্র রেশমী। যেমন তার মনোযোগ, তেমনি বুদ্ধি, তেমনি উৎসাহ। কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও ন্যাড়াকে ঢোকাতে পারা যায় নি বিদ্যালয়ে।

ন্যাড়া বলে, রেশমী দিদি, আমি আবার কি শিখব? কোন্ বিদ্যাটা আমার অজানা বল! জুতো-সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ সব জানি।

রেশমী বলে, পড় দেখি চণ্ডী।

অমনি বুঝি চণ্ডী পড়া যায়! পূজোর যোগাড় কর, দক্ষিণা দাও।

বাঃ, আগেই বুঝি দক্ষিণা দেয়?

আচ্ছা না হয় পরেই দিও, পূজোর যোগাড় তো আগে করতে হয়।

রেশমী হেসে বলে, না রে, লেখাপড়া শেখ্। কায়েৎ দাদার মত পণ্ডিত হলে লোকে কত খাতির করবে, অনেক মাইনে পাবি।

রেশমী দিদি, যে বিদ্যা শিখেছি তারই বাবদ কে মাইনে দেয়! তাতে আবার—

কোথায় আবার লেখাপড়া শিখলি তুই? কেবল বাজে বকিস!

বাজে বকি? কেন, মার্তুনি সাহেবের বাড়িতে যা শিখেছি—বলি নি তোমাকে?

সে তো কেবল ইংরেজ গালাগালি!

আর, বাংলা? বলব কি দিদি, আমরা বাঙালীরাও জানি নে সে-সব গালাগালি!

না না, অমন দুষ্টুমি করিস নে। দুজনে একসঙ্গে পড়লে বেশ মজা হবে। চল্।

তার চেয়ে চল তালডাঙায় বেড়িয়ে আসি, মাঠে নতুন জল পড়েছে, স্রোতে কত মাছ চলেছে, ধরি গে চল। দেখবে পড়ার চেয়ে তাতে আরও কত বেশি মজা।

ন্যাড়ারই জয় হয়, দুজনে নদী পেরিয়ে মাঠের দিকে চলে যায়।

জানার টানের চেয়ে প্রাণের টান প্রবল হলে ইস্কুল না পালিয়ে উপায় নেই। ইস্কুলে যারা পিছনের সারির ছাত্র, জীবনে তারাই প্রথম সারির লোক, কারণ বিদ্যালয় বস্তুটা জীবনের দিকে পিছন ফিরিয়ে প্রতিষ্ঠিত।

টমাস মাঝে মাঝে এসে দু-চার দিন থেকে যায়। কি কারণে জানি না, ন্যাড়াকে সে সুনজরে দেখে নি। টমাস বলে, ঐ ন্যাড়া ছোঁড়াটাই রেশমীকে মাটি করল!

রাম বসু মনে মনে বলে, এখন তোমার সুনজর রেশমীর উপর না পড়লেই বাঁচি, তোমার চরিত্র আমার তো জানতে বাকি নেই।

কেরী বলে, না না, ওরা দুটিতে বেশ আছে। রেশমীর একটা সঙ্গী তো চাই। তাছাড়া রেশমী বিবির খুব মেধা, আমার কাছে তো ইংরেজি পাঠ নিতে শুরু করেছে।

কখনও কখনও উডনীর চিঠি নিয়ে লোক এসে উপস্থিত হয়। তাতে থাকে নীলের চাষ সম্বন্ধে সময়োপযোগী উপদেশ, থাকে প্রজাশাসনের পরামর্শ ; সেই সঙ্গে অবশ্য আনুষঙ্গিক ভাবে খ্রীষ্টধর্ম-প্রচার ও শিক্ষা-প্রসার সম্বন্ধেও উৎসাহ থাকে। নীলের চাষ সম্বন্ধে কেরীর অভিজ্ঞতার ও আগ্রহের অভাব থাকায় চিঠির মর্ম সে উল্‌টে বোঝে ; তার ধারণা, খ্রীষ্টধর্ম-প্রচার ও শিক্ষা-প্রসারের উদ্দেশ্যেই এখানে সে প্রেরিত, নীলের চাষটা নিতান্তই আনুষঙ্গিক। তবু কর্তব্যবুদ্ধির প্রেরণায় এক-আধবার নায়েব গোমস্তাকে তাগিদ দেয়। কিন্তু সে না জানে চাষের মর্ম না বোঝে হিসাব-কিতাব, সুযোগ পেয়ে নায়েব গোমস্তার দল দুহাতে চুরি করতে লাগল। কেরী কোনদিন খাতাপত্র তলব করলে ওরা জন-দুই নূতন শিক্ষার্থী এনে হাজির করে। মুহূর্তে খাতাপত্রের প্রসঙ্গ ভুলে কেরী বলে ওঠে—অসীম কৃপা! প্রভুর খাতাপত্র যায় কৃপা-সমুদ্রে তলিয়ে, ছাত্র দুটিও দিন দুই বিদ্যালয়ে দেখা দিয়ে যায় তলিয়ে! এই রকমই ব্যবস্থা তাদের পিতামাতার সঙ্গে নায়েবের।

একদিন কেরী নায়েবকে বলল, হরিশপুরের চাষ দেখতে যাব আজ।

তখনই গোমস্তা এসে বললে, হুজুর, তালপুকুরের একটা গেরস্ত খিরিস্তান হবার ইচ্ছা জানিয়েছে।

খ্রীষ্টান হবার ! কেরীর মুখ আশায় উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। তখন সে ঘোড়ার মুখ ফিরিয়ে তালপুকুরের উদ্দেশে রওনা হল। তালপুকুর হরিশপুকুরের ঠিক বিপরীত দিকে অবস্থিত আর দূরত্ব প্রায় চৌদ্দ-পনেরো ক্রোশ ; যাতায়াতে দুদিনের ধাক্কা।

হরিশপুরের চাষীরা নায়েবের কৃপায় নীলের বদলে ধানের চাষ শুরু করেছে। এই ভাবে বাস্তবক্ষেত্রে নায়েবের কৃপার সঙ্গে প্রভুর কৃপার প্রতিযোগিতা চলে। প্রভুর কৃপা এঁটে উঠতে পারে না।

৯
না-বনের না-বাগানের

এক একদিন রাত্রে ঘুম ভেঙে গিয়ে রেশমী বিছানার উপরে উঠে বসে। অসহ্য দুঃখে সমস্ত মনটা টনটন করে। বীণায় তার চড়াতে চড়াতে এমন এক অবস্থায় পৌঁছেছে, সামান্যতম নিশ্বাসে, এমন কি যে নিশ্বাস কেবল মনের মধ্যে দুলে উঠেছে এখনও বাইরে প্রকাশ পায় নি, সেই গুপ্ত নিশ্বাসেও যেন ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে। রেশমী ভাবে, দুঃখের এ কি সর্বনাশা মূর্তি ! দুঃখের বন্যা প্রবল হয়ে উঠলে কূলের বাধা মানে না, তখন তীরে নীরে এক হয়ে যায়। মানসিক দুঃখ যে শরীরকে বিকল করে দেয়, তা কে জানত ? দুঃখের সঙ্গে রেশমীর নূতন পরিচয়। অবশ্য শৈশবে মস্ত একটা মর্মান্তিক ঘটনা ঘটেছিল তার জীবনে। হঠাৎ শুনতে পেল বাবা-মা-ভাই-বোন আর ফিরবে না। তখন ব্যাপারটিকে যথাযথ ভাবে গ্রহণ করবার বয়স তার হয় নি। পরে সব বুঝেছে। কিন্তু সেসব হয়ে-বয়ে চুকে গিয়েছে, শৈশবের অতি দূর দিগন্তে একটুখানি অশ্রু-বাষ্প এখন তার একমাত্র চিহ্ন। ঐটুকু ছেড়ে দিলে তার জীবন সুখেই কেটেছে বলতে হবে, দিদিমার স্নিগ্ধ হৃদয়ের সমস্ত ভালবাসা পড়েছিল তাব উপরে। কিন্তু তখন কে জানত যে, এমন এক নিদারুণ বজ্র নির্মিত হচ্ছে তার জন্যে। সে কি অশনি ! যেমন অতর্কিত তেমন নির্মম ! শেষ কদিনের কথা সে ভাল করে ভাবতে পারে না, ভাবতে চায় না। কিন্তু দুঃখের এ কি বিচিত্র প্রকৃতি, ঘুরেফিরে তাকে দেখা দিয়ে যায়। আর না যাবেই বা কেন ? ঐ একটি অভিজ্ঞতা ছাড়া আর কোন্ অভিজ্ঞতা আছে তার জীবনে।

কতক্ষণ সে বসে আছে ঠাহর করতে পারে না। খুব সম্ভব দু-চার মুহূর্ত মাত্র। কিন্তু না, যখন উঠে বসেছিল, ঘুলঘুলি দিয়ে চেয়ে দেখেছিল আকাশটা অন্ধকার, এখন উজ্জ্বল, চোখে পড়ল আকাশের প্রান্তে একটুখানি চাঁদের ফালি। কৌতূহলী চন্দ্রকলা উঁকি মারছে তার মনের মধ্যে।

তার হঠাৎ মনে হল ঘরের বাইরে কার যেন পায়ের শব্দ। চমকে উঠে রেড়ির তেলের আলোয় দেখে নিল দরজার খিল বন্ধ আছে।

প্রথম যখন এখানে এসেছিল, অনেকদিন পর্যন্ত রাতে তার ঘুম হত না, দিনে সে কুঠিবাড়ির হাতা ছেড়ে বাইরে যেত না। দিনে রাতে তার চণ্ডী বক্সীর গুপ্তচরের ভয়। তিনুদাদার কথা মনে পড়ে—'চণ্ডী সহজে ছাড়বে না, খুব সাবধানে থাকিস দিদি।' কিন্তু ছ মাসের মধ্যে চণ্ডী বক্সীর লোকজনের সাক্ষাৎ না পাওয়ায় সে অনেকটা নিশ্চিন্ত হয়েছিল,

ভেবেছিল চণ্ডী তার সন্ধান হারিয়ে ফেলেছে। কিন্তু জীবনে একমাত্র চণ্ডীই তো ভয়াবহ নয়, আরও ভয় আছে, অন্য ধরনের ভয়। রেশমী বুঝেছে, বয়সের ভয় বলতে একটা বিশেষ দুর্বিপাক বোঝায়। মনে পড়ে তার টমাস সাহেবকে। তার মতিগতি দৃষ্টি সে মোটেই পছন্দ করে না।

টমাস একদিন তাকে বললে, রেশমী বিবি, তোমাকে আমি বাইবেলের গল্প শোনাব।

কেরী পরিহাস করে ডাকে রেশমী বিবি। রেশমীর ভাল লাগে—ঠাকুর্দা-নাতনীর সম্পর্কে এমন পরিহাস চলে। কিন্তু টমাসের মুখে 'বিবি' শব্দটা তাকে ভাবিয়ে তোলে, মনে হয়, ওর মধ্যে লালসার তাত আছে।

টমাস বেছে বেছে বাইবেলের প্রাচীন খণ্ড থেকে এমন সব গল্প বলে, যাতে আছে কামনার দাগ। তার কানের ডগা লাল হয়ে ওঠে। এসবের কোন-কোনটা শুনেছে সে কেরীর মুখে। কিন্তু কি আশ্চর্য, মুখান্তরে এমন রসান্তর ঘটে কিভাবে?

রেশমী বলে, এবারে আমি উঠি।

না না বিবি, আর একটু ব'স। যাবে তুমি একদিন মহীপাল দিঘিতে? মস্ত বড় দিঘি আছে, খুব সাঁতার কাটবে।

রেশমী ইতিমধ্যেই বুঝেছে যে কেরীকে টমাসের বড় ভয়।

সে বলে, জিজ্ঞাসা করে দেখি কেরী সাহেবকে!

আরে না না, কেরীকে এসব কথা ব'ল না। আচ্ছা, এখন যাও।

রেশমী মুক্তি পায়। রেশমী বোঝে জীবনের পর্বে পর্বে দুর্ভাগ্য নূতন নূতন মূর্তিতে দেখা দেয়।

সত্যি কথা বলতে কি, একলা ঘরে শুতে তার ভয় করে, কোনদিন অভ্যাস ছিল না। কিন্তু এখানে কে শোবে তার ঘরে? ছিরুর মা জ্যাভেজকে নিয়ে শোয় কুঠিবাড়ির একটি কামরায়। কুঠির উত্তর-দক্ষিণে এক সার করে কতকগুলো ছোট ছোট কামরা আছে। উত্তরদিকের একটা ঘরে শোয় রেশমী—অদূরে আর একটা ঘরে ন্যাড়া। ন্যাড়া বলে, রেশমী দিদি, ভয়ে পেলে ডাক দিও—চণ্ডীর ঘাড়ে চামুণ্ডার মত লাফিয়ে পড়ব। দক্ষিণদিকের ঘরগুলোয় শোয় রাম বসু, পার্বতী ব্রাহ্মণ প্রভৃতি। কে শোবে রেশমীর সঙ্গে, সে একাই শোয়। মনে মনে বলে, ক্ষতি কি? সারা জীবন তো একাই থাকতে হবে—অভ্যাস হয়ে যাক।

হঠাৎ একদিন রাত্রে বাজনাবাদ্যির আওয়াজে রেশমীর ঘুম ভেঙে গেল, চমকে ধড়মড়িয়ে জেগে উঠল; ভাবল, এত শোরগোল কিসের, ডাকাত পড়ল নাকি? জানালার কাছে গিয়ে উঁকি মেরে দেখে হেসে উঠল, বিয়ের শোভাযাত্রাকে ডাকাতের দল ভেবেছিল সে। কিন্তু তখন আবার মনে হল এ-ও একরকম ডাকাতি বইকি! কোন্ ঘরের মেয়েকে ছিনিয়ে নিয়ে কোথায় চলল? নিজের কথা মনে পড়ল। কিন্তু ভাবনা বাধা পায়—আলো, কোলাহল, সানাইয়ের তরুণ আলাপ রাত্রির অন্ধকারকে উদ্‌ভ্রান্ত করে দিয়ে চলেছে। তার চোখে পড়ে পালকির খোলা দরজার ফাঁকে বরের করুণ মূর্তি। কি সুন্দর! এক মুহূর্তে আনন্দের শিখরে উঠে তখনই আবার গড়িয়ে পড়ে বিষাদের খাদে তার মনটি। সুখ আর দুঃখ পাশাপাশি প্রতিবেশী, কি আশ্চর্য! আর ঐ বন্ধ পালকিখানায় নিশ্চয় কনে। সে-ও কি এমনি সুন্দর হবে? না না, সুন্দর মেয়ে এত সুলভ নয়। আর হলেই বা কি, রূপ দিয়ে কি দুর্ভাগ্যকে ঠেকানো যায়? তাহলে তার অমন

অবস্থা হবে কেন? রেশমী জানে যে সে অপূর্ব সুন্দরী। কেমন করে জানল? যে-ভাবে সমস্ত নারী জানে সেইভাবে জেনেছে, পুরুষের চোখের দর্পণে আপনাকে প্রতিফলিত দেখে জেনেছে।

আর একটা হঠাৎ-ঘুমভাঙা রাত্রির কথা তার মনে পড়ল। রাত্রিটাই বিশেষ করে তার নিজস্ব। শুনেছিল সেদিন, শ্মশান-যাত্রীর উচ্চ হরিবোল ধ্বনি। একাকী জেগে জেগে সে ভাবতে লাগল, ঐ হরিবোল ধ্বনি যেন জীবনের প্রান্তে আঁচড় কেটে সীমান্তরেখা টেনে দিচ্ছে। কিন্তু এই প্রকাণ্ড অনন্ত মানবজীবনের মধ্যে তার স্থান কোথায়? সে না-সংসারের না-পরলোকের। পরলোকের গ্রাস থেকে পালিয়েছে সে, সংসারের পাশ থেকে ছিঁড়ে এসেছে সে, হোমানল চিতানল কারও সঙ্গে নেই তার সম্বন্ধ। মনে হল সে বড় অদ্ভুত! এমনটি আর আছে কি? একবারেই কি নেই? হ্যাঁ, আর একটি মাত্র আছে। সেটি একটি কুসুম গাছ। মাঠের মধ্যে উদাসীন নিঃসঙ্গ নিরর্থক দাঁড়িয়ে আছে। তাদের দুজনের একই দশা, তারা দুজনেই না-বনের না-বাগানের।

১০
দুই সখীতে

লোকের সঙ্গে মেশবার ক্ষমতা একটি মস্ত সামাজিক গুণ, এই গুণটি রেশমীর প্রচুর পরিমাণে ছিল। গাঁয়ে থাকতে কোমরে কাপড় জড়িয়ে পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে বেড়াত সে, সব খবর সকলের আগে আসত তার কানে। দিদিমা মোক্ষদা বুড়ী বলত, ও বাতাসে খবর পায়। কার ছেলের বিয়ে, কার নাতনীর বিয়ে, বাড়ির লোকে জানবার আগে জানত ও। লোকে ঠাট্টা করে বলত—ঘটকী ঠাকরুন।

কোমরে-কাপড়-জড়ানো, মুখে-হাসি, সর্বত্র অবাধ-গতিশীল রেশমী ছিল গাঁয়ের আনন্দলহরী। তার পর অকস্মাৎ এল দুঃখের রাত্রি। সংসারের যাবতীয় দুর্দৈব হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ল তার ঘাড়ে। রেশমীর সঙ্গে গাঁয়ের হাসিটুকু গেল এক ফুঁয়ে নিভে। সুখী মানুষ শিশু, চিরসুখী মানুষ চিরশিশু। দুঃখে মানুষের বয়স ভিতরে ভিতরে বাড়িয়ে তোলে। দুঃখের ধাক্কায় এক ধমকে রেশমীর বয়সটা গিয়েছে বেড়ে। তবু পুরনো অভ্যাসটা যায় নি।

মদনাবাটির কুঠিতে পৌঁছে দু-চার দিন পরেই ন্যাড়াকে সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিল গাঁয়ের মধ্যে। বাঁশবনের মধ্যে সৌদামিনী বুড়ীর ঘর। সেখানে গিয়ে উপস্থিত হল।

বুড়ী শুধাল, তোমরা কাদের ছেলেমেয়ে গো?

রেশমী বলল, কায়েৎদের গো।

দেখে ভাইবোন বলে মনে হচ্ছে!

রেশমী বলে, ঠিক ধরেছ দিদিমা।

তা বেশ, ব'স ব'স।

তার পরে শুধাল, এখানে কোত্থেকে গা?

ঐ কুঠিবাড়িতে এসেছি।

তা বয়স এত হয়েছে, বিয়ে হয় নি কেন ?

আমাদের কুলীনদের ঘরে এমন হয়।

হয়ই তো, হয়ই তো। আমার বর জুটতে বয়স দুকুড়ি পেরিয়ে গিয়েছিল, আমরাও কুলীন কিনা।

সৌদামিনী বিধবা।

রেশমী বলে, সে কি কথা দিদিমা, তোমার বয়স এখনই তো দুকুড়ি হয় নি।

প্রতিবাদ করে না বুড়ী। তৎপরিবর্তে দন্তলেশহীন মুখগহ্বরে হাসি ফুটিয়ে বলে, এসেছ চাড্ডি চালভাজা খেয়ে যাও। চাড্ডি চালভাজা খেয়ে যাও।

চালভাজা খেতে খেতে ন্যাড়া শুধায়, চালভাজা খাও কি করে দিদিমা, তোমার দাঁত তো দেখছি না !

মাড়ি দিয়ে খাই দাদা, মাড়ি দিয়ে খাই (প্রত্যেক কথার দ্বিত্বভাষণ বুড়ীর এক মুদ্রাদোষ)। মাড়ির জোর কি দাঁতের আছে ? দাঁত পড়লে তবে চালভাজা খেয়ে সুখ।

সেই অতিদূর অনাগত দিনের জন্য অপেক্ষা করবার ইচ্ছা দেখা গেল না ন্যাড়ার ব্যবহারে, কায়মনোবাক্যে চালভাজায় আত্মনিয়োগ করল সে।

আর একদিন গেল ছুতোরদের পাড়ায়। আজ সঙ্গে ছিল না ন্যাড়া, মাছ ধরবার মত একটা পুকুরের সন্ধান পেয়েছে সে। ছুতোরের মেয়েরা চিঁড়ে কুটছিল। যে মেয়েটি ঢেঁকিতে পাড় দিচ্ছিল সে একটু নামবামাত্র বিনা ভূমিকায় রেশমী ঢেঁকিতে পাড় দিতে শুরু করল।

প্রথমে কেউ লক্ষ্য করে নি। তার পরে তার দিকে চোখ পড়তেই সবাই জিজ্ঞাসা করল, তুমি কোথায় থাক গা ?

রেশমী গম্ভীরভাবে বলল, বাঁশবনে।

ওরা শুধাল, ডোমপাড়ায় ?

ডোমপাডায় কেন হতে যাবে ? বাঁশবনে, আমি বাঁশবনের পেত্নী।

অপ্রত্যাশিত উত্তরে সকলে স্তব্ধ হয়ে গেল, অনেকেরই তার প্রেতযোনিত্বের দাবিতে বিশ্বাস হল। সকলে মুখ চাওয়া-চাওয়ি ও কানাকানি শুরু করল।

তখন একটি বর্ষীয়সী গিন্নীবান্নি গোছের মেয়ে শুধাল, তা এখানে কেন মা ?

আর-জন্মে আমার বাপের বাড়ির অবস্থা ভাল ছিল না, চিঁড়ে কুটে, খই মুড়ি ভেজে আমাদের চলত। তার পরে বিয়ে হল বড়লোকের ঘরে। চিঁড়ে কোটা গেল বন্ধ হয়ে। চিঁড়ে কুটতে না পেরে হাঁপিয়ে উঠলাম। একদিন ছুতোরদের পাড়ায় চিঁড়ে কোটা হচ্ছিল, লুকিয়ে গিয়ে চিঁড়ে কুটে এলাম। কথাটা জানাজানি হয়ে গেলে শাশুড়ী বাপের বাড়ির খোঁটা দিয়ে গালাগালি করল। সেই দুঃখে গলায় দড়ি দিয়ে মরলাম।

তার গতজন্মের বিবরণে ইহজন্মবাসিনীরা ভয়ে বিস্ময়ে বসে পড়ল, কারও মুখে কথা নেই।

তখন সেই বর্ষীয়সী মেয়েটি বলল, তা এখানে কেন মা ?

ওই যে বললাম, চিঁড়ে কোটার শখ, বিশেষ করে ছুতোরদের চিঁড়ে কোটা।

পেত্নী মাঝে মাঝে ভাজা মাছ দাবি করে উপদ্রব করে এই সংবাদটাই সকলের জানা ছিল, চিঁড়ে-কোটা পেত্নীর বিবরণ কেউ শোনে নি,—তার উপরে আবার পেত্নীটা অত্যন্ত বেয়াড়া রকমের নাছোড়বান্দা।

নিরুপায় দেখে সেই বর্ষীয়সী মেয়েটি গলায় কাপড় দিয়ে গড় হয়ে প্রণাম করল, মিনতি জানাল, মা, তুমি দেবী কি মানবী যেই হও, দয়া করে এখন স্বস্থানে যাও।

রেশমী দেখল তামাশায় আশাতীত ফল ফলেছে, সে রোখের সঙ্গে বলে উঠল, তার প্রত্যেকটি শব্দের উপরে সানুনাসিক ঝোঁক দিল (কথাটা এতক্ষণ তার মনে পড়ে নি)—না, কঁখ্‌খনও যাঁব না, তোঁদের আঁড়াই মণ চিঁড়ে কুঁটে দিয়ে তঁবে যাঁব। শাঁশুড়ীর গাঁলাগাঁলের জ্বাঁলায় এঁখনও গাঁ জ্বঁলছে।

প্রণতা মহিলা বলল, মা, আমরা বড় গরিব।

আঁরে সেঁই জন্যেই তঁ এসেছি। রাঁজারা কি চিঁড়ে কোঁটে, তাঁরা তঁ চিঁড়ে খাঁয়, ক্ষীঁর দিয়ে, সঁন্দেশ দিয়ে, কঁলা দিয়ে মেঁখে।

পেত্নী বড়ই নাছোড়বান্দা।

দলের মুখপাত্ররূপে সেই মেয়েটি বলল, দয়া করে তুমি অন্তর্ধান কর মা, চিঁড়ে ক্ষীর সন্দেশ কলা দিয়ে তোমার ভোগ দেব।

কোথায় দিবি? কখন দিবি?

বলা বাহুল্য, শব্দের অনুনাসিক প্রয়োগ চলল, কিন্তু অভ্যাস না থাকায় মাঝে মাঝে ভুল হয়ে যায়, আবার সংশোধন করে নেয় রেশমী। পেত্নী না হয়ে পেত্নীর অভিনয় করা যে সহজ ব্যাপার নয় এই ঘটনাতে তা সকলেই বুঝতে পারবেন।

যেখানে বল, আসছে শনিবারে অমাবস্যা পড়ছে—সেইদিন।

পেত্নী বলে, না, মানুষের কথা বিশ্বাস করি নে। তারা মানৎ করে দেয় না।

রেশমীর এ বিশ্বাসের বিশেষ কারণ আছে, বিপদে পড়ে অনেকবার মানৎ করেছে, বিপদ কেটে গেলে দেয় নি।

আজই দিতে হবে, এখনই, এখানে।

সকলের পুনরায় বিস্মিত নির্বাক ভাব।

একজন বলল, বড়গিন্নী, দাও না এনে।

বড়গিন্নী, মানে সেই মুখপাত্র, বলল, আমার ঘরে আর সবই তো আছে, কেবল কলাটা নেই।

পেত্নী ক্ষোভে বলে উঠল—(অনুনাসিক উচ্চারণে) তা হবে না, কলা আমার ভাল লাগে। পাকা কলা না পেলে ছেড়ে যাব না।

একজন বলল, ছিদামদের গাছে বোধ করি আছে।

পেত্নী—(সানুনাসিক) তবে যাও না, নিয়ে এস না, হাঁ করে দাঁড়িয়ে কি দেখছ? পেত্নী কি কখনও দেখ নি?

সত্য কথা বলতে কি, ইতিপূর্বে তারা কেউ পেত্নী দেখে নি—আর পেত্নীর যে এত রূপ হয় তা-ও কেউ শোনে নি।

দু-তিনজন অগ্রণী হয়ে পেত্নীর ভোগের উপকরণ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে প্রস্থান করল, একটা আস্ত পেত্নীকে সশরীরে ক্ষীর সন্দেশ ও কদলী সহযোগে টিপিটিক ভক্ষণ করতে দেখবার দুর্দমনীয় কৌতূহল তাদের পেত্নীভীতিকে অভিভূত করে ফেলেছিল।

একটা ক্ষুধিত কুপিত পেত্নীর সঙ্গে এই অবকাশে ঠিক কিরূপ ব্যবহার করা উচিত জানা না থাকায় সকলে নির্বাক হয়ে রইল।

এমন সময় ছুটে প্রবেশ করল গোলগাল কালো-কোলো রঙের চুল-ছোট-করে-

ছাঁটা একটি মেয়ে, বলল, তোমরা সবাই অমন হাঁ করে বসে আছ কেন? কি হয়েছে?

একজন বলে উঠল, ফুলকি, চুপ কর, দেখছিস নে পেত্নীর আবির্ভাব হয়েছে!

ফুলকি রেশমীকে লক্ষ্য করে নি, এবারে দেখে চীৎকার করে উঠবে, রেশমী চোখের ইশারায় তাকে নিষেধ করল।

অন্য একজন বলল, এদিকে সরে আয়, উনি চিঁড়ে-দুধের ভোগ চান, নইলে সর্বনাশ করবেন!

ফুলকির সঙ্গে এই কদিনেই রেশমীর ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল, এরা তা জানত না। কিন্তু ফুলকি বিলক্ষণ জানত রেশমীর স্বভাব, বুঝল একটা কিছু চলছে। তাই সে বলল, ভোগ চান তো দাও।

আনতে গিয়েছে।

এমন সময়ে চিঁড়ে ক্ষীর, সন্দেশ ও কলা নিয়ে একটি মেয়ে প্রবেশ করল। তখন সমস্যা হল—কে এগিয়ে দেবে?

ফুলকি বলল, সেজন্যে ভাবনা কি? আমি দিচ্ছি গিয়ে।

তোর হাতে কি উনি খাবেন?

কেন খাবেন না! পেত্নীতে জাতবিচার করে না।

তবে এগিয়ে নিয়ে যা, গিয়ে মর।

কিন্তু ভয়ের কিছুমাত্র লক্ষণ দেখা গেল না ফুলকির আচরণে। সে ভোগের উপকরণ পেত্নীর কাছে নিয়ে যাওয়া মাত্র পেত্নী দিব্য মানুষটির মত এসে বসল। আর সবাই হতচকিত হয়ে রুদ্ধনিশ্বাসে দেখল যে, শুধু পেত্নী নয়, পেত্নী ও ফুলকি দুজনে যথাশাস্ত্র সেগুলি মেখে-চুখে নিয়ে খেতে আরম্ভ করেছে।

ক্রমে আসল রহস্য প্রকাশ হয়ে পড়ল। সব শুনে মেয়েদের কেউ কেউ হেসে উঠল, অনেকেই রাগ করে চলে গেল। কেবল সেই বর্ষীয়সী মেয়েটি বলল, ওঁদের বিষয়ে এমন করে ঠাট্টা-তামাশা করা ভাল নয়, মেয়েটা মরবে!

কুঠিতে আসবার পরদিনেই ফুলকির সঙ্গে রেশমীর দেখা হয় আর অল্পক্ষণের আলাপের পরেই দুজনের খুব ভাব জমে যায়।

রেশমী শুধাল, তুমি ভাই কোথায় থাক?

ফুলকি বলল, আলেডালে।

সে আবার কি?

আজ এখানে কাল ওখানে।

রেশমী বুঝল, মেয়েটি একটু অন্য ধরনের, শুধাল, কাল রাতে কোথায় ছিলে তাই না হয় বল?

কাল রাতে ছিলাম কালীবাড়ির পোড়ো মন্দিরটায়।

ভয় করল না?

আমার ভয় করবে কেন? ভয় করল ওদের।

কাদের?

মা কালীর ডাকিনী-যোগিনীদের।

সে আবার কি রকম?

তারা আমার চেহারা দেখে মা কালী ভেবেছিল তাই কাছে ঘেঁষে নি।

এবারে রেশমী ঠাট্টা করে বলল, আর শিবঠাকুরটি ?

জানতে পারলে অবশ্য তিনি পোড়ো মন্দিরেই দেখা দিতেন।

দেবতারা তো ভাই অন্তর্যামী।

তা আর জানি নে! বলে উঠল ফুলকি।

বেশ তো, কাল না হয় কাটালে কালীবাড়িতে, আজকে কোথায় থাকবে ?

ভাবছি ভোলা বাগদির ঘরেই থাকব।

বিস্মিত রেশমী শুধায়, সে আবার কে ?

এই গাঁয়েই থাকে লোকটা। কিছুদিন আগে তার বউ মরেছে—আমার পিছু-পিছু আজ কদিন ঘুরছে। দেখ না, এই শাড়িখানা তারই দেওয়া।

এই স্পষ্ট ইঙ্গিতে রেশমী নিতান্ত বিব্রত বোধ করল, নিজের অজ্ঞাতসারে বসল একটু সরে, এতক্ষণ ঘেঁষাঘেঁষি বসেছিল।

ব্যাপারটা লক্ষ্য করে ফুলকি বলল, এতেই সরে বসলে ?

অপ্রস্তুত রেশমী বলল, না না।

না ভাই, তোমার আর দোষ কি! সরে বসাই তো চাই। কিন্তু সব কথা শুনলে বোধ করি দশ রশি দূর থেকে আমাকে গড় করবে।

মেয়েটির কথায় রেশমীর কৌতূহল বাড়ছিল, অস্ফুট স্বরে বলল, কি শুনি না ?

ফুলকি শুরু করল, পুরুষ বড় লোভী, ঠিক যেন বাড়ির লোভী ছেলেটা। সন্দেশের থালা দেখলেই ছুঁক ছুঁক করে আশেপাশে ঘুরে বেড়াবে। এখন সারাদিন কি ভাই সন্দেশ পাহারা দিয়ে থাকা যায়, তাই একটু-আধটু ভেঙে তাদের হাতে দিতে হয়, খুশি হয়ে চলে যায়, নিশ্বাস ফেলবার সময় পাওয়া যায়। সন্দেশ যতই দামী হক, দিনরাত্রি পাহারা বসিয়ে রাখবার মত দামী নিশ্চয়ই নয়।

রেশমী বলল, তা কতজনকে সন্দেশ ভেঙে দিলে ?

এবারে কথায় মিশল একটু ঝাঁজ।

হেসে উঠে ফুলকি বলল, তুমি রাগ করেছ দেখছি।

তার পরে গুন গুন সুরে গান ধরল—

'তা গুনতে গেলে গুণের নাহি শেষ।'

রেশমী তার নির্লজ্জতায় রেগে উঠে বলল, এ তো গেরস্ত মেয়ের মত কাজ নয়।

নয়ই তো। যার ঘর নেই দুয়োর নেই, সে আবার গেরস্ত কি!

তোমার কি বাপ-মা নেই ?

ছিল নিশ্চয়ই, নইলে হলাম কেমন করে ?

তবে ?

তবে আবার কি ?

এই বলে আবার সে গান ধরে—

'আমরা যে ভাই মায়ের ছেলে
বাপ চিনি নে কোনকালে।'

তার পরে ব্যাখ্যা করে শোনায়, আমরা তরাই অঞ্চলের লোক। মা সাঁওতাল, বাপ শুনেছি কোন্ জমিদার কি তার নায়েব কি অমনি একটা কেউ। দেখি নি কোনকালে।

ওলাউঠায় মা মরে যাওয়ার পরে ঘুরতে ঘুরতে এদেশে চলে এসেছি, ভাল না লাগলে আবার ভেসে অন্যত্র চলে যাব। ঐ দেখ—এই বলে আকাশে একখানা কালো মেঘ দেখায়—ঐ কালো মেঘখানা কেমন জল দিতে দিতে এক দেশ থেকে আর এক দেশে চলে যাচ্ছে!

কিছুদিন গেল রেশমীর এই মেয়েটির সম্বন্ধে মনস্থির করতে। একদিকে তার সামাজিক মন বলে, এ অন্যায় এ অন্যায়, এ ঘৃণার্হ এ ঘৃণার্হ ; অন্যদিকে তার আদিম মন বলে, এমন কি হয়েছে, এমন কি হয়েছে! একদিকে আকর্ষণ, অন্যদিকে বিকর্ষণ ; এ সেই সোনার আপেল দর্শনে আদি রমণী ইভের দ্বন্দ্ব আর কি! ইভের ক্ষেত্রে যেমন রেশমীর ক্ষেত্রেও তেমনি, শেষ পর্যন্ত সোনার আপেলেরই হল জয়। দুজনের সম্পর্ক অচ্ছেদ্য হয়ে উঠল, দুই সখী।

শুধু তাই নয়, গাঁয়ের লোকের সঙ্গেও সম্বন্ধ পাতিয়ে ফেলল রেশমী, কেউ মাসি, কেউ পিসি, কেউ দিদিমা, কেউ মামীমা ইত্যাকার।

এইভাবে বেশ চলছিল, এমন সময়ে কেমন করে রটে গেল রেশমীর জীবনের প্রকৃত বৃত্তান্ত, সে বিধবা এবং চিতাপলায়িতা। অমনি এই অলক্ষুণে মেয়েটার প্রতি মাসি পিসি দিদিমা মামীমার দল সর্বৈব বিমুখ হল। ফুলকির চরিত্র জানা সত্ত্বেও ফুলকিকে তারা ক্ষমা করেছে, কিন্তু এ যে আর এক কথা! হয়তো তাদের দৃষ্টিই যথার্থ, প্রবৃত্তির নিয়ম যে ভঙ্গ করেছে অদৃষ্ট তাকে শাসন করবে, কিন্তু সমাজবিধি-ভঙ্গের শাসক সমাজ।

গাঁয়ের লোকের দ্বারা প্রত্যাখ্যাত রেশমীর আরও কাছে এসে দাঁড়াল ফুলকি, বলল, বেশ করেছ ভাই, খামকা মরতে যাবে কেন? বেঁচে থাকবার কত সুখ!

পদ্মদিঘির উঁচ পাড়ের উপরে দাঁড়িয়ে দুজনে কথা বলছিল, দিঘির কালো জলরাশি দেখিয়ে ফুলকি বলল, চল নেমে খানিকটা সাঁতার কাটি, দেখবে কত আরাম!

তার পরে একটু থেমে বলল, চিতায় পুড়ে মরতে যাব—মরণ আর কি!

রেশমীকে দ্বিধাগ্রস্ত দেখে শাড়িখানা খুলে রেখে উঁচু পাড় থেকে সবেগে দিঘির বুকে ঝাঁপ দিয়ে পড়ল ফুলকি, মুহূর্ত-মধ্যে জল উথাল-পাথাল হয়ে উঠল।

রেশমী দেখল, মন্থিত কালো জলের মধ্যে কালোদেহ স্নানরসরসিকা কালীয় নাগিনী।

১১
ছায়াসঙ্গিনী

একা একা, নিঃসঙ্গ, সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ। ভবিষ্যতের দিকে যত দূর চায় কোথাও এতটুকু সঙ্গ নেই, আশ্রয় নেই, ছায়াতরুর স্নেহ নেই, গ্রামের আভাস মাত্র নেই। নিঃসঙ্গতা এমন সম্পূর্ণ যে, মন ভীত হয়ে ওঠে, অবশেষে ভীতির চরমে এসে ভয়টাও মিলিয়ে যায়--ঐ ক্ষীণ বনান্তের পাড়খানি যেন কখন অজ্ঞাতসারে দিগন্তে মিলিয়ে গিয়েছে।

রেশমী একাকী বসে বসে ভাবে আর দেখে। কখন যে তার ভাবনা দেখায় পরিণত হয়, আর দেখা যে কখন ভাবনায় রূপান্তরিত হয় টের পায় না।

টাঙন নদীর পশ্চিমে রাঙা মাটির রিক্ত ডাঙা জমির নিস্তব্ধ ওঠা-পড়া একখানি নীরব বেহাগ রাগিণীর মত দিগন্তে গিয়ে সমে মিশেছে। ঐ জনপ্রাণী-তরুগুল্মহীন নিঃশব্দে

ওঠা-পড়ার মধ্যে রেশমী নিজ জীবনের ছবি যেন দেখতে পায়—তার নির্জন ভবিষ্যৎ যেন রূপ ধরে সম্মুখে উপস্থিত।

বিকালের দিকে সময় পেলে—সময়ের তার অভাব কি—একাকী চলে আসে এখানে। স্বচ্ছ জলে ভরা ছোট একটা বাঁধ সে আবিষ্কার করেছে, তার একদিকে সেই নিঃসঙ্গ কুসুমতবুটি। এখানে এসে বসে রেশমী ; ঠিক জলের ধারে একখানি পাথর, বসে সেই পাথরে, পা দুখানি ঈষৎ জলে ডুবিয়ে। কাকচক্ষু জলে ছায়া পড়ে, ছোট ছোট পাথরের টুকরো জলে ফেলে ফেলে ছায়াকে চঞ্চল করে তুলে সে আপনার সঙ্গে আপনি খেলা করে। মানুষ যখন আপনার ছায়ার সঙ্গ কামনা করে, বুঝতে হবে তখন তার অবস্থা কৃপার যোগ্য। আগে অনেকটা সময় তার কাটত গাঁয়ের মধ্যে। কিন্তু তার জীবনবৃত্তান্ত জানায় গ্রাম দ্বার বন্ধ করেছে। এক সঙ্গী ছিল ঐ রহস্যময়ী ফুলকি বলে মেয়েটা। আজ কদিন থেকে সে-ও নিরুদ্দেশ। ভোলা বাগদির বাড়িতে তার রাত্রিযাপন নিয়ে ভোলাদের দুই ভাই-এ মাথা-ফাটাফাটি হয়ে যায়। ভোলা দিয়েছিল তাকে শাড়ি, ভেবেছিল তার ঘরে রাত কাটাবে ফুলকি, কিন্তু ইতিমধ্যে তার কনিষ্ঠ হারু তাকে নাকছবি কবুল করে ঘরে নিয়ে যায়। ভোরে হারুর ঘর থেকে ফুলকিকে বেরুতে দেখে দুই ভাই-এ লাঠালাঠি শুরু হয়ে যায়—ফলে দুজনেরই মাথা ফাটে। ফুলকি গিয়েছিল থামাতে, রক্তে তার কাপড় গেল রাঙা হয়ে। এসব কথা ফুলকির মুখেই শোনা। দিব্য অনায়াসে সব বৃত্তান্ত সে বলে গেল—বেহায়া মেয়েটার এতটুকু লজ্জা, এতটুকু আব্রু নেই। রেশমী জিজ্ঞাসা করেছিল, এমন করলে কেন ভাই ?

ফুলকি বলে, আমার কাছে যে ভোলা সে হারু, তফাত কি বল!

কিন্তু ওরা যে মাথা-ফাটাফাটি করল ?

ও ওদের অভ্যাস। মাসের মধ্যে একবার করে ওদের মাথা ফাটে, এবারে না হয় আমাকে নিয়েই ফাটল!

তোমার লজ্জা করে না ?

লজ্জারও তো একটা সীমা আছে। যে কথা সবাই জানে, তাকে আর লজ্জার বলি কেন ?

না ভাই, এ ভাল নয়।

প্রসঙ্গান্তর করে ফুলকি বলল, তুমি ভাই একটু সাবধানে থেকো।

ভীত রেশমী শুধাল, কেন ?

গাঁয়ের দু-চারজন রসিকের চোখ পড়েছে তোমার উপরে।

সে কি ভাই, আমি তো ও-রকম মেয়ে নই।

আরে সেইজন্যই তো পড়েছে চোখ।

কিছু বুঝতে পারে না রেশমী, শুধায়, সে আবার কেমন ?

ফুলকি বলে—যতদিন ওরা জানত যে তুমি কুমারী, তোমার দিকে চোখ দেয় নি। কিন্তু পরে যখন জানতে পারল যে, তোমার এ-কুলও গেছে, ও-কুলও নেই, তোমার দিকে ঝুঁকল। পুরুষগুলোর ভাই ওই স্বভাব, বেওয়ারিশ মেয়ে পেলে লোভের অন্ত থাকে না। একটু সাবধানে থেকো—তোমার আমার মত মেয়েদের দিকেই ওদের দৃষ্টি।

'তোমার আমার' কথাটা রেশমীর ভাল লাগল না ; যতই কেন না বন্ধুত্ব থাক ফুলকির সঙ্গে, তবু তার সঙ্গে একত্র উল্লেখে তার আপত্তি ছিল।

এই ঘটনার পরে ফুলকির সঙ্গে আর তার দেখা হয় নি ; গাঁয়ের মধ্যে গিয়ে সন্ধান করতে সাহস হয় না, ফুলকিও আসে না।

রেশমী ভাবে, ফুলকি তবে কি অন্যত্র চলে গেল ? তার কথাগুলো মনে পড়ে—মেঘের মত হাওয়ার টানে এসেছে, আবার একদিন হাওয়ার টানে ভেসে যাবে। তবে কি হাওয়ার টানেই ভেসে গেল ! রেশমী বুঝতে পারে না হাওয়ার টানটা কি ? ফুলকির প্রতি তার মনোভাব বড় বিচিত্র—একই সঙ্গে ঘৃণা আর ভালবাসা। দুরন্ত কৌতূহল ঘৃণা আর ভালবাসাকে যুক্ত করে রেখেছে তার মনে।

বাঁধের ওপারে নজর পড়তেই চোখে পড়ল কুসুমতরুটা—সরল উন্নত গাছটি আগাগোড়া রক্তিম হয়ে উঠেছে। তা মনে পড়ল কদিন এদিকে আসে নি। এর আগে যেদিন এসেছিল, দেখেছিল উপরের পাতাগুলোয় লালের আভাস—আজ আর কোথাও এতটুকু সবুজের ছোঁয়া নেই। সমস্ত মাঠের মধ্যে ঐ একটিমাত্র গাছ—ঘন রক্তিম। তার মনে হল ঐ একটি রন্ধ্রপথে মাঠের সমস্ত লাল রঙ ঊর্ধ্বে উৎসারিত। ঐ নিঃসঙ্গ দলছাড়া খাপছাড়া তরুটির সঙ্গে কেমন এক আত্মীয়তা অনুভব করে রেশমী ; মনে মনে ভাবে, আমাদের দুজনের এক দশা, আমরা না-বাগানের না-বনের।

টুপ, টুপ, টুপ। পাথরের টুকরোয় জলে তার ছায়া চঞ্চল হয়ে ওঠে।

রেশমী মাথা দুলিয়ে শুধায়, কিগো, অমন ছট্‌ফট করছ কেন ?

ছায়া মাথা দোলায়, উত্তর দেয় না।

রেশমী মুগ্ধ দৃষ্টিতে ছায়াটিকে দেখে মনে মনে ভাবে—আহা, কি সুন্দর ! তার মনে হয় বিশ্বের যাবতীয় রূপ যেন শরতের শিশিরকণার মত অশত্থপাতার শিষটির শেষ প্রান্তে এসে দোদুল্যমান।

ইস্‌, খুব যে রূপ !

ছায়া হাসে—স্পষ্ট দেখা যায় তার গালের টোল দুটি।

এত রূপ কার জন্যে গো ?

এবারে ছায়া নিস্তব্ধ, বোধ করি তার চোখের কোণ জলে ভরে ওঠে, জলে জল এক হয়ে যায়, কিছু বোঝা যায় না।

এবারে রেশমী মাথা নাড়িয়ে বলে, এত রূপ ভাল নয় রে, ভাল নয় !

ছায়া মাথা নাড়িয়ে তাকে সমর্থন করে।

শুনেছিস তো, দু-চারজনের চোখ পড়েছে তোর উপরে ?

ছায়া ভয়ে নিস্তব্ধ হয়ে থাকে।

কিছুদিন হল রেশমী বুকের মধ্যে এক অদ্ভুত উতলা ভাব বোধ করছিল—মনটা কেমন যেন যখন-তখন অকারণে উন্মনা হয়ে যায় তার। খাঁচার পাখী ক্ষণে ক্ষণে উধাও হয়ে যায় আকাশে, দরজা বন্ধ করতে ভুলে যায় মালিক। কেন এই উদ্‌ভ্রান্তি বুঝতে পারে না, বুঝতে না পারলেও উদ্‌ভ্রান্তিটা তো মিথ্যা নয়। তার মনে হয়, মনের মধ্যে কোথাও যেন ফুল ফুটেছে—স্বর্গীয় তার গন্ধ, দিব্য তার উন্মাদনা। কি ফুল ফুটল, কোথায় ফুটল, ব্যাকুল হয়ে ওঠে সে, খুঁজতে বের হয়। কিন্তু হায়, মনের ফুলের সন্ধান বাইরে পাবে কেমন করে ? মনের গহনে কি প্রবেশ করতে পারে সবাই ? তাই শুধু সে এখানে-ওখানে হাতড়ে বেড়ায়। ক্রমে গন্ধে বাতাস ভারী হয়ে ওঠে, রেশমীর জীবন দুর্বহ মনে হয়। কত রাতে ঘুম ভেঙে গিয়ে দুই হাতে বুক চেপে ধরে কেঁদেছে—চোখের জলে অন্ধকার

ধুয়ে ভোর হয়ে গিয়েছে। এই অকারণ আবেগ, অমূলক বেদনা কেন, সে বুঝতে পারে না। যে দুঃখের কারণ স্পষ্ট তার সীমা আছে, অকারণ দুঃখ অনন্ত। সে যখন ধীরভাবে চিন্তা করে, দেখতে পায় যে, দুঃখটাও নিশ্ছিদ্র নীরন্ধ্র নয়, তার মধ্যেও আলোকরশ্মি আছে, একরকম আনন্দ আছে, বেশ একটু মজা আছে। তখন সে দুঃখের সঙ্গে খেলা করে, যেমন করে ঐ ছায়াটির সঙ্গে। দুঃখ তার বুকের রক্ত শোষণ করে রস সংগ্রহ করে, সেই রস তার খাদ্য, তার প্রাণ—এটুকু পীড়াদায়ক। কিন্তু মরি মরি, সেই দুঃখের লতায় ফুলের কি অপূর্ব শোভা ! মানুষ গাছ, দুঃখ পরগাছা, গাছের ফুলের চেয়ে পরগাছার ফুলের সৌন্দর্য বেশি।

কিন্তু একদিন সে বুঝতে পারল দুঃখের কারণ, বুঝিয়ে ছিল ঐ ছায়সঙ্গিনী। নিজের ছায়া দেখে সে চমকে উঠল—সম্মুখে ও কে ? পুরাণে শোনা অপ্সরীদের কেউ নাকি ? এত রূপ তার ? রূপ নাকি গৌরব ! তার খুশি হওয়া উচিত ছিল, তার বদলে জলের ধারে লুটিয়ে পড়ে সে কাঁদল—সাথে সাথী ছায়াও কাঁদল নীরবে। সে ভেবে পায় না, কেন এমন হল ? রূপ রমণীর গৌরব, গৌরবে আছে গুরুত্ব, সেই গুরুভারে সে পীড়িত—এ কান্না সেই পীড়নের। ফুলের ভারে গাছ পীডিত, ফলের ভারে শাখা পীড়িত, তারার ভারে পীড়িত শরতের আকাশ, নীরবতার ভার চরাচরের পীড়া, আর আজ রেশমী পীডিত রূপের দুর্বহ ভারে।

যে-বন্যা এক রাতের মধ্যে এসে চরাচর ডুবিয়ে দেয় তার সন্ধান আগে পাওয়া যাবে কেমন করে ? রেশমীর রূপের আবির্ভাবও যে বন্যার অতর্কিত অভিযান। কাল ছিল সে কিশোরী, এখানে-ওখানে রূপের কুঁড়ি উঁকি মারছিল, আজ সে পরিপূর্ণ যুবতী। দেহের কানায় কানায় রূপের বান, আর এক অঞ্জলি বেশি হলে পাড় যাবে ছাপিয়ে।

টুপ, টুপ, টুপ।

শোন লো শোন, গায়ে সামলে কাপড় দিস। দেখেছিস তো ফুলকির হেনস্তা।

ছায়া হাসে।

এত হাসির কপাল ! তিন কুলে নেই কেউ !

ছায়ার উত্তর কেড়ে নিয়ে নিজেই বলে, ফুলকিরও তো নেই কেউ, তাতে কি তার হাসির অভাব হয়েছে ?

তবে কি ফুলকির মত হতে চাস নাকি ?

আবার ছায়ার উত্তর নিজে দেয়, ছি ছি, গলায় দড়ি !

এমন সময়ে হাওয়ায় বুকের আঁচল পড়ে খসে। স্খলিত-অঞ্চল বুকের দিকে তাকিয়ে পলক পড়ে না রেশমীর চোখে।

কায়া আর ছায়া দুজনে নির্নিমেষ তাকিয়ে থাকে সৌন্দর্যমেরুর শিখরে।

পুরাণের মতে সৃষ্টির যাবতীয় সুবর্ণ পুঞ্জীভূত হয়েছে মেরুচুড়ায়, এখানেও বুঝি তাই। রেশমী ভাবে, আহা, এক মুহূর্তের জন্য যদি সে পুরুষের চোখ পেত, দেখে নিত ঐ দৃশ্যটি।

হঠাৎ তন্দ্রা ভেঙে সে চমকে ওঠে, জলে আর একটি ছায়া পড়েছে। তাড়াতাড়ি বুকে আঁচল তুলে দেয়।

কে, কায়েৎ দাদা নাকি ? কখন এলে ?

রাম বসু বলে, এদিক দিয়ে যাচ্ছিলাম, হঠাৎ দেখতে পেলাম তোমাকে। তা এখানে

একা বসে কি করছ? সন্ধ্যাবেলা মাঠের মধ্যে একা একা থাকা কিছু নয়।

রেশমীর মনে পড়ল ফুলকির সতর্কবাণী, ঘুরিয়ে জিজ্ঞাসা করল, চোর-ডাকাতের ভয় নাকি?

মাঠের মধ্যে চোর-ডাকাত কি লুট করবে? নেকড়ে বেরুতে পারে।

চল তবে কায়েৎ দাদা কুঠিতে ফিরে যাই, সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছে খেয়াল ছিল না।

দুজনে কুঠি বলে রওনা হল।

রাম বসুর 'হঠাৎ দেখতে পেলাম তোমাকে' কথাটা সম্পূর্ণ সত্য নয়। হঠাৎ দেখতে পেয়েছিল সত্য—কিন্তু কিছুক্ষণ রেশমীর অগোচরে দাঁড়িয়ে যে তাকে দেখছিল সে কথাটা বলে নি, এমন ক্ষেত্রে বলা চলেও না।

রাম বসু আজ যেন হঠাৎ নূতন করে রেশমীকে আবিষ্কার করল, দেখল সে অপূর্ব সুন্দরী। বাঁধের ওদিকের রক্তিম কুসুমতরুটির সঙ্গে রেশমীকে মিলিয়ে দেখছিল। তার মনে হচ্ছিল, বা বা, এরা দুজনে যেন জুড়ি, যেমন একক তেমনি দলছাড়া, তেমনি রহস্যময় সৌন্দর্যময়! রাম বসুর কেমন তন্দ্রাচ্ছন্ন ভাব।

রেশমী শুধাল, কেরী সাহেব কি মহীপাল দিঘিতে রওনা হয়েছেন?

কেমন করে হবেন, মিসেস কেরী যে আরও বেশি উন্মাদ হয়ে উঠেছেন।

হবেন না! কোলের ছেলেটা হঠাৎ মারা গেল। মিসেস কেরী যে কদিন বাঁচবেন তাই ভাবছি।

সে ভাবনা ক'র না, সাহেবী প্রাণ খুব শক্ত। বোঁটা শক্ত হওয়ার আগে জ্যাভেজের মত ঝরে পড়লে এক কথা। কিন্তু একবার বোঁটা শক্ত হয়ে গেলে যমরাজের পাইক-বরকন্দাজের সাধ্যও নেই লাঠির ঘায়ে পাড়ে। ওদের নিতে হলে স্বয়ং যমরাজকে আসতে হবে।

এইরকম কথাবার্তা বলতে বলতে দুজনে কুঠির কাছে এসে পড়ল, এমন সময়ে নৈশ অন্ধকার বিদীর্ণ করে সঙ্গীত ধ্বনিত হল—'ভরা নদী ভয় করি নে, ভয় করি সই বানের জল।'

কে গান করে রে?

ফুলকি। চেন না ওকে কায়েৎ দাদা?

দেখেছি বটে মেয়েটাকে।

তুমি যাও কায়েৎ দাদা, আমি ওর সঙ্গে দুটো কথা বলে আসি, দেখি নি অনেক দিন ওকে। ফুলকি, এদিকে আয় ভাই।

১২
অন্ধকারের ভুল

ফুলকি শুধাল, এত রাতে কোথায় গিয়েছিলে?

রেশমী বলল, এত রাতে কোথায়? কেবল তো সন্ধ্যা!

তা বটে, কলির সন্ধ্যা আর কি! তা সঙ্গে উটি কে ছিল?

চেন না? কায়েৎ দাদা!

তা কায়েৎ দাদার সঙ্গে এত রাতে মাঠের দিকে গিয়েছিলে কেন? বলে ফুলকি মুচকে হাসল।

তার হাসি দেখে রেশমীর গা উঠল জ্বলে, সে বেশ একটু তেতে উঠে বলল, যেখানেই যাই, যার সঙ্গেই যাই, তোমার তাতে কি?

ভাল রে ভাল! আমি তোমার হয়ে লড়াই করে মরছি—আর তুমি করছ রাগ!

রেশমীর রাগ কমে নি, গা তখনও জ্বলছিল, তবু রাগ দমন করে শান্তভাবে শুধাল, আমার হয়ে কার সঙ্গে লড়াই করছিলে?

গোপাল নায়েবের সঙ্গে।

আর লড়াই-এর বিষয়টা কি, শুনি?

তবে শোন, শুনে রাখাই ভাল—এই বলে সে আরম্ভ করল, আজ অনেকদিন থেকে নায়েব বলছে, ওরে ফুলকি, তোর সঙ্গে তো ঐ কুঠির মেয়েটার খুব ভাব-সাব, ওকে যোগাড় করে দে না। আমি বলি, নায়েব মশাই, ও সে-রকম মেয়ে নয়, ওর দিকে নজর দিও না। নায়েব বলে, রাখ্ রাখ্—তিন কুলে কেউ নেই, ভরা যৌবন, আবাব সে-রকম মেয়ে নয! তা ছাড়া, কতদিন ওকে রাতের বেলায় মাঠের দিক থেকে ফিরতে দেখেছি—অত রাতে মাঠের মধ্যে যায় পূজো করতে, না?

ফুলকির কথা শুনে রেশমী স্তম্ভিত হয়ে যায়, সে স্বপ্নেও ভাবে নি তার যাতায়াত কেউ লক্ষ্য করছে—আর তার এমন কদর্থ সম্ভব।

রেশমীকে নীরব দেখে ফুলকি বলে চলল, আজ আবার নায়েব ধরেছিল, যা ফুলকি, মেয়েটাকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে রাজী করে ফেল, তাকে বালিস, গয়নাগাঁটি দেব—আর তুইও বাদ যাবি নে।

তার পরে একটু থেমে পুনরায় আরম্ভ করল, আসছিলাম তোমাকে সাবধান করে দিতে। কিন্তু এখন দেখছি নায়েবের কথা মিথ্যে নয়—ধরা পডলে তো একেবারে বামাল ধরা পড়লে, তাও আবার আমার চোখে!

রেশমীর ঝগড়াঝাঁটি করা স্বভাব নয়, জীবনে কখনও ঝগড়া করেছে বলে কেউ জানে না—কিন্তু ফুলকির কথায় তার গা এমন জ্বলে উঠল যে ভুলে গেল নিজ স্বভাব।

সে ঝঙ্কার দিয়ে উঠে বলল, আমি যখন যত রাতে খুশি যেদিকে ইচ্ছা যাব, কারও তোয়াক্কা আমি রাখি নে।

ফুলকিও কখনও রাগে না, তবে খোঁচা দিতে পারে বিলক্ষণ, বলল, আর যার সঙ্গে খুশি যাবে, কি বল?

নিশ্চয়।

এবারে ব্যঙ্গ মিশিয়ে বলল, তবে ভাই একবারটি নায়েব মশাই-এর সঙ্গে যাও না। আহা, বুড়ো মানুষ, বেচারার অনেকদিনের শখ! তাছাড়া, দুটো একটা গয়নাগাঁটি যদি পাই, তোমার ভাগ্যে তো বাজুবন্দ নাচছে!

তবে তাই গড়াতে বলে দাও গে তোমার নায়েব মশাইকে—অসহ্য ক্রোধে কাঁপছিল রেশমী।

রেশমীকে ভাল মেয়ে বলে ধারণা হয়েছিল ফুলকির, তাই সে গায়ে পড়ে এসে মিশত তার সঙ্গে। এখন সেই ধারণা ভেঙে যাওয়ায় ফুলকির মনের মধ্যে চলছিল আলোড়ন। ফুলকির ধারণা ছিল যে, মানুষের ভাল মন্দ সে চেনে, এখন সে ধারণা

ভঙ্গ হওয়ায় বোকা বনে গিয়েছে সে। দেখা গেল যে, রেশমী তার চেয়েও চতুর। তাই সে নিজের প্রতি ধিক্কার অনুভব করছিল। চতুর মানুষের বিপদ এই যে, একবার বোকা প্রতিপন্ন হয়ে গেলে নিজেকে কিছুতেই ক্ষমা করতে পারে না। নিজের নির্বুদ্ধিতার জন্য দায়ী করল রেশমীর সূক্ষ্মতর বুদ্ধিকে—তাই গঞ্জনার সুরে বলল, আর কি কি গয়না পছন্দ বলে দাও, একসঙ্গে গড়ালে নায়েব মশাই-এর দু পয়সা সস্তা পড়বে।

খুব যে দরদ নায়েব মশাই-এর জন্য!

হবে বই কি ভাই, আমিও তো কিছু কিছু পেয়েছি কিনা।

তবে তুমিই যাও না, আবার কুটনীগিরি করতে এসেছ কেন?

এসব জাগ্রত দেবতা, নিত্য নূতন ভোগ চাই, নইলে আমার কি অসাধ!

রেশমীর গালাগালির অভিধান খুব বৃহৎ নয়, কোন্ শব্দ ব্যবহার করবে ভাবছে—এমন সময়ে ন্যাড়া এসে উপস্থিতঃ রেশমীদিদি, তুমি এতক্ষণেও ফেরনি দেখে কায়েৎ দাদা চিন্তিত হয়ে উঠেছেন, আমাকে পাঠালেন, শীগগির চল।

রেশমী বুঝল, ঘটনাচক্র আজ তার প্রতিকূল, ফুলকির মন-গড়া ধারণাটাই ক্রমে স্পষ্টতর হয়ে উঠছে, ভয় ছিল ন্যাড়ার সম্মুখে ফুলকি না-জানি কি বলে বসে!

ফুলকি এমন কিছু বলল না যাতে ন্যাড়ার সন্দেহ উদ্রেক করে—অথচ অতি-সাধারণ কথায় এমন একটি সুর মিশিয়ে দিল যাতে রেশমীর বুঝতে ভুল না হয়।

যাও ভাই শীগগির যাও, কায়েৎ দাদার কথা অমান্য করলে তিনি আবার রাগ করবেন!

রেশমীর উত্তর দেওয়ার সাহস ছিল না, পাছে ন্যাড়া সন্দেহ করে, আর উত্তর দেওয়ার ইচ্ছাও ছিল না। সে ন্যাড়াকে অনুসরণ করে হন হন করে প্রস্থান করল। ফুলকির সন্দেহে তার সর্বাঙ্গ জ্বলছিল। ক্রমক্ষীয়মাণ গানের সুরে বোঝা যাচ্ছিল যে, ফুলকি ক্রমেই দূর থেকে দূরান্তরে চলে যাচ্ছে—

'ভরা নদী ভয় করি নে
ভয় করি সই বানের জল।'

১৩
রাম বসুর আবিষ্কার

রাম বসু হঠাৎ আবিষ্কার করে ফেলেছে যে, রেশমী অপূর্বসুন্দরী। মহৎ আবিষ্কার মাত্রেই আকস্মিক। দুরন্ত সমুদ্রের বঙ্কিম দিগন্তের ভ্রূতোরণশায়ী নবজগতের সঙ্গে কলম্বাসের যেদিন প্রথম চোখাচোখি হয়েছিল সে কি নিতান্ত আকস্মিক ছিল না? পরিচিত সমুদ্র তাকে বহন করে নিয়ে পৌঁছে দিল একটি মহৎ অপরিচয়ের সম্মুখে। রাম বসুরও ঘটল ঠিক সেইরকম অবস্থা।

রেশমীকে সে দেখছে আজ দু বছরের উপর, তাকে চপল চঞ্চল বালিকা ছাড়া কিছু মনে হয় নি। যখন সে প্রথম ইংরেজি লিখতে পড়তে বলতে শিখল কৌতূহল অনুভব করেছে মুন্সী। ন্যাড়ার সঙ্গে যখন সে ইংরেজিতে কথা বলতে চেষ্টা করেছে আর

ন্যাড়া তার উত্তর দিয়েছে ইংরেজি বাংলা হিন্দীর মিশলে, কিছু না বুঝতে পেরে রেশমী জরুরী কাজের অছিলায় পৃষ্ঠভঙ্গ দিয়েছে, বিজয়ী ন্যাড়ার হাসিতে সে কৌতুক অনুভব করেছে। ন্যাড়া বলেছে, দেখলে তো কায়েৎ দাদা, কাজের ছুতো করে পালাল রেশমী দিদি! ও পারবে কেন আমার সঙ্গে ইংরেজী বিদ্যায়?

আরও বলেছে, ও শিখেছে ইংরেজী, আমি শিখেছি ইংরজকে। ওদের ভাষার মধ্যে বারো আনা গায়ের জোর, বুঝলে কায়েৎ দাদা, হিন্দী বাংলা মিশিয়ে জোরে গর্জন করে উঠলেই ইংরেজি হয়।

দূর বোকা, বলে বসুজা।

এতদিন তুমি ইংরেজের সঙ্গে কাটালে, তুমিও কিছু বোঝ না দেখি।

বেশ তো, বুঝিয়ে দে না।

অদম্য ন্যাড়া বলে, তবে শোন। শূয়োর বললে বোঝায় শূয়োর নামে জীবটা। কিন্তু যখন সাহেব গর্জন করে ওঠে--'ইউ শূয়ার, ইধার আও' তখন শূয়োরের মানে বদলে যায়।

তখন আবার কি মানে হয়?

তখন মানে হল, খানসামা, বাবুর্চি যেটি ঠিক সেই সময়ে সাহেবের দরকার।

রাম বসু হাসে।

ন্যাড়া বলে, তোমার হাসি পেল, কিন্তু ঐ গর্জন শুনে খানসামা বাবুর্চিদের প্রাণ উড়ে যায়, তারা সম্মুখে এসে কাঁপতে থাকে।

তার পরে একটু থেমে বলে, মাতুনি সাহেবের আবার ভাষারও দরকার হত না, হাতের কাছে যা পেত ছুঁড়ে মারত। একদিন পর পর তিনখানা প্লেট আমাকে ছুঁড়ে মারল, আমি পর পর তিনখানা লুফে ফেললাম। তাই না দেখে সাহেব খুশি হয়ে আমার পিঠ চাপড়ে বলে উঠল, 'ওয়েল ডান, হ্যাটট্রিক!' আবার প্লেট ভাঙে নি দেখে মেমসাহেবও আমার উপরে খুব খুশি।

আবার রেশমী যেদিন সায়া-শেমিজ ধরল সেদিন ন্যাড়া বলে উঠল, কে বলবে রেশমী দিদি বাঙালী! খাস মেমসাহেব বলে চালিয়ে দেওয়া যায়!

রেশমী ঠাট্টা করে বলল, তা হলে এবারে একটা সাহেব বর খুঁজে বার কর্।

খুঁজতে হবে কেন, তাদের কাছেই হাজির।

কে রে?

কেন, ঐ আমাদের টমাস্ সাহেব, না হয় নাই থাকল গোটা-পাঁচেক দাঁত।

টমাসের নাম শুনে রেশমী একখানা ঠ্যাঙা নিয়ে তাড়া করে।

দূরে বসে রাম বসু দেখত এসব দৃশ্য, মনটা খুশি হত, ভাবত, আহা যেমন করে হক মেয়েটা দুঃখের কথা ভুলে থাকুক।

রেশমী সহজে সায়া-শেমিজ ধরতে চায় নি। কেরী-দম্পতির বিশেষ পীড়াপীড়িতেই ধরেছিল। তবু একবার জিজ্ঞাসা করেছিল রাম বসুকে।

তুমি কি বল কায়েৎ দাদা?

ক্ষতি কি!

ক্ষতি কি? সায়া-শেমিজ ধরলে খিরিস্তান হতে আর বাকি থাকল কি?

দূর বোকা! ঐ যে ছিবুর মা সায়া-সেমিজ পরে, ও কি খিরিস্তান? কোন সাহেব

যদি ধুতি চাদর ধরে তবেই কি হিন্দু হয়ে গেল ?

হিঁদু তো হওয়া যায় না, খিরিস্তান যে হওয়া যায়।

হওয়া যায় বলেই তো হচ্ছিস না।

ওসব পরলে আমাকে যে চেনাই যাবে না।

সে তো ভালই হবে, চণ্ডী বক্সীর লোকে তোকে চিনতে পারবে না, কাছে এসে পড়লেও মেমসাহেব ভেবে পালাবার পথ খুঁজবে।

যুক্তিটা তার মনে ধরল, আর সে ধরল সায়া-শেমিজ। চণ্ডী বক্সীর চোখে ধুলো দেবার উপায় এত সহজ জানত না রেশমী।

এ হেন রেশমীকে হাটে ঘাটে মাঠে ঘরে বাইরে দিনে রাতে সদাসর্বদা রাম বসু দেখেছে কিন্তু সে যে বিশেষ করে সুন্দরী একথা কখনও তার মনে হয় নি।

সেদিন হঠাৎ আবিষ্কার করে বসল তার সৌন্দর্য। সেই গোধূলির আলো-আঁধারি রঙীন প্রচ্ছায়ে, মাঝ-বসন্তের খেয়ালে ভরা এলোমেলো বাতাসের অদৃশ্য চামরব্যজনের ছন্দে, স্বচ্ছ বারিখণ্ডের পটে সন্নিবিষ্ট নিঃসঙ্গ নারীমূর্তি হঠাৎ রহস্যের চমকে উদ্‌ঘাটিত হল তার চোখে। প্রথম দৃষ্টিতে বুঝতে পারে নি কে এল এখানে ! পরমুহূর্তে মন বলল— রেশমী। কিন্তু বোঝবার ফলে রহস্য ফিকে না হয়ে গাঢ়তর হল। রেশমী ! যাকে আগে সহস্রবার দেখা গিয়েছে, সহস্রাতীত একবারের জন্য এমন বিস্ময় সঞ্চিত ছিল তার মধ্যে ? বিস্ময়ের অন্ত পায় না রাম বসু। নিস্তব্ধ নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল সে। পা দুখানি জলের দিকে নামিয়ে দিয়ে ঈষৎ ঝুঁকে বাম করতলে চিবুক ন্যস্ত করে তন্ময় হয়ে বসে রয়েছে। নিঃসঙ্গ তরুণী—নির্জনতার প্রশ্রয়ে আঁচল পড়েছে খসে, লুটিয়ে আছে ঘাসের উপরে, শুভ্র গ্রীবার উপরে বাতাসে কাঁপছে আলগা চুলের গুচ্ছ, অর্ধাবগুণ্ঠিত পূর্ণিমা-চাঁদের আভাস দিচ্ছে অপ্রচ্ছন্ন বাম পয়োধর, সুঠাম নিটোল তনুযষ্টি, রেখায় রঙে ছায়াতপে তাল মিলিয়ে সৃষ্টি করেছে নেত্রপেয় একখানি রাগিণীর। রাম বসুর চোখের পলক পড়ে না। সে ভাবল, সৌভাগ্য এই যে ওকে মুখোমুখি দেখি নি, তা হলে কি এমন খুঁটিয়ে দেখবার পূর্ণ অবকাশ পেতাম ; ভাবে, মুখ দেখলে প্রত্যহের পরিচিত সেই মেয়েটিকে দেখতাম, সংসার যেখানে অঙ্কিত করে দিয়েছে ছোটখাটো সুখদুঃখের চক্রচিহ্ন ; ভাবে, কখনও মনে হয় নি প্রত্যহের অতীত কিছু আছে ওর মধ্যে ; এখন বুঝল সমগ্রভাবে দেখলেই তবে পাওয়া যায় সৌন্দর্যকে, সত্যকেও সেই সঙ্গে। সে নির্বাক দাঁড়িয়েই থাকে যেমন নির্বাক বসে আছে রেশমী, সৌন্দর্য-সোনার মিনে-করা লোহার হাতুড়ি, অকস্মাৎ বুকের উপরে নিক্ষিপ্ত হয়ে অতর্কিতে হতচৈতন্য করে দেয় দ্রষ্টাকে।

রাম বসু অতিশয় ধূর্ত, অতিশয় ঘোড়েল, অতিশয় প্রাজ্ঞ বাস্তববাদী ; ক্ষিপ্র নিপুণ ছিপ নৌকার মত ডাইনে বাঁয়ে সাহেব-সমাজ ও বাঙালী-সমাজের ঢেউ কাটিয়ে ছুটতে সে অভ্যস্ত ; পিছে পড়ে থাকে পাণ্ডিত্যের বজরা, ঐশ্বর্যের পান্সী, বানচাল হয়ে যায় নিবুদ্ধিতার পালোয়ারী সব নৌকা, সংসার-তরঙ্গতলে নৃত্য করে ছুটে চলে যায় রাম বসুর লঘুভার ছিপ। সারাজীবন ধূর্তপনা করে তার ধারণা হয়েছিল সে নীতির উর্ধ্বে ; হিন্দুধর্ম খ্রীষ্টধর্ম দুয়েরই মাথায় নিরপেক্ষভাবে সে কাঁঠাল ভেঙে এসেছে ; টাকার দুর্নিবার আকর্ষণেও তাকে অর্থগৃধ্নু করতে পারে নি ; জ্ঞানের ক্ষেত্রকে পরিণত করেছে সে সরাইখানায়, আকণ্ঠ পান করেছে সরাব, তার পরে রাত্রিশেষে চলে গিয়েছে নূতন সরাবখানার উদ্দেশে ; আর নারীদেহ, তাতে পেয়েছে সে জড়, পায় নি কখনও জাদু,

কেবল ঐ টুশকি ছাড়া।

সে কেবল অনুভব করে না, অনুভূতিকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বিচার বিশ্লেষণ করে, নিজের অনুভূতিকে বাইরে স্থাপিত করে নিরীক্ষণ করে ; একসঙ্গে সে তন্ময় ও মন্ময় ; 'প্রাচীন মানুষ' হয় শুধু তন্ময়, নয় শুধু মন্ময় ; 'প্রাচীন মানুষ' হরগৌরী, 'নব্যমানুষ' অর্ধনারীশ্বর। রাম বসু প্রাচ্য ভূখণ্ডের প্রথম 'মর্ডান ম্যান' বা 'নব্যমানুষ'। এ বিষয়ে সে রামমোহনের অগ্রজ।

টুশকির প্রসঙ্গে বসুজার মনে নিজের যৌন-জীবনের ইতিহাস জেগে ওঠে। যৌবনের সূচনা থেকে যত নারী তার জীবনে এসেছে—কেউ এক রাত্রির দীপ জ্বালিয়ে, কেউ বা বৎসরকাল মশাল জ্বালিয়ে—তাদের সংখ্যা গণনা করতে গেলে স্বয়ং শুভঙ্করকে বা আর্যভট্টকে ডাক দিতে হয়। তার পরে হঠাৎ একদিন এল টুশকি, তখন সে বুঝল জড়ে জীবে প্রভেদ। জীব সত্য, তবু জাদু নয়। টুশকির দেহটার সঙ্গে পেয়েছিল সে স্নেহ, ঐ দাক্ষিণ্যটুকুর জন্যে টুশকি আর সকলের সঙ্গে একাসনে বসে একাকার হয়ে গেল না, স্থান পেল হৃদয়ের কাছে। গৃহের স্বাদ ও স্বস্তি পাওয়ায় যে চিরন্তন আকাঙ্ক্ষা পুরুষের মনে তারই আভাস পেল টুশকির গৃহে, তখন থেকে সে হল গৃহহীন গৃহী।

কিন্তু আজ, ঐ যে রহস্যময়ী মূর্তি, গোধূলির পড়ন্ত আলোয় আরও অস্পষ্ট হয়ে উঠে অধিকতর মনোজ্ঞ হয়ে উঠেছে, ওতে আর টুশকিতে অনেক প্রভেদ। টুশকি জীব, রেশমী জাদু ; জীবে আছে পৃথিবীর প্রাণ, জাদুতে স্বর্গের আভাস ; জীবে রূপ, জাদুতে সৌন্দর্য ; রূপ রক্তমাংসের সৃষ্টি, সৌন্দর্য সৃষ্টি কল্পনার।

হয়তো বা গাছের পাতার শব্দ হয়ে থাকবে, হয়তো এগোতে গিয়ে পায়ের শব্দ করে থাকবে রাম বসু, চকিতে মুখ ফিরিয়ে সভয়ে জিজ্ঞাসা করে রেশমী, কে ? কে ও ?

আমি কায়েৎ দাদা রে !

তাই বল ! আশ্বস্ত হয় রেশমী।

এত রাতে এখানে একা বসে থাকা ভাল নয়, বাড়ি চল্।

উঠে পড়ে রেশমী, দুজনে অগ্রসর হয় কুঠির দিকে।

স্বভাবতই রাম বসু একটু বেশি কথালু, কিন্তু আজ যোগাতে চায় না তার কথা। বসন্তের খেয়ালে-ভরা আকাশ গান-থেমে-যাওয়া বীণার তন্ত্রের মত রী রী করতে থাকে অনুরণনে, আকাশ তারায় তারায় ওঠে মুখর হয়ে। পশ্চিম দিগন্তের মাথা-বরাবর ঝামা আলোটুকু ক্রমে আসে আরও ঝিমিয়ে ; আরও ক্ষীণ, আরও ম্লান ; এবারে দৃষ্টির সঙ্গে অনুমানকে দোসর না করে নিলে আর দেখবার উপায় নেই।

রাত্রে ঘুম এল না রাম বসুর। আহারটাতেও পড়েছে ফাঁক। অনেক রাত পর্যন্ত বিছানায় পড়ে এপাশ ওপাশ করে সে, নূতন অভিজ্ঞতার ধাক্কা তার মনকে করে রাখে চঞ্চল। হঠাৎ কানে গেল বাইরে কে গান করে চলেছে—"রজকিনী-প্রেম নিকষিত হেম, কাম গন্ধ নাহি তায়।" কতবার শুনেছে সে এই পদটি। আজ মনে হল এত বড় মিথ্যা কোন মহাকবির কলমে আর বের হয় নি। তার মনে হল কামের মধ্যে প্রেম না থাকতে পারে কিন্তু প্রেমে কাম থাকবেই ; হয়তো অগোচরে থাকে, কিন্তু না থেকে যায় না। তার মনে হল কাম ফুল, প্রেম ফল ; ফুল ছাড়া ফল সম্ভব নয়। বিষয়টা নিয়ে মনের

সঙ্গে সে বিচারে বসল। সে বলল, আজ বিষয়টা নূতন করে বুঝলাম। মন বলল, হঠাৎ আজকে বোঝবার কি কারণ ঘটল ? রেশমীর প্রতি তোমার নজরের বদল হয়েছে কি ? সে বলল, আরে ছি ছি, সে রকম কিছু নয়, তবু ভুল হলে স্বীকার করব না কেন ? মন বলে, বেশ, তাই না হয় হল, কাম ফুল, প্রেম ফল ; তবে সৌন্দর্যটা কি ?

কেন, সৌন্দর্য তরু !

আর যৌবনটা ?

ভূমি।

মন বলে, বাহবা, এখনও তোমার অবস্থা চিকিৎসার অতীত নয়।

রোগটা কি যে চিকিৎসার প্রয়োজন হবে ! তবু শুনি আমার অবস্থা বুঝলে কি করে ?

এখনও বেশ গুছিয়ে ব্যাখ্যা করতে পারছ।

না পারবার হেতু কি ?

ব্যাধি।

কি ব্যাধি ?

মন বলে, যে ব্যাধিতে শীঘ্রই আক্রান্ত হবে।

নাম ?

প্রেম।

তার মানে, মূলে কাম আছে ?

মন বলে, নিজেই ভেবে দেখ। বলে, রেশমীর সৌন্দর্যে তুমি অভিভূত হয়েছ, ঐ অনুভূতিটুকু কাটলে বুঝতে পারবে প্রকৃত অবস্থা।

বিরক্ত হয়ে রাম বসু বলে, আচ্ছা তখন দেখা যাবে, এখন ঘুমোতে দাও দেখি।

কদিন ধরে চলে রাম বসুর উন্মনা উদ্‌ভ্রান্ত অবস্থা।

কেরী বলে, মুন্সী, অতিরিক্ত পরিশ্রমে তুমি কাতর হয়ে পড়েছ, বিশ্রাম নাও।

ন্যাড়া বলে, চল কায়েৎ দাদা, কদিন ঘুরে আসি, কাছেই প্রেমতলীর মেলা, খুব জবর মেলা।

রেশমী বলে, কায়েৎ দাদা, ভেবে ভেবে তোমার শরীর যে গেল। শুধায়, কার জন্যে এত ভাব, কায়েৎ বৌদিদির জন্যে নাকি ?

রাম বসু কি উত্তর দেবে ! সব এড়িয়ে যায়।

সেদিন রাতে ন্যাড়া, পার্বতীচরণ, গোলোক শর্মা সবাই গিয়েছে গাঁয়ের মধ্যে যাত্রাগান শুনতে। ডাকাডাকি সত্ত্বেও যায় নি সে, বিছানায় শুয়ে নিজের মনটাকে চিরে চিরে বিশ্লেষণ করে দেখছে ব্যাপারখানা কি ঘটল। তখন বাইরে খেয়ালী বসন্তের মাঝ-রাতের এলোমেলো হাওয়া বাগানের আম কাঁঠাল গাছগুলোর মধ্যে যথেচ্ছাচার করছে, বোলের সঙ্গে শূন্যতা উঠেছে ব্যথিয়ে আর ঝাউ গাছ কটা বহুযুগের পুঞ্জিত দীর্ঘনিঃশ্বাসে সমস্ত আকাশটাকে করেছে উন্মনা। এতদিনের বিচার-বিশ্লেষণে যা স্থির করতে পারে নি হঠাৎ এক মুহূর্তে তা স্থির হয়ে গেল। রেশমীকে তার চাই। রাত্রির অন্ধকারে ভাস্বরতর হীরককঠিন রেশমীর যৌবনদ্যুতি লুব্ধ নাগরাজের মত সবলে করল তাকে আকর্ষণ। ত্বরিতে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ে সোজা গিয়ে রেশমীর দরজায় ঘা দিল সে।

১৪
ধর্মস্য তত্ত্বম্

রাত অনেক হয়েছে দেখে কেরী বই খাতাপত্র গুছিয়ে রেখে শুতে যাওয়ার ব্যবস্থা করছে, এতক্ষণ সে পড়বার ঘরে ছিল। এমন সময়ে দরজা খুলে দমকা হাওয়ার মত ঢুকে পড়ে টমাস।

বিস্মিত কেরী বলে ওঠে, এ কি, টমাস যে! হঠাৎ এত রাত্রে?

টমাস হাঁপাচ্ছিল, লক্ষ্য করে কেরী বলল, বস, বস, একেবারে হাঁপিয়ে পড়েছ যে!

দম নিয়ে টমাস বলল, হাঁপাব না! ঘোড়া ছুটিয়ে হঠাৎ আসতে হলে না হাঁপিয়ে উপায় কি!

হঠাৎ এমন কি ঘটল যে এত রাত্রে ঘোড়া ছুটিয়ে আসতে হবে?

টমাস আসন গ্রহণ করে বলে, একটা লোকের ওলাউঠো হয়েছে খবর পেয়ে গিয়েছিলাম পঁচিশ মাইল দূরের রামকানাই বলে একটা গ্রামে। সন্ধ্যাবেলায় মহীপালদিঘিতে ফিরে এসে দেখলাম মিঃ উডনীর লোক অপেক্ষা করছে।

কেরী বলে, তাতে ব্যস্ত হয়ে পড়বার কি আছে?

আগে সবটা শোন। সেই লোকটি মিঃ উডনীর এজেণ্ট রীডারের অগ্রদূত। মিঃ রীডার কাল সকালে এসে পৌঁছবে।

ভাল কথা, অনেক দিন পরে একজন দেশের লোক দেখতে পাওয়া যাবে।

কি মুশকিল! আগে সবটা শুনেই নাও।

দুঃখিত, বল।

মিঃ রীডার বেরিয়েছে উডনীর বিভিন্ন কুঠির তদারকে। কালকে প্রথমে এসেই সে ক্যাশ মিলিয়ে দেখবে।

বেশ তো, ক্যাশ মিলিয়ে দিও।

ক্যাশ যে শর্ট।

বলে টমাস নীরব হল। কেরীও নীরব। দেয়ালের ঘড়িটার টিক টিক ধ্বনি স্ফুটতর হয়ে উঠল।

নীরবতা ভঙ্গ করে কেরী প্রথমে কথা বলল, আবার তুমি ক্যাশের টাকা ভেঙেছ!

কি করব বল, দুঃস্থ লোক দেখলে আমি স্থির থাকতে পারি না।

দুঃস্থ লোকের সাহায্যের জন্যেও পরের টাকা দান করবার অধিকার তোমার নেই।

তার পরে কিছুক্ষণ নীরব থেকে কেরী বলল, কিন্তু ক্যাশ শর্ট পড়বার আসল কারণ জুয়ো খেলে তুমি টাকা নষ্ট করেছ।

নীরবতার দ্বারা টমাস দোষ স্বীকার করে নিল। অপরাধ করবার চেয়ে অপরাধ স্বীকার করা কঠিন, সেই কঠিন কাজটা করতে হল না, কেরীর মুখে প্রকাশ হয়ে পড়ল, তাতে টমাসের উদ্বেগের প্রধান অংশ দূরীভূত হয়ে গেল। দ্বিতীয় অংশ, আজই টাকা সংগ্রহ। কেরীকে সে বেশ জানত যে, কেঁদে গিয়ে পড়লে টাকা পাওয়া যাবেই। অনেকবার

অনেক বিপদ থেকে সে রক্ষা করে দিয়েছে।

টমাস বলে উঠল, এবারের মত আমাকে বাঁচিয়ে দাও ব্রাদার কেরী, ভবিষ্যতে সাবধান হয়ে চলব। আর আমার প্রতিশ্রুতিতে যদি বিশ্বাস না কর তবে ভগবানের নাম করে—

কেরী বাধা দিয়ে বলল, থাম থাম, বৃথা ভগবানের নাম উচ্চারণ ক'র না।

টমাস মাথা হেঁট করে বসে রইল। মনে তার অনুশোচনা হচ্ছিল সত্যি, কিন্তু সেই সঙ্গে উদ্বেগ লাঘব হওয়ায় বেশ একটু স্বস্তিও অনুভব করছিল সে।

কিন্তু বিপদে ফেললে যে! অফিস-ঘরে আছে সিন্দুক, অফিস-ঘরের চাবি থাকে মুন্সীর কাছে। সে হয়তো আর-সকলের সঙ্গে গাঁয়ের মধ্যে গিয়েছে যাত্রাগান শুনতে।

আমি খুঁজে আনছি, বলে টমাস ছুটে বেরিয়ে গেল। টমাসের প্রত্যাবর্তনের অপেক্ষায় আবার বই খুলে বসল কেরী।

টমাস সোজা গিয়ে উঠল রাম বসুর ঘরের বারান্দায়, দেখল মুন্সীর ঘর বন্ধ। সে জানত পাশের ঘরটায় থাকে পার্বতী ব্রাহ্মণ, দেখল সে ঘরটাও বন্ধ। বুঝল কেরীর অনুমান মিথ্যা নয়—সকলে যাত্রা শুনতে গিয়েছে গাঁয়ের মধ্যে। সে জানত না গাঁয়ের ঠিক কোন্‌খানে গ্নান হচ্ছে, ভাবল, ন্যাড়াকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়া যাক। ন্যাড়ার ঘরটা অন্য দিকে, রেশমীর ঘরের কাছে। সেখানে গিয়ে টমাস দেখল ন্যাড়ার ঘরটাও বন্ধ, বুঝল সবাই একসঙ্গে গিয়েছে। তখন সে নিরুপায় হয়ে স্থির করল রেশমীকে ডেকেই জেনে নেবে যাত্রার আসরের সন্ধান—তাই সে রেশমীর ঘরের কাছে গিয়ে পৌঁছল। রাত্রিবেলা একাকী কোন মহিলার ঘরের দরজায় গিয়ে ডাকাডাকি করা সামাজিক নীতি নয় সত্য, কিন্তু ভোর হওয়া মাত্র যেখানে তহবিল ঘাটতি মিটিয়ে দেওয়া অপরিহার্য, সেখানে ওসব সূক্ষ্ম শিষ্টাচারের বাধা যে কত তুচ্ছ, বিপন্ন ব্যক্তি ছাড়া অপরের পক্ষে সহজবোধ্য নয়।

টমাস দরজায় ঘা দিল।

কেউ সাড়া দিল না বা দরজা খুলল না। কিন্তু দরজা ভিতর থেকে বন্ধ, লোক নিশ্চয় আছে, হয়তো ঘুম ভাঙে নি মনে করে আবার প্রবলতর আঘাত দিল টমাস।

আবার। আবার।

কে এত রাত্রে?

চমকে উঠল টমাস। এ যে মুন্সীর কণ্ঠ!

মুন্সী, তুমি এত রাত্রে এখানে?

রাম বসুর সাড়া দেওয়া উচিত হয় নি, আর কোন উপায়ে দরজায় ঘা পড়ার প্রতিবিধান করা উচিত ছিল তার। কিন্তু সংসারে উচিতমত কাজ কয়টা হয়? সঙ্কটকালে অতিশয় ধূর্ত ব্যক্তিও অতিশয় স্থূল ভুল করে বসে বলেই তো জীবনের রস আজও শুকিয়ে যায় নি। সংসারের জমাখরচের পাকা খাতায় কোথায় যেন একটা সূক্ষ্ম হিসাবের গরমিল থেকে গিয়েছে।

সাড়া দেওয়া মাত্র রাম বসু বুঝল মস্ত ভুল হয়ে গিয়েছে, হয়তো তার জীবনের প্রকাণ্ডতম ভুল। কিন্তু সেই সঙ্গে এই অপ্রত্যাশিত সঙ্কটের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে, টমাসের কণ্ঠস্বরে বাস্তবের কেন্দ্রে পুনঃসংস্থাপিত হয়ে—এই কদিনের উদ্‌ভ্রান্তি গেল তার দূর হয়ে, যেমন হঠাৎ উদ্‌ভ্রান্তি কুয়াশায় ঢুকে পড়েছিল, আবার তেমনি হঠাৎ প্রখর প্রোজ্জ্বল কাণ্ডজ্ঞানের সূর্যালোকে এল ফিরে; লুপ্ত হয়ে গেল ক্ষণিকের প্রেমিক ভাবুক রোমাণ্টিক

সত্তা, উঠল জেগে স্বভাবসিদ্ধ প্রত্যুৎপন্নমতি, শ্লেষরসিক, বাস্তববাদী রামরাম বসু।

মুন্সী, তুমি এত রাত্রে একাকী রেশমী বিবির ঘরে! এ যে দুর্বোধ্য!

ভিতর থেকে অবিচলিত কণ্ঠে রামরাম বসু উত্তর দিল, তার চেয়ে অনেক বেশি দুর্বোধ্য তত্ত্ব নিয়ে পড়েছি।

বুঝতে পারে না টমাস, বিস্মিত হয়ে শুধায়, কি সেই তত্ত্ব?

ভিতর থেকে রাম বসু বলে, ধর্মস্য তত্ত্বম্।

পুনরায় মূঢ়ের মত টমাস শুধায়, তা ওখানে কেন?

ভিতর থেকে উত্তর আসে, সে বস্তু যে নিহিতং গুহায়াম্।

ওটা বোধ করি সংস্কৃত ভাষা, বুঝতে পারছি না, বুঝিয়ে বল।

সেটা মন্দ নয়, তবে শোন—The mystery of religion is hidden in the cave.

টমাস শুধায়, রিলিজ্যন তো বুঝলাম, কিন্তু মিস্ট্রিই বা কি আর কেভই বা কি?

আরে সেই তো অনুসন্ধান করছি। আমাদের শাস্ত্রে বলেছে গুহা অর্থাৎ কেভে সশরীরে না ঢুকলে সেই মিস্ট্রির সাক্ষাৎ পাওয়া সম্ভব নয়।

বাস্তবিক আশ্চর্য তোমাদের শাস্ত্র! কিন্তু এত রাত্রে কেন?

রাত্রি কোথায়? বলে রাম বসু, আর তাছাড়া রাত্রিই তো গুহাবতরণের প্রশস্ত সময়। শাস্ত্রের অনুশাসন হচ্ছে—"যা নিশা সর্বভূতানাং তস্যাং জাগর্তি সংযমী।"

অনুবাদ করে বোঝাও।

তবে শোন—When it is night to ghosts, সংযমী—কি না people like myself—keep up late.

বিস্ময়-উদ্বেল হয়ে ওঠে টমাসের মন। বলে, আশ্চর্য তোমাদের শাস্ত্র, সব কাজেরই সমর্থন আছে!

তার পর কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আবার বলে টমাস—কিন্তু একাকী রমণীর ঘরে পুরুষের প্রবেশ কি ঠিক?

তোমার এ প্রশ্নের উত্তরটাও শাস্ত্রের বচনে দিই—

এর সমর্থনও শাস্ত্রে আছে নাকি, বাপ রে বাপ—

কথার মাত্রা হিসাবে 'বাপ রে বাপ' বলা টমাসের অভ্যাস।

আছে বই কি। শাস্ত্রে বলেছে, "না স রমণ, ন হাম রমণী।" ডাঃ টমাস, পুরুষ রমণী ওসব দৃষ্টির ভ্রম।

তবে আসলে তোমরা কি?

জীবাত্মা আর পরমাত্মা। জীবাত্মা ভোগ করতে উদ্যত—

আর পরমাত্মা কি করছে?

আপাতত নারাজ।

এবারে গম্ভীর ভাবে টমাস বলে, মুন্সী, তোমার উদ্দেশ্য মহৎ আর পথটা না হয় শাস্ত্র-সম্মত কিন্তু যুবতী রমণীর সঙ্গে গভীর রাত্রে নিভৃত কক্ষে অবস্থান, এর মর্ম লোকে ভুল বুঝতেও পারে।

রাম বসু বলে, ডাঃ টমাস, শাস্ত্র মানলে শাস্ত্রের সকল বাক্যই মানতে হয়—যুবতী নারীই এই শ্রেণীর ধর্মসাধনার শ্রেষ্ট সহায়।

কিন্তু রেশমী কি সম্মত আছে?

আরে সেইখানেই তো গোল!

কেন?

কেন আর কি, ছেলেমানুষ! মিষ্ট্রি অব রিলিজ্যন যে হিডন ইন দি কেভ—তা স্বীকার করতেই চায় না।

কেন, ও কি শাস্ত্র জানে না?

জানে কিন্তু না-জানার ভান করছে।

তবে না হয় দরজাটা খুলে দাও, দুজনে মিলে চেষ্টা করি।

কি সর্বনাশ! এসব ক্ষেত্রে দুই গুরু অচল।

তবে তুমি একাই চেষ্টা কর।

তার পরে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলে, সত্যি মুন্সী, তুমি খুব সৌভাগ্যবান, নতুবা মিষ্ট্রি অব রিলিজ্যন বোঝাবার এমন মনোরম সুযোগ পেতে না। আমি কতবার চেষ্টা করেছি, সুযোগ পাই নি।

উপযুক্ত সাধনা চাই, সাহেব, উপযুক্ত সাধনা চাই।

টমাস বলে, মুন্সী, তত্ত্বটা বুঝলে রেশমী বিবি কি খ্রীষ্টান হতে রাজী হবে?

মুন্সী বলে, তখন খ্রীষ্টান হওয়া ছাড়া আর কোন্ গতি থাকবে ওর!

তবে বোঝাও মুন্সী, ভাল করে বোঝাও, তোমার সমস্ত শক্তি দিয়ে বোঝাও, প্রয়োজন হলে সারারাত ধরে বোঝাও।

তাই তো বোঝাচ্ছিলাম, হঠাৎ তুমি এসে পড়ে রসভঙ্গ করলে।

কিন্তু আমার কত সৌভাগ্য দেখ—এমন যে পবিত্র কর্ম চলছে, হঠাৎ এসে পড়ায় তা জানতে পেলাম।

বেশ তো, এখন সরে পড় না!

সে কথায় কর্ণপাত না করে টমাস শুধায়, আচ্ছা মুন্সী, তুমি কি আগেও ওকে মিষ্ট্রি অব রিলিজ্যন বোঝাতে চেষ্টা করেছ?

না সাহেব, এই প্রথম।

আশা করি, এই শেষ নয়!

নিশ্চয়ই নয়, এখন কিছুদিন চলবে।

চলবেই তো, চলবেই তো—উৎসাহে বলে ওঠে টমাস সাহেব, এ সুযোগ পেলে কেউ সহজে ছাড়তে চায় না।

তার পরে শুধায়, কিছু সুবিধা করতে পারলে মুন্সী?

কিছু সুবিধা হবে মনে হচ্ছে।

টমাস ভক্তির আবেগে বলে ওঠে, নিশ্চয় হবে, নিশ্চয় হবে।

তার পরে আবার থেমে বলে, উপর-উপর না বুঝিয়ে একবারে গভীরে প্রবেশ করতে চেষ্টা কব।

তা নইলে আর বুঝিয়ে আনন্দ কি?

মুন্সী, তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে তুমি ও-বিষয়ে বিশেষজ্ঞ।

না হয়ে উপায় কি, অনেককাল তোমাদের সঙ্গ করছি।

এবারে টমাস ব্যাকুলভাবে বলে, মুন্সী, দয়া করে একবার দরজাটা খুলে দাও, আমি একবার পরমরমণীয় দৃশ্য দেখে প্রভুর নামকীর্তন করি!

না না, এখন দরজা খোলা চলবে না, রেশমীর এমনিতেই খুব সঙ্কোচ।

স্বীকার করে টমাস। বলে, তা আমি দেখেছি কিনা। বাইবেলের একটা সাধারণ গল্পেই ওর গাল লাল হয়ে ওঠে, আর এ তো গূঢ়তম রহস্য। সঙ্কোচ হবে বই কি।

একটু থেমে বলে, মুন্সী, আমার যে ভগবানের নাম করতে ইচ্ছা করছে।

তা ঐখানে বারান্দায় দাঁড়িয়ে নাম কর, আমরা ভিতর থেকে বেশ শুনতে পাব।

না, দাঁড়িয়ে নয়, নতজানু হয়ে। মুন্সী, আমি এখানে নাম করি আর তুমি ওখানে ক্রমে গভীরতর অন্তরে প্রবিষ্ট হয়ে নিগূঢ়তম তত্ত্বটি বুঝিয়ে দাও।

মুন্সী বলে, সাহেব, এখন ঘরে যাও দেখি।

নিশ্চয়ই যাব, আনন্দের সংবাদ বহন করে যাব, কিন্তু তার আগে একবার বল দেখি, ও বুঝেছে কি না ?

বিরক্ত হয়ে মুন্সী বলে, বুঝেছে বুঝেছে, তুমি গেলে আরও ভাল করে বুঝবে।

'জয় হক' বলে লাফিয়ে দাঁড়িয়ে ওঠে টমাস, তার পরে 'পেয়েছি, পেয়েছি, স্বর্গের চাবি পেয়েছি' বলে চীৎকার করতে করতে ছুটে চলে যায় কেরীর ঘরের উদ্দেশে।

১৫
স্বর্গের চাবি

টমাসের ফিরতে বিলম্ব দেখে কেরী মনে মনে বিরক্ত হয়ে উঠছিল। বেরিয়ে সন্ধান করবে কিনা ভাবছে, এমন সময়ে সশব্দে দরজা খুলে দমকা হাওয়ার মত প্রবেশ করল টমাস।

পেয়েছি পেয়েছি, সোল্লাসে চীৎকার করে উঠল।

টমাসের ভাবালুতার সঙ্গে কেরী পরিচিত কিন্তু আজ কিছু বাড়াবাড়ি মনে হল, তাই কিঞ্চিৎ বিরক্ত ভাবেই বলল, পেয়েছ তো দাও, খামকা অমন চীৎকার করছ কেন ?

টমাস বলল, এ দেওয়া যায় না, অনুভব করা যায় মাত্র।

কি সব বাজে কথা বলছ তুমি ! সিন্দুক-ঘরের চাবি কই ?

সিন্দুক-ঘর ! বিস্মিত হয় টমাস।

তুমি কি সিন্দুক-ঘরের চাবি আনতে যাও নি ?

এতক্ষণে সব কথা মনে পড়ে টমাসের, বলে ওঠে, তাই গিয়েছিলাম বটে, কিন্তু পেয়েছি তার অনেক বেশি।

কি আর এমন পাবে ?

কি আর এমন পাব ! বলে বিস্ময়ের সঙ্গে টমাস। তার পরে শুধায়, অনুমান কর তো ব্রাদার কেরী, কি পেতে পারি ?

স্পষ্ট বিরক্তির সঙ্গে কেরী বলে ওঠে, দেখ টমাস, এত রাতে তোমার সঙ্গে ছেলেমানুষি করবার সময় আমার নেই। সিন্দুক-ঘরের চাবি পেয়ে থাক তো দাও।

ব্রাদার কেরী, সিন্দুক-ঘরের চাবি খুঁজতে গিয়ে স্বর্গের চাবির সন্ধান পেয়েছি।

কেরী দাঁড়িয়ে উঠে বলল, তবে তুমি স্বর্গে প্রবেশের চেষ্টা কর, আমি শুতে চললাম,

বড় ক্লান্তি অনুভব করছি।

ব্রাদার কেরী, স্বর্গে প্রবেশের সুযোগ পেলে কি আর বাইরে থাকি! কিন্তু মুন্সী কিছুতেই রাজী হল না, রেশমীর তাতে নাকি খুব সঙ্কোচ। তার পরে স্বগত ভাবেই যেন বলে উঠল, মুন্সী এতক্ষণ একাকীই বোধ হয় স্বর্গে প্রবেশ করল। স্বার্থপর!

রাম বসু ও রেশমীর নাম একত্রে শুনে কান খাড়া করল কেরী, গভীরভাবে শুধাল, কি ব্যাপার বল তো?

যথোচিত ভাবানুষঙ্গে আদ্যোপান্ত বর্ণনা করে টমাস বলল, ব্রাদার কেরী, এমন ব্যাপার যে দেখতে হবে, আগে ভাবি নি।

কেরী বলল, আমিও আগে ভাবি নি যে, এমন ব্যাপারে দেখতে হবে।

কিন্তু আমি বাইরে থেকেও যেটুকু আভাস পেয়েছি, তুমি তো সেটুকুও পেলে না। তার পরে বলল—চল না কেন, দেখে আসি। এতক্ষণে নিশ্চয় মিস্ট্রি অব রিলিজ্যন রেশমীকে বুঝিয়ে সেরেছে—মুন্সী সত্যই একজন জ্ঞানী পুরুষ।

মুন্সী যেমন জ্ঞানী, তুমিও তেমনি ভক্ত! ধিক্কার দিয়ে ওঠে কেরী, তুমি একটি আস্ত গর্দভ!

কেন, এতে নির্বুদ্ধিতার কি দেখলে?

দেখেও যদি না বুঝতে পার তবে আর কেমন করে বোঝাব!

খুলেই না হয় বল না।

গভীর রাত্রে একজন পুরুষ একটি যুবতীর নিভৃত কক্ষে প্রবেশ করেছে, কি উদ্দেশ্যে হতে পারে?

আমিও তো প্রথমে সেই প্রশ্ন করেছিলাম। মুন্সী বলল, মিস্ট্রি অব রিলিজ্যন বোঝাবার উদ্দেশ্যে।

ও বলল আর তুমি বিশ্বাস করলে?

ক্ষতি কি? তুমি অন্য কিছু সন্দেহ করছ নাকি?

অন্য কিছু তো সন্দেহ করবার নেই—এ রকম ক্ষেত্রে একটিমাত্র ঘটনাই সম্ভব।

কি সেটা?

নাঃ, তোমাকে নিয়ে পারলাম না! বলে ওঠে কেরী।

তার পরে বলে, ঐ মেয়েটাকে নষ্ট করবার উদ্দেশ্যে ঢুকেছে লোকটা! এমন কতদিন ধরে চলছে কে জানে!

ও যে বলল, এই প্রথম।

ও যা বলল তাই বিশ্বাস করলে? ও বলল এই প্রথম, তুমি বিশ্বাস করলে? ও বলল, মিস্ট্রি অব রিলিজ্যন বোঝাতে এসেছে, তুমি বিশ্বাস করলে?

টমাসের ভক্তির নেশা কাটতে চায় না। বলে, যদি অসদুদ্দেশ্যেই ঢুকে থাকবে, তবে ধর্মতত্ত্বের কথা তুলল কেন?

জানে যে, ভক্তি তোমার ক্রনিক ব্যাধি, তাই সেখানে একটু মোচড় দিয়ে তোমার মনটাকে সন্দেহের পথ থেকে ভক্তির পথে চালিয়ে দিল।

তা দেয় দিক, কিন্তু ধর্ম-প্রসঙ্গ নিয়ে এমন পরিহাস অমার্জনীয়।

ব্যভিচারী ব্যক্তির কাছ থেকে আর কি তুমি আশা করতে পার?

আমি তো মুন্সীকে সৎ ব্যক্তি বলে জানতাম।

আমারও সেইরকম ধারণা ছিল। তা ছাড়া লোকটার অন্য অনেক গুণ; ওর সঙ্গে সমানে সমানে কথা বলা যায়।

এবারে কিছুক্ষণ নীরবে পায়চারি করে সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে কেরী—মুন্সী মাস্ট গো!

অব কোর্স হি মাস্ট গো!

গর্জে ওঠে টমাস। কাঁচা ভক্ত ভক্তির উপরে ব্যঙ্গ ছাড়া আর সব সহ্য করতে পারে—আর একবার ভক্তিতে উপহসিত হলে মরীয়া হয়ে ওঠে। মরীয়া হয়েই উঠল টমাস। আমার সঙ্গে পরিহাস, দেখে নেব সেই শয়তানটাকে!

সবেগে সে ছুটল রেশমীর ঘরের দিকে।

টমাস, টমাস, হঠাৎ নাটকীয় কিছু করে বোসো না, ফের ফের, ফিরে এস।

কে কার কথা শোনে! ততক্ষণে অন্ধকারের মধ্যে উধাও হয়ে গিয়েছে উন্মত্ত টমাস।

ধর্মশাস্ত্রের অপমানেই টমাসের এই উষ্মা মনে করলে ভুল হবে। আরও কিছু গূঢ় কারণ ছিল। রেশমীর প্রতি লালসার ভাব দেখা দিয়েছিল টমাসের মনে, সেখানে রাম বসুকে সফল প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে দেখে তার মন গিয়েছিল বিষিয়ে। সেই উত্তেজনা তাকে ভিতরে ভিতরে মারছিল ঠেলা। টমাসকে বললে নিশ্চয় সে স্বীকার করত।

১৬
আবার ভাসমান

নৌকা চলেছে টাঙন হয়ে, মহানন্দা হয়ে ভাগীরথীর দিকে।

রাম বসু ভেবেছিল তাকে একাই যেতে হবে। কিন্তু সে কলকাতা রওনা হয়ে যাচ্ছে শোনবামাত্র তার সঙ্গীরাও জিনিসপত্র বেঁধে প্রস্তুত হল।

রাম বসু শুধাল, কি ন্যাড়া, তুই যাবি নাকি?

ক্ষতি কি? কায়েৎ দিদি আমাকে পাঠিয়েছিল তোমাকে দেখাশোনা করবার জন্যে। তুমি গেলে দেখব কাকে।

পার্বতী ব্রাহ্মণ বলল, যেখানে রাম সেখানে লক্ষ্মণ। তুমি চলে গেলে আমি একাকী এই দণ্ডকারণ্যে থাকতে পারব না।

গোলোক শর্মা এই অঞ্চলের লোক।

রাম বসু বলল, তোমার তো না থেকে উপায় নেই।

পাগল হয়েছ ভায়া! 'বামুন গেল ঘর, লাঙল তুলে ধর'! তোমরা নৌকোয় উঠবে আমিও চরণ দাঁড়ির নৌকোয় উঠে পাড়ি দেব গাঁয়ের দিকে।

রাম বসু সঙ্গীদের মনোভাবে বিস্মিত হল, মোটা বেতনের চাকুরি ছেড়ে চলল সবাই তার আকর্ষণে। কিন্তু তার বিস্ময় চরমে উঠল যখন ছোট পুঁটুলিটা নিয়ে রেশমীও এসে নৌকোয় চড়ল।

বিভ্রান্ত রাম বসুর মুখ দিয়ে বের হল, তুই যাবি নাকি?

রেশমী নৌকার গলুই-এ বসে পা ধুতে ধুতে বলল, কি মনে হচ্ছে?

যাবি কেন রে?

কাল সন্ধ্যাবেলা একটা লোককে দেখে সন্দেহ হয়েছে।

কি সন্দেহ হল আবার?

বোধ করি চণ্ডী বক্সীর লোক। কাল সন্ধ্যাবেলা বাগানের কাছে ঘোরাঘুরি করছিল।

সবাই বলল, তাই তো, তাহলে একলা থাকবি কি করে?

রেশমীর কথাটা সত্য নয়। সন্দেহজনক কোন লোক সে দেখে নি। কিন্তু ঐ রকম কিছু একটা না বললে তার যাওয়ার পথ সুগম হয় না, তাই ঐ ছলনাটুকু করতে বাধ্য হল।

নৌকা ছেড়ে দিল।

রাম বসু হঠাৎ কলকাতায় চলে যাচ্ছে শুনে সবাই কারণ শুধালে রাম বসু একটা কাহিনী বানিয়ে বলল। সে বলল, আর ব'ল না ভাই, বেটা টমাসের কাণ্ড। সেদিন রাতে তোমরা সবাই যখন যাত্রা গান শুনতে গিয়েছিলে, পাষণ্ডটা এসে রেশমীর দরজায় ধাক্কা মারছিল। আমি দেখতে পেয়ে নিষেধ করতেই লেগে গেল আর কি! তার পরে কেরীকে হাত করে এই কাণ্ডটি ঘটাল। লোকটা ভেবেছিল আমি গেলে রেশমী ওর খপ্পরে পড়বে!

পার্বতী ও গোলোক বলল, তাই বল। আমরা আগেই জানতাম ওর ভাব-গতিক ভাল নয়। এখন সব বোঝা গেল।

রাম বসু বলল, যাক কথাটা নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি ক'র না, রেশমীর কানে উঠলে লজ্জা পাবে। এমন ভাব দেখিও যেন তোমরা কিছু জান না।

তারা বলল, ছি ছি, এ সব কি ঐ অতটুকু মেয়ের সামনে আলোচনা করা যায়!

নৌকো স্রোতের টানে পূর্ণবেগে ভেসে চলেছে।

রাম বসু একা একা শুয়ে বিস্ময়ের অন্ত পায় না; ভাবে, আশ্চর্য এই মেয়েটি রেশমী। এতকাল পর্যন্ত যত মেয়ের সঙ্গ পেয়েছে কারও সঙ্গে তার মিল নেই। না, টুশকির সঙ্গেও নয়। টুশকিতে মায়া-মমতা কিছু বেশি, কিন্তু নারীসুলভ রহস্য যা তা আছে ঐ রেশমীতে, আর কোন মেয়েতে সে এমনটি দেখে নি। সে ভাবে, অধিকাংশ মেয়েকেই দূর থেকে স্ফটিকের দ্বার বলে মনে হয়; মনে হয় অগম্য, কিন্তু কাছে এসে দাঁড়াতেই দেখা যায় প্রশস্ত দ্বার, অনায়াসে গলে যাওয়া যায়। সেই অভিজ্ঞতাতে রেশমীকেও স্ফটিকের দ্বার বলে মনে হয়েছিল, গলা গলালেই দিব্যি গলে যাওয়া যাবে। কিন্তু সেদিনকার রাত্রের অভিজ্ঞতায় দেখল—না, স্ফটিকের দেয়াল, দূর থেকে স্বচ্ছতার দরজার বিভ্রান্তি উৎপাদন করেছিল। দেয়ালে মাথা ঠুকে ঠুকে অবশেষে বুঝতে পারল প্রবেশ একেবারেই নিষিদ্ধ।

টমাস ফিরে আসবার আগেই রেশমী বিদায় করে দিয়েছিল রাম বসুকে, বলেছিল, এবারে যাও কায়েৎ দা।

বসুজা বলেছিল, কেন রে, এত তাড়া কিসের? এতক্ষণ পাষণ্ডটার সঙ্গে হাঁকাহাঁকি করলাম, একটু জিরিয়ে নিই।

না না, আর দেরি ক'র না। টমাস আবার ফিরে আসবে, হয়তো এবারে কেরীকে সঙ্গে নিয়ে আসবে।

কথাটা রাম বসুর মনে হয় নি। সে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হল, জিজ্ঞাসা করল, টমাস এসে ডাকাডাকি করলে কি বলবি?

কিচ্ছু বলব না, দরজা খুলে দিয়ে বলব, দেখ কেউ নেই।

দরজা খুলে দিতে ভয় করবে না ?

তোমাকেও তো ভয় পাই নি দরজা খুলে দিতে।

রেশমীর কথা বসুর হৃদয়ে গোপন কশাঘাত করল। তবে কি তারা দুজনে সমান রেশমীর চোখে ? তখন মনে পড়ল, নিশ্চয়ই সমান নয়, বসুর স্থান আজ অনেক নীচে। এই আত্মদোষ স্বীকারেও সান্ত্বনা পেল না তার মন, গম্বুজের মধ্যেকার প্রতিধ্বনির মত রেশমীর কথাটা মাথা কুটে বেড়াতে লাগল মনের মধ্যে।

দরজার কাছে গিয়ে ফিরে দাঁড়িয়ে রাম বসু শুধাল, হাঁরে রেশমী, আজ যে কাণ্ডটা করলাম, কাল বেশ স্বাভাবিক ভাবে কথা বলতে পারবি আমার সঙ্গে, অপ্রস্তুত হবি নে ?

সহজভাবে রেশমী বলল, অপ্রস্তুত হব কেন ?

রাম বসুর মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল, সংস্কার !

চিতার আগুনে আমার সব সংস্কার যে পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে।

বলিস কি !

রেশমী পূর্বসূত্র অনুসরণ করে বলে চলল, এখন কোন পুরুষের সাধ্য নেই আমার কাছে আসে, আমাকে ঘিরে জ্বলছে চিতার আগুন।

অপ্রস্তুত হল রাম বসু। সে নীরবে বেরিয়ে এল। বুঝল এ মেয়ে সত্যই অগ্নিসম্ভবা—রিরংসার গ্রাস ত নয়।

রাম বসু বেরিয়ে চলে গেলে দরজা বন্ধ করে দিয়ে বিছানায় লুটিয়ে পড়ে কেঁদে বালিস ভিজিয়ে দিল রেশমী। কেন জানি নে বারংবার তার মনে পড়তে লাগল ফুলকির কথা। সেদিন সন্ধ্যার ঘটনার পরে দারুণ ঘৃণায় ভরে গিয়েছিল তার মন, চরম শত্রু বলে মনে হয়েছিল ফুলকিকে। তবু আজ এই পরম দুঃখের ক্ষণে ঐ স্বৈরিণী মেয়েটাই থেকে থেকে উদিত হচ্ছে তার মানে। বিষ দিয়ে বিষ নামাতে হয়। যে বিষ এইমাত্র সে পান করেছে তার প্রতিকার কেমন করে জানবে সাধ্বী কুলবালারা ! তার প্রতিকার জানে ঐ কুলটা নারী, যে নিজে আকণ্ঠ পান করেছে বিষ। রেশমী ভাবল, হক সে বিষকন্যা, তবু তার কাছে আজ সে-ই হচ্ছে ধন্বন্তরি।

তার মনে পড়ল একদিন ফুলকিকে জিজ্ঞাসা করেছিল, আচ্ছা সই, ঐ যে গানটা সব সময়ে তোমার মুখে লেগে রয়েছে 'ভরা নদী ভয় করি নে, ভয় করি সই বানের জল' ওর মানে কি ? ভরা নদীই বা কি, বানের জলই বা কি ? ফুলকি বলেছিল, ভরা নদী ভরা যৌবন, তখন ভয় কম ; ভয় যখন গাঙে প্রথম বানের জল আসে, তখন কূল ভাসিয়ে দেবার আশঙ্কা। আমি যে ভাই প্রথম বানের জলে কূল থেকে ভেসে গেলাম। তার পর রেশমীকে সতর্ক করে দিয়ে বলেছিল, তোমার গাঙে এখন সই প্রথম বানের জল ঢুকছে, সাবধানে থেকো।

রেশমী বলেছিল, তুমি তো ভাই লেখাপড়া শেখ নি, এত জানলে কি করে ?

ফুলকি হেসে বলেছিল, পাঠশালায় গিয়ে আর কতটুকু শেখা যায় !

তার পরে বলেছিল সে, পাঠশালায় দশ বছরে যা শেখা যায় মেয়েরা শেখে তা এক রাত্রের পুরুষ-সংসর্গে—ঐ হল তার আগুন ছোঁয়া।

কথাগুলো সম্পূর্ণ বিশ্বাস করে নি রেশমী, কিন্তু তখনও যে—ফুলকির ভাষায়—

সে আগুন ছোঁয় নি।

তার পর সে-রাত্রে আগুনের মশাল নিয়ে এল রাম বসু, রেশমী আগুন ছুঁল না বটে, কিন্তু তাত লাগল গায়ে ; সেই তাপ ভিতরে বাইরে হঠাৎ উঠল বেড়ে। সেই তাপের মরীচিকায় তার কামনার দিগন্তরে ছুটল স্বপ্নের সওয়ার ; ঝলমলিয়ে উঠল তার বুকের গজমোতির মালা, বক্ষের কবচ, মাথার উষ্ণীষ। রেশমী বুঝল সে সওয়ার আর যেই হক রাম বসু নয়—বড়জোর রাম বসু তার নকীব। নকীবের অভ্যর্থনায় সে ত্রুটি করে নি।

রাম বসু দরজায় ধাক্কা দিয়ে পরিচয় দিতেই বিনা প্রশ্নে সে দরজা খুলে দিয়েছিল, ভেবেছিল হঠাৎ কোন প্রয়োজন হয়েছে। কিন্তু রাম বসু যখন বিনা ভূমিকায় বিছানায় এসে বসল, তার চোখের দিকে তাকিয়ে এক মুহূর্তে সব বুঝল রেশমী। ফুলকির গানটা মনে পড়ল, বুঝল, প্রথম বানের দুর্বার গতি নিয়ে এসেছে প্রথম পুরুষ তার জীবনে। কয়েক মুহূর্ত দুজনেই নীরব। নরনারীর যৌন সম্পর্কের এই শেষ বাধাটিই দুর্লঙ্ঘ্যতম। অধিকাংশ ক্ষেত্রে সে বাঁধ ভাঙে না. দুজনে দুদিকে আঘাত করে ফিরে যায়। নির্জন রাত্রে নিভৃত কক্ষে একক পুরুষের সঙ্গ তার শরীরে মনে দাবাগ্নি জ্বেলে দিল, সে উঠে গিয়ে দরজা এঁটে দিয়ে ফিরে এসে বসল। আবার দুজনে মূঢ়ের মত নির্বাক। অত্যন্ত চতুর পুরুষ, অত্যন্ত প্রগল্‌ভা নারীও যে এ সময়ে নির্বাক হয়, মূঢ়বৎ হয়, তার কারণ সেই আদিম পরিবেশ ওঠে জেগে—ভাষা যখন সৃষ্টি হয় নি, সামাজিক চাতুরী যখন ছিল ভবিষ্যতের গর্ভে। এমন কতক্ষণ চলত বলা যায় না এমন সময়ে আবার দরজায় ঘা পড়ল। এবারে টমাস সাহেব।

টমাসের কণ্ঠস্বরে একমুহূর্তে একশ' জন্মান্তর পেরিয়ে রাম বসু ফিরে এল স্বকালে, আর চালাল কৌশলী উত্তর-প্রত্যুত্তর। রেশমীও ফিরে পেল সম্বিৎ। সে বালিসে মুখ গুঁজে হাসি চাপা দিয়ে ফুলে ফুলে উঠতে লাগল।

কই গো, তোমরা সব খেতে এস, পাত পড়েছে।

পার্বতী ব্রাহ্মণ রাঁধে, সবাই খায়। অন্য কেউ রাঁধলে সে খাবে না, তাই এই ব্যবস্থা।

ন্যাড়া শুধায়, আচ্ছা পার্বতী দাদা, এক পাটাতনের উপরে বসে যে খাচ্ছ, জাত যায় না?

পার্বতী বলে, বৃহৎ কাষ্ঠে দোষ নেই রে।

আচ্ছা পিঁড়িখানা যদি বড় করে নেওয়া যায়, তবে দোষ হয় কি না?

সে কথার উত্তর না দিয়ে পার্বতী বলে, তার উপর স্বয়ং মা গঙ্গার বুকের উপরে।

দুবেলা রান্না খাওয়া ছাড়া আর কাজ নেই। রেশমী আর ন্যাড়া দুজনে নৌকোয় ছইয়ের উপরে বসে গল্প করে, উজান-ভাটিতে নৌকা যাতায়াত দেখে, সন্ধ্যাবেলায় আকাশের তারা আর গাঁয়ের প্রদীপ গোনে। সময়ের স্রোত নদীর স্রোতের মত দুজনের কচি মনের উপর দিয়ে অবাধে মসৃণভাবে গড়িয়ে চলে যায়, এতটুকু বাধা পায় না।

একদিন রাম বসুকে গম্ভীর দেখে পার্বতী শুধাল, গম্ভীর হয়ে কি ভাবছ ভায়া?

ভাবছি রেশমী তো সঙ্গে চলল, কিন্তু কলকাতায় নিয়ে ওকে রাখি কোথায়?

পার্বতী বলে ফেলল, কেন, তোমার বাড়িতে! তার পরে প্রস্তাবের অসম্ভাব্যতা বুঝে বলল, না না, তা চলে না।

তার পরে বলল, টুশকির বাড়িতে রাখা চলে না?

বসু বলল, সে কি কথা, ও সব জায়গায় কি ঐ কচি মেয়েটাকে নিয়ে যাওয়া যায় ?

কেন, টুশকি তো মন্দ নয়।

মন্দর ভাল, বলল রাম বসু, তবে কিনা জায়গা তো ভাল নয়।

তা হলে তো দেখছি মুশকিল। তা ছাড়া রাখতে হবে সাবধানে, চণ্ডী বক্সীর হাজার জোড়া চোখ—বলেছিল তিনু চক্রবর্তী।

রাম বসু নিশ্বাস ফেলে বলল, দেখা যাক কি হয়, আগে তো গিয়ে পৌঁছই। চল এখন শুতে যাই।

রাম বসুর ঘুম আসে না। সেদিন তার মনে হয়েছিল যে চণ্ডীদাসের 'রজকিনী-প্রেম নিকষিত হেম, কাম-গন্ধ নাহি তায়' পদটা মিথ্যা। এখন মনে হল, না, মিথ্যা নয়। তবে কিনা সত্য ও মিথ্যার মাঝখানে আর কয়েকটা অবস্থা আছে, স্থূল বিচারের সময়ে সেগুলো বাদ পড়ে যায়। তার মনে হল 'নিকষিত হেম' মিথ্যা নয়, কিন্তু খাঁটি সোনায় সংসারের কাজ চলে না, সংসারের উপযোগী করতে হলে একটু খাদ মেশানো চাই। তার মনে হল ঐ খাদ মেশানোর পরিমাণ-নৈপুণ্যের উপরেই স্যাকরার ওস্তাদি। যে তিনটি মেয়েকে খুব কাছে থেকে সে দেখেছে তাদের কথা মনে পড়ল। টুশকিতে খাদে সোনায় ঠিকটি মিলছে তাই সে সর্বকর্মক্ষম। অন্নদায় খাদের ভাগ কিছু বেশি, নিজের সংসারের বাইরে সে অচল। আর এই রেশমী খাঁটি সোনা—সংসার এখনও খাদ মেশাবার সুযোগ পায় নি তার মনে।

১৭
তিনু চক্রবর্তীর কর্তব্যপালন

সন্ধ্যাবেলায় মাঝিরা বলল, কর্তা, এখানেই নৌকা বাঁধি ?

রাম বসু বলল, কেন রে ?

সামনের পথটা ভাল নয়, একা রাত-বিরেতে যাওয়া কিছু নয়, বোম্বেটের ভয় আছে।

তবে এখানেই আজ রাতের মত নৌকা বাঁধ।

গাঁয়ের নাম কিরে ? শুধায় পার্বতী।

আজ্ঞে, জোড়ামাউ।

জোড়ামউ ! সবাই চমকে ওঠে।

রেশমীকে ডেকে রাম বসু সাবধান করে দিল, ভিতরে চুপটি করে বসে থাক, বাইরে বের হস না। চণ্ডী বক্সীর এলাকায় এসে পড়েছে জেনে রেশমী নৌকার মধ্যে গিয়ে আত্মগোপন করল। কিন্তু তবু তার মনের মধ্যে কৌতূহল ও করুণা একযোগে আলোড়ন শুরু করে দিল। এই তার গাঁ ! আহা, একবার দিদিমার সঙ্গে দেখা করা যায় না ? না, তা অসম্ভব। আহা, কোন রকমে যদি তিনুদাদার সঙ্গে একবার দেখা হয়ে যেত, গাঁয়ের খবরাখবর পায় নি। না, তা-ও সম্ভব নয়। তাই সে একা শুয়ে শুয়ে গাঁয়ের

কথা ভাবতে ভাবতে কখন ঘুমিয়ে পড়ল।

মাঝিরা চাল ডাল পান তামাক কেনবার জন্যে বাজারের দিকে গেল।

তাদের সাবধান করে দিতে, নৌকোর আরোহীদের পরিচয় জ্ঞাপনে নিষেধ করতে সবাই ভুলে গেল। আর না ভুললেও সতর্ক করা সহজ নয়, হয়তো তাতেই গোল বাধবার আশঙ্কা ছিল বেশি।

মাঝিরা বাজারে গিয়ে কথাবার্তার সূত্রে কোথা থেকে আসছে, কোথায় যাবে, নৌকোর যাত্রীদের বিবরণ প্রকাশ করল। তারা তো জানে না লুকোবার কিছু আছে। সেখানে চণ্ডী বক্সীর এক চেলা উপস্থিত, খবরটা চণ্ডীকে পৌঁছে দেবার জন্যে সে উঠে গেল।

চণ্ডী সব শুনে বলল, জয় মা কালী, তোমার ইচ্ছায় বলি একেবারে ঘাটে এসে উপস্থিত! তার পরে দলের আর পাঁচজনের দিকে তাকিয়ে বলল, হবে না? শাস্ত্র তো মিথ্যা হবার নয়?

তখন দলবল জুটিয়ে নিয়ে সে পরামর্শ করল। স্থির হল অনেক রাতে সকলে মিলে গিয়ে পড়বে নৌকাখানার উপরে আর তার পরে রেশমীকে টেনে তুলে রাতেই কাজটা শেষ করে ফেলতে হবে। শাস্ত্রজ্ঞ চণ্ডী বক্সী জানিয়ে দিল যে চিতাপলায়িতাকে চিতায় অর্পণ করাই শাস্ত্রের বিধান।

একজন বলল, দেখো দাদা, শেষে বিপদে না পড়ি!

আরে বিপদ বাধাবে কে? সাহেব তো নেই?

নৌকোয় সাহেব নেই মাঝিরা বলেছিল।

অন্ধকারে আবার নৌকা ভুল করে ব'স না—বললে আর একজন।

পাগল নাকি! চণ্ডী বক্সীর চোখ পেঁচার চোখ, অন্ধকারেই খোলে ভাল। ঘাটে আর ক-খানা নৌকা! সাহেবের নৌকা যখন, অবশ্যই বজরা হবে। চিনতে ভুল হবে না।

চণ্ডী বক্সীর অভিপ্রায়ের সংবাদ গড়াতে গড়াতে তিনু চক্রবর্তীর কানে গিয়ে পৌঁছল। জেলেদের উপরে তিনুর অপ্রতিহত প্রভাব, সে রসিক জেলেকে ডেকে বলল, তোরা জন-কতক ঠিক থাকিস, সময়মত আমি খবর দেব।

গভীর রাত্রে কোলাহল ও বন্দুকের আওয়াজে রাম বসুদের নৌকায় নিদ্রাভঙ্গ হল। সকলে ব্যস্তভাবে জেগে বাইরে এসে ঘটনা কি জানবার জন্যে উদ্গ্রীব হয়ে উঠল। সকলেরই মুখে এক প্রশ্ন—কি হল? ওরা কারা? কাকে আক্রমণ করল? নিদ্রার ঘোর কাটলে সকলে দেখতে পেল অদূরে অবস্থিত একখানা বজরার ছাদে অনেক লোক চড়বার চেষ্টা করছে, সেই অন্ধকারেও চোখে পড়ল বজরার ছাদে জন-দুয়েক লোক দণ্ডায়মান, খুব সম্ভব তারাই বন্দুকের আওয়াজ করে আক্রমণকারীদের তাড়াবার চেষ্টা করছে।

রাম বসু পরামর্শ দিল যে আর এখানে থাকা নয়, আস্তে-সুস্থে নৌকা খুলে দিয়ে এগনো যাক। এখন ওরা বজরাখানা লুট করছে, এর পরে হয়তো আমাদের পালা আসবে।

সেই পরামর্শ সকলের মনঃপূত হল, মাঝিরা সন্তর্পণে নৌকা খুলে দিয়ে মাঝগাঙে গিয়ে নৌকা স্রোতের মুখে ছেড়ে দিল। মাঝিরা নিজেদের মধ্যে বলা-কওয়া করছিল, ও ভাই, বোম্বেটের ভয়ে গাঁয়ে আশ্রয় নিলাম, এখন দেখছি গাঁয়েই ছিল বোম্বেটের দল! মাঝিদের কথাবার্তায় আকৃষ্ট হয়ে পার্বতী ও রাম বসু তাদের কাছে গেল। অনেকক্ষণ

তাদের জেরা করে বুঝল যে বাজারে গিয়ে কথাপ্রসঙ্গে নৌকার আরোহীদের পরিচয়, কোথা থেকে আসছে কোথায় যাবে প্রভৃতি মাঝিরা সবই প্রকাশ করে দিয়েছে।

তখন রাম বসু পার্বতীকে আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে বলল, দেখ ভাই, এবারে ব্যাপারটা যেন বুঝতে পারছি। এ সেই চণ্ডী বক্সীর কাজ। মাঝিদের কথায় চণ্ডী বক্সী আমাদের পরিচয় পেয়ে আমাদের আক্রমণ করবে ভেবেছিল, ভুলক্রমে বজরাখানা আক্রমণ করেছে।

পার্বতী শুধাল, কিন্তু বজরায় ছিল কারা ?

রাম বসু বলল, যারাই থাক, ভীরু নয়, বন্দুক চালিয়েছে তারাই মনে হচ্ছে।

নৌকা গ্রাম ছেড়ে অনেক দূরে এসেছে, ইতিমধ্যে রাতও ফরসা হয়ে এসেছে, তারা দেখতে পেল একখানা বজরা পিছু পিছু আসছে।

পার্বতী বলে উঠল, পিছু নিল নাকি ?

রাম বসু ভাল করে দেখে নিয়ে বলল, এ সেই বজরা। তবু সাবধানের মার নেই। ও মাঝি, পাল তুলে দেওয়া যায় না ?

মাঝিরাও বজরাখানা দেখেছিল, পাল খাটাবার কথা ভেবেছিল। এখন রাম বসুর কথা শুনে বলল, না কর্তা, পাল চলবে না, হাওয়া উত্তুরে।

বেশ ফরসা হয়ে এসেছে, বজরাখানাও কাছে এসে পড়েছে, বজরার ছাদের লোক চিনতে পারা যায়, জন-তিনেক লোক বন্দুক হাতে দাঁড়িয়ে।

রাম বসু তাদের ঠাহর করে দেখে বলল, পার্বতী ভায়া, চেনা লোক যেন !

সাহেব যে !

জন স্মিথ বলে মনে হচ্ছে—আর ও দুজনকেও তাদের বাড়িতে দেখেছি মনে হয়।

তারা বুঝল যে বজরা থেকে ভয়ের কারণ নেই, তখন নৌকার গতি ধীর করে দেওয়া হল।

রাম বসু বলল, একবার ওদের জিজ্ঞাসাবাদ করে জেনে নেওয়া যাক কাল কি ঘটেছিল।

রাম বসু হেঁকে ইংরেজিতে বলল—মিঃ স্মিথ নাকি ?

জন তাকে চিনতে পেরে বলল—আশ্চর্য, মুন্সী যে, তোমরা কোথা থেকে ?

মদনাবাটি থেকে আসছি।

মিঃ কেরী কোথায় ?

তিনি আসেন নি, আমরাই কয়েকজন আসছি।

তবে নৌকা ভেড়াও, অনেক কথা আছে।

তখন নৌকা দুখানা এক জায়গায় বাঁধা হলে পার্বতী ও রাম বসু বজরায় গিয়ে উঠল।

রাম বসু বলল, মিঃ স্মিথ, আমার এই বন্ধুকে নিশ্চয় মনে আছে—পার্বতী ব্রাহ্মণ !

অবশ্য মনে আছে। এবারে আমার বন্ধুদের সঙ্গে তোমাদের পরিচয় করিয়ে দিই। মিঃ রিংলার ও মিঃ মেরিডিথ—আমাদের বাড়িতে দেখেছ নিশ্চয় !

খুব দেখেছি, বেশ মনে আছে।

জন বন্ধুদের উদ্দেশে বলল, ইনি রাম বসু, পণ্ডিত ব্যক্তি, মিঃ কেরীর মুন্সী, আর ইনি রাম বসুর বন্ধু, ইনিও খুব শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি।

রাম বসু শুধাল, কাল কি হয়েছিল বল ত?

জন বলল, কিছুই জানি নে। আমরা শিকার করবার উদ্দেশ্যে কদিন আগে বেরিয়ে কাল সন্ধ্যায় এই গাঁয়ে নৌকা ভিড়িয়েছিলাম। হঠাৎ রাত্রে বোম্বেটেদের দল আক্রমণ করে বসল—আর কিছুই জানি নে।

রাম বসু বলল, আমি জানি বলে মনে হচ্ছে।

তুমি জানবে কি করে?

ওদের লক্ষ্য ছিল আমাদের নৌকা, ভুলক্রমে তোমাদের নৌকাখানা আক্রমণ করে বসেছিল।

কিন্তু তোমাদেরই বা আক্রমণ করতে যাবে কেন?

সে অনেক কথা। বলে রাম বসু রেশমী-সংক্রান্ত যাবতীয় বৃত্তান্ত বলল, মদনাবাটির দু বছরের জীবন-বৃত্তান্ত দিল, কেবল হঠাৎ মদনাবাটি পরিত্যাগের প্রকৃত কাহিনীটি চেপে গিয়ে বলল, অনেক দিন হয়ে গেল, একবার নিজেদের আত্মীয়স্বজন স্ত্রীপুত্রদের দেখবার আশায় চলেছি কলকাতায়। যাক, তোমাদের সঙ্গে দেখা হয়ে খুব আনন্দ পেলাম।

জন বলল, মেয়েটিকে তো সঙ্গে নিয়ে এলে, কলকাতায় রাখবে কোথায়? শত্রুপক্ষ খুব দুঃসাহসী বলে মনে হচ্ছে, লুট করে নিয়ে না যায়।

সেই তো পড়েছি দুশ্চিন্তায়।

জন বলল, মেয়েটির যদি আপত্তি না থাকে তবে খুব এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে থাকবার ব্যবস্থা করে দিতে পারি; সেখানে যম ছাড়া আর কেউ হস্তক্ষেপ করতে পারবে না।

কি রকম পরিবার শুনি।

আমাদের পাড়ায় থাকে জন রাসেল, সুপ্রীম কোর্টের জজ। কিছুদিন আগে তার শ্যালীকন্যা এসে পৌঁছেছে। মেয়েটির অল্প বয়স, তার কাজে-কর্মে সাহায্য করবার জন্য একটি দেশী মেয়ের আবশ্যক।

কি কাজ করতে হবে?

কাজ আর কি—তাদের কি কাজের লোকের অভাব আছে! ইংরেজিতে যাকে Maid of honour বলে সেইভাবে থাকবে। চুলটা বেঁধে দেবে, আয়নাটা হাতের কাছে এগিয়ে দেবে, বেড়াবার সময়ে সঙ্গে যাবে, দুটো গল্পগুজব করবে—এই আর কি!

রাম বসু বলে, সে রকম কাজের জন্য এর চেয়ে ভাল মেয়ে সহসা পাবে না। এ বেশ ইংরেজি বলতে কইতে লিখতে পড়তে পারে, ইংরেজী সমাজের কায়দা-কানুনও শিখেছে, সচ্চরিত্র ও মধুরভাষী। তা ছাড়া বয়সও অল্প।

জন উল্লসিত হয়ে বলে ওঠে, বেশ মিলবে রোজ এলমারের সঙ্গে। আমি অনেক জায়গায় সন্ধান করেছি, পাই নি। তা হলে কথা পাকা, কি বল মুন্সী?

নিশ্চয় পাকা।

অপ্রত্যাশিতভাবে রেশমীর নিরাপদ আশ্রয় জুটে যাওয়ায় রাম বসু ও পার্বতী স্বস্তি অনুভব করল।

এমন সময়ে রাম বসুদের নৌকো থেকে কান্নার শব্দ উঠল—রেশমী কাঁদছে।

ন্যাড়া, রেশমী কাঁদে কেন রে?

ঐ দেখ না কেন কাঁদে, আমারও কান্না পাচ্ছে।

ন্যাড়ার নির্দেশে নদীর দিকে তাকিয়ে তারা দেখল অদূরে একটি সদ্যোমৃত নরদেহ।

রাম বসু ও পার্বতীর চিনতে বিলম্ব হল না—তিনু চক্রবর্তীর মৃতদেহ।

জন বলে উঠল—এটা ডাকুদের কারও দেহ হবে। কাল গুলি চালিয়েছিলাম, অন্ধকারে বুঝতে পারি নি যে কেউ মারা গিয়েছে। রাম বসু বলে উঠল, মিঃ স্মিথ, এ লোক ডাকু নয়, এই গাঁয়ে আমাদের যে একমাত্র বন্ধু তারই মৃতদেহ।

তবে ও ডাকাতদের সঙ্গে এসেছিল কেন?

সঙ্গে এসেছিল কিন্তু এক উদ্দেশ্যে আসে নি, ও নিশ্চয় এসেছিল তার দলবল নিয়ে আমাদের সাহায্য করতে।

জন সত্যকার দুঃখিত হয়ে বলল, আর শেষে কিনা মারা পড়তে সেই লোকটাই মারা পড়ল! এর চেয়ে মর্মান্তিক আর কিছুই হতে পারে না।

তখন পার্বতী, রাম বসু, ন্যাড়া মিলে মৃতদেহ জল থেকে তুলে কাঠ সংগ্রহ করে মৃতদেহের সৎকার করল। যতক্ষণ মৃতদেহ পুড়ে নিঃশেষ না হয়ে গেল রেশমী তার মুখের দিকে তাকিয়ে বসে কাঁদল। ঐ মৃতদেহের সঙ্গে তার গ্রাম্যজীবনের শেষ চিহ্ন পুড়ে ছাই হয়ে গেল। তিনু চক্রবর্তী মৃত্যুর পরেও তার কর্তব্য ভোলে নি, রেশমীর পিছু পিছু ভেসে এসে অভয়পূর্ণ আশীর্বাদ জানিয়ে গেল।

১৮
আর একটি অবান্তর অধ্যায়

রাম বসু প্রভৃতির প্রস্থানের পরে কেরীর সমস্যা ও সঙ্কট ঘনীভূত হয়ে এল—একটার পরে একটা। প্রথমেই বাংলা পাঠশালাটি ভেঙে গেল; ছাত্ররা আগেই পালিয়েছিল, এবারে গুরুমশায় সরে পড়ল। তার পরে জ্যাভেজের মৃত্যুর কিছুদিন পরেই পিটার হঠাৎ মারা গেল। কেরী যখন শোকে আচ্ছন্ন, ছিরুর মা কতক তৈজসপত্র নিয়ে সরে পড়ল। বিপদের এখানেই শেষ নয়। কুঠির কাজে ক্রমাগত ক্ষতি হচ্ছে দেখে উডনী পত্রযোগে জানাল তার পক্ষে আর অধিক দিন ক্ষতি বহন করা সম্ভব নয়—শীঘ্রই কুঠির কাজ গুটিয়ে ফেলতে মনস্থ করেছে সে। ওদিকে ভবঘুরে টমাসের পালে আবার লেগেছে দমকা হাওয়া, সে নিরুদ্দেশ হয়ে চলে গেল, কোথায় কেউ নিশ্চয় করে বলতে পারে না; কেউ বলে রাজমহলে কেউ বলে বীরভূমে।

এ-হেন অবস্থাতেও কেরীর আদর্শবাদ অটল, লক্ষ্য স্থির। যেন সমস্তই আগের মত নিয়মিত চলছে এইভাবে সকালবেলা সে সংস্কৃত ব্যাকরণ খুলে কেবল বসেছে এমন সময়ে মিসেস কেরী ঘরের মধ্যে উঁকি মেরে বলল, কাউকে যে দেখছি নে! সব বাঘে নিয়েছে, তুমি এখনও একা বসে? পালাও, পালাও, শীঘ্র পালাও, এবার তোমার পালা।

এই বলে ছুটে মারল দৌড় বাইরের দিকে।

কেরী ছুটল পিছু-পিছু, দাঁড়াও ডরোথি, দাঁড়াও, কোন ভয় নেই।

এমন আজকাল প্রায়শ হচ্ছে। জ্যাভেজ ও পিটারের পর পর মৃত্যুতে ডরোথির মাথা সম্পূর্ণ খারাপ হয়ে গিয়েছে। উন্মাদ পত্নী ও কঠিন সংস্কৃত ব্যাকরণ এই দুয়ের চর্চায় কেরীর দিবারাত্রি এখন বিভক্ত। একজন স্থানীয় লোকের সাহায্যে ফেলিক্স যথাসাধ্য

গৃহকর্মাদি করে।

রাম বসু থাকতেই কেরী সংস্কৃত সাহিত্যের বিপুল ভাণ্ডার আবিষ্কার করেছিল। পাণ্ডিত্য ও কাণ্ডজ্ঞানের বলে সে বুঝেছিল—রাম বসুর ফারসীও নয়, ন্যাড়ার লোক-মুখের ভাষাও নয়—সংস্কৃত ভাষার মধ্যেই ভারতীয় যাবতীয় ভাষার প্রাণ-রহস্য নিহিত। রাম বসু ও পার্বতী ব্রাহ্মণ একবাক্যে কেরীকে সমর্থন করল—সংশয়ের আর কিছু রইল না। কেরী সবেগে নিজেকে নিক্ষেপ করল সংস্কৃতভাষা-সমুদ্রে। সংস্কৃত ভাষার প্রেরণায় সে বুঝতে পারল যে এই আদর্শে গড়ে তুলতে হবে বাংলা গদ্য-রীতি। তখন সে সংস্কৃত ব্যাকরণের মডেলে বাংলা ব্যাকরণ এবং সংস্কৃত অভিধানের মডেলে বাংলা অভিধান সঙ্কলন শুরু করে দিল। অন্যদিকে চলল বাইবেল তর্জমার কাজ। বাইবেলের সেণ্ট ম্যাথিউ লিখিত সুসমাচারের অনুবাদ রাম বসুর সহযোগিতায় শেষ হয়েছিল, এবারে নবার্জিত সংস্কৃত-জ্ঞানের সাহায্যে তার সংশোধন চলল।

কেরী ভাবল, অনুবাদ তো চলছে, ক্রমে আরও জমে উঠবে, কিন্তু ছাপবার উপায় কি? এমন সময়ে সে খবর পেল কলকাতায় একটি ছাপাখানা নামমাত্র মূল্যে বিক্রয় হচ্ছে। কেরী অবিলম্বে কলকাতায় গিয়ে ছাপাখানাটি কিনে মদনাবাটিতে ফিরে এল। ফিরে এসে দেখল যে, উডনীর একখানা চিঠি অপেক্ষা করছে। কুঠি উঠিয়ে দেবার সিদ্ধান্ত জানিয়েছে উডনী। তখন কেরী নিকটবর্তী খিদিরপুর গ্রামে এক নীলকুঠি ক্রয় করে সপরিবারে সেখানে উঠে চলে গেল।

টমাস চলে গেলে কিছুদিন পরে ফাউণ্টেন নামে ধর্মোৎসাহী এক যুবক তার কাজে এসে যোগ দিয়েছিল—তারই সাহায্যে কোন রকমে কাজ চলল। কিন্তু মনের মধ্যে সে অনুক্ষণ অনুভব করত রাম বসুর অভাব। রাম বসুর উৎসাহ, বিচক্ষণতা, ভাষাজ্ঞান, ও সাহিত্যপ্রীতির অভাব সে পদে পদে অনুভব করতে লাগল। এক-একবার মনে হত মুন্সীকে আনবার জন্যে ফাউণ্টেনকে পাঠিয়ে দিই, আবার তখনই মনে হত, না থাক, লোকটা ঘোরতর দুশ্চরিত্র। এই রকম দোটানার মধ্যে কোন রকমে গড়িয়ে গড়িয়ে চলতে লাগল কেরীর কর্মজীবন।

তৃতীয় খণ্ড

১
রোজ এলমার (Rose Aylmer) বা গুলবদনী

বাগানে দেশী বিদেশী নানা জাতীয় ফুল ; গোলাপের বাহারই কিছু বেশি ; সাদা লাল, কোথাও কুঁড়ি কোথাও ফোটে-ফোটে, কোথাও পূর্ণ প্রস্ফুটিত। রেশমী বেছে বেছে স্ফুটনোম্মুখ লাল কুঁড়ি তুলছিল। একবার একটি তোলবার জন্য হাত বাড়ায়, ভাল করে নিরীক্ষণ করে হাত গুটিয়ে নেয়--কিছুতেই পছন্দ হয় না। অবশেষে অনেকক্ষণ ঘুরে অনেকগুলো কুঁড়ি তুলল, তুলে ঘরে ফিরে এল। ঘরে এসে একটি জরির সুতো নিয়ে বেশ ভাল করে একটি তোড়া বাঁধল।

তার পরে তোড়াটি নিয়ে একটি তরুণীর কাছে গিয়ে বলল—এই নাও মিসিবাবা।

তোড়াটি নিয়ে তরুণী করুণ-সুন্দর হাসি হেসে বলল—ঐ বিশ্রী নাম করে আমাকে ডেকো না—ওর অর্থ হচ্ছে 'মিস ফাদার'।

রেশমী বলল, ঐ নামেই তো সকলে ডাকে তোমাকে।

সকলে যা খুশি বলুক, তোমার সঙ্গে সম্বন্ধ আলাদা। দেখ না আমি তোমাকে কেমন Silken Lady বলে ডাকি।

তরুণী 'রেশমী' শব্দের অর্থ জেনে নিয়ে অনুবাদ করে নিয়েছিল 'Silken Lady'।

কি বলে ডাকলে তুমি খুশি হও ?

কেন, তুমি যে মাঝে মাঝে 'গুলবদনী' বলতে তাই বল না কেন, নইলে auntie যেমন Rosy বলে—তাই ব'ল।

রেশমী বলল, তার চেয়ে দেশী নামটাই ভাল, তোমাকে না হয় গুলবদনী বলেই ডাকব।

মনে থাকবে ত ?

দেখো, এবার আর ভুল হবে না।

তখন রোজ এলমার তোড়াটি নিয়ে উঠে দাঁড়াল, টেবিলের উপরে একজন তরুণের ছবি দাঁড় করানো ছিল, তার কাছে গিয়ে রেখে দিল।

রেশমী বললে, তোমাকে এত যত্নে তোড়া বেঁধে দিই, তুমি রোজ রোজ সেটা ঐ ছবির কাছে নিয়ে রেখে দাও কেন ? ও কার ছবি ?

রোজ এলমার হাসল, বলল, ও একজন কবির ছবি।

কবিওয়ালার সঙ্গে তোমার সম্বন্ধ কি ?

সে প্রশ্নের উত্তর এড়িয়ে গিয়ে রোজ এলমার বলল, জান, ছবিখানা আমি এঁকেছি।

তুমি ছবি আঁকতে জান নাকি ? কই কখনও দেখি না তো আঁকতে ?

দেশে থাকতে আঁকতাম—এদেশে এসে ঐ একখানা ছবিই এঁকেছি।

কই মানুষটাকে তো কখনও দেখি নি ?

মানুষটা দেশে আছে।

বেশ কথা! মানুষ রইল দূরে, ছবি আঁকলে কি করে?

তরুণী হেসে বলল, দূরে থাকলেই কি সব সময়ে দূরে থাকে?

সে আবার কি রকম?

মনের মধ্যেও তো থাকতে পারে!

কথাটা রেশমী ঠিক বুঝল কিনা জানি না, সে বলে উঠল—ঐ যে মিঃ স্মিথ আসছে, আমি যাই।

না, না, তুমি থাক।

রেশমী সে কথায় কর্ণপাত করল না, এক দরজায় সে বেরিয়ে গেল, অন্য দরজায় প্রবেশ করল জন স্মিথ।

শুভ সন্ধ্যা, মিস এলমার!

শুভ সন্ধ্যা, মিঃ স্মিথ। ব'স।

জন অপাঙ্গে ছবিটির কাছে নিয়মিত স্থানে নিয়মিত ফুলের তোড়াটি দেখে অপ্রসন্ন মুখে উপবেশন করল।

আশা করি, আজকের দিনটা আনন্দ কেটেছে।

কালকের দিন যেমন কেটেছিল তার চেয়ে বেশিও নয়, কমও নয়।

মিস এলমার, আমার ইচ্ছা তোমাকে নিয়ে একদিন নৌ-বিহারে যাই। আমরা একখানা নূতন হাউসবোট কিনেছি।

মিস এলমারকে নীরব দেখে জন বলে উঠল, সঙ্গে মিস স্মিথও যাবে।

সেজন্য নয়, নদীর মাঝিদের কোলাহল আমার ভাল লাগে না—তার চেয়ে এই বাগানের নীরবতা বড় মধুর।

কিন্তু কর্নেল রিকেট তো তোমাকে মাঝে মাঝে এখানে-ওখানে নিয়ে যায়।

সে যে নাছোড়বান্দা।

আমি নিরীহ, সেটাই কি তবে দোষ?

কখনও কখনও, হেসে উত্তর দেয় এলমার।

বেশ, তবে এবার থেকে জবরদস্তি করব।

যার যা স্বভাব নয় তেমন আচরণ করতে গেলে আরও বিসদৃশ দেখাবে।

দেখ মিস এলমার, আমি ঐ গোঁয়ারটাকে একদম পছন্দ করি নে। তুমি কি করে ওটাকে সহ্য কর তাই ভাবি।

ও যে জঙ্গী সেপাই, গোঁয়ার্তুমি করাই ওর ব্যবসা।

লোকটা বড় অভদ্র।

ভদ্রতা করলে লড়াই করা চলে না।

কিন্তু তোমার বাড়ি কি লড়াই-এর মাঠ?

ও হয়তো এ-বাড়িটাকে অপরের বাড়ি মনে করে না।

ঠিক বলেছ, লোকটা এমন ভাবে তোমার ঘরে প্রবেশ করে, যেন এটা ওর পৈতৃক আলয়।

এটাই তো যুদ্ধজয়ের রহস্য।

কিন্তু এ বাড়িতে যুদ্ধজয়ের আশা ওর নেই।

বুঝলে কি করে?

এ তো সহজ ব্যাপার। আত্মম্ভরি লোকটা তোমাকে নিজের যে ছবিখানা উপহার দিয়েছিল—ঐ যে তার উপরে জমেছে ধুলো। আর প্রতিদিন ফুলের তোড়া পড়ে...আচ্ছা মিস এলমার, ছবিটি নাকি একজন কবির—কই নাম তো শুনি নি!

একদিন শুনবে।

আচ্ছা, ও কি গ্রে, বার্নস্‌-এর মত লিখতে পারে?

এই দেখ! একজন কবি কি অপর কবির মত কবিতা লেখে? গোলাপ কি ডালিয়ার মত? তার পর বলে—জান মিঃ স্মিথ, ঐ কবির সঙ্গে আমার একটা চুক্তি হয়েছে!

শঙ্কিত জন শুধায়, কি চুক্তি?

আমি মরলে এমন সুন্দর একটা কবিতা লিখবে যাতে আমার নাম অমর হয়ে থাকবে।

আহা, তুমি মরতে যাবে কেন?

আমি কি অমর হয়ে জন্মেছি?

অন্তত একজনের মনে।

তবে বোধ করি সে অমর। কিন্তু ঠাট্টা ছাড়, আমার মনে হয় কি জান, এখানকার প্রতিকূল আবহাওয়ায় আমি বুঝি বেশি দিন বাঁচতে পারব না।

তার পরে নিজ মনে বলে চলে, কি জীবন! নাচ-গান, হৈ-হল্লা, পান-ভোজন, জুয়ো-আড্ডা, ডুয়েল-মারামারি! অসহ্য! এর মধ্যে লোকে বাঁচে কি করে?

জন বলে, বাঁচে আর কই, কটা লোক পঞ্চাশ পেরোয় কলকাতায়?

তবু তো পঞ্চাশ অবধি টেঁকে—আমি তো কুড়িও পার হতে পারব না।

Three-score and ten! তার আগে তোমাকে মারে কে? সদম্ভে সদর্পে ঘরে প্রবেশ করে সগর্জনে বলে ওঠে জঙ্গী সেপাই কর্নেল রিকেট।

তার পরে টুপিটা টেবিলের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে প্রকাণ্ড একখানা চেয়ারের সর্বাঙ্গে আর্তনাদ উঠিয়ে বসে পড়ে বলে, শুভ সন্ধ্যা রোজি!

শুভ সন্ধ্যা কর্নেল, এই যে এখানে মিঃ স্মিথ আছে।

মিস এলমারের কথায় ফলোদয় হয় না, রিকেট লক্ষ্যই করে না জনকে। তার বদলে উঠে দাঁড়িয়ে তরুণ কবির পদপ্রান্তে লুণ্ঠিত তোড়াটি হস্তগত করে বলে ওঠে—এটা তো আমার প্রাপ্য, অস্থানে কেন?

নীরব ঈর্ষায় জ্বলতে থাকে জন।

তার পর রিকেট নিজের বোতাম থেকে লাল গোলাপের কুঁড়িটি খসিয়ে নিয়ে মিস এলমারের দিকে এগিয়ে দেয়—সঙ্গে সঙ্গে ফরাসী কায়দায় 'বাউ' করে—বলে—Rose to Rose! তার পরে একবার কটাক্ষে জনকে লক্ষ্য করে বলে, ফরাসী ধরনে 'বাউ' করার কায়দাটি শিখেছি মঁ দুবোয়ার কাছে। লোকটা গুণী বটে।

লজ্জায় ঘৃণায় মাটিতে মিশিয়ে যায় জন। মিস এলমারেরও সঙ্কোচের অবধি থাকে না।

মিস এলমার, কাল আমরা মস্ত একটা দল নৌকোয় করে সুখচরে যাচ্ছি। খুব হৈ-হল্লা, স্ফূর্তি হবে।

কথায় মোড় ঘুরল এই আশায় মিস এলমার বলল, তাই নাকি, খুব আনন্দের বিষয়। তা কে কে যাচ্ছে?

অনেকেই যাচ্ছে, সঙ্গে তুমিও যাচ্ছ।

রোজ কুণ্ঠিতভাবে বলল—আমার তো ভাল লাগে না।

সঙ্গে আমি থাকলে অবশ্যই ভাল লাগবে।

রোজ আবার মৃদু আপত্তি করল। রিকেট সে সব ঠেলে দিয়ে বলল, ওসব ঠিক হয়ে গিয়েছে। কাল ব্রেকফাস্টের পরে তোমাকে তুলে নিতে আসব।

ম্লান ছায়ার মত সন্তর্পণে প্রস্থান করল জন, তার পক্ষে আর বসে থাকা অসম্ভব হয়ে পড়েছিল। প্রেমে ও সঙ্কটে যারা ইতস্তত করে, তাদের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী।

নিঃসপত্ন যুদ্ধক্ষেত্রে বিজয়ীর অকুণ্ঠিত প্রত্যয়ে কর্নেল বলে উঠল, তুমি অবশ্যই যাচ্ছ—তোমার জন্যেই এত আয়োজন এত খরচ, দেশ থেকে সদ্য আনীত তিন কাস্কেট বী-হাইভ ব্রান্ডি !...নাও, অমন মন-মরা হয়ে থেকো না রোজি, চল একটু হাওয়া খেয়ে আসা যাক—আমার গাড়ির নূতন জন্তুটা দেখবে কেমন ছোটে ! চল, রেলকোর্সে এক পাক ঘুরে এলেই মনটাও হাল্কা হবে—আর খিদেটাও বেশ জমবে।

জঙ্গী কর্নেলের উৎসাহে বাধাদান রোজ এলমারের সাধ্য নয়—কাজেই সে ফাঁসির আসামীর মুখ নিয়ে চেপে বসল গিয়ে নূতন জন্তুতে টানা গাড়িতে, আদিম জন্তুটির পাশে।

গাড়ি ছুটল টগবগিয়ে। চরম বিজয়ের আশায় উল্লসিত সুখাসীন কর্নেল রিকেট তখন জীবনের ফিলজফি ব্যাখ্যায় লেগে গিয়েছে। সে ফিলজফি তার যেমন, তেমনি সেকালের কলকাতা সমাজের অধিকাংশ শ্বেতাঙ্গেরও বটে।

রোজি ডিয়ার, জীবনটার অর্ধেক যুদ্ধক্ষেত্র, অর্ধেক জুয়োর আড্ডা, দুই জায়গাতেই লড়াই আর তার জন্যে চাই টাকা। কাজেই যেন-তেন-প্রকারেণ চাই টাকা রোজগার করা। যে কটা দিন বাঁচা যায় স্ফূর্তি করে নিতে হবে, কারণ কবে যে কলকাতার Ditch Fever আক্রমণ করে বসবে তার স্থিরতা নেই।

কর্নেলের বিচিত্র ফিলজফি শুনে রোজ এলমার স্তম্ভিত হয়, বলে, তবে যে এত খরচ করে সেন্ট জনস্ চার্চ তৈরি হল তার সার্থকতা কোথায় ?

ওসব হচ্ছে বাতিকগ্রস্ত লোকের কাণ্ড।

বল কি ! জীবনে তবে ধর্মের স্থান নেই ?

একেবারেই নেই তা নয়, লড়াই ফতে করবার জন্যে একটা ভগবানের দরকার।

শুধু এই জন্যেই ?

তাছাড়া আর কি, আমার বুদ্ধিতে তো আসে না। আসল কথা কি জান ডিয়ারি, লড়াই হক আর জুয়োর টেবল্ হক, চাই সাহস, ভীরুর স্থান নেই জীবনে।

রিকেট নিজের বাগ্মিতায় এমন মুগ্ধ হল যে গলা খুলে গান ধরল—

None but the Brave, none but the Brave, none but the Brave deserves the Fair.

সঙ্গে সঙ্গে ঢিল দিল লাগামে—গাড়ি ছুটল দ্রুত।

জন স্মিথ হেঁটে যাচ্ছিল, তার চোখে পড়ল গাড়ির উল্কাপাত, মনে পড়ল তার আর একদিনের কথা, রোজ এলমারের জন্য সে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল।

২
আর একদিনের কথা

জন ফিরছিল ময়দানের দিক থেকে, এমন সময়ে দেখতে পেল ছোট একখানা হাল্কা গাড়ি ছুটছে বেগে, ঘোড়া রাশ মানছে না তরুণী আরোহীর হাতে। জন বুঝল আর একটু পরেই গাড়িসুদ্ধ তরুণী উল্টে পড়বে খানার মধ্যে। গাড়িখানা যেমনি তার কাছে এসে পৌঁছল, অমনি সে প্রাণের মায়া ত্যাগ করে লাফিয়ে উঠল গাড়ির পাদানির উপরে, আর লাগাম সবলে আকর্ষণ করল। দশ-বিশ গজ গিয়েই গাড়ি থামল প্রকাণ্ড একটা ঝাঁকুনি খেয়ে। তরুণী হুমড়ি খেয়ে পড়ল জনের গায়ে, জন বাঁহাতে তাকে জড়িয়ে ধরল, নইলে সে পড়ে যেত নীচে।

খুব কি লেগেছে তোমার ?

দু-চার মুহূর্ত দম নিয়ে তরুণী বলল, আর দু-দণ্ড তুমি না এলে আমার আজ দুর্দশার অন্ত থাকত না।

জন বলল, সব ভাল যার শেষ ভাল। এমন একা বের হওয়া উচিত হয় নি।

প্রত্যেকদিন্ তো একাকীই বের হই, তবে আজ ঘোড়াটা নূতন। অনুগ্রহ করে আমাদের বাড়িতে চল। তুমি আমার প্রাণ বাঁচিয়েছ শুনলে মেসো আর মাসিমা খুব খুশি হবে।

এবারে জন তরুণীকে লক্ষ্য করল, এতক্ষণ আসন্ন বিপদের কথা ভাবছিল।

জন দেখল তরুণী আশ্চর্য সুন্দরী। শরতের ঊষাকে পেটিকোট আর বডিস পরিয়ে যেন ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। পরিশ্রমে ও উদ্বেগে সে সৌন্দর্য আমূল প্রকট হয়ে উঠেছে, ঝড়ের আভাস-লাগা শরতের ঊষা।

তরুণী রোজ এলমার। সুপ্রীম কোর্টের জজ সার হেনরি রাসেলের শ্যালীকন্যা।

সার হেনরি ও লেডি রাসেল সব শুনে জনকে সাদর অভ্যর্থনা করে নিল ; বলল, জন, তোমার বাড়ি তো কাছেই, যখন খুশি এসো। তারা বলল, রোজ দেশ থেকে সবে এসে পৌঁছেছে, এখনও কারও সঙ্গে পরিচিত হয় নি, বড় নিঃসঙ্গ অনুভব করছে, তুমি এলে ও খুশি হবে। অবশ্য আমরাও কম খুশি হব না।

ঘটনাচক্রে জনের রাসেলদের বাড়িতে যাতায়াতের পথ সুগম হয়ে গেল। নতুবা এমন আশা ছিল না, কেননা সামাজিক বিচারে রাসেলরা স্মিথদের উপরের থাকের লোক।

রোজ এলমারের সঙ্গে জনের বন্ধুত্বে লিজা মনে মনে খুশি হল, ভাবল এতদিনে কেটির অভাব ও ভুলতে পারবে।

লিজা মাঝে মাঝে রোজ এলমারকে নিমন্ত্রণ করে বাড়িতে নিয়ে আসে। লেডি রাসেলের নিমন্ত্রণে সে-ও যায় তাদের বাড়িতে। জন ও রোজের পরিচয় যে প্রণয়ে পরিণত হয়েছে, স্ত্রীসুলভ বুদ্ধিতে বুঝে নিল লিজা।

একদিন সে জনকে বলল—রোজকে বিয়ে কর না জন।

আগের দিনের জন হলে কথাটা অসম্ভব মনে হত না তার কাছে। কিন্তু কেটির ব্যাপারে এমন আঘাত পেয়েছিল যে, তার মনে একটা দীনতার ভাব স্থায়ীভাবে বাসা

বেঁধেছিল, তাই সে বলল—কোন্‌দিন বলবে, জন, চাঁদকে বিয়ে কর!

তা তো আর বলছি নে।

প্রায় তাই বলছ। জান রোজ এলমার লাটঘরানা?

তার চেয়েও বেশি জানি। রোজের বাপ আবার বিয়ে করেছে—সেই দুঃখেই তো এদেশে চলে এসেছে ও।

তার পরে একটু থেমে বলল, এদেশে তোমার চেয়ে ভাল বর পাবে কোথায়?

জন বলল, হয়তো তা অসম্ভব ছিল না, কিন্তু মাঝখানে এক কবি এসে জুটেছে।

সে আবার কে? বিস্ময়ে শুধায় লিজা।

ওয়াল্টার ল্যাণ্ডের তার নাম, বয়সে রোজের প্রায় সমান, লোকটা নাকি কবি।

কোথায় থাকে সে?

দেশে।

নিশ্চিন্ত হয়ে লিজা বলল, তাই বল। সে যদি দেশে থাকে, তবে তোমার বাধা কোথায়?

ছবিতে লিজা, ছবিতে। আমি প্রতিদিন যত ফুল নিয়ে গিয়ে দিই, সব পড়ে গিয়ে ছবির পদতলে।

ছবিকে ভয় ক'র না জন, ও ছায়া মাত্র।

কিন্তু কায়াটা আছে মনের মধ্যে, নইলে ছায়া আসে কিভাবে?

তুমি এবারে মনের মধ্যেকার কায়াটাকে ঠেলে ফেলে দিয়ে সেখানে গিয়ে আসন নাও। অনুপস্থিত কবির চেয়ে বেশি দাবি উপস্থিত ব্যবসায়ীর। জন, আমার কথা শোন, মেয়েরা লতার মত, যে গাছটা কাছে পায় তাকেই জড়িয়ে ধরে।

জন দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলে, মনের মানুষের চেয়ে কাছে আর কে!

তার পরে একটুখানি নীরব থেকে বলে, তা হবার নয় লিজা, বিশেষ মিস এলমার একটু অন্য প্রকৃতির লোক।

হেসে ওঠে লিজা, বলে, সব মেয়েরই এক প্রকৃতি, তাদের কাছে শেষ পর্যন্ত কাছের মানুষের মূল্য বেশি হয়ে দাঁড়ায় মনের মানুষের চেয়ে।

তবে তোমার বেলায় ভিন্ন নিয়ম দেখছি কেন, তোমার কাছে তো রিংলার আর মেরিডিথ দুটি বনস্পতি বর্তমান।

সেই তো হয়েছে বিপদ। কোন্‌টিকে বেয়ে উঠব বিচার করতে করতেই বিয়ের বয়স গেল পেরিয়ে।

তার পরে গম্ভীরভাবে বলে, না জন, আমি ওল্ড মেড, আইবুড়ো হয়ে থাকব।

এ কেমন শখ!

শখের কি কোন কারণ থাকে!

তার পরে আন্তরিকতার সঙ্গে বলে লিজা, না জন, শীঘ্র বিয়ে কর। বাবা গত হবার পর থেকে বাড়িটা খাঁ খাঁ করছে। তাছাড়া একবার মিস এলমারের কথাটাও ভেবে দেখা উচিত, সে খুব নিঃসঙ্গ।

আপাতত একটি সঙ্গিনী জুটিয়ে দিয়েছি।

দেখেছি মেয়েটিকে, এদেশী মেয়েদের মধ্যে অমনটি সচরাচর দেখা যায় না। প্রথম দিন দেখে হঠাৎ ইউরেশিয়ান মেয়ে বলে মনে হয়েছিল।

হাঁ, ইংরেজি বলতে কইতে শিখতে বেশ মজবুত।
এই বলে রেশমীর পূর্ব ইতিহাস শোনায় জন লিজাকে।

৩
এক নদীতে দুইবার স্নান সম্ভবে না

দার্শনিকেরা বলেন এক নদীতে দুবার স্নান করা সম্ভব নয়। মানুষ সম্বন্ধে একথা আরও সত্য। নিয়ত সঞ্চরমাণ চৈতন্যপ্রবাহ মানুষকে অবলম্বন করে চলেছে, এই মুহূর্তের মানুষ পরমুহূর্তে থাকে না। এক মানুষের সঙ্গে দুবার কথা বলা সম্ভব নয়। জলপ্রবাহ নিয়ত পরিবর্তনশীল, নদী অপরিবর্তিত। চৈতন্যপ্রবাহ পরিবর্তনশীল, মনুষ্যরূপী সংস্কার অপরিবর্তিত। কিন্তু তলিয়ে বিচার করলে দেখা যাবে নদী ও মানুষ দুই-ই চঞ্চল। সব নদীতে স্রোতোবেগ সমান নয়, সব মানুষে চৈতন্যপ্রবাহ সমান গতিশীল নয়। মহানদীতে ও মহাপুরুষে পরিবর্তন দ্রুততর।

যে রাম বসু মালদ গিয়েছিল আর যে রাম বসু মালদ থেকে ফিরল কেবল তত্ত্ববিচারে তারা ভিন্ন নয়—ব্যবহারিক বিচারেও তাদের ভেদ প্রকট হয়ে উঠল।

বিনা নোটিশে রাম বসুকে ফিরতে দেখে পত্নী অন্নদা ঝঙ্কার দিয়ে উঠল—কথা নেই বার্তা নেই অমনি এসে পড়লেই হল!

উত্তম বীণা-যন্ত্রের ও সাধ্বী পত্নীর বিনা কারণে ঝঙ্কৃত হয়ে ওঠা স্বভাব।

আগে হলে রাম বসু উত্তর দিত, হয়তো বলত, নিজের বাড়িতে আসব তার আবার এত্তালা কি ; হয়তো বলত, যখন শালাদের বাড়িতে যাব—তোমাকে দিয়ে আগে এত্তালা পাঠাব। ঐ উপলক্ষে স্বামী-স্ত্রীতে এক পশলা ঝগড়া হয়ে যেত। কিন্তু এখন তেমন উদ্যম করল না, শুধু একবার হেসে বলল, ভাল লাগল না, চলে এলাম। তাছাড়া অনেকদিন তোমাদের দেখি নি।

মরি মরি, কত সোহাগ রে, বলে অন্নদা বলয়ঝঙ্কৃত হাতখানা তার মুখের কাছে বার-কতক নেড়ে দিল।

নরোত্তম বা নেরু ন্যাড়াদাকে পেয়ে খুশি হল, তার সঙ্গে জুটে গেল।

অন্নদা লক্ষ্য করল যে রাম বসু এবারে কেমন যেন নীরব, সর্বদা মনমরা হয়ে থাকে, নয়তো বাইরে বাইরে ঘুরে বেড়ায়।

রাম বসু বার হতে যাচ্ছে দেখে জিজ্ঞাসা করে, কোন্ ভাগাড়ে যাচ্ছ?

একটা চাকুরি ছেড়ে এলাম, আর একটা খুঁজে বার করতে হবে তো? চলবে কি করে?

কেন, ধিঙ্গিপনা করে! যাও খিরিস্তানগুলোর সঙ্গে গিয়ে ঘোর গে! দিলে তো ঝাঁটা মেরে বিদেয় করে!

নিরুত্তর রাম বসু চাদরখানা কাঁধে ফেলে বেরিয়ে যায়।

ঝগড়ার মুখে নিরুত্তর স্বামী স্ত্রীর পক্ষে অসহ্য। উত্তর-প্রত্যুত্তর দুইজনে ভাগ করে নেবে—এই হল গিয়ে কলহের গার্হস্থ্যবিধি। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে স্ত্রীকে একা পূর্বপক্ষ ও উত্তরপক্ষ করতে হলে যে তাপ উৎপন্ন হয় তার আঁচ পাড়া-প্রতিবেশীর গায়ে গিয়ে

লাগে। স্বামীর ভর্ৎসনাকে স্ত্রী প্রেমের বিকার বলে গ্রহণ করে, কিন্তু স্বামীর নীরবতার অর্থ অবহেলা। কোন্ সাধ্বী স্ত্রী তা সহ্য করবে? রাম বসুর নিরুত্তর অবহেলায় কালবৈশাখীর অতর্কিত কর্কশ মেঘ-গর্জনের মত চীৎকার করে উঠল অন্নদা—এমন পাষাণের হাতেও পড়েছিলাম! এবং মুহূর্তেই কালবৈশাখীর বিপুল বর্ষণে সংসার-ক্ষেত্র পরিপ্লাবিত করে দিল—হাড় জ্বলে গেল, হাড় জ্বলে গেল, এখন মরণ হলেই বাঁচি!

অভীষ্ট ফলোদয়ে বিলম্ব হল না, পাশের বাড়ির বর্ষীয়সী বামুন-গিন্নী এসে উপস্থিত হল।

কি আবার হল কায়েৎ বউ, এতদিন পরে সোয়ামী ঘরে এল, অমন করে কি কাঁদতে আছে!

সোয়ামী ঘরে এল তো আমার চৌদ্দ পুরুষ স্বর্গে গেল! এখন মরণ হলেই বাঁচি বামুনদিদি।

তবে সত্যি কথা বলি কায়েৎ বউ—বলে ধীরেসুস্থে আসন গ্রহণ করে মধুর উপদেশের সঙ্গে তীব্র বিষ মিশিয়ে দিয়ে—তেমন করে মধুতে বিষে মেশাতে কেবল মেয়েরাই পারে—বলল, সত্যি কথা বলি বাছা, পুরুষ মানুষ একটু গায়েগত্তি আশা করে, কেবল নাকে কাঁদলে কি পুরুষের মন পাওয়া যায়! তুমি তো বাছা কাঠের পুতুল—আমার কথা যদি শোন—

কথা শোনাবার সুযোগ বামুন-গিন্নীর ঘটল না, ছিন্ন-জ্যা ধনুর্যষ্ঠির মত উৎক্ষিপ্ত হয়ে উঠে দাঁড়াল অন্নদা—তোমাকে তো সাতটা বাঘে খেয়ে ফুরোতে পারবে না, তবে বামুন দাদা সারারাত বাইরে বাইরে কাটায় কেন? বলি আমাকে আর ঘাঁটিও না।

এত বড় অপবাদেও বামুন-গিন্নী বিচলিত হল না, আত্মস্থভাবে ধীরেসুস্থে বলল, তোমরা তো আসল কথা জান না—তাই ঐ রকম ভাব, বামুন শ্মশানে গিয়ে শব-সাধনা করে—তান্ত্রিক কিনা!

তবু যদি সব না জানতাম। শ্মশান হচ্ছে গিয়ে সোনাগাছি আর শবটি হল ক্ষান্তমণি।

ভরি-পরিমাণ দোক্তা মুখের মধ্যে নিক্ষেপ করে বেশ চিবিয়ে চিবিয়ে বামুন গিন্নী বলল, এত কথাও জান, তোমার কর্তাটির সঙ্গে দেখা হয়েছিল বুঝি, না তোমার নিজেরই যাওয়া-আসা আছে ওই দিকে?

তবে রে শতেকখোয়ারী মাগী—

তখন অবিচলিত বামুন-গিন্নী উঠে দাঁড়িয়ে ধীরপদে অগ্রসর হতে হতে শেষ বিষটুকু ঝেড়ে বিদায় হল—এখন থেকে রাতের বেলায় বামনুটাকে আর অত দূরে যেতে দেব না—বলব পাশের বাড়িতেই শবের যোগাড় হয়েছে, চণ্ডালের শবের অনুসন্ধান করছিল কিনা লোকটা!

এ কথার যোগ্য উত্তর মানবভাষায় সম্ভব নয় বুঝে অন্নদা সম্মার্জনীর সন্ধান করছিল। সশস্ত্র প্রত্যাবর্তন করে দেখল শত্রু প্রস্থিতা। তখন সে মনের আক্রোশ মিটিয়ে শত্রু-অধিকৃত স্থানটির উপরে সম্মার্জনী বর্ষণ করতে শুরু করল, মর্ মর্ তুই শুকিয়ে, পাটকাঠি হয়ে শীগগির মর্।

টুশকি বলে, কায়েৎ দা, এবারে তোমার রকম-সকম কিছু ভিন্ন রকম দেখছি।

কি রকম দেখছিস বল্ না!

কথাবার্তা আর আগের মত নয়।

রাম বসু বলে, না রে, আর কথাবার্তায় ফুল ফোটানো নয়, এবারে ভিতরের দিকে শিকড় চালিয়ে দিচ্ছি।

সেখানে রস যোগাচ্ছে কে, গৌতমী নাকি ? শুধায় টুশকি।

রাম বসু হেসে বলে, কে, ওই ছোট্ট মেয়েটা ? তার সাধ্যি কি !

রেশমী বলেছিল, কায়েৎ দা, আমার নামটা আর গাঁয়ের নামটা প্রকাশ ক'র না। মুখ পুড়িয়েছি, কে কোথায় চিনে ফেলবে।

রাম বসু বলে, তা ছাড়া চণ্ডী বক্সীর ভয়টাও আছে।

রেশমীকে গৌতমী বলে উল্লেখ করে ন্যাড়া আর রাম বসু।

টুশকি শুধায়, মেয়েটাকে একদিন নিযে এসো না। খুব দেখতে ইচ্ছে করে।

তাকে আনা সহজ নয় রে, সে এখন সাহেব-বাড়ির দাসী, মেমসাহেবরা খুব ভালবাসে।

তবে একদিন আমাকেই কেন নিয়ে চল না সেখানে ?

কি বলে পরিচয় দেব ?

বলবে, ওর দিদি।

আচ্ছা দেখি, আজকাল আমিই দেখা করবার সুযোগ পাই কম।

টুশকি বলল, কায়েৎ দা, অনেকদিন পরে এলে, আজ রাতটা এখানে থাক না।

রাম বসু একটু ভেবে বলল, না, আজকে থাক।

কেন, কায়েৎ বউদির ভয়ে বুঝি ? কেমন আছে বউদি ?

সে তোর ঐ চরখাটার মত, যত সুতো কাটে তার বেশি জড়ায়, ঘ্যানর ঘ্যানর করে তার চেয়ে বেশি।

টুশকি বলে, আহা কি সুখের তোমার জীবন !

রাম বসু কিছু বলে না, একটা দীর্ঘনিশ্বাস চাপে।

টুশকির কাছে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে পড়ে রাম বসু, চলতে থাকে উদ্দেশ্যহীন ভাবে এপথ সেপথ ধরে।

পাহাড়ের চূড়ায় সজ্জিত ছিল স্তরবিন্যস্ত শুষ্ক ইন্ধন, সে জানত একদিন না একদিন নামবে বিদ্যুদগ্নিশিখা, প্রজ্বলিত দাবানলে সার্থক হবে তার নিষ্প্রভ জীবন। সহসা নামল বহুপ্রতীক্ষিত শিখা ; ইন্ধনবহ্নি উর্ধ্বোত্থিত করযুগলে বলে উঠল, ধন্য হল আমার প্রতীক্ষা, সার্থক হল আমার জীবন, যত দাহ সার্থকতা তত অধিক।

রাম বসুর মন পর্বতচূড়াস্থ ইন্ধনস্তূপ, রেশমী বিদ্যুদ্‌বহ্নিশিখা।

মধ্যযুগের জীবন-মানদণ্ড ছিল পাপ আর পুণ্য। নব্যযুগ বদলে ফেলল পুরাতন মানদণ্ড, তার বদলে গ্রহণ করল নুতন মানদণ্ড—সুন্দর আর কুৎসিত। নব্যযুগের চোখে যা সুন্দর তা-ই পুণ্য, যা কুৎসিত তা-ই পাপ। মধ্যযুগ শিল্পী, মধ্যযুগ সাধক। নব্যযুগের প্রথম মানুষ রাম বসুর চোখে সৌন্দর্যের অরুণাভা উদ্‌ঘাটিত হল রেশমীর দিব্য সৌন্দর্যে। রাম বসু প্রচ্ছন্ন কবি।

রাম বসুর যখন সম্বিৎ হল সে দেখলে রাসেল সাহেবের বাড়ির কাছে এসে পৌঁছেছে—ভাবল একবার দেখা করেই যাই না কেন ! বাগানের খিড়কি দরজায় এসে সে ডাক দিল, রেশমী, রেশমী !

৪
বকলমে প্রেম

রাম বসু শুধালে, হাঁরে রেশমী, তার পর, কেমন লাগছে বল্?

রেশমী বলল, আমার ভাগ্যে এমন সুখ হবে ভাবি নি। রোজি দিদি খুব ভালবাসে।

আর কর্তা গিন্নী?

তাদের সঙ্গে দেখা হয় না। আর দেখা হলেই কি কাছে যাই? দূর থেকে সেলাম করে সরে পড়ি। তাদের আলাদা মহল।

আর কে কে আসে?

একজনকে তো চেন। জন সাহেব।

আর একজন কে?

মহাজন সাহেব!

মহাজন আবার কে রে?

যেমন মোটা তেমনি লম্বা, কুমোরের চাকার মত বেড় পেটের, মহাজন ছাড়া আর কি বলব?

আর কেউ আসে না?

এই দুইজনের উপরে আরও দরকার? বিশেষ, মহাজন সাহেব একাই একশ।

কেমন?

ঘরের মধ্যে যখন কথা বলে, ছাদের কড়িবরগা কাঁপে।

তুই কাঁপিস না?

আমি কাঁপি কিনা জানি নে তবে জন সাহেব কাঁপে।

কেন?

কেন কি, রাগে হিংসায় এককোণে বসে কাঁপতে কাঁপতে অবশেষে উঠে বেরিয়ে যায়।

কেন রে?

কেন রে! তুমি এত বোঝ আর এইটে বুঝতে পারছ না? দুইজনেই ভালবাসে রোজি দিদিকে। কিন্তু মহাজনের সঙ্গে পারবে কেন জন?

তোর রোজি দিদি কাকে আমল দেয়?

মহাজন কি সেই পাত্র যে তাকে আমল দিতে হবে। পুরনো জামাই-এর মত নিশ্চিন্তভাবে প্রবেশ করে সে।

আর জন সাহেব?

মুখটি শুকিয়ে বেরিয়ে চলে যায়।

আহা, বেচারার তবে বড় কষ্ট।

কষ্ট তো আসে কেন? ওরকম মেয়েলী পুরুষকে পছন্দ করে কোন্ মেয়ে! কথাগুলো ঝাঁঝের সঙ্গে বলে রেশমী।

তুই-ও দেখছি মহাজনের দিকে।

না হয়ে উপায় কি ! হ্যাঁ, একটা পুরুষ বটে।

না হয় তাই হল। তা কতদিন আর দ্রৌপদী হয়ে সৈরিন্ধ্রী বেশে থাকবি ?

যতদিন না কীচক-বধ সম্পন্ন হয়।

কীচক আবার হতে গেল কে ?

কেন, চণ্ডী খুড়ো ! কোন সন্ধান পেলে তার ?

কখনও তো চোখে পড়ে নি, বোধ করি সব ভুলে গিয়েছে।

পাগল হয়েছ তুমি ! ভীমরুল সাত হাত জলের তলে গিয়ে কামড়ায়—চণ্ডীখুড়ো যায় সাতান্ন হাত জলের তলে !

তাহলে খুব নিরাপদ স্থানে আছিস।

তা আছি বই কি। আর যদি এদিকে ভুলে আসেই, তবে ভীমসেন তো ঘরেই আছে।

কে ?

কেন, মহাজন সাহেব ! রেশমী হেসে ওঠে।

এবার তবে যাই।

মাঝে মাঝে এসো, একদিন ন্যাড়াকে এনো সঙ্গে।

আচ্ছা দেখব, বলে বিদায় নেয় রাম বসু।

রাতে একা ঘরে শুয়ে রোজ এলমার, জন কর্নেল রিকেটের নিত্যকার জীবনলীলার কথা চিন্তা করে রেশমী।

কতক ফল আছে যার পাক ধরে বাইরে থেকে শেষে একদিন ভিতরে গিয়ে পৌঁছয় পরিণতি। আর এক জাতের ফল আছে যাদের পরিণতি শুরু হয় ভিতরে, বাইরে থেকে হঠাৎ দেখলে মনে হয় বেশ কাঁচা, তার পরে বাইরে যখন রঙ ধরে বুঝতে হবে যে কোথাও এতটুকু অপরিণত নেই। রেশমী সেই শেষ জাতের ফল। ফুলকি তাকে জ্ঞান বৃক্ষের সন্ধান দিয়েছিল, তার পরে একদিন রাতে রাম বসু তার হাতে তুলে দিয়ে গেল জ্ঞানবৃক্ষের পরমরমণীয় ফলটি। রেশমী না পারল ফেলতে, না পারল গিলতে, কিংকর্তব্য স্থির করতে না পেরে বেঁধে রাখল আঁচলে। জ্ঞানবৃক্ষের স্বাদ গ্রহণ না করলেই যে তার প্রভাব নিষ্ক্রিয় থাকে তা নয়। তার সৌগন্ধে ঘরের বায়ু আমোদিত হয়ে মনকে উতলা করে, তার সৌন্দর্যে মন রঙীন হয়ে ওঠে, তার মধুর উত্তাপে মনটি তাপিত হতে থাকে। বেচারা রেশমী জানত না, কেউ বলে দিলেও স্বীকার করত না যে তার ভিতরে পাক ধরেছে। রাম বসুকে সে বলেছিল যে চিতার আগুনে সব পুড়ে গিয়েছে। কিন্তু সব কিছু কি পোড়ে ? সোনা ও বাসনা কি অগ্নিদাহ্য ? তবে বাসনার তাড়নায় অশরীরী প্রেত ঘুরে বেড়ায় কেন মৃত্যুর পরেও ? না, তা নয়। চিতার আগুনে রেশমীর পুড়েছিল হিন্দুনারীর সংস্কার, পোড়ে নি রমণী-হৃদয়। পুড়েছিল বাঁধন, পোড়ে নি বাসনা ; হয়তো সে বাসনা নিস্তেজ হয়ে থাকত তার জীবনে, কিন্তু এখন এমন এক পরিবেশে এসে পড়েছে সে, যেখানে সমস্তই বাসনার অনুকূল। পরিচিত আচার বিচার শাস্ত্র সংসার কতদূরে গিয়ে পড়েছে। তার উপরে রোজ এলমারকে নিয়ে প্রেমের যে লীলা চলেছে সম্মুখে, তার তাপে সমস্ত দেহমন উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। ওদের সুরার ছিটেফোঁটা এসে লাগে ওর গায়ে, তার তীব্র মদির গন্ধ নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করে—ওকে ভিতরে মাতিয়ে তোলে, তাতিয়ে দেয়। সে রোজ এলমারের বকলমে প্রেমাভিনয় করে—কার সঙ্গে ?

নারীসুলভ অশিক্ষিত-পটুতায় সে বুঝে নিয়েছিল যে ঐ গোঁয়ার কর্নেলটার কোন আশা নেই ; ঝড়ের বেগে লতা নত হয়, উন্মুলিত হয় না, তেমনি দশা মিস এলমারের কর্নেলের সম্মুখে। তাই কর্নেলের প্রতি রেশমী ঈর্ষা অনুভব করত না। কিন্তু জনের কথা স্বতন্ত্র। রেশমী জানত জনের প্রতি রোজ অনুকূল তবে মাঝে বাধা ঐ ছবিখানা। কি জানি কেন ঐ ছবির মানুষটার প্রতি কৃতজ্ঞতার ভাব অনুভব করে। জনকে আসতে দেখলে সে আরও বেশি করে ফুল ঢেলে দিত ছবির কাছে। জনের মুখ কালো হয়ে যেতে দেখলে সে ভারি আনন্দ পেত।

সেদিন ছিল রোজ এলমারের জন্মদিন। জন বেশ সাজগোজ করে উপহার নিয়ে এসে দেখে ছবিটি ফুলের তোড়ায় সাজানো, অগুরু গন্ধ উঠছে ধূপদীপ থেকে, জন এতটুকু হয়ে গেল।

রোজ বলল, দেখ জন, কেমন ইণ্ডিয়ান স্টাইলে সাজানো হয়েছে।

জন শুধু বলল, হুঁ।

রোজ আবার বলল, আমি এত জানতাম না, রেশমী সাহায্য করেছে।

অদূরে দাঁড়িয়ে ছিল রেশমী। জন রোষ-কটাক্ষে তাকাল তার দিকে, কৌতুকমিশ্রিত আনন্দ অনুভব করল সে।

আর একদিন জন আসতে রোজ বলল, দেখ জন, রেশমী আমাকে কত ভালবাসে। পুরনো কাঠের ফ্রেমের বদলে কেমন চন্দন কাঠের ফ্রেমে ভরে দিয়েছে ছবিখানাকে!

রাম বসুকে দিয়ে চীনেবাজার থেকে কাঠের ফ্রেম আনিয়ে নিয়েছে রেশমী। বলা বাহুল্য কারও প্রতি প্রেমে নয়, জন মর্মাহত হবে আশাতে।

জন বললে—বেশ।

শুধু ঐটুকু বললে ? ওকে একটা থ্যাঙ্কস্ দাও।

জন চাপা গলায় যন্ত্রের মত উচ্চারণ করল, থ্যাঙ্কস্—তা প্রায় Dam-এর মতই শোনাল।

তার উষ্মায় রেশমীর মুখে ফুটল হাসির রেখা। সে হাসি দেখে জন উঠল জ্বলে, বলল, মিস এলমার, আমি বোধ হয় দু-চার দিন আসতে পারব না।

ব্যস্ত হয়ে মিস এলমার বলল, কেন, কেন ?

রেশমী মনে মনে বলল, অত উদ্বিগ্ন হয়ো না রোজি, চব্বিশ ঘণ্টা না যেতেই বান্দা আবার ফিরে আসবে।

সুন্দরবনে যাব।

রেশমী মনে মনে বলল, একবার গিয়ে শখ মেটে নি ? সেবার তো হারিয়েছিলে কেটিকে, এবার বুঝি পৈতৃক প্রাণটা হারবার শখ !

কেটি-প্রসঙ্গ শুনেছে সে রাম বসুর কাছে।

জন জানত যে পশু-বধ পছন্দ করে না মিস এলমার। তাই বলল, মধুর সন্ধানে।

রেশমী মনে মনে বলে, এখানকার মধুর আশা তবে ছাড়লে ?

আমাকে কিছু দিও।

উল্লসিত জন বলে, তুমি নেবে ? ইনডীড ! কি করবে ? খাবে ?

না, মধু আমার ভাল লাগে না। রেশমী বলছিল ভাল মধু পেলে ইণ্ডিয়ান স্টাইলে অফারিঙ (offering) দেবে ছবির কাছে।

কালো হয়ে যায় জনের মুখ, বলে, আচ্ছা পেলে দেব, কিন্তু আজকাল ভাল মধু সুন্দরবনে পাওয়া যায় না।

কেন, সব বুঝি মঁ দুবোয়া খেয়ে ফেলেছে? মানস-উক্তি রেশমীর।

আর একদিনের কথা মনে পড়ে রেশমীর। জন আসতেই উল্লাসে মিস এলমার তাকে বলে, জন, আজ একটা surprise আছে তোমার ভাগ্যে।

আশা করি সুখদায়ক?

নিশ্চয়।

এই দেখ জুঁই কি না জেসমিন ফুলের মালা।

চমৎকার!

কি দিয়ে গাঁথা অনুমান কর তো!

কেমন করে বলব?

আমার চুল দিয়ে।

ওয়াণ্ডারফুল, হেভেনলি! দাও, রোজি, আমাকে দাও।

তা কি করে সম্ভব, ছবিটির জন্যে স্বহস্তে কত যত্নে তৈরী করেছে রেশমী।

জন বুঢ় কিছু বলতে যাচ্ছিল, এমন সময়ে চোখে পড়ল পর্দার ফাঁকে রেশমীর হাস্যোজ্জ্বল চোখ দুটি—মুখ ফিরিয়ে জানলার ধারে গিয়ে দাঁড়াল জন।

জনের হাড় জ্বলে যায় যখন দেখে যে কর্নেল রিকেট ঘরে ঢোকামাত্র রেশমী আভূমিনত হয়ে সেলাম করে, আর চেয়ারখানা সরিয়ে দেয় মিস এলমারের কাছে। জনকে সেলাম দূরে থাকুক যেন মানুষ বলেই গ্রাহ্য করে না। আবার চেয়ারখানা যদি মিস এলমারের কাছে থাকে, সুবিন্যস্ত করবার অজুহাতে বেশ খানিকটা দূরে সরিয়ে দেয়। আরও তার মনে পড়ে—কর্নেল রিকেট আসন গ্রহণ করলে সম্ভ্রমে ও যায় ঘর ছেড়ে বেরিয়ে, কিন্তু জন বসলে চায় না ঘর ছেড়ে নড়তে—আর যদিই বা বাইরে যায়, পর্দার চঞ্চলতা প্রমাণ করে সে পাশেই আছে দাঁড়িয়ে। অব্যক্ত ক্রোধে জ্বলতে থাকে জন, আবার ঠিক সেই পরিমাণে কৌতুক অনুভব করতে থাকে রেশমী।

সেদিনকার ঘটনা মনে পড়ে রেশমীর। সেদিন মনে মনে খুব হেসেছিল, আজও হাসি পেল। ছোট ছেলে চুরি করা সন্দেশের স্বাদ যেমন গোপনে নেয় আবার ধরা পড়বার ভয়ে লুকিয়ে ফেলে, তেমনিভাবে স্বাদ অনুভব করতে থাকে অভিজ্ঞতাটির।

জন ঘরে ঢুকে দেখে মিস এলমার নেই, শুধাল, মিস এলমার কোথায়?

রেশমী বলল, বেরিয়েছেন।

কোথায়?

জানি নে।

কার সঙ্গে?

রেশমীর বলা উচিত ছিল, একাকী, কারণ একাকী বেরিয়ে গিয়েছিল সে।

কিন্তু তা না বলে 'অশ্বত্থামা হত ইতি গজঃ' করল, বলল, মিসি বাবা সাধারণত কর্নেল সাহেব ছাড়া আর কারও সঙ্গে বের হন না।

খুঁটিয়ে জেরা করবার প্রবৃত্তি হল না জনের, গম্ভীরভাবে জানলার ধারে দাঁড়িয়ে রইল।

রেশমী চেয়ার এগিয়ে দিয়ে বললে, বস।

না, এখানে বেশ আছি, বাতাস লাগছে।

রেশমী উদাসীনভাবে বলল, যদি মাথা গরম হয়ে থাকে টানা পাখার হুকুম করছি।

জন মনে মনে বলল, অসহ্য! কড়া কিছু বলবে ভেবে তার মুখের দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে গেল। এতদিন ভাল করে দেখে নি তাকে, আজ মনে হল মেয়েটি তো সামান্য সুন্দরী নয়। মিস এলমারকে মনে হয়েছিল পেটিকোট পরা শরতের উষা—আর এখন রেশমীকে মনে হল শাড়ি শেমিজ পরা বসন্তের সন্ধ্যা। হাঁ, উন্মাদিনী শক্তি এই ওরিয়েণ্টাল মেয়েদের যেমন আছে তেমন কোথায় ঠাণ্ডা দেশের মেয়েদের সৌন্দর্যে?

অবাক হয়ে নীরবে তাকিয়ে থাকা অভদ্রতা, কিছু বলতে হয়—জন বলল, রেশমী বিবি, তুমি খুব সুন্দরী।

কথাটা শুনে আমি অবশ্যই খুব খুশি হলাম কিন্তু মিসি বাবার কানে গেলে কি সে সে-রকম খুশি হবে?

কেন, ক্ষতি কি?

লাভ ক্ষতি সে বুঝবে।

যাই হক, তার কান তো এখানে নেই।

আমিই না হয় কানে কথাটা তুলব।

খানিকটা আন্তরিকভাবে, খানিকটা খুশি করবার অভিপ্রায়ে জন বলল—তুমি খুব বুদ্ধিমতি।

এসব গুণ আজ হঠাৎ আবিষ্কার হল নাকি?

সে কথার উত্তর না দিয়ে জন বলল, এ রকম ইংরেজী উচ্চারণ দেশী মেয়েদের মুখে শুনি নি।

দেশী মেয়েদের সঙ্গে খুব মেলামেশা আছে বুঝি?

রেশমী বিবি, তোমার বাক্‌পটুতা অসাধারণ।

এমন সময়ে মিস এলমার ঘরে প্রবেশ করল।

জনের ভয় হল পাছে মেয়েটা সব প্রকাশ করে দেয়।

মিস এলমার শুধাল. কখন এলে?

জন উত্তর দেবার আগেই রেশমী বলল, এইমাত্র।

সে বুঝল রেশমী কিছু প্রকাশ করবে না। তার প্রশংসার মনোভাবের সঙ্গে কৃতজ্ঞতা যুক্ত হল।

এইসব স্মৃতি রোমন্থন করতে কবতে ঘুমিয়ে পড়ল রেশমী। স্বপ্ন দেখল আকাশে তিনটি তারা জ্বল-জ্বল করছে, ভাল করে তাকিয়ে দেখলে তিনটি তারায় তিনটি মুখ, মিস এলমার কর্নেল রিকেট আর জন স্মিথ—তিনজনের। এমন সময়ে দেখল জন স্মিথের তারাটি খসে পড়ল। ও কি, তারাটা জানলার দিকেই ছুটে আসছে যে! জানলার বাইরে এসে জন থামল।

ওখানে থেমে রইলে কেন? ভিতরে এস।

না না, মিস এলমার আছে!

তবে এসেছিলে কেন?

তুমি খুব সুন্দরী এই কথাটি বলতে।

রেশমীর ঘুম ভেঙে যায়। তার কানে সঙ্গীতের মত বাজতে থাকে—রেশমী, তুমি

খুব সুন্দরী—রেশমী, তুমি খুব সুন্দরী।

যে মেয়ে ঐ কথাটি কখনও কোন পুরুষের মুখে শোনে নি, তার নারীদেহ-ধারণ বৃথা। কিন্তু তেমন মেয়ে কি সত্যই আছে?

রেশমী শয্যা ত্যাগ করে উঠে আয়নার সম্মুখে দাঁড়াল—স্বপ্নের শিশির পড়ে মুখখানি অলৌকিক হয়ে উঠেছে। সে একবার চুলটা আঁচড়ে নিয়ে, বালিসে দীর্ঘশ্বাস চেপে শুয়ে পড়ল।

তখনও ভোর হতে অনেক বিলম্ব।

৫
সুরা-সাম্য

রাম বসু বাড়ি ফিরে চলেছে, এমন সময় শুনতে পেল কে যেন পিছন থেকে ডাকছে, মিঃ মুন্সী, মিঃ মুন্সী!

কে ডাকে? পিছন ফিরে দেখে যে মিঃ স্মিথ দ্রুতপায়ে তার দিকে আসছে।

মিঃ স্মিথ যে, গুড ইভনিং! তার পর—খবর কি?

গুড ইভনিং। এদিকে কোথায় এসেছিলে?

অনেকদিন রেশমীকে দেখি নি তাই একবার দেখে এলাম। তোমার সঙ্গেও অনেকদিন পরে দেখা, আশা করি সব কুশল।

এক রকম কুশল বই কি। মিঃ মুন্সী, তোমার কি খুব তাড়া আছে?

আমার কখনও তাড়া থাকে না। যে-কাজটা সম্মুখে এসে পড়ে তখনকার মত সেটাই আমার একমাত্র কাজ।

এখন কি কাজ তোমার সম্মুখে?

বাড়ি ফিরে যাওয়াটাই কাজ।

আর ধর আমি যদি একটু গল্পগুজব করতে অনুরোধ করি?

তখন সেটাই হবে একমাত্র কাজ।

তুমি incomparable, মিঃ মুন্সী।

আমারও তাই বিশ্বাস।

দুইজনে একসঙ্গে হেসে উঠল।

জন বলল, চল না, কাছেই আমাদের বাড়ি, একটু গল্পগাছা করা যাক, রাত তো এমন হয় নি।

রাম বসু বুঝল গরজ কিছু বেশি, নইলে কোন শ্বেতাঙ্গ এমন করে কৃষ্ণাঙ্গকে বাড়িতে আহ্বান করে না।

চল, ক্ষতি কি!

বাড়ি পৌঁছে লিজাকে বলল, মিঃ মুন্সীকে নিয়ে ড্রয়িংরুমে আমি একটু স্কলারলি ডিসকাশন করছি, এখন যেন কেউ না আসে, দেখো।

লিজা হেসে বলল, কেউ যাবে না। তবে ব্রাণ্ডি সোডা পাঠিয়ে দেব কি? শুনেছি

স্কলারলি ডিসকাশনে ও দুটো বস্তু অপরিহার্য।

জন হেসে বলল, মিথ্যা শোন নি, দাও পাঠিয়ে।

সোডার সঙ্গে উপযুক্ত মাত্রায় মিশ্রিত ব্র্যান্ডির মহৎ গুণ এই যে ওতে বয়স বিদ্যা লিঙ্গ জাতি বর্ণ ভাষা প্রভৃতি লৌকিক গুণ অতি সত্বর লোপ পায়। এখানেও তার অন্যথা ঘটল না। অল্পক্ষণের মধ্যেই জনের সাদা চামড়া কটা ও মুন্সীর কালো চামড়া ফিকে হতে মৈত্রী সীমান্তে এসে ঠেকল—তখন মুখোমুখি হল দুটিমাত্র মানুষ ; বয়স, বর্ণ বিদ্যা ইত্যাদির তুচ্ছ পার্থক্য বেঙাচির লেজের মত গেল খসে।

মুন্সী, ইউ আর এ জলি গুড ফেলো।

সো আর ইউ, জন।

দেখ মুন্সী, তোমাদের হিণ্ডু রিলিজ্যান অতি আশ্চর্য বস্তু।

সেই রকম ধারণাই ছিল, কিন্তু পাদ্রী ব্রাদাব-ইন-ল'দের সঙ্গে পরিচয় হয়ে অবধি হতমান হয়ে আছি।

আচ্ছা মুন্সী, তুমি পাদ্রীদের ব্রাদান-ইন-ল বললে কেন ?

বাংলা ভাষার ওটা সবচেয়ে আদরের শব্দ।

ইনডীড ! কি ওটার বাংলা ?

শালা।

জন উচ্চারণ করে, সা—লা। চমৎকার, fine-sounding word! Sa—la, Sa—la, তার পর নিজ মনেই বলে উঠল, How I wish Miss Aylmer's brothers were my S—ala!

হবে জন, হবে। দুঃখ করো না।

আবেগ-কম্পিত কণ্ঠে জন জিজ্ঞাসা করে—কেমন করে জানলে মুন্সী ?

ঐ যে হিন্দু রিলিজ্যানের কথা বললে না—তারই কৃপায়। আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রে নেই এমন জিনিস নেই।

ইনডীড !

এখন তোমার একজন রাইভ্যাল জুটেছে।

কি করে জানলে মুন্সী ?

প্রসঙ্গের উত্তর না দিয়ে মুন্সী বলে, লোকটা খুব মোটা।

আশ্চর্য !

লোকটা জঙ্গী সেপাই।

ঠিক কথা।

আপাতত মিস এলমার তার প্রতি অনুরক্ত।

জিজ্ঞাসা ও কান্নার মাঝামাঝি সুরে জন ফুকরে ওঠে, আমার কি হবে মুন্সী ?

ঋষিবাক্যের গাম্ভীর্যে রাম বসু বলে, মিস এলমার তোমারই হবে।

ঋষিবাক্যের আশ্বাসে কতকটা নিশ্চিন্ত হয়ে জন বলে, তোমার কাছে চিরকৃতজ্ঞ থাকব মুন্সী, সেই ব্যবস্থাই করে দাও।

বেশ, তাই হবে, বলে বসুজা।

শুনেছি তোমাদের Shastras-এ yogic rites দ্বারা অসম্ভবকে সম্ভব করা যায় ?

শাস্ত্রগৌরবে স্ফীতবক্ষ রাম বসু সংক্ষেপে বলল, যায়ই তো। কিন্তু সে যে ব্যয়-সাপেক্ষ।

ব্যয়ে আমি কুণ্ঠিত নই। তুমি একটু চেষ্টা করে ঐ জঙ্গী সেপাই বেটাকে কাত করে দাও। লোকটা পাওয়ারফুল, কিন্তু শুনেছি তোমাদের Coligot-এর (কালীঘাট) Coli (কালী) একবারে অলমাইটি!

নিশ্চয়। বলে কালীর প্রাপ্য সম্মান আত্মসাৎ করে নেয় রাম বসু।

তুমি শীঘ্র ব্যবস্থা কর।

তুমি চিন্তা ক'র না জন, আমি কালকেই yogic rites-এর সবচেয়ে বড় এক্সপার্টের সঙ্গে দেখা করব—তার ক্রিয়ায় মানে ফাংকশনে হাতে হাতে ফল মানে হ্যাণ্ড টু হ্যাণ্ড ফ্রুট পাওয়া যায়।

তবে তাই ক'র মুন্সী, আপাতত এই নাও, বলে মুন্সীর হাতে কিছু টাকা গুঁজে দিল জন।

দেখ না জন, তোমার রাইভ্যাল ব্রাদার-ইন-ল-কে কেমন জব্দ করি!

ও কি মুন্সী, তুমি গোড়াতেই বিশ্বাসঘাতকতা শুরু করলে?

কেন? সত্যিই বিস্মিত হয় মুন্সী।

ওই মোস্ট এনডিয়ারিং টার্মটা ব্যবহার করলে ঐ গোঁয়ারটা সম্বন্ধে!

রাম বসু বুঝল তার ব্যাখ্যাতেই ভুলের মূল; বলল, আই অ্যাম সরি! ভুল হয়ে গিয়েছে।

নেভার মাইণ্ড ম্যান! এখন মিস এলমারের ভাই শীঘ্র যাতে আমার ব্রাদার-ইন-ল হতে পারে তার ব্যবস্থা করে দাও। ওটার বাংলা কি যেন বললে?

শালা।

Sa—la! Fine! It tastes as sweets as Miss Aylmer! Sa—la! আসন্ন জয়ের সুনিশ্চিত সম্ভাবনায় সে এমনি উল্লসিত হয়েছিল, স-সোডা ব্র্যাণ্ডিতে দুটি গেলাস পূর্ণ করে একটি বসুজার হাতে তুলে দিয়ে বলল, মুন্সী, বিদায় নেবার আগে—let us drink to the honour of Eternal, Universal, Ever-present, All-powerful—

রাম বসু বলল, ব্রাদার-ইন-ল!

জন বলল, নো, নো, বাংলা শব্দটা অনেক বেশি মিষ্টি, সা—লা!

তখন দুজনে সমকণ্ঠে উচ্চারণ করল, শা—লা!

অগ্নিময় পানীয় যথাস্থানে পৌঁছল।

বিদায় নেবার মুখে রাম বসু বলল, উদ্বিগ্ন হয়ো না জন, আমি কালই এক্সপার্ট ওপিনিয়ন নেব—হ্যাণ্ড টু হ্যাণ্ড ফ্রুট!

জন বলল, নাঃ, এই খ্রীষ্টধর্মে কিচ্ছু নেই। কাল থেকেই আমি যাতায়াত শুরু করব "হিন্দু স্টুয়ার্ট"-এর কাছে।

৬
রূপচাঁদ পক্ষী

পরদিন সকালে পটলডাঙায় রূপচাঁদ পক্ষীর আড্ডায় গিয়ে উপস্থিত হল রাম বসু।

রূপচাঁদ পক্ষীর পিতৃদত্ত নাম সনাতন চক্রবর্তী বা ঐরকম একটা কিছু। মহাপুরুষগণের জীবনে প্রায়ই দেখা যায় যে, স্বোপার্জিত পরিচয়ের তলে কৌলিক পরিচয় চাপা পড়ে যায়—এক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম ঘটে নি। স্বোপার্জিত রূপচাঁদ পক্ষী পৈতৃক সনাতন চক্রবর্তীকে চাপা দিয়ে লুপ্ত করে দিয়েছে।

সেকালে যে-সব মহাপুরুষ একাসনে বসে একশ আট ছিলিম গাঁজা খেতে পারত তারা একখানা করে ইঁট পেত। এইভাবে উপার্জিত ইঁটে বাসভবন নির্মাণ করতে পারলে পক্ষী পদবী পাওয়া যেত। তখনকার কলকাতায় দেড়জন পক্ষী ছিল। পটলডাঙায় রূপচাঁদ পক্ষী আর বাগবাজারে নিতাই হাফ পক্ষী। হাফ পক্ষীর অর্থ এই যে, বাড়ীর চার দেয়াল গড়বার পরে হঠাৎ সাধনোচিত ধামে প্রয়াণ করে নিতাই, তাই লোকে তাকে হাফ পক্ষী বলত। বস্তুত রূপচাঁদই একমাত্র পক্ষী। নিতাই-এর কথা উঠলে রূপচাঁদ দুঃখ করে বলত, ছোকরার এলেম ছিল, অকালে না মরলে একটা আস্ত পক্ষী হতে পারত। তার পরে ভবিষ্যতের জন্য খেদ করে বলত, এসব প্রাচীন প্রথা তো একরকম উঠেই গেল, আমার মত-দু-চারজন মরলেই সব ফরসা। এখনকার ছেলেরা সব গোঁফ না উঠতেই 'এলে' 'বেলে' পড়ে, ফিরিঙ্গির বেনিয়ান মুচ্ছুদি হতে যায়—কৌলিকপ্রথা রক্ষায় আর কারও আগ্রহ নেই। দিনে দিনে কি হতে চলল, অ্যাঁ! বলে সে ছিলিমের সন্ধান করে।

যাই হক, রূপচাঁদের ভরসা ছিল যে, তার জীবনকালে এ প্রথা লুপ্ত হতে সে দেবে না—বলা বাহুল্য, প্রতিজ্ঞা সে রক্ষা করেছিল।

শহরের বহু সম্ভ্রান্ত ঘরের উঠতি বয়সের ছোকরা রূপচাঁদ পক্ষীর আড্ডায় নিয়মিত যাতায়াত করত—আর সেখানে যে শাস্ত্রচর্চা করত না তা বলা নিষ্প্রয়োজন। পাদ্রীদের সঙ্গে জোটবার আগে এক সময়ে রাম বসুও যাতায়াত করত তার আড্ডায়, সেই সূত্রে পরিচয়। রাম বসু জানত যে, মুখ্য গুণের আনুষঙ্গিক আরও অনেক গুণের অধিকারী রূপচাঁদ পক্ষী। তুকতাক মন্ত্রতন্ত্র তাবিজ-কবচ, ঝাড়ফুঁক এবং তান্ত্রিক ক্রিয়াকর্মে তার বিপুল অভিজ্ঞতা। বস্তুত তার ভরসাতেই রাম বসু জনের অনুরোধ স্বীকার করেছিল।

রাম বসু রূপচাঁদ পক্ষীর দরজায় ধাক্কা দিতে ভিতর থেকে ভাঙা গলায় কর্কশস্বরে ধ্বনি হল—ক্যা,—ক্যা, বলি এত সকালে ক্যা হে!

দরজা খুলুন পক্ষীমশাই, চেনা লোক।

দরজা খুলে বাইরে এসে দাঁড়াল একটি মূর্তি। দীর্ঘ কঙ্কাল, হাঁটু পর্যন্ত মলিন ধুতি, পায়ে খড়ম, খালি গা, জীর্ণ উপবীত, অত্যুজ্জ্বল কোটরগত চক্ষু, মুখমণ্ডলের বাকি অংশ—গাল, কপাল, চিবুক প্রভৃতি—অজস্র বলিচিহ্নিত, চুল সাদা, খোঁচা খোঁচা দাড়িগোঁফও সাদা; বয়স পঁয়ত্রিশও হতে পারে আবার পঁচাত্তর হতেও বাধা নেই।

প্রণাম পক্ষীমশায়।

ঠাহর করে দেখে নিয়ে গলায় ভাঙা কাঁসর বাজিয়ে বলল পক্ষী, ক্যা, বসুজা যে!

অনেক দিন পর, হঠাৎ চিনতে পারি নি। তার পর, ভাল তো? ব'স ব'স।

জীর্ণ তক্তপোশের উপরে দুজনে পাশাপাশি বসল।

কেমন আছেন পক্ষীমশায়?

আর থাকাথাকি, এখন গেলেই হয়।

সে কি কথা, এরই মধ্যে গেলে চলবে কেন?

আর থেকেই বা কি করছি? এখনকার বড়লোকের ছেলেরা আর এদিকে ঘেঁষতে চায় না, ফিরিঙ্গি বেটাদের দেখাদেখি সব মদ ধরছে। মদে কি আছে হ্যা? বলে জিজ্ঞাসু নেত্রে তাকাল বসুজার দিকে।

কিছু বলা কর্তব্য মনে করে বসুজা বলল—যুগের ধর্ম, কি করবেন বলুন!

এই কি একটা উত্তর হল! তুমি যে খিরিস্তান হলে হ্যা!

কিছুক্ষণ এইভাবে সময়োচিত কথাবার্তার পরে পক্ষী শুধাল—তার পর, কি মনে করে?

রাম বসু তখন আগমনের উদ্দেশ্য বিবৃত করল। সমস্ত বিবরণ ধীরভাবে শুনে গম্ভীরভাবে পক্ষী বলল—তা হবে। কিন্তু এ যে খরচপত্রের ব্যাপার।

সেজন্যে ভাববেন না, আপাতত কিছু রাখুন, বলে জন-প্রদত্ত অর্থের কিয়দংশ পক্ষীর হস্তে সমর্পণ করল রাম বসু।

মুদ্রা-স্পর্শে তড়িৎস্পর্শের লক্ষণ ঘটল পক্ষী-দেহে, সে বেশ এঁটেসেঁটে জেঁকে বসল, বলল, আর কিছু নয়, প্রথমে একটা বগলা পূজা করে একটা বশীকরণ কবচ করতে হবে; কিন্তু সব প্রথমে চাই কালীঘাটে ষোড়শোপচারের একটা পূজা দেওয়া।

সে সব বাধবে না, কিন্তু মেমসাহেব কি কবচ তাবিজ পরতে চাইবে—তাকে লুকিয়ে সব করা হচ্ছে কিনা!

সে একটা কথা বটে। তার পরে কিছুক্ষণ ভেবে বলল, দেখ শাস্ত্রে সব রকম বিধানই আছে। কবচটা গোপনে একবার মেমসাহেবকে মাথায় ঠেকিয়ে তার শয়ন-গৃহে রেখে দিতে পারবে তো?

রাম বসু বলল, তা পারা যাবে।

তবেই হবে, বলল পক্ষী।

আচ্ছা পক্ষীমশায়, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, কলিকালে কবচ তাবিজে ফল ফলে?

দেখ বাপু, মানলে কেউটে, না মানলে ঢোঁড়া—এই হচ্ছে গিয়ে তন্ত্রমন্ত্রের রহস্য।

তা তো বটেই, তবে কথা হচ্ছে কিনা, ম্লেচ্ছগুলোর উপরে এসব ফলদায়ক হয়ে থাকে?

কেন হবে না? এই যে স্টুয়ার্ট সাহেব, হিন্দু স্টুয়ার্ট বলে যার নাম পড়েছে, শালগ্রাম পূজো না করে যে জলগ্রহণ করে না, গঙ্গাজলে স্ব-পাক করে হবিষ্যি খায়—এসব কেমন করে সে খোঁজ রাখ?

রাম বসুকে স্বীকার করতেই হল যে, সে খোঁজ রাখে না।

উদ্‌গত-পঞ্জর বুকের উপরে বারকতক চড় মেরে বলল—এই বান্দার কাজ। সব কথা বলব আর একদিন।

তার পরে বলল, সব ভালয় ভালয় হয়ে যাবে, সাহেবকে চিন্তা করতে নিষেধ করে দিও। মেমসাহেবের কপালে কবচটা স্পর্শ করবার সাত দিনের মধ্যে বেটী এসে

সাহেবের পায়ে লুটিয়ে পড়বে না! অমন কত গণ্ডা দেখলাম—হ্যাঃ!

রাম বসু বলল—তাহলে আজ উঠি। তাড়াতাড়ি গিয়ে সাহেবকে সুসংবাদ শুনিয়ে দিই।

কবে আবার আসছ?

কালকেই—না হয় পরশু।

পরশু আবার কেন—কালই এসো। অমনি গোটা পঞ্চাশেক টাকা হাতে করে এসো।

টাকা আনতে ভুলবে না বলে রাম বসু রওনা হয়ে গেল।

এমন সময় পিছন থেকে ভাঙা গলায় সজোরে বেজে উঠল—সিক্কা টাকা, ভায়া, সিক্কা টাকা।

রাম বসু ইঙ্গিতে জানাল, তাই হবে।

৭
সরল স্বাস্থ্যলাভ পদ্ধতি

বামুনগিন্নীকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করেছিল বটে অন্নদা কিন্তু তার উপদেশটা কিছুতেই ভুলতে পারল না, থেকে থেকে মনের মধ্যে খোঁচা দিতে লাগল—পুরুষমানুষ একটু গায়েগত্তি চায়, কাঠিপারা মেয়েছেলেয় তাদের মন ওঠে না। বলা বাহুল্য অন্নদা নিজেকে সুন্দরী মনে করত, কোন নারীই বা তা মনে না করে। পাড়ার পরিচিত মেয়েদের সঙ্গে নিজের তুলনামূলক আলোচনা করল মনে মনে, এমন কি যাদের সুন্দরী বলে খ্যাতি ছিল তাদের সঙ্গেও নিজেকে মিলিয়ে দেখল মনে মনে ; একই সিদ্ধান্ত, সে সুন্দরী। তবে হ্যাঁ, বোধ হয় একটু রোগা। ভাল করে নিজের চেহারা দেখবার জন্যে বহুদিন অব্যবহৃত পুরনো আয়নাখানা বের করল।

পোড়ারমুখো আয়না, আছড়ে ফেলে দিল সে।

বহুদিনের অব্যবহারে কতক কতক পারদ উঠে গিয়েছে, মুখের খানিকটা দেখা যায় খানিকটা দেখা যায় না, সবসুদ্ধ মিলে যে ছায়া ভেসে ওঠে তা সন্তোষজনক মনে হয় না তার। দোষ অবশ্যই দর্পণের, আছড়ে ফেলে দেয় দর্পণখানা।

তখন সে স্থির করল একখানা নূতন আয়না কিনে আনতে হবে, একেবারে সাহেব-বাড়ী থেকে। তার বিশ্বাস সাহেবী দোকানের আয়নায় মেমের মত ছায়া ফুটবে।

ন্যাড়ার হাতে গোটা দুই টাকা দিয়ে অন্নদা বলল, একখানা আয়না কিনে আনতে পারিস?

এ আর কি কঠিন কাজ দিদিঠাকরুন!

একবারে সাহেবী দোকান থেকে আনবি।

খুব পারব, কসাইটোলা গিয়ে বলব give me one looking glass!

গেলাস নয় রে গেলাস নয়, আয়না।

নিজের জ্ঞানগর্বে স্ফীত ন্যাড়া বলল, গেলাস নয়, দিদিঠাকরুন, গ্লাস, মানে তোমরা যাকে বল আয়না। জান দিদিঠাকরুন, মাতুনি সাহেবের বাড়িতে এত্ত বড় একখানা

আয়না ছিল, বলে লাফ দিয়ে উঁচু হয়ে উঠে আয়নার আয়তন নির্দেশ করে।

তবে যা লক্ষ্মীটি, দেখিস কেউ যেন না দেখে।

দেখলেই বা, নিজের পয়সায় কিনব তার আবার ছাপাছাপি কেন ?

না না, লুকিয়ে নিয়ে আসিস—দৌড়ে যা।

সাহেব-বাড়ির নূতন আয়নায় নিভৃতে নিজেকে পরীক্ষা করে বুঝল তার সিদ্ধান্ত ভ্রান্ত নয়, তবে নানা কারণে আপাতত সে কিছু রোগা হয়ে পড়েছে যেন। গাল দুটো তেমন পুষ্ট নয়, কণ্ঠার হাড়টাও বের হয়ে পড়েছে, হাত দুটোও শীর্ণ। তার ধারণা হল এই সামান্য ত্রুটি শোধরাতে পারলেই নিখুঁত সুন্দরী প্রতিপন্ন হতে পারে সে। তার মনে হল অভাব তার সৌন্দর্যের নয়, কেবল গায়ে কিছু গত্তি চাই। বামুনগিন্নীর উপদেশ মনে পড়ল, পুরুষ-মানুষ নাকি ওতেই ভোলে। তখন সে পৃথুল হবার উপায় সন্ধানে নিযুক্ত হল।

এমন সময়ে পাশের বাড়ির পাঁচু ছেলেটার কথা মনে পড়ল, এই কিছুদিন আগেও ছেলেটা হাড়-জিরজিরে রোগা ছিল, এখন বেশ হৃষ্টপুষ্ট লাবণ্যময় হয়ে উঠেছে। ঐ পনেরো বছরের ছেলেটা যদি হৃষ্টপুষ্ট হয়ে ওঠবার ফলে এমন লাবণ্যময় হয়ে উঠতে পারে, তবে পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে আরও কত বেশী লাবণ্যময় হওয়ার সম্ভাবনা। মানসাঙ্কে সমস্যার অনুকূল সমাধান হওয়ায় সে অকারণে খুশি হয়ে উঠল। জরাবিজয়ী যযাতিও বোধ করি এতটা খুশি হয় নি।

পরদিন পাঁচুকে ডাকিয়ে চালভাজা খেতে দিয়ে জেরায় জেরায় তার স্বাস্থ্যের রহস্য উদ্ধার করে নিল সে।

হাঁরে পাঁচু, তোর শরীরটা আজকাল যেন ভালই চলছে ?

খুশি হয়ে পাঁচু বলল, হবে না মাঠান ? সকাল-বিকাল কুস্তি করি, মুগুর ভাঁজি, একশ-টা বৈঠক মারি।

অন্নদা বুঝল তার পক্ষে এসব সম্ভব নয়, তাই কিঞ্চিৎ হতাশ হল, তবু আশা ছাড়ল না, চলল জেরা।

আর কি করিস ?

পাড়ার ছেলেদের জুটিয়ে কপাটি খেলি।

তা তো খেলিস দেখতেই পাই, আর কি করিস ? বলি খাস কি ?

খাব আর কি, ডাল ভাত মাছ!

সে তো আগেও খেতিস, বলি, স্বাস্থ্য ফিরল কিসে ?

তা-ই বল মাঠান, সকাল-বিকাল ভিজে ছোলা খাই।

ছোলাভিজে! বিস্ময় প্রকাশ করে অন্নদা।

হাঁ মাঠান, ছোলাভিজে। রাতে ভিজিয়ে রাখি, সকালবেলা খানিকটা খাই, বাকিটা বিকালে। আবার ভিজিয়ে রাখি।

ওতেই তোর স্বাস্থ্য ফিরল ?

ফিরবে না! গফুর মিঞা বলেছে—গফুর মিঞা আমাদের ওস্তাদ কিনা—ছোলাভিজেয় যে তাগদ আছে এমন মাছ মাংস ছানা সন্দেশে নেই।

অন্ধকারে আলোর রেখা দেখে অন্নদা শুধায়, কতখানি করে খাস ?

দু বেলা দু মুঠো।

যদি দু বেলায় চার মুঠো খাস, তবে?

তবে আর কি, শীগগিরই খাব, আরও তাগদ হবে, বুকের পাটা ইয়া চওড়া হবে।

বলিস কি রে! ছোলাভিজেয় এত গুণ?

বিশ্বাস না হয় খেয়েই দেখ মাঠান।

দূর বোকা ছেলে, ছোলাভিজেয় কি আর আমার মত বুড়ির স্বাস্থ্য ফেরে!

দ্বিগুণ জোর দিয়ে বলে সে, বিশ্বাস না হয় খেয়েই দেখ মাঠান।

তার পরে বলে, তোমার আর কি বয়স, গফুর মিঞার বয়স পঞ্চাশ ; যেমন বুকেব ছাতি তেমনি হাত-পায়ের গোছ।

সব কি ঐ ছোলাভিজের গুণে?

চালভাজা শেষ হয়ে যাওয়ায় যে দীর্ঘশ্বাসটা কণ্ঠনালীতে জমে উঠেছিল সেটাকে উত্তরের মধ্যে আমূল সঞ্চারিত করে দিয়ে পাঁচুগোপাল বলল, স—ব!

গফুর বুঝি দু বেলা দু মুঠো করে খায়?

পাগল হয়েছ মাঠান! অতবড় জোয়ানের দু মুঠোয় কি হবে? দু বেলায় সের খানেক খায়।

তার পর বলে, যখন ছোলা জুটে ওঠে না, তখন ঘোড়ার বরাদ্দ থেকে চুরি করে খায়। ও বসাকবাবুদের ঘোড়ার সহিস কিনা। এদিকে বরাদ্দ ছোলা না পেয়ে ঘোড়া শুকিয়ে যাচ্ছে—আর চুরি করা ছোলায় গফুর ফুলে উঠছে! দুনিয়াটা না ভারি মজার মাঠান! খুব হাসে একচোট পাঁচুগোপাল।

পাঁচুর অন্যথা-বেকার রসনা আর থামতে চায় না। একদিন জিজ্ঞাসা করেছিলাম, মিঞা, ঘোড়ার ছোলা যে চুরি কর, দোষ হয় না? মিঞা বলেছিল, দূর! ঘোড়ার ছোলা চুরি করলে বুঝি চুরি হয়? ওতে দোষ নেই। মানুষের জিনিস চুরিকেই চুরি বলে।

অন্নদার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছিল, পাঁচুর গল্প শোনবার আর তার প্রয়োজন ছিল না, সহজে স্বাস্থ্যলাভের উপায় সে অবগত হয়েছে, কাজেই পাঁচুকে বিদায় দিয়ে উঠে পড়ল এবং ঘরে ঢুকেই সেরখানকে ছোলা ভিজিয়ে লুকিয়ে রেখে দিল।

মালদ থেকে ফিরে পত্নীকে খুশি করবার অভিপ্রায়ে রাম বসু একদিন একটা শেমিজ কিনে এনেছিল।

অন্নদা তর্জন করে শুধাল, বলি ওটা কি?

রাম বসু হেসে বলল, খুলেই দেখ।

অন্নদা কাগজের মোড়ক খুলে দেখল, আলখাল্লার মত একটা বস্তু।

আমাকে বুঝি সঙ সাজাবার জন্যে এনেছ?

শেমিজ কখনও চোখে দেখে নি সে।

না গো না, এসব মেমসাহেবরা পরে, খাস সাহেবী দোকান থেকে খরিদ।

তখনই সেটা ফেলে দিয়ে সে গর্জন করে উঠল, ও ড্যাকরা মিন্সে, নিজে খিরিস্তান হয়ে সাধ মেটে নি, এখন আমাকে খিরিস্তান করবার মতলব! থুঃ থুঃ! তখনই সে গঙ্গাজল স্পর্শ করে পবিত্র হল।

অপ্রস্তুত হয়ে রাম বসু প্রস্থান করল। তার দুশ্চরিত্রতা সম্বন্ধে নূতন প্রমাণ পেল অন্নদা। মেমসাহেবদের অন্তর্বাসের সঙ্গে এমন ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের আর কি অর্থ সম্ভব!

এতদিনে সেই বস্তুটার কথা মনে পড়ল অন্নদার। সেটা নষ্ট হয় নি, বসুজা তুলে রেখেছিল। এখন সেটাকে আবিষ্কার করে গোপনে বসে পর্যবেক্ষণ করল সে। রঙ, ফিতে, কাজ-করা পাড় সবসুদ্ধ মিলে মন্দ লাগল না তার চোখে। গায়ে দিয়ে দেখল বড় ঢিলে, ভাবল গায়ে আর একটু গত্তি লাগলেই পরবে। সেই শুভদিনের আশায় একখানা কল্কাদার শাড়ি আর শেমিজটা (অন্নদা উচ্চারণ করে শামিজ) যত্ন করে তুলে রেখে দিল। পাড়ার ঠাকুরঝির উপদেশ মনে পড়ল, পুরুষ-মানুষ একটু সাজগোজ পছন্দ করে বউ, সাজগোজ পছন্দ করে।

সাধ্বী স্ত্রীর একটি প্রধান লক্ষণ এই যে, স্বামীর নিঃসপত্ন অধিকার সে চায়। সতীনের সঙ্গে ভাগ করে নেওয়ার চাইতে পতির নিঃসপত্ন মৃতদেহও তার কাছে বাঞ্ছনীয়। কিন্তু অন্নদার সমস্যা কিঞ্চিৎ ভিন্ন রকম। তার সতীন নেই, তবু কেন স্বামীর পুরো অধিকার পায় না বুঝতে পারে না সে। মানুষের ভয়ের চেয়ে ভূতের ভয় অনেক বেশি ভীষণ, কারণ তার কোন বাস্তব ভিত্তি নেই। এই রহস্যময় সমস্যা-সমুদ্রে যত বেশি সে হাঁসফাঁস করে, যত বেশি সে হাত-পা ছোঁড়ে, তত আরও তলায়—কূলের দিকে অগ্রসর হয় না। স্বামীর মন পাওয়ার আশায় যত অধিক তরঙ্গ তোলে, সে মনটি তত অধিক দূরে গিয়ে পড়ে। শিল্পীর মন ঘুড়ির মত, তার লীলার জন্যে আকাশের ফাঁকের আবশ্যক, গেরস্তালির হাঁড়িকুঁড়ির মধ্যে তার যথার্থ স্থান নয়। রাম বসু জাতশিল্পী। এ কথা তার স্ত্রী বুঝবে কি করে, তখনকার দিনে কেউ বোঝে নি। অনাত্মীয় সমাজ আকাশের সেই অবকাশ, শিল্পীর মন যথেচ্ছ বিহারক্ষেত্র পায় সেখানে। আত্মীয় সমাজের হাঁড়িকুঁড়ি, ডালাধামার মধ্যে স্বভাবতই সে সঙ্কুচিত। শিল্পীর কাছে অনাত্মীয় আপন, আত্মীয় পর। কেন যে রাম বসু বাইরে ঘোরে অন্নদা তা বুঝবে কি করে? শিল্পী পত্নীর দুরূহ সৌভাগ্য।

৮
পল্বলে চাঁদের ছায়া

সেদিন জন আসবামাত্র রোজ এলমার সাগ্রহে সানন্দে বলে উঠল, এস, এস জন, তোমাকে দু দিন দেখি নি কেন?

প্রত্যাশাতীত স্বাগতে অভিভূত হয়ে জন বলল, একটু ব্যস্ত ছিলাম। তা ছাড়া, আমার ধারণা কি জান?

কি তোমার ধারণা, শুনি?

আমার ঘন ঘন আসাটা তুমি পছন্দ কর না।

আমার প্রতি অবিচার করছ, জন। আমি সারাদিন অপেক্ষা করে থাকি কখন তুমি আসবে।

এই যদি সত্যই তোমার মনের কথা হয়, বেশ তাহলে আর কখনও আসা বাদ পড়বে না।

রোজ এলমার হেসে বলল, নিশ্চয় তো?

হাসতে হাসতে প্রত্যুত্তর দিয়ে জন বলল, দেখো নিশ্চয় কি না!

রোজ এলমার বলল, তুমি একটু অপেক্ষা কর, আমি একখানা শাল নিয়ে আসি, তোমার সঙ্গে বেড়াতে বের হব।

জনের বিস্ময়ের আর অন্ত থাকে না। বলে, জীবনের শেষদিন পর্যন্ত অপেক্ষা করে থাকব।

না না, ততখানি ধৈর্যের প্রয়োজন হবে না, দশ মিনিটের মধ্যেই আসব, বলে হেসে লঘুছন্দে গৃহান্তরে যায় মিস এলমার।

অভিভূত জন ভাবে, হঠাৎ এ পরিবর্তন কেমন করে সম্ভব হল ? তার পরে ভাবে, এই তো স্বাভাবিক, না হলেই তো বিস্ময়কর হত। সাধে কি আড়াইশ টাকা খরচ করে ইণ্ডিয়ান yogic ট্যালিসম্যান যোগাড় করেছি! মনে পড়ে তার রাম বসুর কথা। রাম বসু কবচখানা তাকে দেবার সময়ে বলেছিল, মিঃ স্মিথ, ফল না ফলে যায় না, মাদার কালী হচ্ছে এভার ওয়েকফুল গডেস! এখন জন রাম বসুর ভাষায় hand to hand fruit হাতে হাতে ফল পেয়ে মনে মনে বলে উঠল, "জয় মা কালী"। রাম বসু শিখিয়ে দিয়েছিল, মাঝে মাঝে বলতে হবে "জয় মা কালী"।

আগের দিন মন্ত্রপূত তামার কবচখানা নিয়ে রাম বসু জনের সঙ্গে দেখা করে বলে, মিঃ স্মিথ, এ ট্যালিসম্যান অব্যর্থ, তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবেই।

জন শুধায়, এবারে কি করতে হবে ?

এবারে নিয়ে গিয়ে এটা মিস এলমারের হাতে বেঁধে দাও।

বিভ্রান্ত জন বলল, তা কি করে সম্ভব ? এ যে বিড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধার মত। না না, মুন্সী, তা কখনও সম্ভব নয়, ও রকম অদ্ভুত প্রস্তাব আমি মিস এলমারের কাছে করতে পারব না।

গম্ভীর হয়ে রাম বসু বলল, তবেই তো মুশকিল!

জন বলল, আর কি কোন উপায় নেই ?

উপায় নেই সে কি হয়! আমাদের হিন্দুশাস্ত্র খুব উদার, বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন উপায়ের নির্দেশ দিয়েছে!

তবে তারই একটা বল।

কিন্তু সে যে আবার খরচের ব্যাপার!

Damn it! কত চাই বল, বলে এক মুঠো টাকা বের করল জন।

বেশি নয়, আপাতত গোটা কুড়ি হলেই চলবে।

এই নাও। কিন্তু talisman কখন দেবে ?

ট্যালিসমান এখনই নাও, পরে আমি পূজো দিয়ে দেব। এ রকম posthumous পূজার রীতি আমাদের দেশে আছে।

তবে দাও, বলে কবচখানা প্রায় ছিনিয়ে নিল রাম বসুর হাত থেকে, বল এবারে কি করতে হবে ?

আর কিছু নয়, কোনরকমে মিস এলমারের বিছানার নীচে কবচখানা রেখে দিতে হবে।

আবার বিভ্রান্ত হয়ে জন বলল, তা কি করে সম্ভব ? মিস এলমারের শয়নগৃহে আমি ঢুকব কি করে ?

রাম বসু মনে মনে বলল, হাঁদারাম, তা কি আমি জানি নে, তার শয়নগৃহে যদি

ঢুকতেই পারবে তবে কি আর আমার ফাঁদে পা দিতে এস! মনে মনে আরও বলল, তুমি ওর শয়নগৃহের বাইরে চিরদিন ফ্যা ফ্যা করে ঘুরে বেড়াবে। ঢুকবে ঐ বেটা জঙ্গী সেপাই। হয়তো এতদিন ঢুকেছে নইলে বেটী তোমাকে আমল দিতে চায় না কেন!

মুন্সীকে নীরব দেখে জন বলল, দেখ মুন্সী, আমার মাথায় এক বুদ্ধি এসেছে। রেশমী বিবি মিস এলমারের শয্যা প্রস্তুত করে। সে ইচ্ছা করলে অবশ্যই গোপনে বিছানার তলায় রেখে দিতে পারে। সে তো তোমার হাতের লোক, তাকে দাও না কেন!

চমৎকার বলেছ মিঃ স্মিথ। আমাদের শাস্ত্রে বলেছে যে, প্রেমে পড়লে মানুষের বুদ্ধি খুলে যায়।

তখন স্থির হল যে, রেশমীকে দিয়ে কাজটা করাতে হবে।

রাম বসু রেশমীর সঙ্গে দেখা করে প্রস্তাবটা করল। সব শুনে রেশমী রেগে উঠে বলল, কায়েৎ দা, তুমি কত লেখাপড়া শিখে এই সব বুজরুকিতে বিশ্বাস কর!

রাম বসু বলল, ওরে রেশমী. রাম বসু কিছুতেই বিশ্বাস করে না, আবার কিছুতেই অবিশ্বাস করে না, তবে কিনা লাগে তাক না লাগে তুক। যা বলছি কর।

রেশমী বলে—এ যে বিশ্বাসভঙ্গ করা হবে!

কেমন?

মিস এলমারকে না বলে তার বিছানার তলায় রাখলে—

দূর বোকা মেয়ে! বিশ্বাসভঙ্গ তো দূরের কথা, সামান্য নিদ্রাভঙ্গও হবে না—যা বলছি কর।

শেষে সত্যি যদি মিস এলমার জনকে বিয়ে করতে চায়?

বিয়ে করবে। তাতে তোরই বা কি আর আমারই বা কি!

আমার অবশ্য কিছু নয়। কিন্তু ধর এর পরে কর্নেল সাহেব যদি আবার তোমাকে ধরে একটা কবচ করে দিতে?

করে দেব।

তখন যদি আবার মিস এলমার—তখন অবশ্য মিসেস স্মিথ—কর্নেলকে বিয়ে করবার জন্যে ক্ষেপে ওঠে?

করবে কর্নেলকে বিয়ে। ক্ষতিটা কি! ওদের কতবার করে ডাইভোর্স আর বিয়ে হয় জানিস না কি?

কিন্তু তখন মিঃ স্মিথের কি অবস্থা হবে ভেবে দেখেছ?

রেশমীর কথা শুনে রাম বসু হো হো করে হেসে উঠল, কামিখ্যেয় ঝড় হল, কাক মরল ময়নাকাঁদিতে, সেইরকম কথা বলছিস যে! আচ্ছা, জনের অবস্থা যদি তখন খুব খারাপ হয় তখন তুই না হয় কণ্ঠিবদল করে ওকে বিয়ে করিস! এই বলে আবার হেসে উঠল রাম বসু।

কি যে বলছ কায়েৎ দা, থাম।

আচ্ছা থামছি, এখন বল্, কবচটা নিবি কি না!

কিছুক্ষণ নীরব থেকে হঠাৎ বলে উঠল, দাও।

যেমন বলেছি ঠিক-ঠিক করিস, শিয়রের দিকে বিছানার তলায়।

আচ্ছা, তাই হবে।

রাম বসু চলে গেলে রেশমী স্থির করল যে, কখনও সে বিশ্বাসভঙ্গ করবে না,

কখনও সে মিস এলমারের বিছানার তলায় কবচ রাখবে না।

তার পরে মনে মনে বলল, আর ঐ বোকা হাঁদা মানুষটা বিয়ে করবে কিনা মিস এলমারকে! নিজের পৌরুষে যখন কুলোল না, তখন আন্ তাবিজ, আন্ কবচ! যত সব বুজরুকি! নাঃ, কখনই এমন হীন কাজের মধ্যে আমি নেই।

এইভাবে সঙ্কল্প স্থির করে নিজ শয়নগৃহে প্রবেশ করল আর কবচটা নিজের বালিসের তলায় চাপা দিয়ে রেখে বলল, আপাতত থাকুক এখানে। আর যাই হক, মিস এলমারকে আমি বিপন্ন করতে পারব না। তাবিজ কবচের ফলে অনেক সময়ে মানুষ মারা যায়।

এমন তিন-চারটি ঘটনা ঠিক সময় বুঝে মনে পড়ে গেল তার হঠাৎ।

রেশমী বেশ নিশ্চিন্ত ছিল। কিন্তু জনের অপ্রত্যাশিত সাদর অভ্যর্থনায় তার আপাদমস্তক বিষিয়ে উঠল, বিস্ময়ে ও তিক্ততায় তার মন গেল ভরে। জন ও মিস এলমারের প্রীতিপূর্ণ আলাপের অন্তরায়িত পটভূমিতে দাঁড়িয়ে বারংবার সে মনে মনে বলতে লাগল—ওঃ সব্বাই এমন, ওঃ সব্বাই এমন!

সব্বাই বলতে কে কে আর এমন বলতে কি কি—বিচার করবার মত মনের অবস্থা তখন তার ছিল না। নিজের ভদ্রাসন নীলাম-নহবতে উঠে বিক্রি হয়ে যাচ্ছে দেখলে ধীরমস্তিষ্কে বিচার করতে পারে কয়জন?

জন ও রোজ এলমার বেড়াতে বেরিয়ে গেলে যতক্ষণ তাদের দেখা যায় দেখল চেয়ে রেশমী, সাপে-কাটা মানুষ যেমন একদৃষ্টে চেয়ে দেখে ভয়াল সাপটার দিকে। তার পরে এক ছুটে সরে গিয়ে বের করে নিল কবচটা, হাতের চাপে দিল সেটাকে চেপটিয়ে, তার পরে ধীরে ধীরে এগিয়ে গেল বাড়ির প্রান্তের পুকুরটার* ধারে—সবলে ছুঁড়ে দিল সেই দীর্ণ কবচ গভীর জলের দিকে—যাঃ!

রেশমী ফিরে এসে দেখে, অপেক্ষা করছে কর্নেল রিকেট।

সে আভূমি নত হয়ে সেলাম করল।

মিস এলমার কোথায়?

বেড়াতে বেরিয়েছে।

একাকী?

না।

সঙ্গে কে গিয়েছে?

মিঃ স্মিথ। তার সঙ্গেই তো যায় মিস এলমার।

সে কি কথা! গতকাল পর্যন্ত আমি তো গিয়েছি তার সঙ্গে!

তবে আজ থেকেই শুরু হল।

এ কেমন হল? জানিয়েছিলাম যে, আমি আসব!

হয়তো সেইজন্যেই আগে বেরিয়েছে।

কি জন্যে?

তোমাকে এড়াবার জন্যে।

* সেই পুকুরটা এখনও বর্তমান।

অসম্ভব।

সম্ভব তো হল।

মধুর সঙ্গে বিন্দু বিন্দু বিষ মিশিয়ে দিতে মেয়েরা কেমন পারে! মধুর অধরে কঠিন কথা কেমন অঙ্গুলিতে হীরের অঙ্গুরীয়ের মত শোভা পায়!

কর্নেলের আত্মম্ভরিতায় আঘাত পড়ায় তার কাণ্ডজ্ঞান লোপ পেয়েছিল, নতুবা বুঝতে পারত, সামান্য একজন পরিচারিকাকে এমন করে জেরা করা ভদ্রতাসম্মত নয়।

কার বেশি আগ্রহ দেখলে?

রেশমী একটু ভেবে বলল, দুজনেরই সমান মনে হল।

কখন ফিরবে জান?

বোধ হয় রাত হবে।

কেমন করে জানলে?

গায়ের শাল নিয়ে গিয়েছে।

টগবগ করে ফুটছিল কর্নেল—পায়চারি করছিল ঘরের মধ্যে।

আমার সম্বন্ধে কিছু বলল?

না। অনেক সময়ে উদাসীনতাটাই খারাপ।

রাইট! ময়দানের দিকে গিয়েছে?

না, বনের দিকে।

তার পরে প্রায় স্বগতভাবে—একটু নিরিবিলি চায় বোধ করি।

হেঁটে গিয়েছে?

হাঁ।

গাড়ি ছিল না?

ছিল।

তবে গেল না কেন?

নিতান্ত নির্বিকারভাবে রেশমী বলল, কোন কোন সময়ে তৃতীয় পক্ষের উপস্থিতি বিড়ম্বনাজনক।

রাইট! আজ ছবিখানায় ফুল দেখছি না কেন?

আজ ফুল অন্যত্র শোভা পাচ্ছে।

কোথায়, শীঘ্র বল।

মিঃ স্মিথের বুকে।

কে দিল?

দিতে একজনই মাত্র পারে।

আমি স্কাউণ্ড্রেলটাকে দেখে নেব—বলে সগর্জনে ছুটে বেরিয়ে গেল কর্নেল রিকেট।

রেশমী জানলা দিয়ে দেখতে পেল কর্নেলের বগি গাড়ি নক্ষত্রবেগে ছুটে বেরিয়ে গেল বেরিয়াল গ্রাউণ্ড ধরে পুবদিকে।

রোজ এলমার ফিরে এসে শুধাল, কর্নেল এসেছিল নাকি?

রেশমী বলল, এসেছিল।

আমার জন্যে কি অপেক্ষা করেছিল?

না।

অপেক্ষা করতে বলেছিলে কি ?

আর অপেক্ষা করতে বলে কি হবে ?

রেশমীর কথার ভঙ্গীতে কিছু বিস্মিত হয়ে এলমার শুধাল, কেন ?

কেন আর কি ! মনে হল, তুমিও চাও না, আর খুব সম্ভব মিঃ স্মিথও বিরক্ত হবে।

কি আশ্চর্য, আমিই বা চাই না কেন, আর মিঃ স্মিথই বা বিরক্ত হবে কেন ?

কোনদিন তো কর্নেলকে উপেক্ষা করে তোমরা বেরিয়ে যাও না, তাই মনে হল।

হঠাৎ চমক ভাঙল এলমারের, সে বলে উঠল, ওঃ বুঝেছি। তুমি ভেবেছ আমি মিঃ স্মিথকে ভালবাসি !

আমার ভাবায় কি আসে যায়, কর্নেল তাই মনে করেছে।

কর্নেল একটি গোঁয়ার আর তুমি একটি নির্বোধ।

সে তো বরাবরই আছে, নূতন করে মনে পড়াবার কারণ কি ?

মনে পড়াবার কারণ এই যে, আজ সকালে দেশ থেকে কবির একখানা চিঠি পেয়েছি।

নিরানন্দমুখে রেশমী বলল, বড় আনন্দের কথা।

আগে সবটা শোনাই, তার পরে উত্তর দিও। জন আর কর্নেলের কথা কবিকে খুলে লিখেছিলাম। উত্তরে কবি লিখেছে যে, কর্নেলের মত লোকের জন্যে চিন্তা করি নে, ওদের হাতে সব সময়েই একাধিক তীর থাকে, ওরা জন্মতীরন্দাজ লোক। তোমার কাছে প্রত্যাখ্যাত হলে ভগ্নহৃদয় হয়ে ও মরবে না, সমান উৎসাহে অন্য লক্ষ্যে তীর নিক্ষেপ করতে শুরু করবে। চিন্তা করি অপর লোকটির জন্যে যার নাম লিখেছ জন স্মিথ। সংসারে মুষ্টিমেয় একদল লোক আছে যারা জন্মপ্রেমিক—স্মিথ সেই দলের। ভালোবাসার প্রত্যাখ্যান ওদের কাছে মৃত্যুতুল্য। ভালবাসতে ওকে যখন পারবেই না, অন্তত একটু আদর-যত্ন আত্মীয়তা কর। কবি লিখেছে, ওটা ভালবাসার বিকল্প নয় জানি—তবু ওর বেশি তোমার হাতে তো নেই। সংসারে অনেক সময়েই চরমধন জোটে না, তখন কাছাকাছিটা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকা ছাড়া উপায় কি।

এই পর্যন্ত ধীরে ধীরে বলে রোজ এলমার কিছুক্ষণ নীরব হয়ে থাকল। তার পরে আবার শুরু করল—কবির কথায় আমার চৈতন্য হল। তাই আজ জনকে নিয়ে একটু বেড়াতে বের হলাম। এর মধ্যে ভালবাসা-টাসা নেই। তোমার তো এতদিনে বোঝা উচিত, সংসারে আমার একমাত্র যে ভালবাসার লোক ঐ তার ছবি। যদি আমি কখনও কাউকে বিয়ে করি তবে ওকেই করব।

রোজ এলমারের কথার আন্তরিকতায় রেশমীর বুকের ভার নেমে গেল। সে স্বাভাবিকভাবে বলল, মিস এলমার, আমাকে ক্ষমা ক'র।

এর মধ্যে ক্ষমা করবার কি আছে ? তুমি তো কোন অন্যায় কর নি, বড় জোর ভুল বুঝেছ।

রেশমী বিদায় হচ্ছিল এমন সময়ে এলমার বলল, Silken Lady, আমি লক্ষ্য করেছি যে, তুমি জনকে সহ্য করতে পার না। আর কিছু না হক, সে আমার বন্ধু বলেও অন্তত তাকে সহ্য করা তোমার কর্তব্য।

রেশমীও বলতে পারত, মিস এলমার, তুমিও আমাকে ভুল বুঝেছ।

সে-রাত্রে বিছানায় শুয়ে সুখতন্দ্রালীন জন যখন Coligot (Kalighat)-এর Coli (Kali)-র উদ্দেশ্যে শত শত salutation জানাচ্ছিল, মনে মনে যখন বলছিল যে, হিণ্ডু শাস্ত্রের yogic rites সব অব্যর্থ, নতুবা এমন hand to hand fruit কি রকমে ফলল—আগের দিন রোজ ছিল উদাসীন, আজ সে—প্রায় তার কণ্ঠলগ্ন, ঠিক সেই সময়েই রেশমী বিছানায় শুয়ে শুয়ে মনে মনে কালীঘাটের মা কালীর উদ্দেশ্যে শত শত প্রণাম করে বলছিল—মা, তোমার লীলার অন্ত নেই, এই কবচের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হওয়াও তোমার এক লীলা মা। হঠাৎ ভুল বুঝে তোমার উপর অবিশ্বাস করেছিলাম বলে অবোধ সন্তানের অপরাধ নিও না মা, নিও না। এইরকম কত কথা মনে মনে বলতে বলতে সুখনিদ্রায় কখন সে অভিভূত হয়ে পড়ল।

রেশমীর এই বিচিত্র মনোভাবের কারণ কি ? সে কি মনে মনে জনকে ভালবেসে ফেলেছে ? জন ও তার মধ্যে দুস্তর অবস্থা-ভেদে তা কি সত্যই সম্ভব ? যদি সত্যই সম্ভব না হয় তবে কেন চাঁদের ছায়া পড়ে পল্বলে ?

৯
পৃথুলা

রাম বসু শুধায়, নরুর মা, তোমার শরীরটা যেন ভাল দেখছি নে।

ভাঙা কাঁসর অধিকতর কর্কশ রবে বেজে ওঠে, কেন, আমাকে কি রামসিং পালোয়ান হতে হবে নাকি ?

কি সর্বনাশ, এতেই তোমার যা প্রতাপ, এর পরে পালোয়ান হলে কি আর বাড়িতে টিকতে পারব !

আহা, সারাদিন যেন বাড়িতেই বসে আছ ! কোন্ আলেডালে সারাদিন ঘুরে বেড়াও ?

শ্যাওড়া গাছের ডালে নরুর মা, শ্যাওড়া গাছের ডালে।

তা জানি। বাজে ভাঙা কাঁসর, পেত্নী ভর করেছে তোমার কাঁধে।

তাহলে তো সারাদিন বাড়িতেই বসে থাকবার কথা।

কি, যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা, আমি পেত্নী !

কি যে বল ছাই ! পেত্নীরও তো গায়ে একটু গত্তি আছে ; একবারে শাঁকচুন্নী।

গভীরতম মর্মে আঘাত লাগে অন্নদার। যে গত্তি অর্জনের আশায় সে এত করছে, তারই অভাবের অপবাদ। আগেকার দিন হলে সম্মার্জনী সন্ধান করত সে, এখন আর তা সম্ভব না হওয়ায় স্থানত্যাগ করে প্রস্থান করল সে।

এরূপ সম্ভব না হওয়ার সত্যই কিছু কারণ আছে। পাঁচুগোপালের উপদেশে, গায়ে মাংস লাগবার আশায় ভিজে ছোলা খেতে আরম্ভ করবার সঙ্গে সঙ্গে দেখা দিল অজীর্ণ ও পেটের পীড়া। একদিন পাঁচুকে ডেকে অন্নদা জিজ্ঞাসা করল—হাঁরে পাঁচু, তোরা যে ছোলা ভিজে খাস, অসুখবিসুখ করে না ?

করে না আবার মাঠাকরুন ! প্রথম যখন আমি ছোলা ভিজে খেতে শুরু করি, হল

হাম, তার পর সর্দি-কাশি, তার পরে পায়ের ব্যথা। ওস্তাদকে জিজ্ঞাসা করি—কি করব ওস্তাদ! ছেড়ো না বাবা ছেড়ো না—ও-রকম একটু আধটু প্রেথমে হয়েই থাকে। ওস্তাদ বলে, আমি যখন প্রেথমে শুরু করি—

অন্নদা তাকে থামিয়ে দিয়ে বলে, ওসব অসুখ নয় রে।

তবে আবার কি অসুখ?

ধর—এই অজীর্ণ আর—

ওঃ, এই কথা! ও তো একটু-আধটু হবেই, তাই বলে ছেড়ো নি মাঠাকরুন, খেতে যখন শুরু করেছ, খেয়ে যাও, ভবিষ্যতে—

আবার তাকে থামিয়ে দিয়ে অন্নদা বলে, আরে আমি খেতে যাব কোন্ দুঃখে—

তবে আবার ভাবনা কি! ও পাড়ার লোকের যদি অজীর্ণ হয়, তবে তোমার মাথাব্যথা কেন!

পাঁচুগোপালের কাছে অভয় পেয়ে দ্বিগুণ বেগে ভিজে ছোলা চালায় অন্নদা, অবশ্য পেটের পীড়াও দ্বিগুণ বাড়ে।

মাঝে মাঝে সন্দেহ হয় তার মনে, বুঝি মুষ্টিযোগে ফল ফলছে না, বুঝি আরও একটু রোগা হয়ে গিয়েছে। কখনও কখনও গোপনে সুতো দিয়ে মেপে দেখে হাত-পায়ের গোছ, ফল উৎসাহজনক মনে হয় না। তখন মুখশ্রীর সাক্ষ্য নেবার আশায় বের হয় সাহেব-বাড়ির আরশিখানা। নাঃ, মুখশ্রীতে একটু লাবণ্য যেন ফুটেছে। মনে আশা হয়, অচিরে একদিন সেই শেমিজ ও শান্তিপুরে শাড়িতে সুসজ্জিত হয়ে যৌবনলাবণ্য-মুখশ্রীতে স্বামী-সম্ভাষণ করতে সক্ষম হবে সে। স্বামীর এমন আদর পাবে যে পাড়ার মুখপুড়ীর দল হিংসেয় জ্বলেপুড়ে মরবে। সেদিন নিমন্ত্রণ উপলক্ষে ডেকে এনে দেখাতে হবে ঐ তিনকালগত বামুনগিন্নীকে। ভারি গায়ে গত্তির অহঙ্কার হয়েছে!

কিন্তু আর চলে না, অবশেষে শয্যা গ্রহণ করতে হয় অন্নদাকে।

রাম বসু বৈদ্য ডেকে আনে। বৈদ্য লক্ষণ দেখে বলে, এ যে দারুণ অজীর্ণ ও পেটের পীড়ার ফল দেখছি।

এখন উপায়? জিজ্ঞাসা করে রাম বসু।

চিকিৎসা, অর্থাৎ ঔষধ ও সুপথ্য। আহার বিষয়ে বিশেষ সাবধান হতে হবে। একটু মাগুর মাছের ঝোল ও সুজি ছাড়া আর কিছু চলবে না।

অন্নদা শুধায়, ডাল?

কাঁচা মুগের ডালের জল একটু চলতে পারে।

কুণ্ঠিত কণ্ঠে শুধায় অন্নদা, ছোলার—

কথা শেষ হওয়ার আগেই সর্পচকিত হয়ে বৈদ্য চীৎকার করে ওঠে, ছোলার নাম করেছ কি 'মৃত্যুরেব ন সংশয়ঃ!

বৈদ্য চলে গেলে অন্নদা স্বামীকে বলে, মুখপোড়াকে আর ডাকতে হবে না, তার চেয়ে সোনারপুর থেকে ঠাকুরঝিকে আনতে লোক পাঠাও।

ঠাকুরঝিকে আনাবার প্রস্তাব শুনে রাম বসু শঙ্কিত হয়ে ওঠে, বোঝে যে অবস্থা সত্যই সঙ্কটাপন্ন।

রাম বসুর বিধবা বোন তার সংসারে থাকত। তাকে মুখের ধোঁয়া দিয়ে তাড়িয়েছিল অন্নদা—এখন তাকেই আনাবার প্রস্তাব। এই রাজ্যে কখনও দুই রাজার বাস সম্ভব হলেও

হতে পারে, কিন্তু এক সংসারে দুই স্ত্রীলোকের বাস শশবিষাণের চেয়েও অসম্ভব।

ঠাকুরঝি এলে শয্যাগতাকঙ্কালময়ী অন্নদা সংসারের ভার তাকে বুঝিয়ে দিল, স্বামীর পায়ের ধুলো নিল, নবুর মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করল, তার পরে আগামী জন্মে পৃথুলা হয়ে জন্মাবার আশা নিয়ে ইষ্টযন্ত্র জপ করতে করতে নির্ভয়ে শেষনিশ্বাস ত্যাগ করল ভগ্নহৃদয় নারী।

নবু চীৎকার করে কেঁদে উঠল, মা, কার কাছে রেখে গেলে ?

ন্যাড়া তাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে কাঁদতে বলল, তোর ন্যাড়াদা তো রইল নবু, ভয় কি !

সমস্ত ব্যাপারটা কাঠের পুতুলের মত ঠায় দাঁড়িয়ে দেখল রাম বসু। স্বভাবমুখর লোকের মুখে না যোগাল একটা কথা, না এল চোখে এক ফোঁটা জল।

ঠাকুরঝির কাছে একটু হেসে, একটু কুণ্ঠায়, একটু লজ্জায় অন্নদা ইচ্ছা জানিয়েছিল যে, তাকে যেন ঐ শাড়ি আর শেমিজে শেষবারের মত সাজিয়ে দেওয়া হয়।

১০
বিপত্নীক রাম বসু

পত্নীর অন্ত্যেষ্টি সমাধা করে আলুথালু বেশে রাম বসু গিয়ে উপস্থিত হল টুশকির বাড়িতে। টুশকি শুধাল, এ কি বেশ কায়েৎ দা !

টুশকি রে, নবুর মা স্বর্গে গিয়েছে।

ওমা সে কি কথা ! স্তম্ভিত হয়ে যায় টুশকি, শুধায়, এমন সর্বনাশ কখন হল ?

আজ সকালে রে, এইমাত্র সব সেরে আসছি।

টুশকি কি বলবে ভেবে পায় না, গালে হাত দিয়ে চুপ করে বসে থাকে। কিছু বলবার দায়িত্ব থেকে তাকে অব্যাহতি দিল রাম বসু, বলল, এতটা লাগবে ভাবি নি রে।

ঐ একটিমাত্র ক্ষুদ্র বাক্যে রাম বসুর আঘাতের গুরুত্ব বুঝতে পারল টুশকি। আঘাত যে সামান্য নয় তা অনুমান করেছিল প্রথম প্রবেশের মুখে তার 'টুশকি রে' সম্বোধনে। টুশকি জানে যে অনেক কথা বলা রাম বসুর অভ্যাস কিন্তু সে সমস্ত মনের উপরতলার কথা, সেখানে আকাশ-কুসুম ফোটে, মনের নীচেতলার কথা মুখে প্রকাশ করায় সে অভ্যস্ত নয়। তাই বলে সেখানকার সন্ধান তো টুশকির অনবগত নয়। ঐ ছোট্ট 'রে' ধ্বনিটির এতটুকু ফাঁক দিয়ে ভিতরকার দাবদাহ চোখে পড়ে টুশকির। গালে হাত দিয়ে সে মূঢ়ের মত বসে থাকে, ঘরের মধ্যে ইতস্তত পায়চারি করতে করতে রাম বসু অনর্গল বকে যায়।

সবাই অবাক হয়ে গেল তার ঐ স্থির নির্বিচল নির্বাক ভাব দেখে।

তারা বলে, একটু কাঁদ, হাল্কা হবে।

টুশকি, চোখের জলের স্বভাব বড় বিচিত্র। যে বৃষ্টি ভাদ্র মাসে থামতে চায় না, মাথা কুটে মরলেও তার দেখা পাওয়া যায় না অঘ্রাণে, বড় অদ্ভুত এই চোখের জল। আপনজনের মাথা ধরতে দেখলে আমার চোখ ছলছল করে আসে অথচ মৃত্যুতে এক ফোঁটা জল আসে না চোখে।

এই পর্যন্ত বলে সে থামে, জানলার ধারে গিয়ে দাঁড়ায়, চুপ করে তাকিয়ে থাকে সূর্য-ডোবার আলো যেখানে রাঙিয়ে তুলেছে চলমান নৌকার পালগুলোকে। কিছুক্ষণ পরে আবার শুরু করে—

শোকে যারা কাঁদতে পারে তাদের তো সৌভাগ্য, চোখের জলে রোখ শোধ করে দিব্যি হাল্কা হয়ে গেল তারা ; আর আমি, এই চেয়ে দেখ্ এখানে, বলে বুকটা দেখায়, শোকের পাষাণভার বয়ে বেড়াচ্ছি, কতকাল এমন বেড়াতে হবে জানি নে, তবে জানি যে তিলে তিলে পলে পলে ফোঁটা ফোঁটা জল ঝরবে সারাজীবন ধরে। লোকে বলে আমি কাঁদি না কেন, ওরে কাঁদতে পারি কই!

টুশকি বুঝল এই অনর্গল বাক্য-প্রবাহই তার শোকপ্রকাশের রীতি, চোখের জলের বিকল্প। সে বলল, কয়েৎ দা, তুমি ব'স, একটু শরবৎ করে দিই।

শরবৎ খেয়ে একটু ঠাণ্ডা হলে টুশকি শুধাল, কি হয়েছিল বল তো, কই কোনদিন তো কিছু বল নি ?

বলব কি, আমরাই কি ছাই কিছু জানতাম! মানুষটা চিরকালের রোগা। রোগা তো রোগা, এমন অনেকে থাকে। এদানীং কিছুদিন থেকে দুর্বল হয়ে পড়ছিল, বিছানা ছেড়ে আর উঠতে পারে না। বদ্দি আনলাম—দিল তাড়িয়ে। শেষে যখন সোনারপুর থেকে আমার বোনকে আনিয়ে নিতে বলল তখন বুঝলাম আর আশা নেই। তার পরে আর দুটো দিনও সময় পাওয়া গেল না।

তাহলে বোঝাই গেল না কি হয়েছিল ?

কেন যাবে না, অজীর্ণ, পেটের অসুখ।

এই সামান্য অসুখ চিকিৎসার অসাধ্য হয়ে উঠল ?

সে যে নিজে করে তুলেছিল অসাধ্য, সারবে কেমন করে ?

সে আবার কি রকম ?

সব শেষ হয়ে যাওয়ার পরে ভাঁড়ার থেকে বের হল এক হাঁড়ি ভেজানো ছোলা। ব্যাপার কি ? শেষে পাড়ার একটা ছেলের কাছ থেকে রহস্য উদ্ধার হল। গায়ে মাংস লাগবে আশায় ঐগুলো খেত। এদিকে পেটের অসুখ চলছে, ওদিকে চলছে ছোলা ভিজে।

হঠাৎ এমন ইচ্ছা হতে গেল কেন কিছু শুনেছ ?

শুনব আর কোথায়, তবে অনুমান করছি, একটু মোটাসোটা হলে স্বামীর ভালবাসা পাওয়া যাবে এই ভরসায় অখাদ্য খেয়ে প্রাণটা দিল সে। পরে পায়ে পায়ে টুশকির সম্মুখে এসে দাঁড়িয়ে দুই আঙুলে তার গাল টিপে ধরে বলল, তোরা এক অদ্ভুত জাত টুশকি, স্বামীর ভালবাসা পাওয়ার জন্যে সব করতে পারিস।

টুশকির চোখ ছলছল করে উঠিল। টুশকির চোখে জল দেখে এতক্ষণে এই প্রথম জল এল রাম বসুর চোখে।

রাম বসুর কথাই যথার্থ, বড় বিচিত্র স্বভাব চোখের জলের।

সন্ধ্যা হয়ে এসেছিল, বাতি জ্বলল ঘরে, শাঁখ বাজল, কাঁসর-ঘণ্টা বাজল মদনমোহনতলায়। হঠাৎ রাম বসু বলে উঠল, টুশকি, আজ এখানে থাকব।

বিস্ময় চেপে রেখে টুশকি কুণ্ঠিত ভাবে বলল—আজ না থাকলে হয় না ?

না না, আজই বিশেষ দরকার। হাঁরে, বোতলটায় কিছু আছে নাকি ?

থাকবে কি করে ? কতদিন আস নি!

আচ্ছা সে-ব্যবস্থা হবে এখন।

রাম বসুর মন ঘোরাবার আশায় আবার সে বলল, তুমি না গেলে নরুর খুব ফাঁকা লাগবে।

তার পিসি আছে, নেড়ুদা আছে, আমার অভাব সে অনুভব করবে না।

তারপর একটু থেমে বলল, আমার ফাঁক পূরণ করবার কে আছে বল্!

এই বলে সবলে সে বুকের মধ্যে টেনে নিল টুশকিকে।

মৃত্যুর পরে মানুষের চৈতন্য যদি নির্মল ও সর্ব্বব্যাপী হয় তবে অবশ্যই অন্নদা খুশি হত, এই মুহূর্তে তার স্বামীর আলিঙ্গনাবদ্ধ নারী টুশকি নয়, দেহান্তরে সে নিজেই, তার পরজন্মের আশা ফেলে-আসা জন্মে সার্থক হয়ে উঠল, পৃথুলারূপে সন্নিবিষ্ট হল সে স্বামীর বক্ষে।

রাত্রে আহারের পর টুশকি বলল, এবারে তোমার খুব অসুবিধা হবে কায়েৎ দা, তাই না?

রাম বসু বলল, এক কথায় এর কি উত্তর দেব বল!

এক কথায় না হয় নাই দিলে, বুঝিয়ে বল না।

তবে তাই বলি শোন্। অসুবিধা হবে এবং না।

টুশকি বলল, কথা একটার বেশি হল বটে, কিন্তু বুঝতে পারলাম না কিছু।

পারবি নে জানি, বুঝিয়ে দিচ্ছি। স্ত্রী স্বামীকে টেনে রাখে কিসের জোরে বল্ তো?

ভালবাসার জোরে।

ওটা বোকা মেয়ের মত কথা হল। হ্যাঁ, ভালবাসা দিয়ে পুরুষের মনের দরজাটা খোলে বটে, কিন্তু ঐ পর্যন্ত।

টুশকি শুধায়, তার পরে?

তারপরে অশিক্ষিত-পটুতায় ধীরে ধীরে তিলে তিলে দিনে দিনে স্বামীর ছোটখাটো দৈনন্দিন অভ্যাসগুলো জেনে নিয়ে, তার অজ্ঞাতসারে সেগুলো পূরণ করে তাকে অসহায় করে তোলে। সময়মত গাড়ু-গামছা এগিয়ে দেওয়া, সময়মত দাঁতনটি ভেঙে দেওয়া, স্নানের তেল, স্নানের পরে ধুতি, আহারের সময়ে বিশেষ পছন্দের ব্যঞ্জন হাতে তুলে দিয়ে দিয়ে নিজের উপর নির্ভরশীল করে তোলে স্বামীকে। সহস্র অভ্যাসের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বিনা সূতায় বাঁধা পড়ে বনের বিহঙ্গ, তখন খাঁচার দরজা খোলা পেলেও আর বাইরে যেতে মন সরে না তার। যে স্ত্রী স্বামীর অজ্ঞাতসারে এই কাজটি করতে পারে সে সাধ্বী, যে স্বামী অনায়াসে এই অবস্থায় আত্মসমর্পণ করে সে সুখী।

আর ভালবাসা? শুধায় টুশকি।

ওরে হাবা মেয়ে, ভালবাসার প্রাণ বড় দুর্বল, তার পাখা আছে পা নেই, সংসারে তার মত অসহায় আছে অল্পই।

তবে যে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ভালবাসার কথা শুনি!

অশ্বত্থামার দুধ বলে পিটুলি খাওয়ার কথা কি শুনিস নি?

চুপ করে থাকে টুশকি।

চুপ করে রইলি যে বড়?

সবই তবে ভুল?

কিছুই ভুল নয়। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে অভ্যাসের বশ্যতার ঐ সম্বন্ধটাই বা তুচ্ছ কি!

কিন্তু আসল প্রশ্নের তো উত্তর পেলাম না, তোমার সুবিধা-অসুবিধার কথা বল।

আমি চিরকাল দূরে দূরে থেকেছি, অভ্যাসের দাস হয়ে পড়ি নি, সেই জন্যই তার রাগের অন্ত ছিল না আমার উপরে, কাজেই সেদিক থেকে আমার অসুবিধা হওয়ার কথা নয়।

তবে ?

তবে আর কি ! এতদিন দেখছিস আমাকে, বুঝতে পারিস নি ? আমি নিজের দুঃখ এক রকম করে সইতে পারি কিন্তু সেই দুঃখটা অপরের ঘাড়ে পড়তে দেখলে অসহ্য বোধ হয়। ছেলেটার কান্নাকাটি, ঘরদোরের খাঁ খাঁ ভাব—অসুবিধা ঐখানে।

কায়েৎ দা, তুমি বড় পাষাণহৃদয়।

সেকথা একেবারে মিথ্যা নয়। সংসারে আমার মন থাকলে এতদিনে দুঃখ-দুর্দৈবের ভারে ভেঙে পড়তাম।

তবে তোমার মন কোথায় ?

খানকতক বই পেলে সব ভুলে যাই। বাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়ে শোভাবাজারের রাজবাড়ির গ্রন্থাগারে গিয়ে ঢুকি—এক মুহূর্তে সব ভুলে যাই।

প্রসঙ্গ বন্ধ করবার আশায় টুশকি বলল, বেশ কর ভুলে যাও, এখন দয়া করে ঘুমোও দেখি।

রাত অনেক হল, না ?

হল বই কি।

শোন্, এখন দিনকতক তোর বাড়িতেই থাকব। পাড়াপড়শীদের ঘ্যান ঘ্যান বড় অপছন্দ করি।

ভালই তো, থেকো।

পরদিন বিকালে ঘুরে এসে রাম বসু বলল, তোর এখানে থাকা হল না টুশকি।

হঠাৎ আবার মত বদলাল কেন ?

কেরী সাহেবের চিঠি পেয়েছি, অবিলম্বে দেখা করতে লিখেছে।

আবার মালদ যাবে ?

মালদ কোথায়, সাহেবরা চলে এসেছে শ্রীরামপুরে।

কিন্তু এমন জোর তাগিদ কেন ?

সেটা গিয়ে শুনব।

আসবে কবে ?

গিয়ে পৌঁছবার আগে তা বলি কেমন করে ?

কবে রওনা হচ্ছ ?

আগামীকাল, আর দেরি নয়।

টুশকি দুঃখ করে বলল, নরু তাহলে একেবারে একলা পড়ল !

একলা কেন, ন্যাড়া রইল, দুটিতে বেশ মিলেছে।

তোমার সংবাদ পাব কি করে ?

পাবি নে বলে ধরে রাখ্, পাস্ তো ভাল। ন্যাড়াকে বলে দিয়েছি মাঝে মাঝে এখানে এসে দেখা করে যেতে।

আজকের রাতটা তো এখানে থাকছ ?

আর কোথায় থাকব বল্ !

কেরীর আকস্মিক আমন্ত্রণে সত্যই খুব আনন্দিত হয়েছিল রাম বসু, স্ত্রী-বিয়োগের দুঃখদায়ক পরিস্থিতি থেকে দূরে যাওয়া সম্ভব এটা প্রধান কারণ হলেও আরও কারণ আছে। কেরীর জ্ঞানচর্চার আবহাওয়া তার জীবন-ধারণের পক্ষে অপরিহার্য হয়ে উঠেছিল। কলকাতায় সেই অভাবটাই তাকে পীড়িত করছিল প্রতি মুহূর্তে। অবশ্য কেরীর চিঠিতে যতই আনন্দিত হক, সে বিস্মিত হয় নি একটুও ; সে জানত অচিরে কেরীর আহ্বান এসে পৌঁছবেই, সে বুঝে নিয়েছিল কেরীর পক্ষেও সে সমান অপরিহার্য হয়ে উঠেছে।

শ্রীরামপুরে গেলে কতকাল আর রেশমীর সঙ্গে দেখা হবে না ভেবে সে তখনই রওনা হয়ে গেল রাসেল সাহেবের কুঠির দিকে—কোথায় যাচ্ছে জানাল না টুশকিকে। রাম বসু জানত রেশমীর স্মৃতি ছোট্ট একটি কাঁটার মত বেঁধে টুশকির বুকে। রাম বসু ভাবে, অকারণে দুঃখ দিয়ে কি লাভ !

১১
শ্রীরামপুরে পুনর্মিলন

শ্রীরামপুরে ঘাটের কাছেই 'ডেনমার্ক টাভার্ন'। কেরী সেখানে খোঁজ করতে রাম বসুকে লিখেছিল। 'ডেনমার্ক টাভার্নে' পৌঁছতেই কেরী দৌড়ে এসে রাম বসুকে ধরল, ওয়েলকাম মুন্সী, ওয়েলকাম ! আমি জানতাম তুমি আসবেই।

কেরী উৎসাহে চীৎকার করে ডাকে, মিঃ মার্শম্যান, মিঃ ওয়ার্ড, শীগগির এস, আমাদের বন্ধু মিঃ বসু এসেছে।

কেরীর আহ্বানে পাশের ঘর থেকে বেরিয়ে আসে ওয়ার্ড আর মার্শম্যান।

তার পরে পরিচয়, করমর্দন ও সৌজন্যের পালা শুরু হয়। রাম বসু দেখে ওয়ার্ড আর মার্শম্যান দুজনেরই বয়স অল্প, ত্রিশের দু-চার বছরের উপর, তার অধিক নয়।

কেরী বলে, মুন্সী, আমি তোমার সবিশেষ পরিচয় এদের দিয়েছি, এদের পরিচয় দিই।

তার পরে একটু থেমে বলে, এদের পরিচয় মুখে আর দেব কি—ক্রমে প্রকাশ পাবে। এদের আগমনে আমার শক্তি শতগুণ বেড়ে গিয়েছে, আমরা জোর কদমে ছাপখানার কাজ শুরু করে দিয়েছি।

রাম বসু শুধায়, কিন্তু তোমরা কলকাতা থাকতে শ্রীরামপুরে আস্তানা গাড়লে কেন ? এ সব কাজের জন্য কলকাতাই প্রশস্ত।

তাই তো ইচ্ছা ছিল এদের, কিন্তু মাঝখানে এক ভ্রান্তিবিলাস ঘটে যাওয়ার এখানে বাস করা ছাড়া আর গত্যন্তর রইল না।

এমন কি ভ্রান্তিবিলাস ঘটতে পারে যাতে এমন হওয়া সম্ভব ?

তবে খুলে বলি, বলে কেরী।

এদের জাহাজ কলকাতায় পৌঁছবার আগে সেখানকার কাগজে ছাপা হল যে,

কয়েকজন প্যাপিস্ট পাদ্রী আসছে। লেখা উচিত ছিল 'ব্যাপটিস্ট' কিন্তু লেখা হয়ে গেল 'প্যাপিস্ট' !—কি না পোপের চেলা, রোম্যান ক্যাথলিক। তুমি নিশ্চয় জান যে, কলকাতার খ্রীষ্টীয় সমাজ প্রোটেস্টাণ্ট খ্রীষ্টান, রোম্যান ক্যাথলিক গুরু পোপের চেলাদের বড় ভয় তাদের। তখনই সরকারী হুকুম বের হল যে, ওরা যেন কলকাতায় নামতে না পারে। অগত্যা তাদের নামতে হল শ্রীরামপুরে। এ শহর ইংরেজ কোম্পানির অধীন নয়, ডেনমার্কের রাজার রাজত্ব। এখানকার খ্রীষ্টীয় সমাজ সাদরে এদের বরণ করে নিল।

কিন্তু এই সামান্য ভুল কি সংশোধন করা যায় না? শুধায় রাম বসু।

মুন্সী, ভুল বড় মারাত্মক বস্তু, আর সবচেয়ে মারাত্মক—ছাপার ভুল।

তার পরে একটু থেমে সকলের দিকে তাকিয়ে বলে, আমরাও ছাপাখানা খুলেছি, আর ছাপাখানার দৈত্যদানবদের—আমরাই ছাপাখানার দৈত্যদানব—বলে দিয়েছি, দেখো সাবধান, তোমরা এক মারাত্মক ছাপার ভুলের শহিদ, তোমরা যেন আবার ভুল ছেপে বোসো না।

সকলে হো হো করে হেসে ওঠে।

এমন সময়ে মার্শম্যান বাইরের দিকে তাকিয়ে বলে ওঠে, ওই যে একটি ক্ষুদে দৈত্য আসছে।

এক গেলি ভিজে প্রুফ হাতে প্রবেশ করে ফেলিক্স কেরী, এই প্রুফটা এখনই দেখে দিতে হবে।

কেরী ছোঁ মেরে প্রুফটা কেড়ে নিয়ে তন্ময় হয়ে যায়।

মুন্সী এগিয়ে এসে ফেলিক্সের করমর্দন করে জিজ্ঞাসা করে, তার পর মাস্টার কেরী, কেমন আছ?

খারাপ থাকবার উপায় কি! দিনরাত্রি আমি আর মিঃ ফাউণ্টেন কাজের মধ্যে ডুবে রয়েছি।

কি ছাপছ?

'মথীয়ের লিখিত সুসমাচার।'

ওটা কবে শেষ হল?

তুমি চলে আসবার পরে বাবা একাই শেষ করেছে।

তোমার পিতার তুলনা হয় না মাস্টার কেরী।

প্রুফ নিয়ে ফেলিক্স ফিরে যেতে উদ্যত হলে রাম বসু বলল, চল তোমার সঙ্গে গিয়ে ছাপাখানার কাজ কেমন হচ্ছে দেখি গে। আর অমনি মদনাবাটি ত্যাগের পরেকার ইতিহাসটুকুও শুনে নেওয়া যাবে।

বেশ তো, চল, বলে ফেলিক্স, কাছেই ঐ বাড়িটা আমাদের ছাপাখানা।

ওদের যেতে দেখে কেরী বলে, মুন্সী, এক মিনিট দাঁড়াও!

তার পরে বলে, মুন্সী, তুমি আজ এই মুহূর্ত থেকে আমাদের মিশনের কাজে নিযুক্ত হলে, বেতন ত্রিশ টাকা। কেমন, রাজী তো?

রাম বসু বলে, ডাঃ কেরী, কবে আমি তোমার কথার অন্যথাচরণ করেছি!

ওরা দুজনে বেরিয়ে যায়। কেরী মার্শম্যান আর ওয়ার্ডকে বলে, মুন্সীর সঙ্গে পরিচয় হলে দেখবে পাণ্ডিত্যে, বাগ্মিতায়, নিষ্ঠায় ওর দোসর নেই হিন্দুস্থানে।

তুমি তো চলে এলে মুন্সী, কেন চলে এলে আজও জানতে পারলাম না, তার

পরে শুরু হল বিপদ, একটার পরে একটা।

বিগত কাহিনী বলে যায় ফেলিক্স। প্রথমে বাংলা পাঠশালাটি গেল ভেঙে, ছিরুর মা একদিন রাতে বাসনকোসন চুরি করে পালাল—সেই সঙ্গে পালাল কুঠির আমলা-গোমস্তার দল তবিল ভেঙে। এদিকে মার পাগলামি আরও বাড়ল, ওদিকে উডনী সাহেব নোটিশ দিল কুঠি দেবে উঠিয়ে। আমি বাবাকে বললাম, চল যাই কলকাতায় ফিরে। বাবা কি বলে জান মুন্সী ? সে বলল, জীবন-যুদ্ধে এক পা হটলে আর কখনও এগোনো সম্ভব হয় না। বাবা বলল, এইটুকু অসুবিধেয় পড়ে যদি কলকাতায় ফিরি, তবে কলকাতায় অসুবিধা দেখলে শেষ পর্যন্ত বিলেত ফিরে যেতে ইচ্ছা হবে। না ফেলিক্স, তা হয় না।

মুন্সী তন্ময় হয়ে শোনে, বলে, কথাটা মিথ্যা নয় ফেলিক্স, শেষ পর্যন্ত হটবার ইচ্ছা না থাকলে কেউ প্রথম ধাপ পিছোয় না।

এমন সময়ে মিঃ ফাউণ্টেন এল, তার সহায়তায় বাবা কলকাতা থেকে কিনে আনল চল্লিশ পাউণ্ড দিয়ে একটা মুদ্রাযন্ত্র। ঠিক সেই সময়ে গেল কুঠি উঠে, সবাই মিলে চলে এলাম খিদিরপুর নামে নিকটবর্তী এক গ্রামে। সেই ছাপাখানায় যেদিন প্রথম শীট ছাপা হল, পাঁচ গাঁয়ের লোক পড়ল ভেঙে, কলে বই ছাপা হয়! ওদের বিস্ময়ের অন্ত থাকে না। উপলক্ষটা নিয়ে গাঁয়ের লোক একটা গান বেঁধে ছিল, এখনও দু-একটা কলি মনে আছে।

এই পর্যন্ত বলে সুর করে আবৃত্তি করে ফেলিক্স—

ধন্য সাহেব কোম্পানি,
বই লেখা হয় কলে
কলটি যখন চলে
গুরুমশার ব্যবসা মাটি, ঘুচল দানাপানি,
মরি ধন্য সাহেব কোম্পানি।

বাঃ, বেশ লিখেছে তো! বলে রাম বসু, তার পরে কি হল বল ?

এমন সময় খবর পৌঁছল যে, এরা পৌঁছেছে শ্রীরামপুরে। বাবাকে সাদরে আহ্বান করল। বাবাও দেখল, উদ্দেশ্য এক, তবে আর অতদূরে পড়ে থাকি কেন, সবাই মিলে চলে এলাম।

আর টমাসের কি হল ?

তোমার চলে আসবার কিছুদিন পরে সেই যে সে বেগানা হল, আজও খোঁজ পাই নি তার। কেউ বলে, গিয়েছে রাজমহলে, কেউ বলে বীরভূমে।

মদনাবাটির পরবর্তী ইতিহাসের মোটামুটি একটা আভাস পায় রাম বসু।

রাত্রিবেলা বিছানাতে শুতেই সারাদিনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা মাকড়সার সুতোর মত কোথায় ছিন্ন হয়ে গেল উড়ে, মনে পড়ল রেশমীর অশ্রুকাতর মুখখানা। নিস্পন্দ চোখের কোণ দিয়ে জল গড়াচ্ছে—সমস্ত মুখখানি নিপুণ ভাস্করের গড়া মূর্তির মত স্থির। সামনে দাঁড়িয়ে রাম বসু অথচ চোখে পড়ছে না, দৃষ্টি হারিয়ে গিয়েছে কোন্ অলক্ষ্য দিগন্তে।

কি হল রে রেশমী, কাঁদছিস কেন ?

কে উত্তর দেবে ? উত্তর দেবার মালিক যে মন সে আজ কোন্ অগম গহনে পথ ভুলেছে। বিমূঢ়ের মত দাঁড়িয়ে থাকে রাম বসু—দুইজনে মুখোমুখি নির্বাক।

হঠাৎ সম্বিৎ পেয়ে রেশমী বলে ওঠে—কায়েৎ দা যে, এখন এলে ?

রাম বসু ব্যাখ্যার মধ্যে যায় না, বলে—ব্যাপার কি রে, কাঁদছিস কেন ?

ঐ প্রশ্নে চোখের জল আবার দ্বিগুণ বেগে নামে।

রাম বসু বিরক্তির সুরে বলল, কেন কাঁদছিস যদি না বলিস, তবে থাক, আমি চললাম !

ওঃ, বলি নি বুঝি ? কায়েৎ দা, আজ সকালে মিস এলমার মারা গেছে।

বলিস কি রে, চমকে ওঠে বসুজা। বলে, হঠাৎ ?

ঠিক হঠাৎ নয়, কিছুদিন থেকে শরীর খারাপ চলছিল। প্রায়ই আমাকে বলত, রেশমী বিবি, আমি আর বেশিদিন বাঁচব না।

ওসব কথা বললে আমি আর তোমার কাছে ঘেঁষব না।

মিস এলমার বলত, তাই বলে মনে ক'র না যে তোমার দৃষ্টান্ত যম গ্রহণ করবে—প্রতিদিন সে একটু একটু করে আমার দিকে এগিয়ে আসছে।

বুঝলে কায়েৎ দা, প্রায়ই এমনি কথাবার্তা হত আমাদের মধ্যে।

শেষে কি হয়েছিল বল্।

এমন কিছুই নয়, দুইদিন আগে সামান্য জ্বর—কালকে জ্বর বিকারে পরিণত হল, আজ সকালে সব শেষ হয়ে গেল।

রাম বসু বলল, মিঃ স্মিথ খুব দুঃখিত হয়েছে নিশ্চয় ?

একবারে ভেঙে পড়েছে, তার সবতাতেই বাড়াবাড়ি।

বলিস কি রে, ভালবাসে, দুদিন বাদে বিয়ে হবে, এমন সময়ে এই কাণ্ড, ভেঙে পড়বে না তো কি ?

ভালবাসে না ছাই, মিস এলমার ওকে দুচক্ষে দেখতে পারত না।

কিন্তু আমাকে যে স্মিথ বলেছিল কবচের ফল ফলেছিল !

এই তো ফল দেখলে। তাছাড়া যে পুরুষ কবচ-তাবিজ করে তাদের এমনিটিই হয়ে থাকে, এমনিটিই হওয়া উচিত।

বেশ একটু চাপা ঝাঁজের সঙ্গে কথাগুলো বলে রেশমী। রাম বসু বুঝতে পারে না তার ঝাঁজের কারণ।

এ যে আর এক সমস্যা হল।

কেন ?

এখন থাকবি কোথায় ?

লেছি রাসেল এখানেই থাকতে বলেছে আমাকে ; বলেছে, তুমি আর কোথায় যাবে, যতদিন আমরা আছি এখানে থাক।

যাক, নিশ্চিন্ত হলাম, নইলে কাল আমার যাওয়া হত না।

কাল আবার কোথায় চললে ?

শ্রীরামপুরে, কেরী সাহেব ডেকে পাঠিয়েছে।

ওরা কি সব শ্রীরামপুরে এসেছে ?

নইলে আর আমাকে ডেকে পাঠাবে কেন ?

তবে কি এখন ওখানেই স্থায়ীভাবে থাকবে ?

আমার পক্ষে যতখানি স্থায়ী হওয়া সম্ভব।

কিন্তু নরুর কষ্ট হবে না ?

ইতিমধ্যে ন্যাড়া এসে অন্নদার মৃত্যুসংবাদ জানিয়ে গিয়েছে।

রাম বসু বলে, মা মরলে কোন্ ছেলের কষ্ট না হয় ?

তার উপরে তুমি আবার চললে!

মার অভাব কি বাপে দূর করতে পারে ? থেকেই বা কি করব ?

রাম বসুর ঘুম আসতে চায় না, ঘুরে ঘুরে রেশমীর মুখ, রেশমীর চোখের জল মনে পড়ে। এতদিন রেশমীর স্মৃতি যদি বা একটু ঝাপসা হয়ে এসেছিল, অশ্রুধৌত হয়ে তা আবার শতগুণ উজ্জ্বল হয়ে উদিত হল তার মনে। একটুখানি কলঙ্কিত না হলে চাঁদ বুঝি এত সুন্দর হত না।

শেষ রাতে একটু ঘুম এসেছিল, হঠাৎ একটা কোলাহলে ঘুম ভেঙে গেল রাম বসুর।

উঠানের মধ্যে সকলে একসঙ্গে তারস্বরে কথা বলছে, বিশেষ উৎসাহের কারণ ঘটে থাকবে। কৌতূহলী হয়ে বাইরে গিয়ে দেখল পাদ্রীদের মধ্যে ডাঃ টমাস দণ্ডায়মান। রাম বসু দেখল টমাসের পোশাক যেমন ছিন্ন তেমনি মলিন, চেহারাও তদ্‌বৎ, উপরির মধ্যে সঙ্গে একটি জরাজীর্ণ মধ্যবয়স্ক বাঙালী হিন্দু।

এই যে মুন্সী, তুমিও এসেছ, আহা প্রভুর মন্দির পূর্ণ হয়ে উঠল—বলে ছুটে এসে টমাস জড়িয়ে ধরে রাম বসুকে।

তার পর, ভাল ছিলে তো ডাঃ টমাস ?

খুব ভাল। আনন্দে ছিলাম।

এতদিন ছিলে কোথায় ?

বীরভূমে সুবুল নামে একটা গ্রাম আছে সেখানে।

সেখানে কি গির্জা আছে নাকি ?

কোম্পানীর প্রত্যেক কুঠিটাই যে একটা গির্জা। ওখানকার কুঠিয়াল মিঃ চীপ বড় সদাশয় ব্যক্তি।

সঙ্গে ওটি তোমার চাকর নাকি ?

আমার চাকর কোথায় ? প্রভুর চাকর। ওর নাম ফকির। ও হচ্ছে 'খ্রীষ্টের খোঁয়াড়ে প্রবেশেচ্ছু একটি মেষ।'

বেশ বেশ, বড় আনন্দের কথা, বলে মুন্সী।

ওকে খ্রীষ্টমণ্ডলীভুক্ত করে প্রথম খ্রীষ্টান করবার গৌরব লাভ করব আমি।

দেখা যাবে তুমি কত বড় বাহাদুর! মনে মনে বলে রাম বসু।

ইতিমধ্যে কেরী, মার্শম্যান, ওয়ার্ড, ফাউণ্টেন প্রভৃতি সকলে একে একে সরে পড়েছে, তার কারণ টমাসের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস প্রত্যেকের একবার করে শোনা হয়ে গিয়েছিল, পুনরায় শোনবার আগ্রহ আর কারও ছিল না।

টমাস দেখল মুন্সীই একমাত্র শ্রোতা, পাছে সেও অন্য সকলের পদাঙ্ক অনুসরণ করে, তাই সবলে তার হাত ধরে বসিয়ে সংক্ষিপ্ত ইতিহাসের বিস্তারিত ভাষ্য কথনে নিযুক্ত হল। রাম বসু টমাসের প্রকৃতি জানত, বুঝল সকালবেলাটা এই পর্বেই যাবে।

১২
উদ্দেশ্য—তীর্থদর্শন

চণ্ডী বক্সী রেশমীর দিদিমা মোক্ষদা বুড়িকে হাত করে নিয়ে রেশমীর নামীয় বিষয়-আশয় জোত-ব্রহ্মত্র বাড়িঘর দখল করে বসেছিল। লোক কানাকানি করছে অনুমান করে যত্রতত্র বলে বেড়াত, আরে বাপু, একটু দেখাশোনা না করলে পাঁচভূতে লুটে খাবে, বুড়ো মানুষ—সামলাতে পারবে কেন?

তার পরে বলত, কি গেরো! যত দায় কি আমার ঘাড়ে এসে চাপবে!

লোকে মনে মনে বলত, কথাটা মিথ্যা নয়, গাঁয়ে এবং আশেপাশে পাঁচ গাঁয়ের এমন অনেকগুলো বিষয়-আশয়ের ভার ঘাড়ে চেপেছে বটে তোমার।

চণ্ডী বক্সী বলত, এ যেন কাকের বাসায় কোকিলের ছানা পুষছি, ডানায় জোর পেলেই উড়ে পালাবে, তখন কাকস্য পরিবেদনা! মানে বুঝলে তো মুৎসুদ্দি, কাকের কেবল মনে ব্যথা। এর চেয়ে অনেক ভাল ছিল যদি নিজের জোত-জমির তদারক করতাম।

সে খেদের প্রয়োজন ছিল না চণ্ডীর, নিজস্ব বলতে এক ছটাক জমিও ছিল না তার। চণ্ডীর মত লোকের পক্ষে পরস্বই নিজস্ব।

কিন্তু লোকের কাছে যাই বলুক, মনে শান্তি ছিল না চণ্ডীর। সে জানত রেশমী এখনও জীবিত, আর আছে সাহেবের হেফাজতে। কোন্‌দিন যে হঠাৎ দেখা দেবে, তখন বিষয়-আশয় যাবেই, না জানি কোন্ প্যাঁচে পড়বে, ভেবে তার দুশ্চিন্তার অন্ত ছিল না। বিপদে মধুসূদন মহারাজা নবকৃষ্ণ বাহাদুর কিছুকাল আগে দেহরক্ষা করেছেন, কাজেই কে তখন রক্ষা করবে চণ্ডীকে!

কিন্তু মেঘ যতই কালো হক দু-একটা রজতরেখা না থেকে যায় না। চণ্ডীর অভিপ্রায়ের প্রধান অন্তরায় তিনু চক্রবর্তী নিহত হয়েছে। গাঁয়ের লোকে আজও বুঝতে পারে নি তিনুর হত্যাকাণ্ডের রহস্য। কেবল চণ্ডী ঠিক অনুমান করেছিল। অসৎ লোকের ধূর্ত না হলে চলে না, সাধুসজ্জনেরই নির্বোধ হওয়া সাজে।

চণ্ডী বুঝেছিল যে, তিনু চক্রবর্তী তার অভিপ্রায় জানতে পেরে রেশমীকে রক্ষা করবার উদ্দেশ্যে গিয়েছিল বজরায়। অন্ধকারে শত্রুমিত্র একাকার। মরতে মরল তিনু। এটাকেও সে বিধাতার অভিপ্রায় বলে ব্যাখ্যা করত।

সে বলত, মিত্যুঞ্জয়,—মিত্যুঞ্জয় তার দুষ্কর্মের প্রধান সঙ্গী,—বল দেখি এটা কেমন করে ঘটল? আমি যদি অন্যায় কাজ করতেই গিয়ে থাকি, মরা উচিত ছিল আমার, মরল কেন তিনু?

লোকে বলে সাহেব অন্ধকারে গুলি চালিয়েছিল।

বাবা মিত্যুঞ্জয়, অন্তর্যামীর চোখেও কি আলো অন্ধকার আছে? তিনি তো দেখেছিলেন কে মরছে, রক্ষা করলেন না কেন?

মৃত্যুঞ্জয় বলে, আপনিই বুঝিয়ে দিন, আমরা যে লোকের প্রশ্নের উত্তর দিতে পারি না।

তাতে দুঃখিত হয়ো না বাবা, শাস্ত্রের ধর্ম বোঝা সহজ নয়।

তার পরে বেশ শাস্ত্রালোচনার উপযুক্ত শান্ত সংযত ভাবে উপবেশন করে বলে, গীতায় শ্রীভগবান কি বলেন নি যে 'পরিত্রাণায় সাধুনাম্, বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্, সম্ভবামি যুগে যুগে!' আরে বাপু, তিনু যখন মরল তখন বুঝে নিতে হবে যে লোকটা দুষ্কৃতকারী, আমি যখন বেঁচে গেলাম বুঝে নিতে হবে যে আমি সাধু।

একটু থেমে পুনরায় বলে, পড় পড়—গীতা পড়, ভাল করে গীতা পড়লে কোন কাজ করতে বাধবে না।

চণ্ডী খুব সম্ভব শাগরেদের মহিমা সম্পূর্ণ অবগত ছিল না, নতুবা এমন উপদেশ কেন দিতে যাবে!

মৃত্যুঞ্জয় বলল, এখন কি করবেন ভাবছেন?

একবার কলকাতা যেতে হবে।

কলকাতায় কেন?

আমার মনে হচ্ছে ছুঁড়িটা ওখানেই গিয়েছে, সেখানে সাহেবে সাহেবে মুখ শোঁকাশুঁকি, কতদূর কি গড়াল একবার সরেজমিনে দেখে আসা ভাল—জানই তো ক্ষেত্রে কর্ম বিধীয়তে।

আর কাকে সঙ্গে নেবেন?

বেশি লোক নেওয়া কিছু নয়, জানাজানি হবে যাবে।

তবে একাই যাচ্ছেন?

একেবারে একাকীও কিছু নয়। তুমি যেতে পারবে না?

বাধা কি।

আর সঙ্গে নিতে হবে মোক্ষদা বুড়িকে।

তাকে আবার কেন?

ছেলেমানুষ, কিছুই বোঝ না দেখছি। কলকাতা কোম্পানির মুল্লুক, আইনের রাজত্ব। ছুঁড়িটার প্ররোচনায় সাহেবগুলো গোলমাল বাধতে চেষ্টা করলে মোক্ষদাকে এগিয়ে দেব, বলব যে বুড়ি এসেছে নাতনীকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে। বুঝলে না? তা হলে আমাদের আর কোন দায় থাকবে না।

ভাল বলেছেন, কিন্তু বুড়িকে তো এত বলা যায় না!

যা বলা যায়, বলেছি, কালীঘাটে যাচ্ছি মা কালীকে দর্শন করতে। বুড়ি নেচে রাজী হয়েছে।

তবে তো চারদিক বেঁধেই অগ্রসর হয়েছেন।

অগ্রসর আর কোথায় হলাম, এখনও তো জোড়ামউ গাঁয়ে বসে আছি। যাও তুমি গিয়ে গোছগাছ করে নাও, কাল সকালেই বেরিয়ে পড়ব।

পরদিন সকালে মোক্ষদাকে নিয়ে চণ্ডী আর মৃত্যুঞ্জয় কলকাতা রওনা হয়ে গেল।

লোকে বলাবলি করল, চণ্ডী মুখে কটুকাটব্য করলেও মনটায় সাদা। বুড়িকে নিয়ে তো গেল কালীঘাটে—একা যেতে তার কি বাধা ছিল? যাই বল, দোষে গুণে মানুষ!

তিনু চক্রবর্তীর অভাবে চণ্ডীর প্রকৃত উদ্দেশ্যের সন্ধান কেউ জানতে পারল না।

১৩
জীবিত না মৃত ?

বেরিয়াল গ্রাউণ্ড রোডের পুবদিকে সুন্দরবনের মধ্যে খানিকটা জায়গা গাছপালা কেটে পরিষ্কার করে নিয়ে নূতন সমাধিক্ষেত্র স্থাপিত হয়েছে। তারই একদিকে একটি সদ্যোনির্মিত সমাধি পাথর দিয়ে গাঁথা, এখনও চুন-সুরকি ভাল করে শুকোয় নি। একদিন বিকালবেলা জন কতকগুলো সাদা ফুল নিয়ে সেখানে এসে উপস্থিত হল। ধীরপদে বিষণ্ণ মুখে সমাধির কাছে এসে চমকে উঠল—একি, এ ফুলগুলো দিয়ে গেল কে ? কাল অবশ্য সে এসেছিল, কিন্তু ফুল তো রেখে যায় নি। সাদা গোলাপের একটি তোড়া নিয়ে কাল এসেছিল সে, তোড়াটি রেখেছিল সমাধির শিয়রে। অনেকক্ষণ বসে থেকে উঠে যাওয়ার সময়ে তোড়াটি নিয়ে গিয়েছিল। সাদা গোলাপ রোজির খুব প্রিয় ছিল ; ইদানীং কতদিন তাকে হোয়াইট রোজ বলে ঠাট্টা করত। মনে পড়ল রোজি বলেছিল যে কর্নেল ডাকে আমাকে রেড রোজ বলে, এখন আবার তোমাদের মধ্যে ওয়ার অব্ রোজেস না বেধে যায় ! রোজের স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ সাদা গোলাপের তোড়াটি সঙ্গে করে সে বাড়ি ফিরেছিল। এখন আবার সেখানে সাদা ফুল দেখে তার বিস্ময়ের অন্ত রইল না, সেই সঙ্গে একটুখানি ঈর্ষাও কাঁটা ফুটিয়ে দিল। আমার প্রিয়জন আর কারও প্রিয়, এ চিন্তা প্রেমিকের পক্ষে হৃদ্য নয়, এমন কি প্রিয়জনের মৃত্যুর পরেও এ চিন্তার ধারা অবসিত হয় না, হয়তো বা বাড়ে। মৃত্যু যখন পর্দা ঝুলিয়ে দেয়, তখন সমস্ত সম্বন্ধের অবসান হয়—থাকে একমাত্র প্রেমের সম্বন্ধ ; সেই সম্বন্ধ অপর কোন জীবিত মানুষ স্মরণ করে রেখেছে প্রেমিকের পক্ষে তা অসহ্য। তার মনে একবার বিদ্যুতের কশা আঘাত করে গেল—কর্নেল নয় তো ? তখনই আবার মনে পড়ল, না ! কর্নেল রোজির মৃত্যুর দিনেই আড়াই-মণী মিস স্পেংলারের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে ; অবশ্য কর্নেলের পক্ষে যতখানি আত্মসমর্পণ সম্ভব। এ তার নিজের চোখে দেখা। যখন সবাই রোজ এলমারের মৃতদেহের সঙ্গে সমাধিক্ষেত্রের দিকে যাচ্ছিল তখন কর্নেলকে দেখা গেল নবলব্ধ প্রিয়তমাকে নিয়ে জুড়িগাড়ি হাঁকিয়ে যেতে। পাষণ্ডটা নামল না, একটু থামল না, এমন কি একবার টুপিটাও তুলল না ! সবাই মনে মনে তাকে ধিক্কার দিল, কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি, জনের মনে কেন যেন আনন্দ হল। ওঃ, এবার বেশ প্রমাণ হয়ে গেল তোমার প্রেম কতটা সত্য। মৃত্যুর কাছে চালাকি খাটে না।

সে ভাবল, তবে এক ফুল কে দিয়ে গেল ? কাল যখন এসেছিল, ছিল না এ ফুল। তবে সেই অজ্ঞাত ব্যক্তি আরও পরে এসেছিল—অর্থাৎ প্রায় সন্ধ্যাবেলা। তার পরে ভাবল, যে-ই দিক ক্ষতি কি ? কর্নেল যে দেয় নি এই তো যথেষ্ট। ফুলগুলি সমাধির শিয়রে রেখে সে মূঢ়ের মত বসে রইল। এমন সময়ে পিছনে পত্রমর্মরে পদশব্দ শুনে চমকে পিছনে চাইল—রেশমীর হাতে লাল ফুল ! এক মুহূর্তে ফুলের রহস্য পরিষ্কার হয়ে গেল তার মনে।

জন উঠে দাঁড়াল, রেশমী বিবি, তুমি ?

হাঁ মিঃ স্মিথ।

তুমি কাল এই ফুলগুলো দিয়ে গিয়েছিলে ?

হাঁ মিঃ স্মিথ।

আমি ভাবছিলাম, আবার কে এল !

এলেই বা ক্ষতি কি ? মৃত্যুর কাছে তো রেষারেষি চলে না।

অবশ্যই চলে না, তাছাড়া তোমার সঙ্গে আমার রেষারেষিই বা হতে যাবে কেন ? দাঁড়িয়ে রইলে যে ? ফুলগুলো দাও। বস।

রেশমী ফুলগুলো সমাধির শিয়রে সাজিয়ে দিয়ে বসল। লাল ফুল। রেশমীর ফুলে আর জনের ফুলে মেশামেশি হয়ে গেল।

মৃতকে কি লাল ফুল দেয় রেশমী বিবি ?

মিস এলমার মরেছেন, একথা আমার মন মানতে চায় না।

হায়, যদি তা সত্য হত !

সত্য হতে বাধা কি ? সবই তো মনের ব্যাপার !

ফাল্গুনের হাওয়ার দমক বড বড় বনস্পতিগুলোর মধ্যে চাপা দীর্ঘনিশ্বাসের মত হুহু করে ওঠে ; নানা ফুলের মিশ্র গন্ধ ছড়িয়ে দেয় অব্যক্ত অস্পষ্ট আকৃতি ; হাজার পতঙ্গের চঞ্চল পাখা অদৃশ্যের উত্তরীয়-প্রান্তের মত হঠাৎ গায়ে এসে ঠেকে ; আর অলক্ষ্য ঘুঘুটা একটানা বিলাপের রশি নামিয়েই চলেছে অতলের তল সন্ধান করে।

কথা ফুরিয়ে গিয়েছে অনেকক্ষণ দুজনের, দুজনে মূঢ়ের মত বনের রহস্যের দিকে তাকিয়ে নির্বাক বসে থাকে। মৃত্যুর কাছে মুখরতার স্থান নেই।

রেশমী কি ভাবছিল কেমন করে বলব। তবে জনের আর্ত ভাব, ফুল নিয়ে আগমন বোধ করি তাকে খুশি করে নি। কাল যখন সে দেখল যে সমাধিতে কারও ফুলের চিহ্ন নেই,—সে নিশ্চয় জানত জন ছাড়া ফুল দেওয়ার লোক আর কেউ নেই,—তখন মনে মনে বেশ একটু খুশি হয়েছিল। নিজের মনকে বোঝাতে চেষ্টা করেছিল যে, ভালই হল, মৃত্যুর পরে নিঃসপত্ন অধিকার সে পেয়েছে মিস এলমারের। কিন্তু খুশি কি কেবল সেই জন্যেই ? হয়তো মনের নীচের তলায় আবও একটা কারণ ছিল—জনের আর কোন টান নেই মিস এলমারের উপরে, নইলে মৃত্যুর দুদিন পরেই এমন করে ভুলে যেত না, সমাধির শিয়রে দুটো ফুল নিতান্ত নিস্পরেও দিয়ে থাকে। আজকে জনকে দেখে মনে লাগল তার খোঁচা, তবে দেখছি ভোলে নি ; ভাবল, ভালই তো, এত শীগগির ভোলা কি শোভন ? আবার ভাবল, দুটো ফুল দেওয়া নিতান্ত সামাজিক প্রথা, ওর সঙ্গে ভোলা না ভোলার কোন সম্বন্ধ নেই।

মিঃ স্মিথ, তুমি আজই প্রথম এলে ?

না রেশমী বিবি, গতকালও এসেছিলাম।

তবে ফুল দাও নি কেন ?

এনেছিলাম সাদা গোলাপ, সমাধির শিয়রে ঠেকিয়ে ফিরিয়ে নিয়ে গেলাম, সাদা গোলাপ আমার প্রিয়ার বড় প্রিয় ছিল।

সমাধির ফুল কি ফিরিয়ে নিয়ে যায় !

কেন ?

মৃত্যুর দান ফিরিয়ে নিতে নেই।

এই তো তুমি এখনই বললে যে রোজিকে তুমি মৃত ভাবতে পার না !

তুমি তো পেরেছ দেখছি।

কেমন করে জানলে?

তোমরা পুরুষরা প্রেয়সী মরলে নিতান্ত দুঃখিত হও না।

চমকে উঠে জন বলে, সে কি কথা!

তরুণতর প্রেয়সীর সন্ধানে সুযোগ পাও তোমরা।

রেশমী বিবি, তুমি যেমন কোমল তোমার কথাগুলো তেমনি কঠিন।

খুশি হল মনে মনে রেশমী। বলল, তোমাদের মনকে আঘাত করতে পারে এমন কঠিন কথা মেয়েদের অজ্ঞাত।

কি উত্তর দেবে জন ভেবে পায় না।

কোকিল দুটো সুরের টানাপোড়েনে আকাশটা প্রায় আচ্ছন্ন করে ফেলল।

জন বলল, রেশমী বিবি, চল, আর থাকা উচিত নয়, সন্ধ্যায় অনেক সময় শ্বাপদ বের হয় এদিকে।

রেশমী উঠল।

কাল আবার আসবে তো বিবি?

দেখি, চেষ্টা করব, সময় পাওয়া দুর্ঘট।

না না, অবশ্য এসো, তোমার হাতের ফুল বড় ভালবাসত মিস এলমার।

তুমি নিশ্চয় আসছ মিঃ স্মিথ?

আমার আর অন্য কি কাজ আছে বল। চল তোমাকে একটু এগিয়ে দিই।

দুজনে অগ্রসর হয় পশ্চিমদিকে এবং লোকালয়ের কাছাকাছি এসে চলে যায় দুজন দুদিকে।

জন মনে মনে ভাবে, রেশমী বিবি আসবে তো?

রেশমী মনে মনে ভাবে, পৃথিবী রসাতলে গেলেও জনের না এসে উপায় নেই।

পরদিন নির্দিষ্ট সময়ের অনেক আগে মিস এলমারের সমাধির কাছে পৌঁছে জনের মন দমে গেল। কেউ নেই। কিন্তু যখন তার নজরে পড়ল সমাধির শিয়রে টাটকা তাজা ফুলের রাশ, সে হতাশ হয়ে একবারে বসে পড়ল। রেশমী এসেছিল এবং ফুল দিয়ে চলে গিয়েছে। জনের মনে হল এ অন্যায়, মনে হল রেশমী অত্যন্ত বিশ্বাসঘাতক, মনে হল সুখ-সৌন্দর্য আশাপূর্ণ পৃথিবী একবারে নিরর্থক। সে চুপ করে বসে হাঁটুর মধ্যে মাথা গুঁজে পড়ে রইল।

অদূরে একটা সমাধির আড়ালে দাঁড়িয়ে জনের হেনস্তা দেখে রেশমীর চোখে কৌতুকের আভা ফুটল, ওষ্ঠাধরে হাসির রেখা ফুটল, সমস্ত মুখে চোখে ফুটল সার্থকতার আলো, সে যা চাইছিল তা-ই ঘটল। বলা বাহুল্য সে আগেই এসেছিল আর ফুলগুলো রেখে একটু আড়াল হয়েছিল জনের মনোভাব যাচাই করবার উদ্দেশ্যে, সে পরীক্ষা করতে চায় জীবিত ও মৃতের মধ্যে কার টান বেশি? গতকাল পর্যন্ত তার ধারণা ছিল মৃত চাঁদের টানে যেমন জোয়ার ফেনিয়ে ওঠে সমুদ্রের বুকে, তেমনি আজও মৃত এলমার ফেনিয়ে ফাঁপিয়ে তুলছে জনের বুক। কিন্তু এইমাত্র জনের যে দশা স্বচক্ষে সে দেখল, বুঝল যে এক্ষেত্রে মৃতের উপরে জীবিতের স্থান। তার মনে কেমন একটু দয়াভাবের সঞ্চার হল এই হতভাগ্য যুবকটির উপরে, কেমন যেন একটু মাতৃভাব। প্রত্যেক প্রেমের সঙ্গে মাতৃভাব মিশ্রিত, প্রত্যেক নারী সম্ভাবিত মাতা, এই অর্থে নিতান্ত বালিকাও অত্যন্ত

বয়োজ্যেষ্ঠ পুরুষের চেয়ে জ্যেষ্ঠতর।

ফাল্গুনের পত্র-মর্মরে পায়ের শব্দ মিশিয়ে রেশমী কাছে গিয়ে ডাকল, মিঃ স্মিথ!

চকিতে মুখ তুলে চাইল জন, তার মুখে জ্বলে উঠল আলো, বলে উঠল, বিবি, তুমি এসেছ?

এবং তার পরেই কি করছে ভাল করে ভেবে দেখবার আগেই হাত বাড়িয়ে রেশমীর হাতখানা ধরে—পাছে ছলনাময়ী পালিয়ে যায়, পাছে রহস্যময়ী স্বপ্নে পরিণত হয়—বসাল তাকে সমাধির উপরে।

তোমার ফুলগুলো দেখে আমার মন দমে গিয়েছিল, ধারণা হয়েছিল তুমি এসে চলে গিয়েছ।

চলে যাব কেন, অন্য সমাধিগুলো ঘুরে ঘুরে দেখছিলাম।

কি আর দেখবার আছে ওগুলোতে?

বল কি মিঃ স্মিথ, মৃতের সমাধি বড় রহস্যময়।

না বিবি, এ তোমার ভুল, রহস্যময় যদি কিছু থাকে তবে তা জীবন, যেমন রহস্যময় তেমনি সৌন্দর্যময়, তেমনি সার্থক।

কিন্তু মিঃ স্মিথ, মৃত্যুও কি জীবনের অঙ্গ নয়, মৃত্যুর রহস্যও যে জীবনের রহস্যের অন্তর্গত।

তোমার কথা ঠিক বিবি, কিন্তু মৃত্যুর মধ্যে প্রবেশের পথ যে জীবনের তোরণ দিয়ে, সমাধিতে প্রবেশ করতে হয় আঁতুড়ঘর দিয়ে।

সেই কথাই তো বলছিলাম, জীবনে প্রবেশের দুটি দরজা, আঁতুরঘর আর সমাধি।

বিবি, তোমাদের হিন্ডুদের দর্শন-শাস্ত্রে সহজাত অধিকার।

তার পর বলে উঠল, আহা তুমি যদি হিন্ডু না হতে!

তবে কি নিগ্রো হলে খুশি হতে? বলে খিল খিল করে হেসে উঠল রেশমী, যেন প্রেমিকার শিয়রে বীজনরত বনাঙ্গনার হাতে বেজে উঠল রেশমী চুড়ির গোছা।

জীবন-মৃত্যু সম্বন্ধে এত কথা ওদের জানবার নয় যারা বলে, তাদের মনে রাখা উচিত প্রেম মুখে অজ্ঞাত ভাষা যুগিয়ে দেয়, আবার প্রেমই হরণ করে মুখের ভাষা; যে বসন্ত বনে বনে ফুল ফুটিয়ে তোলে সেই বসন্তই দমকা হাওয়া তুলে আবার তা ঝরিয়ে দেয়।

ওদের মুখের কথা গেল বন্ধ হয়ে, কিন্তু মানুষ তো শুধু মুখ দিয়েই ভাব প্রকাশ করে না। চৈত্রসন্ধ্যায় আকাশ-কোণায় ছোট ছোট বিদ্যুৎ-সঞ্চারের মত ওদের চোখের কোণে কোণে ফুটল জিজ্ঞাসা, শুক্লা তৃতীয়ার চাঁদের ফালির মত ওদের ওষ্ঠাধরে ফুটল হাসির রেখা, পিপাসার অদৃশ্য মরীচিকা ওদের সর্ব অঙ্গ ঘিরে আলোকরশ্মির চমক তুলতে লাগল।

অবশেষে ওদের মুখের কথা গেল একবারে বন্ধ হয়ে। বসন্তের রাতে হাওয়ার মাতামাতি যখন ক্ষণতরে স্তব্ধ হয়ে যায় তখন আমের বোলের ঘন গন্ধ চেপে ধরে অরণ্যের বুক, সে চাপ একাধারে অসহ্য সুখের আর দুর্বহ দুঃখের, তা সহ্য করা বা সরিয়ে ফেলা দুই-ই সমান কঠিন।

কিছুক্ষণ পরে,—কতক্ষণ পরে তা ওরা জানে না, প্রেমের জগৎ দেশকালের অতীত,—জন আচমকা বলে উঠল, রেশমী বিবি, আমি তোমাকে ভালবাসি।

নিজের কণ্ঠস্বরে চমকে উঠল জন, কে বলল তার মুখ দিয়ে ঐ কথা? বোকার মত, কিঞ্চিৎ লজ্জিতভাবে তাকিয়ে রইল; ভাবল, না জানি এখনই কি রূঢ় উত্তর শুনতে হবে!

অত্যন্ত সহজভাবে রেশমী বলল, এবারে ওঠ মিঃ স্মিথ, সন্ধ্যা হয়ে এসেছে।

উত্তরের সহজ প্রসন্নতায় হাঁফ ছেড়ে বাঁচল জন, ফাঁসির হুকুমের বদলে বেকসুর খালাসের রায়!

তখনই পরমুহূর্তে নৈরাশ্যের ধাক্কা অনুভব করল বুকে—এখনই ফিরতে হবে?

অবশ্য রেশমী ওঠবার জন্যে কিছুমাত্র ব্যস্ততা প্রকাশ না করায় আনন্দিত হল; কিন্তু তখনই আবার কেমন আশাভঙ্গের ভাব প্রবল হয়ে উঠল মনে, আসল কথাটার জবাব তো মিলল না! বেকসুর খালাস আসামী ফাঁসির দায় থেকে মুক্ত হয়ে দেখে, মুক্তি মিলল বটে, কিন্তু আর কিছু তো মিলল না! বাড়িঘর আত্মীয়স্বজন মায় রাহাখরচ কিছুই নেই সম্মুখে!

কোন্ কৌতুকপরায়ণ অদৃষ্ট প্রেমের নাগরদোলায় চাপিয়ে মানুষকে নিয়ে নিষ্ঠুর পরিহাস করে, কি আনন্দ পায় সে-ই জানে।

ওঠ মিঃ স্মিথ, সন্ধ্যা হল যে!

সন্ধ্যা হল তো কি হল?

বাঃ, তুমিই তো কাল বলেছিলে যে, সন্ধ্যাবেলায় এদিকে বাঘ বের হয়!

হয় হক, ক্ষতি কি?

ক্ষতি আর এমন কি, কেবল দুজনের ঘাড় ভেঙে রক্ত পান করবে!

বীর্য প্রকাশ করে জন বলল, ডিয়ারি, আগে আমার ঘাড় ভাঙবে।

কিন্তু তাতেই বা কি লাভ হবে, দু-দণ্ড পরে যদি আমার ঘাড় ভাঙে!

দুশমনটার এমন দুঃসাহস কখনো হবে না।

না হওয়ার কি কারণ? সে তো আমার সঙ্গে প্রেমে পড়ে নি?

ইনডীড! বলে হেসে ওঠে জন।

হাসির দমকায় ভাবালুতার কুয়াশা যায় কেটে। হাসি তত্ত্বজিজ্ঞাসার প্রথম সোপান।

দুজনে সমাধিক্ষেত্র থেকে বেরিয়ে রাস্তার উপর আসে। এমন সময় চমকে উঠে জন ইশারা করে দেখায়, ভীত বিস্ময়ে রেশমী দেখে অদূরে গাছপালার আড়ালে সঞ্চরমাণ শার্দূলরাজ। টুঁ শব্দটি করে না কেউ। ঘনিষ্ঠ হয়ে আসে জনের কাছে রেশমী। জন বাহুবন্ধনে রেশমীকে টেনে নেয়। বাঘের ভয় বাহুবন্ধনের যে জোর দাবি করে তার চেয়ে বোধ করি কিছু অধিক ছিল জনের বাহুতে; বাঘের ভয় পুরুষের যে ঘনিষ্ঠতা দাবি করে তার চেয়ে বোধ করি কিছু অধিক ছিল রেশমীর নৈকট্যে; দুজনে প্রায় একাঙ্গ হয়ে স্থাণুর মত, মূঢ়ের মত, শিশুর মত, জগতে সবচেয়ে সুখীর মত দাঁড়িয়ে থাকে, ভয়ে, আনন্দে, বিচিত্র সৌভাগ্যে; আবার এখনই ছাড়াছাড়ি করতে হবে সেই দুর্ভাগ্যে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁপে; নির্বাক তাকিয়ে থাকে ওরা বাঘটার দিকে; শীঘ্র চলে যাক, ধীরে ধীরে যাক, আর কখনও যেন না আসে, আবার কাল যেন এইভাবে আসে—কত কি বিরুদ্ধ ভাবনার বলাকা উড়ে উড়ে যায় ওদের মনে। মুগ্ধ প্রণয়ী-যুগলের লীলার প্রতি দৃক্‌পাত মাত্র না করে শার্দূল-রাজ নির্দিষ্ট পথে চলে গেল। যে অরণ্যে ওদের প্রণয়ের ভূমিকা সৃষ্টি হয়েছিল সেই অরণ্যের শার্দূল-রাজ নির্মোচ্য গ্রন্থি এঁটে দিল ওদের বসনে। বহু যুগ আগে

অরণ্যের এক সর্প যে-ভূমিকার সৃষ্টি করে দিয়েছিল আদিম দম্পতির জীবনে, সেই অরণ্যেরই আর এক পশু তারই আর এক অধ্যায়ের সূচনা করে দিল বহুযুগ-পরেকার আর এক দম্পতির জীবনে।

বাঘটা চলে গেলেও বাহুবন্ধন ওদের শিথিল হল না, দৃঢ়তর হল না ঘনিষ্ঠতা। এখনও ভয়ের কারণ যায় নি, এই বিশ্বাস জাগিয়ে রেখে ওরা তেমনি রইল দাঁড়িয়ে। এমন কতক্ষণ চলত কে জানে, কিন্তু হঠাৎ সেই সময়ে কোকিলের কুহুতে বুঝি নূতন শর নিক্ষিপ্ত হল, আমের বোলের গন্ধ বুঝি আর একটু চেপে এল, বাতাসের হু-হুতে বুঝি নবীন ছন্দ ধ্বনিত হল, আর শুক্লা তৃতীয়ার কৌতূহলী চন্দ্র বুঝি শাখা-প্রশাখা ভেদ করে কৌতুকের পিচকারি আর একটু বেগে নিক্ষেপ করল—কি হচ্ছে ভাল করে বোঝবার আগেই জনের ওষ্ঠাধর স্পষ্ট হল রেশমীর অধরোষ্ঠে। এমনি চকিতে জ্বালাময় সুখময়, বিষময় অমৃতময়, বেদনা আনন্দময়, সুখদুঃখের নির্যাসময়, বহ্নুজ্জ্বল অগ্নিময় অভিজ্ঞতার সুতীব্র সুদীর্ঘ শূল আমূল নিহিত হল রেশমীর সত্তায়। সে এক ঝটকায় নিজেকে ছিনিয়ে নিয়ে বেগে ছুটে গেল বাড়ির দিকে, পিছনে ফিরে তাকিয়ে দেখল না জনের অবস্থা। কিয়ৎক্ষণ অপ্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে অপরাধীর ন্যায় ধীরপদে জন চলতে শুরু করল।

এতক্ষণ কৌতুকপরায়ণ অদৃষ্ট দুটি অবোধ তরুণতরুণীর প্রেমের লীলা দেখে নিশ্চয় খুব হাসছিল—এবারে তার ছুটি হল।

তত্ত্বজ্ঞানীরা চিরকাল ধরে আলোচনা করে আসছেন মূলত মানুষ ভাল কি মন্দ। কিন্তু সত্য কথা এই যে, মানুষ মূলত ভালও নয়, মন্দও নয়, মূলত মানুষ বিচিত্র, অদ্ভুত অপ্রত্যাশিত তার প্রকৃতি। তাই সমাধিতে বসে প্রেমসূত্র রচনায় তার সঙ্কোচ নেই ; তাই অচিরগত প্রেয়সীর শ্মশান ভস্ম তার হাতে আবীরমুষ্টি হয়ে ওঠে, তাই সমাধির ফুলে প্রেমের মালা রচনা করে সে। এ কি ভালমন্দের কাজ ! এ কাজ অদ্ভুতের। বোধ করি এই হচ্ছে মানব-প্রকৃতির সত্য। কিংবা তার চেয়েও অধিক—এই বোধ করি বিশ্বপ্রকৃতির সত্য। জীর্ণ পত্রপুষ্প রচনা করে নূতন জীবনের ভূমিকা, প্রেমের সমাধি গঠন করে নূতন প্রেমের রঙ্গমঞ্চ, শ্মশানের বুকে অঙ্কুরিত হয় পঞ্চবটী আর একদিন অবশেষে সমাধিস্থ মৃতদেহ নবতর জীবনের পাত্র হাতে করে দেখা দেয় জ্যোতির্ময় রূপে। জীবনের অশ্ব সবেগে সোল্লাসে সার্থকতার মুখে টেনে নিয়ে যায় মৃত্যুর অনড় রথখানা। পরাজিত মৃত্যু আনন্দধ্বনি তোলে, জয় জীবনের জয়।

১৪
কর্তব্যপরায়ণ জন

বাণগ্রস্তা মৃগীর মত ছুটে এল রেশমী, পথে লোকজন ছিল না, নইলে সে অবস্থায় তাকে দেখলে অবাক হয়ে যেত—একটা আস্ত মেয়ে এমনভাবে ছুটছে কেন ! বাগানের খিড়কি দরজা দিয়ে ঢুকে পড়ল বাড়িতে, একেবারে নিজের ঘরে এসে শুয়ে পড়ল, সে রাতে আহার করবার জন্যেও উঠল না।

সমস্ত অবস্থা ধীরভাবে বিবেচনা করে দেখবার মত মনের অবস্থা তার ছিল না ;

যখন যে-ভাবটা প্রবল হয়ে উঠেছিল সেইটাকেই নিচ্ছিল চরম বলে ; ফলে পলে পলে, পলকে পলকে মনের মধ্যে তার ভাবান্তরের বন্যা প্রবল হয়ে উঠেছিল। প্রথমে অপ্রতিরোধ্য দুর্জয় একটা রাগ হল জনের উপরে, মনে হল অসহায়তার সুযোগ নিয়ে ঘোরতর অপমান করেছে সে রেশমীকে। কিন্তু একবারও তার মনে হল না যে, অসহায় অবস্থা কেবল রেশমীর ঘটে নি, হাতে পেলে জনকে ছেড়ে কথা কইত না বাঘটা। তার পর জনকে কাপুরুষ বলে মনে হল, নইলে একলা পেয়ে মেয়েদের সঙ্গে এমন ব্যবহার কোন পুরুষে করে না। কিন্তু তখনও ভেবে দেখল না যে, মনে মনে সে-ও আকৃষ্ট হয়েছিল জনের প্রতি। খুঁটিয়ে দেখলে তাকে স্বীকার করতেই হত যে, তার মনটাও বেশ নুয়ে পড়েছিল জনের দিকে। দুইখানি মনের মেঘ যখন বেশ জলভার-অবনত হয়ে কাছাকাছি এসে পড়েছে, তখন বাঘটা হঠাৎ এসে পড়ে তাদের মধ্যে বিদ্যুতের রাখী বেঁধে দিল। এতদিনের ধীর মন্থর মন্দাক্রান্তা এক মুহূর্তে শার্দূলবিক্রীড়িত ছন্দে পরিণামে গিয়ে পৌঁছল।

এই হল গিয়ে তার মনের সাক্ষ্য। কিন্তু দেহ সাক্ষ্য দেয় ঠিক উল্টো। দেহ থেকে থেকে জনের স্পর্শপুলক স্মরণ করে উল্লাসে কেঁপে কেঁপে ওঠে। সেই চুম্বিত মুহূর্তটাকে স্মৃতির উপরিতলে টেনে আনবার জন্য চেষ্টার তার অবধি নেই, কিন্তু ঠিকমত পেরে ওঠে না। স্বচ্ছ জলের নীচে দেখা যায় সেই স্খলিত চুনিটা, হাত বাড়িয়ে দেয়, আর একটু নীচে, আর একটু, তবু রয়ে যায় অপ্রাপ্য ; চোখে মনে হয় এত কাছে, তবু হাতটা পৌঁছয় না কেন, বুঝতে পারে না বিমূঢ় দেহ। একি রহস্য ! একি রহস্যময় যন্ত্রণা ! ইন্দ্রধনুর মধ্যে দুটি একটি রঙ আছে, মন বলে আছে বই কি, চোখ তবু ধরতে পারে না, মন যত নিবিষ্ট হয়, চোখ হয় তত উদ্‌ভ্রান্ত, চোখে আর মনে কিছুতেই সাক্ষ্য মেলাতে পারে না। রেশমীর মন যতই বলছে জন কাপুরুষ, অত্যাচারী, নিষ্ঠুর, দেহ ততই আগ্রহে সেই চুম্বনে উজ্জ্বল মুহূর্তটিকে যথাযথ আকারে উদ্ধার করতে চায়। মন ও দেহের দ্বৈরথ থেকে দূরে দাঁড়িয়ে রেশমী ভাবে, একি আপদ ! এমন সময়ে তার চোখে পরে জনের ছবিখানা। এখানা আবার কে আনল বলে উত্তেজিত হয়ে ওঠে সে। এনেছিল সে নিজে। রোজ এলমারের মৃত্যুর পরে তার ঘর থেকে ছবিখানা সরিয়ে নিয়ে এসেছিল সে নিজের ঘরে। সরিয়ে ফেলবার উদ্দেশ্যে ছবিখানা হাতে নিয়ে হঠাৎ চমকে ওঠে, জনের মুখে একসঙ্গে দেহ ও মনের বিপরীত সাক্ষ্যের চিহ্ন পড়ে তার চোখে। চোখ দুটো দেখে মন বলে ওঠে, এ তো নিষ্ঠুরতায় পূর্ণ ; অধরোষ্ঠের গুণ-পরানো ছোট্ট ধনুকটার বিলাস-বঙ্কিমা দেখে দেহ সর্বাঙ্গে কণ্টকিত হয়ে ওঠে, চুম্বনঘন সেই মুহূর্তটি অমৃতসিক্ত ক্ষুদ্র একটি শরের মত নিক্ষিপ্ত হয় তার বুকে। কি করছে ভাল করে বোঝবার আগেই দেহ সেখানে মুদ্রিত করে দেয় একটি চুম্বন। পরমুহূর্তে মন করে ওঠে প্রতিবাদ, ছবিখানা দূরে নিক্ষিপ্ত হয়। এইভাবে কতক্ষণ চলত বলা যায় না, কিন্তু এক সময়ে এই অসম দ্বন্দ্বে ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ল কখন, কাপড় বদলাতেও গেল ভুলে।

ওদিকে জনের অবস্থা সহজেই অনুমেয়। পরদিন যথাসময়ে গেল সে রোজ এলমারের সমাধিতে, বসে রইল সন্ধ্যা যতক্ষণ না গড়িয়ে যায় ঘনান্ধকার রাতে, এল না কেউ। একবারও তার মনে পড়ল না যে, কাল এখানে বাঘ বেরিয়েছিল, আজও বের হতে পারে। মনের বাঘের মুখে যে ধরা পড়েছে বনের বাঘে তার কি করতে পারে ! অবশেষে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ফিরে এল। এমনি প্রতিদিন যায়, প্রতিদিন হতাশ হয়ে ফিরে আসে। লিজা তার বিষণ্ণ উদ্‌ভ্রান্ত ভাব দেখে ভাবে, আহা বেচারা জন, কত কষ্টই না

পাচ্ছে! লিজা ভাবে, এত অল্প বয়সে এত বেশি দুঃখ পেল জন। কেটির শোক ভুলতে না ভুলতে রোজির শোক। এক-একবার ভাবে জনকে সান্ত্বনা দেবে, কিন্তু ভাষা পায় না খুঁজে ; ভাই-এর শোককে মনের মধ্যে গোপনে লালন করে চুপ করে থাকে, ভাবে বেচারা জন।

রেশমী মিস এলমারের সমাধিতে যাওয়া বন্ধ করে দিয়েছিল ; জানত যে, সেখানে গেলে জনের সঙ্গে দেখা হওয়া অনিবার্য। সে মনে মনে ভাবল, থাক ওখানে আহাম্মুকটা বসে। বিকাল হলেই বুঝতে পারত জন ওখানে বসে আছে। নির্বোধের নিরর্থক প্রতীক্ষা স্মরণ করে মাঝে মাঝে সে কৌতুক অনুভব করত ; আবার রাগও হত, পড়ুক একদিন বাঘের মুখে, হক উচিত শিক্ষা। লোকে বলে প্রেম অন্ধ। ওটা বাড়াবাড়ি, আসলে প্রেম কানা, নিজের দিকের চোখে মাত্র দেখতে পায়।

ক্রমে জনের মনেও প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। সে ভাবল সে কি অকৃতজ্ঞ! ঐ একটা নেটিভ মেয়ের জন্যে সে কিনা স্বর্গের দূতী রোজিকে অবহেলা করেছে! ছি ছি, এ কি কাপুরুষতা! ভাবল, এ দুঃখ তার ন্যায্য প্রাপ্য, এ তার শিক্ষা। তখনই সে মনঃস্থির করে ফেলল, রোজি ছাড়া আর কোন মেয়ের কথা স্বপ্নেও চিন্তা করবে না সে। টেবিলের উপরে তাকিয়ে দেখল, এতদিনকার অযত্নে মিস এলমারের ছবিতে ধুলো জমেছে, অনেকদিনের ফুলগুলো শুকিয়ে মলিন অবস্থায় পড়ে আছে। তখনই সে তুলে আনল তাজা ফুল, সাদা গোলাপ, ধুলো ঝেড়ে ছবিখানাকে সাজাল, আর অনেকদিন পরে তন্ময় হয়ে তাকাল রোজির মুখে। কি সুন্দর! চোখ দুটি আনন্দে কৌতুকে সৌন্দর্যে ঝলমল করছে। আর সেই সঙ্গে যে একটুখানি অবিশ্বাসের ভাব ছিল চোখ দুটিতে—সেটুকু পড়ল না অবশ্য জনের চোখে।

জনের মনে পড়ল একদিনের বিশ্রম্ভালাপ। জন বলেছিল, রোজি, তোমাকে চিরকাল আমি ভালবাসব।

রোজি উত্তর দিয়েছিল, তার মানে এ-বেলাটা!

ক্ষুব্ধ জন বলেছিল, রোজি, তুমি আমাকে এমন চপল মনে কর?

তোমার দোষ কি জন, ভালবাসা বস্তুটাই চপল।

তাই বলে এ-বেলা ও-বেলা?

এক বেলার জন্যে পেলেই বা মন্দ কি?

দেখে নিও রোজি, আমি সারাজীবন বাসব ভাল।

আমার মৃত্যুর পরেও? শুধিয়েছিল রোজি, চোখে জেগেছিল কৌতুকময় অবিশ্বাসের ভাব।

নিশ্চয়।

কিন্তু কেন জন, চপল বস্তুকে চিরস্থায়ী করবার এই ব্যর্থ চেষ্টা কেন?

তোমাকে ছাড়া আর কাউকে যে আমি জানি নে।

আমাকেই বা কতটুকু জান?

তোমাকে সবটুকু জানি।

জনের ছেলেমানুষি দেখে রোজি হেসেছিল।

জন নিতান্ত অবুঝ না হলে বুঝতে পারত যে, তার প্রতি রোজির মনোভাব আর যাই হক, ভালবাসার নয়। যে ভালবাসে, ভালবাসাকে চপল জেনেও চিরন্তন মনে করে

সে। তাত্ত্বিকের কাছে ভালবাসা চপল, প্রেমিকের কাছে চিরন্তন।

ছবিখানা দেখে আজ সেই সব কথা মনে পড়ল জনের । ছবিখানাকে টেনে নিয়ে সে চুম্বন করল ; সঙ্কল্প করল, আজ রোজির সমাধিতে গিয়ে ফুল দিয়ে সাজিয়ে দেবে। সঙ্কল্প করবামাত্র দেহে মনে নূতন এক তেজ ও উৎসাহ বোধ করল সে, তখন সদর্পে সমস্ত অপবাদ ঝেড়ে ফেলে দিয়ে সদম্ভে খাড়া হয়ে দাঁড়াল। তার পর অনেকদিন পরে দুই পকেটে হাত ঢুকিয়ে দিয়ে প্রফুল্ল মনে একটা হাল্কা গানের সুর শিস দিতে দিতে দ্রুতবিক্ষেপে বেরিয়ে চলে গেল আপিসের দিকে। কর্তব্যপরায়ণ জন।

বিকালবেলা মিস এলমারের সমাধিক্ষেত্রে এসে উপস্থিত হল জন। সেখানে আর কাউকে না দেখতে পেয়ে সে যে হতাশ হয় নি এই কথাটাই মনকে বোঝাবার জন্যে শিস দিতে দিতে বারকয়েক প্রদক্ষিণ করে নিল সমাধিটা। তার পরে ফুল সংগ্রহের আশায় প্রবেশ করল বনের মধ্যে। আজ অফিস থেকে সোজা আসছিল, তাই ফুল আনতে পারে নি।

ওদিকে সমাধির কাছে এসে দাঁড়াল রেশমী। এতদিন পরে হঠাৎ আজ আসতে গেল কেন সে ? রেশমী মনকে বোঝায়, একবার বোকা মানুষটার আহাম্মুকি দেখে আসি ; বলে, পুরুষের বোকামি দেখতে আমার বড় ভাল লাগে। এ ছাড়া আর কিছু তার মনের অগোচরে থাকলে কেমন করে জানব ! একথা অবশ্য সত্য যে, জনের প্রতি বিদ্বেষ সত্ত্বেও তাকে অনেকদিন না দেখে কেমন যেন দমে গিয়েছিল সে। মনকে বোঝাত, একবার দেখা পেলে দুটো কড়া কথা শুনিয়ে দিতাম ; বুঝত যে, রেশমী রোজি নয়, রেশমী ন্যায্য কথা বলতে জানে। কিন্তু কড়া কথা বলবে কাকে ? মানুষটার যে দেখা নেই। মন বলে, যাও না কেন সমাধিস্থলে, শুনিয়ে দিয়ে এস কডা কথা। রেশমী বলে, পাগল নাকি ! তাহলে ভাববে তার সঙ্গে দেখা করবার জন্যেই এসেছি। তার চেয়ে আসুক না এ বাড়িতে। মন বলে, তুমিও পাগল হলে দেখছি। এ বাড়িতে আর কোন্ সুবাদে আসবে সে ? রেশমী বলে, আচ্ছা বাড়িতে না হয় না-ই এল, কিন্তু বাড়ির সামনের পথেও কি যাতায়াত করতে নেই ? মন বলে, তুমি কি পথে দাঁড়িয়ে প্রকাশ্যে ঝগড়া করবে নাকি ? রেশমী বলে, দূর, তা কেন, তবে একবার দেখতাম। মন বলে, দেখবার এত আগ্রহ কেন ? সন্দেহজনক নয় কি ? রেশমী বলে, আগ্রহ আবার কিসের দেখলে ? লোকটা কতখানি শুকিয়ে গিয়েছে তাই একবার দেখতাম। মন বলে, শুকোবে কোন্ দুঃখে ? তোমার বিরহে নাকি ? আর যদি দেখ যে, না শুকিয়ে বেশ মোটাসোটা হয়ে উঠেছে ? রেশমী বলে— যে রকম আহাম্মুক, হতেও পারে।

মনের সঙ্গে এইরকম অবিশ্রাম ঝগড়া করে ক্লান্ত হয়ে পডেছিল রেশমী, ভাবল, একবার দেখেই আসি না, ব্যাপার কি ! তাছাড়া, গুলবদনীর প্রতিও তো একটা কর্তব্য আছে। কিন্তু সমাধিস্থল শূন্য দেখে মনটা কেমন দমে গেল, নিজের নৈরাশ্যকে অস্বীকার করবার উদ্দেশ্যে বারংবার মনকে বোঝাতে লাগল, আহা, কড়া কথা বলবার সুযোগ হল না। সমাধিস্থলে গিয়ে বসে পড়ল বিষণ্ন মনে।

কিছুক্ষণ পরে পত্রমর্মরে সচকিত হলে পিছন ফিরে রেশমী দেখল, পাশেই জন কতকগুলো সাদা করবী ফুল হাতে দণ্ডায়মান। জনকে প্রত্যাশা করে নি সে, কাজেই বিস্মিত হল। জনও কম বিস্মিত হয় নি রেশমীকে দেখে। সেও আগে দেখতে পায় নি রেমশীকে, একটা গাছের আড়াল পড়েছিল, অপ্রস্তুত হয়ে সে তাড়াতাড়ি ফেলে দিল হাতের ফুলগুলো।

রেশমী বলে উঠল, ফুল ফেলে দিলে কেন ?

জন বলল, রেশমী, তুমি তো সাদা ফুল পছন্দ কর না।

কিন্তু সাদা ফুল যে পছন্দ করে তার জন্যেই তো এনেছিলে ?

কে বলল, তোমার জন্যে আনছিলাম।

আমাকে তো প্রত্যাশা কর নি এখানে।

নিশ্চয় করেছি, বলে জন। বলে, প্রেমিকের প্রত্যাশা কি কখনও যায় !

রেশমী জনের কথা বিশ্বাস না করলেও তার অপ্রস্তুত ভাব দর্শনে খুশি হল। চাঁদ কি খুশি হয় না সমুদ্রের উদ্বেল ভাব দর্শনে ?

জন শুধাল, তুমি এতদিন এখানে আস নি কেন রেশমী ?

কেমন করে জানলে যে আসি নি ?

আমি যে এসে এসে হতাশ হয়ে ফিরে গিয়েছি।

হতাশ হলে কেন ? সমাধি তো ছুটে পালায় নি !

সম্পূর্ণ অসহায়ভাবে জন বলে ফেললে, তুমি জান রেশমী, আমি এখানে কেন আসি ?

নিতান্ত নিরীহের মত রেশমী বলল, কেমন করে জানব ?

অধীর আবেগে জন বলে উঠল, জান না ? নিশ্চয় জান।

কি জানি ?

আমি তোমাকে ভালবাসি, কায়মনোবাক্যে ভালবাসি, তোমাকে ছাড়া আর কাউকে ভালবাসি নে।

জনের উক্তির পক্ষে অন্য কোন প্রমাণের প্রয়োজন ছিল না, তার কণ্ঠস্বরই যথেষ্ট প্রমাণ।

বলা বাহুল্য, রেশমী মনে মনে খুশি হল—এহেন কণ্ঠস্বরে এহেন উক্তিতে কোন্ নারী না খুশি হয় !

কিন্তু এ কথার কি উত্তর দেবে রেশমী ? যেখানে কথাটা অবিশ্বাস্য বা অগ্রাহ্য সেখানে উত্তর যেগায়, অন্যত্র মৌনই যে শ্রেষ্ঠ উত্তর। কিন্তু গোলমাল বাধায় এই মৌন ভাবে, মৌন সম্মতির লক্ষণ হতে পারে আবার অসম্মতির লক্ষণ হতেও বাধা নেই।

রেশমীর নীরবতায় শঙ্কিত জন তার পাশে বসে পড়ে রেশমীর হাত দুটি হাতের মধ্যে টেনে নিল, রেশমী ছাড়িয়ে নিল না হাত। এতেই রেশমীর মনোভাব বোঝা উচিত ছিল জনের, কিন্তু কিছু বুঝতে না পেরে উদ্বিগ্নভাবে তাকিয়ে রইল রেশমীর মুখের দিকে।

এসব ক্ষেত্রে পুরুষ নির্বোধ। মেয়েরা অনেক অনায়াসে পুরুষের মনের ভাব বুঝতে পারে। বুদ্ধিজীবী পুরুষ প্রমাণ চায়, সংস্কারজীবী নারী অনুমান করে নেয়।

হঠাৎ লাফিয়ে উঠে জন বলল, দাঁড়াও, তোমার জন্যে লাল ফুল নিয়ে আসি, বনের মধ্যে দেখেছি একটা পলাশ গাছ !

এই বলে সে বনের ঘনায়মান অন্ধকারের মধ্যে ছুটে চলে গেল। বনের মধ্যে সন্ধ্যাবেলায় বিপদ হতে পারে জেনেও বাধা দিল না রেশমী। দ্রৌপদীও তো বাধা দেয় নি পাণ্ডবদের নীলপদ্মের সন্ধানে যেতে।

রেশমী সুখস্বপ্নগ্রস্তের ন্যায় বসে রইল, কিছু চিন্তা করবার মত মনের অবস্থা তার ছিল না, জনের স্পর্শে তখন তার দেহের উপশিরা উচ্চ নিখাদে আহত বীণাযন্ত্রের মত

রী রী করছিল। কখন যে ফিরে এল জন কিংশুকের স্তবক নিয়ে, কখন যে তার খোঁপায় গুঁজে দিল কিংশুকের বহ্নিবলয়—ভাল করে জানতেও পায় নি রেশমী, তার পর যখন জন তাকে বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে চুম্বনে চুম্বনে সহস্র ভ্রমর-চিহ্নিত নিশ্চল পদ্মের মত উদভ্রান্ত করে দিল তখন আর কিছু জানবার অবস্থা ছিল না তার, বাহ্যজ্ঞানলুপ্ত হয়ে দিব্যজ্ঞানের স্বর্ণতোরণ দিয়ে তখন চলে গিয়েছে সে কোন্ আদিম অবস্থার মধ্যে। তখন সেই অবস্থায় সে একরকম করে অনুভব করল, আকাশের সবগুলো গ্রহনক্ষত্র সোনার ঘণ্টা হয়ে জ্যোতির্ময় সঙ্গীত ধ্বনিত করছে, অরণ্যের সবগুলো তরুলতা অযুত বাহু আন্দোলন করে মহানৃত্যে মত্ত হয়ে উঠেছে, আর পৃথিবীর সব ধূলিকণা মহোৎসবের ক্ষেত্রে যে ধুলোট রচনা করেছে আত্মবিস্মৃত স্বয়ং মহাকাল সেখানে লুটোচ্ছে, চরাচরের চৈতন্য চেতনার শেষ প্রান্তে উপনীত হয়ে আপনাকে ফেলেছে হারিয়ে, সিন্ধুতে বিন্দুবিলীন।

প্রথম সম্বিৎ পেল জন, দেখল রাত্রি প্রায়োত্তীর্ণ প্রথম প্রহর, বুঝল নিরাপত্তার কাল অনেকক্ষণ গত।

সে বলল, রেশমী, এবারে ওঠ। রেশমী কোন কথা না বলে কেশবাস বিন্যস্ত করে নিয়ে উঠে দাঁড়াল।

তখন দুইজনে বাহুবদ্ধ অবস্থায় বেরিয়ে এল সমাধিক্ষেত্র থেকে।

সমাধির উপরে যখন মুগ্ধ নরনারীর এই লীলা চলছিল তখন খুব সম্ভব অসহায় জনের একটা হিল্লে হল ভেবে সমাধির অভ্যন্তরে রোজ এলমার স্বস্তিতে পাশ ফিরে শুয়েছিল। আর তার আশেপাশে যেসব মৃত নরনারী শায়িত ছিল খুব সম্ভব তারাও অনেকদিন পরে মর্ত্যজীবনের এই প্রহসন দেখে নিজ নিজ জীবনস্মৃতি স্মরণ করে দীর্ঘশ্বাস ফেলেছিল। জীবনে মরণে মানুষ সত্যিই বিচিত্র!

জনহীন নিরালোক পথে চলতে চলতে জন বলল, রেশমী, কাল সন্ধ্যায় আসবে আমার ওখানে?

বিস্ময়ে বলে ওঠে রেশমী, তোমার বাড়িতে?

না না, বাড়িতে কেন? কসাইটোলা আমার অফিসে ঘরগুলো সন্ধ্যাবেলায় খালি থাকে, তুমি বাড়ির কাছে রাস্তায় দাঁড়িয়ে থেকো, গাড়ি করে তুলে নিয়ে যাব, আবার পৌঁছে দিয়ে যাব গাড়ি করে। যাবে?

রেশমী বলল, যাব।

তার পর বলল, অত রাতে ফেরা সুবিধা হবে না, ধর রাতটা যদি ওখানেই থাকি?

খুব ভাল হবে, আমিও থাকব। বলে টেনে নেয় আর একটু কাছে, কিন্তু কি বলবে লেডি রাসেলকে?

সে কি আমার মত তুচ্ছ লোকের সন্ধান রাখে? যারা রাখে তাদের বলব, আজকের রাতটা কাটাব কায়েৎ দার বাড়িতে।

তুমি লক্ষ্মী মেয়ে রেশমী। তাহলে কথা ঠিক?

নিশ্চয়।

চল তোমাকে বাড়ির কাছ পর্যন্ত এগিয়ে দিই—একাকী ছেড়ে দেওয়া কিছু নয়। এই বলে রেশমীকে বাহুসংবদ্ধ করে নিয়ে অগ্রসর হয় জন। কর্তব্যপরায়ণ জন।

১৫
রেশমীর 'না'

পরদিন অপরাহ্নে জন রেশমীকে গাড়িতে তুলে নিল, পূর্বনির্দেশমত বেরিয়াল গ্রাউন্ড রোড ও চৌরঙ্গীর মোড়ে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিল সে। সেকালে অনেক শ্বেতাঙ্গ দেশীয় রমণীদের নিয়ে প্রকাশ্যে যাতায়াত করত, ঘর করত, কাজেই কেউ বিশেষভাবে লক্ষ্য করল না রেশমীকে। গাড়ি সোজা উত্তর দিকে চলে কসাইটোলার মোড়ে এসে পৌঁছল, মোড়ের কাছেই জনের অফিস। তখন সন্ধ্যাবেলা অফিস খালি, দু-চারজন আরদালি দারোয়ান মাত্র ছিল। জন রেশমীকে নিয়ে সোজা তেতলায় গেল, তেতলায় তার খাস কামরা।

ড্রয়িংরুমে ঢুকে জন রেশমীকে বলল, বস। রেশমী বসলে জন বলল, রেশমী, তুমি আসবে ভাবিনি।

কি আশ্চর্য, না আসব কেন, কাল তো কথা ঠিক হয়ে গেল!

ইউ আর সাচ এ গুড গার্ল!

অ্যাম আই? আর ইউ শিওর?

দুজনে হো হো করে হেসে ওঠে।

আচ্ছা রেশমী, কি বলে বের হলে বাড়ি থেকে?

সে কথা কালকে তো বলেছি।

আমার কি ছাই কালকের সব কথা মনে আছে?

কেবল আমাকে তুলে নেবার কথাটা ভুলতে পার নি!

তাহলে তো নিজেকেই ভুলে যেতে হয়।

কিন্তু আমার ভয় হয়েছিল যে, তুমি ভুলে যাবে।

দেখলে তো যে ভুলি নি।

বাস্তবিক, আশ্চর্য তোমার স্মরণশক্তি।

আবার দুজনে হো হো করে হেসে ওঠে।

প্রাণপ্রাচুর্যের উচ্ছ্বসিত ফেনা ঐ হাসি, যৌবনে তা সুলভ। বার্ধক্যে প্রাণপ্রবাহ নিস্তেজ, হাসি স্তিমিত। যুবক অকারণে হাসে, কারণ উপস্থিত হলেও বৃদ্ধের মুখে হাসি যোগায় না।

জন শুধাল, আচ্ছা রেশমী, আমার আরদালি যদি খাদ্য এনে দেয় তবে খাবে?

কেন খাব না?

আমার ধারণা ছিল তোমাদের সমাজের সংস্কার অন্তরায়।

আমি আজ কতদিন সমাজছাড়া, দীর্ঘকাল কাটল খ্রীষ্টানদের সঙ্গে, খাওয়া-ছোঁওয়া সম্বন্ধে বাছবিচার ছেড়ে দিয়েছি।

ভালই করেছ।

না করে উপায় ছিল না, রাতদিন একসঙ্গে থাকলে ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে চলা খুব শক্ত। তাছাড়া ডাঃ কেরীর মত লোকের, মিস এলমারের মত লোকের ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে চলতেই বা যাব কেন?

আর আমার মত লোকের ছোঁয়াচ ?

তুমি আর সে বিষয়ে চিন্তা করবার সময় দিলে কই ?

রেশমী, আমার মনের কথা যদি জানতে—

তার চেয়ে তোমার আরদালিকে ডাক, খুব খিদে পেয়েছে। মনের কথা না হয় পেটের খিদে মিটিয়ে নিয়ে ধীরেসুস্থে শুনব।

জনের ইঙ্গিতে আরদালি দুজনের মত খাদ্য নিয়ে এল। জন যতদূর সম্ভব দেশীয় খানার ব্যবস্থা করেছিল, রেশমীর কোন রকম অসুবিধা হল না। উচ্ছিষ্ট পাত্র সরিয়ে নিয়ে গেলে একটি সিগারেট ধরিয়ে জন ও রেশমী আবার মুখোমুখি বসল।

হেমন্তের তৃণবনে একটি হাওয়া লাগবামাত্র যেমন অজস্র পতঙ্গ চঞ্চল হয়ে ওঠে, তেমনি অজস্র তুচ্ছ কথা রঙীন পাখার চপল ভঙ্গীতে চঞ্চল হয়ে উঠল ওদের মুখে। মাঝে মাঝে একটা করে হাসির দমকা হাওয়া লাগে, ততই আরও বেশি চঞ্চলতা প্রকাশ করে তাদের পাখা। অবশেষে এক সময়ে কথার ভাগ কমে নীরবতার ভাগ বাড়ল এবং ক্রমে সব কথা আত্মবিসর্জন করল অখণ্ড নীরবতায়। তখন দুজনে মুখোমুখি নীরবে বসে রইল। দুজন লোক নীরব বসে রইলে বুঝতে হবে যে, হয় তাদের সব কথা বলা হয়ে গিয়েছে, নতুবা এমন কিছু কথা আছে যা অনির্বচনীয়। যুবক-যুবতীর নিছক সান্নিধ্য একরকম জৈব বিদ্যুৎ সৃষ্টি করে—মুখের শব্দের চেয়েও যা গভীরতর অর্থে পরিপূর্ণ। সেই বিদ্যুৎময় নীরবতা দুজনের মধ্যে তখন কথা চলাচাল শুরু করে। কথা কুলুপ, নীরবতা কক্ষ।

রেশমীর দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে জন ভাবছিল, যার নয়নে অধরে, কপোলে গ্রীবায়, ভ্রূসন্ধিতে কুন্তলে, বসনে ভূষণে সর্বাঙ্গে এমন অজস্র অমৃতের সঞ্চয় তার কেন এত কৃপণতা ; একজন দারুণ পিপাসায় সামনেই পুড়ে মরছে, আর একজন শীতল বারিধি নিয়ে নির্বিকার বসে আছে ! জন ভাবছিল, কেন এমন সৌন্দর্য, এমন নিষ্ঠুরতা, এমন তৃষ্ণা, এমন পানীয় পাশাপাশি !

রেশমী জনের মনের কথা বুঝেছিল, ভারি একটা বেদনা বোধ করছিল মনে মনে, তবু শেষ সঙ্কোচটুকু কিছুতে যেতে চায় না। জন কেন একটুখানি জোর করে না ! রেশমী যুদ্ধপ্রত্যাশী নয়, তবু একবার যুদ্ধের ভাণ না করে আত্মসমর্পণ করে কিভাবে সে ? পরাজয় অবশ্যম্ভাবী তবে আত্মসম্মান রক্ষার পক্ষে অপরিহার্য ঐ যুদ্ধের অভিনয়টুকু। রেশমী ভাবছিল, জন বোধকরি মনে করছে যে এখনও স্তম্ভমূল দৃঢ়। নির্বোধ ! এখন একটিমাত্র মৃদু ধাক্কার প্রয়োজন, সেটুকুও কি দিতে রাজী নয় জন ? মনে একটুখানি রাগের মতও হল ! কিন্তু তখনই দৃষ্টি পড়ল জনের আর্ত অসহায় তৃষিত চোখের দিকে। সে আর স্থির থাকতে পারল না, তার সঙ্কল্প বিচলিত হল। সে মনে মনে বলল, জন, তোমাকে কেবল আত্মসমর্পণ করলাম না, আত্মসম্মান রক্ষার যে সান্ত্বনাটুকু নারীরা হাতে রেখে দেয় সেটুকু অবধি তোমাকে দিলাম। তুমি বড় অসহায় বলেই তোমার দাবি বড় প্রচণ্ড।

হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে রেশমী বলল, জন, আর ঠায় বসে থাকতে পারছি না, আমি কাপড় বদলাতে চাই, শোবার ঘর কোথায় দেখিয়ে দাও।

জনের মত নির্বোধ লোকেও কথাটার ইঙ্গিত বুঝল, কৃতজ্ঞতায় আনন্দে তার দুই চোখ চকচক করে উঠল, বলল, এটা তোমার শোবার ঘর রেশমী, পাশেই স্নানের ঘর,

সেখানে ব্যবস্থা আছে। যাও ভিতরে যাও, আমি 'নক' করলে তুমি আসতে ব'ল।

কোন উত্তর না দিয়ে রেশমী শয়নগৃহে প্রবেশ করল।

রেশমী ক্লান্ত হয়েছিল, ভাবল স্নান করে নিই, তাহলে আরাম পাওয়া যাবে। স্নানের ঘরে ঢুকে শাড়ি শেমিজ খুলে ফেলে. শীতলজলে খুব আরাম করে সে স্নান করে নিল, তার পরে মাথাটা মুছে শোবার ঘরের প্রকাণ্ড আয়নার সম্মুখে দাঁড়িয়ে চুল আঁচড়াবার জন্যে চিরুনি হাতে নিয়ে প্রতিবিম্বের দিকে তাকিয়ে একবারে মুগ্ধ হয়ে গেল। বিধাতাপুরুষ সদ্যসৃষ্টি বিশ্বদৃশ্যের দিকে তাকিয়ে খুব সম্ভব এমনি বিস্ময় বোধ করেছিল ; আদিম নারী ইভ পল্বলে প্রথমবার নিজেকে প্রতিবিম্বিত দেখে নিশ্চয় এমনি মোহ বোধ করেছিল ; সমুদ্রোত্থিত উর্বশী পুরুষের আঁখিতারায় নিজেকে প্রতিবিম্বিত দেখে নিশ্চয় এমনি তন্ময়তা বোধ করেছিল। কেশবিন্যাস, বেশবিন্যাস ভুলে গিয়ে রেশমী অপলক তাকিয়ে রইল নিজের জীবন্ত ছায়ার দিকে। স্ফুটনোন্মুখ সূচ্যগ্র ম্যাগনোলিয়ার কুঁড়ির মত চিবুক থেকে একটির পর একটি জলবিন্দু ঝরে বুকের দুর্গম গিরিসঙ্কটে অবিরত ধারার সৃষ্টি করেছে ; মসৃণ তপ্ত উজ্জ্বল ত্বকের স্পর্শে জলবিন্দু মুক্তাবিন্দুর চেয়ে রমণীয় হয়ে উঠেছে ; আর স্নানের আয়েসে মৃদু স্পন্দিত বক্ষের আন্দোলনে তালে তালে কাঁপছে সেই মুক্তাহার। রেখামনোরম কণ্ঠ, জলে সিক্ত আঁখিপক্ষ্ম ; ভেজা অলকাগ্রগুলো বিচিত্র রেখায় ললাটপ্রান্তে লিপ্ত ; চোখের দৃষ্টি স্বপ্নভারাতুর মধুকরী তরীর মত নিরুদ্দেশের দিকে উধাও, আর চুম্বনের কুঁড়িভরা অধরোষ্ঠের দুই কোণে বিস্মিত পুলকের আভাস। রেশমীর আর পলক পড়ে না ; তৃপ্তি হয় না— তার মনে হল, সে যেন আর কাউকে দেখছে। রূপ দেহলগ্ন, সৌন্দর্য দেহবিবিক্ত ; নিতান্ত সৌন্দর্যচেতন নারীর কাছেও আপন সৌন্দর্য সম্পূর্ণ আয়ত্ত নয় ; রূপসী স্বাধীন, সৌন্দর্যময়ী আপন সৌন্দর্যের অধীন ; সে নিতান্ত অসহায়। দেব-সমাজে যার অসীম প্রতাপ সেই উর্বশীর মত অসহায়, দুর্বল, পরাধীন আর কে !

আয়নার কাছে বসে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল রহস্যময়ী ছায়ার দিকে রেশমী ; সে ভুলে গেল জনের কথা, ভুলে গেল বেশবিন্যাসের কথা, ভুলে গেল বাহ্যজ্ঞান। তার মনে পড়ে গেল মদনাবাটির পল্বলে ছায়া-দর্শনের স্মৃতি ; তার মনে হল, সেদিন সৌন্দর্য ছিল পাতার আড়ালের কুঁড়ি, আর আজকের সৌন্দর্য পত্রাবরণ মুক্ত, নিরাবরণ, নিরাভরণ, আবৃন্তপ্রস্ফুট পুষ্প।

হঠাৎ দরজায় ঠক্ ঠক্ আওয়াজে তার আচ্ছন্ন ভাব কেটে গেল, মনে পড়ল, বাইরে অপেক্ষমাণ জনের কথা। কেমন একটা বিস্বাদে বিতৃষ্ণায় তার মন ভরে গেল ; কেবলই মনে হতে লাগল, এ অন্যায়, এ অন্যায়, জনের এ অন্যায় দাবি। তার মনে হল, জন সৌন্দর্যের দস্যু, তার দেহ মন্থন করে হরণ করে নিতে চায় সৌন্দর্যটুকু। এ অন্যায় দাবি জন, এ অন্যায় দাবি !

আবার দরজায় ঠক্ ঠক্ আওয়াজ। রেশমী কাপড় পরে নিল, আর টেবিলের উপর থেকে কলম তুলে নিয়ে এক টুকরো কাগজে কি যেন লিখল, তার পরে উৎকণ্ঠ ব্যাকুল ঠক্ ঠক্ আওয়াজ উপেক্ষা করে স্নানের ঘরসংলগ্ন ঘোরানো লোহার সিঁড়ি দিয়ে সোজা নেমে গিয়ে বেরিয়াল গ্রাউন্ড রোডের বাড়ির দিকে দ্রুত চলতে শুরু করে দিল।

আরও কিছুক্ষণ পরে, বিলম্বশঙ্কিত জন 'ভিতরে আসছি রেশমী' বলে ঘরে ঢুকে পড়ে দেখল ঘর শূন্য, কেউ কোথাও নেই। ভয়ে আশাভঙ্গে যখন সে ব্যাকুল হয়ে উঠেছে, চোখে পড়ল কাগজের টুকরো—খপ করে তুলে নিয়ে পড়ে ফেলল এক নজরে। তার

মনে হল সে বুঝি ভাষা ভুলে গিয়েছে ; বারংবার পড়ে, মনে মনে পড়ে, অবশেষে নিজেকে শোনাবার উদ্দেশ্যে উচ্চস্বরে পাঠ করল—"জন, পারলাম না। ক্ষমা ক'র। সংস্কার অন্তরায়। আমার মন তুমি জান, ঠিক বুঝে নিতে পারবে আমার কথার অর্থ। রেশমী।"

ভগ্ন মহীরুহের মত একেবারে ভেঙে গিয়ে বসে পড়ল জন, চিন্তা করবার শক্তি তার লোপ পেল।

রেশমীর মনের কথা জন ঠিক বুঝতে পারল কিনা জানি নে। কিন্তু কি তার যথার্থ অন্তরায় ? সংস্কার না সৌন্দর্য ? সে ভাবল সৌন্দর্য, লিখল সংস্কার, তার কলম আর মন চলল ভিন্ন পথে। অথবা সৌন্দর্যই প্রবল করে তুলল তার সংস্কারকে। অথবা সুন্দরী নারীর মনের কথা স্পষ্ট বোধগম্য হলে মানুষ শিল্পসৃষ্টি করবার অসাধ্য সাধনে আত্মনিয়োগ করত না কখনও।

১৬
ননদ-কাঁটা

পরদিন জন বিনা ভূমিকায় লিজাকে বলল, লিজা, আমি স্থির করেছি বিয়ে করব।

লিজা এমন প্রস্তাবের জন্যে প্রস্তুত ছিল না, তাই হঠাৎ উত্তর দিতে পারল না। তার নীরবতা খুঁচিয়ে উত্তর আদায় করবার আশায় আবার জন বলল, কি, উত্তর দিলে না যে ?

এবারে লিজাকে কথা বলতে হল, বলল, এর চেয়ে আনন্দের আর কি হতে পারে !

জন বলল, মুখে যাই বল না কেন, তোমার আনন্দ যে হয় নি তা মুখ দেখেই বুঝতে পারছি।

লিজা বলল, আনন্দ না হওয়ার কারণ তো দেখছি না।

সত্য বলতে কি, জনের প্রস্তাবে লিজা হকচকিয়ে গিয়েছিল। রোজ এলমারের সমাধিতে ঘাস গজাবার আগেই এমন প্রস্তাবের প্রত্যাশা করে নি সে জনের কাছে। সে মনে মনে ভাবল—ধন্যি এই পুরুষ জাতটা !

জন বলল, আনন্দের কারণ থাক আর নাই থাক, আমি মনঃস্থির করে ফেলেছি।

লিজা হেসে বলল, জন, শুধু সঙ্কল্পে তো বিয়ে হয় না, একটা পাত্রীও প্রয়োজন হয় বলে জানি।

অবশ্যই একজন পাত্রী আছে।

এবার কে সেই সৌভাগ্যবতী জানতে পারি কি ?

'এবার' শব্দটার খোঁচা বিঁধল গিয়ে জনের মর্মে, সে নিতান্ত বিরক্ত হয়ে বলে উঠল, এবারে ছাড়া আর কোন্‌বার বিয়ের প্রস্তাব করেছি শুনতে পাই কি ?

লিজা অবশ্য ইচ্ছা করলে কেটি ও রোজ এলমারের নাম করতে পারত, কিন্তু সেদিক দিয়ে গেল না, বলল, কিছু মনে কর না জন, মনটা ভাল নয়, তাই হয়তো কি বলতে কি বলে ফেলেছি !

জন বলল, আশা করি মন খারাপের কারণ আমার প্রস্তাবটা নয় ?

নিশ্চয়ই নয়। তার পরে বলল, কথা কাটাকাটি থাক, এবারে মেয়েটির নাম বল।

লিজা ঘুণাক্ষরেও টের পায় নি জন ও রেশমীর ঘনিষ্ঠতা।

এবারে জনের উত্তর দেওয়ার পালা। বিয়ের প্রস্তাবটা সে ঝোঁকের মাথায় বলে ফেলেছিল বটে, কিন্তু অত সহজে মেয়ের নামটা মুখে এল না তার। গতকাল সন্ধ্যাতেও রেশমীকে বিয়ে করবার ইচ্ছা তার মনে ছিল না, কিন্তু রেশমীর পলায়ন ও তার চিঠি প্রচণ্ড একটা রোখ জাগিয়ে দিয়েছিল তার মনে। বিশেষ রেশমী যে লিখেছিল 'সংস্কার অন্তরায়', তার স্বকৃত ভাষ্য করে নিয়েছিল জন ; সে ধরে নিয়েছিল যে, কোন সৎঘরের মেয়ে বিয়ের আগে আত্মসমর্পণ করে না। রেশমীর চিঠিখানা পড়ে অনেকক্ষণ সে মাথায় হাত দিয়ে বসে ভেবেছিল, তার পরে মনে হয়েছিল, ভাল, রেশমী যদি তা-ই চায় তবে বিয়েই করব। জনের মত ভাবালু লোক নীতি বা সঙ্কল্পের দ্বারা চালিত হয় না, চলে ঝোঁকের মাথায়। সেই ঝোঁকটা থাকতে থাকতে তারা অসাধ্যসাধন করতে পারে, ঝোঁক চলে গেলেই তারা চরম অসহায়।

জনকে নীরব দেখে লিজা হেসে বলল, কি জন, আগে বিয়ের সঙ্কল্প স্থির করে এখন বুঝি মেয়ের নাম ভাবতে বসলে ? না জন, এমন ছেলেমানুষি ভাল নয়।

ছেলেমানুষি দেখলে কোথায় ? মেয়ে তো স্থির আছে।

তবে নামটা বলে ফেল।

কিন্তু নামটা এত সহজে আসতে চায় না জনের মুখে, তার মনে পড়ল রেশমীর চিঠি—'সংস্কার অন্তরায়'।

লিজা বলল, এস আমরা ভাগাভাগি করে নিই, তুমি সঙ্কল্প স্থির করেছ, আমি এখন মেয়ে স্থির করি।

ধন্যবাদ লিজা, তোমাকে কষ্ট করতে হবে না, মেয়েটির নাম রেশমী।

বজ্রচালিত হয়ে লিজা বলে উঠল, রেশমী ! আর কোন কথা বের হল না তার মুখে।

কি, চুপ করে রইলে যে ?

এ যদি পরিহাস না হয় তবে নিতান্ত মূঢ়তা !

কেন, শুনতে পাই কি ?

সে যে নেটিভ।

কেন, নেটিভ কি মানুষ নয় ?

ওসব তর্কের মধ্যে যেতে চাই নে জন, আমি বলছি এ অসম্ভব।

কেন অসম্ভব ? এই কলকাতার প্রতিষ্ঠাতা জব চার্নকের কি নেটিভ পত্নী ছিল না ?

সে একশ বছর আগেকার কথা ছেড়ে দাও, তখন কজন শ্বেতাঙ্গ ছিল এ শহরে ?

তাই বলে বিয়েটা কি বিয়ে হয় নি ?

লিজা বলল, সেদিন কলকাতায় শ্বেতাঙ্গ সমাজ বলে কিছু ছিল না, সব কিছু চলত। আজকে তুমি নেটিভ বিয়ে করলে আমরা একঘরে হব।

বিয়ের পরে আমার ঘরে কেউ না এলে আমি দুঃখিত হব না।

কিন্তু আমাকেও যে ছাড়তে হবে এ ঘর।

তোমাকে তো একদিন ছাড়তেই হবে, তুমি কি বিয়ে করবে না ?

লিজা বলল, ইচ্ছে ছিল করব, কিন্তু তোমাদের পুরুষদের ব্যবহার দেখে সে ইচ্ছা আর বড় নেই।

আমার ব্যবহারে কি দোষ দেখলে শুনি ?

লিজা ইচ্ছে করলে রোজ এলামারের প্রসঙ্গ তুলতে পারত, কিন্তু আর আঘাত দেওয়ার ইচ্ছা ছিল না জনকে। তাই প্রসঙ্গ পাল্টে বলল, জন, সব কথা ভেবে দেখ নি, ও যে বিধর্মী।

কথাটা সত্যই ভেবে দেখে নি জন। কিন্তু হটবে কেন, বলল, ধর্মান্তর গ্রহণ করবে।

কণ্ঠস্বর কোমল করে লিজা বলল, না না জন, এসব ছেলেমানুষি ছাড়।

লিজার কণ্ঠে স্নেহের স্পর্শ পেয়ে জনও নরম হল, শুধাল, তবে কি করতে বল ?

আমি বলি রেশমীর প্রসঙ্গটাই ভুলে যাও, আর যদি নিতান্তই ভুলতে না চাও, তবে অনেক শ্বেতাঙ্গ যেমন নেটিভ মেয়ে রাখে, তেমনিভাবে ওকে রাখ না কেন !

মুহূর্তে অগ্নিদীপ্তবৎ জ্বলে উঠে জন বলল, মুখ সামলে কথা বল লিজা, অপমান কর না আমাকে।

এই বলে সে বেরিয়ে যেতে উদ্যত হল। লিজারও প্রচণ্ড রাগ হল, বলল, কি, চললে কোথায় ? আশা করি তোমার রেশমীকে নিয়ে একবারে গির্জায় চললে না ?

উত্তর না দিয়ে জন হন হন করে বেরিয়ে চলে গেল।

লিজা ঘরে এসে শুয়ে পড়ল। কিন্তু শান্তি কোথায়, স্বস্তি কোথায় ? ভূমিকম্প-অন্তে গৃহস্থ সযত্নসজ্জিত গৃহে প্রবেশ করে যেমন চমকে ওঠে, দুদণ্ড আগের চিরপরিচিত গৃহে যেমন নিজেকে অপরিচিত বোধ করে, আপন গৃহকুটিরে যেমন পা ফেলতে ভয় পায়, তেমনি অবস্থা হল লিজার। তার চোখের সামনে দেওয়ালগুলোয় দুঃস্বপ্নের পাণ্ডুরতা, ছাদের কড়িকাঠগুলো অদৃষ্টের শাসনদণ্ডের মত উদ্যত, প্রকাণ্ড আয়নাখানায় নিষ্ঠুর পরিহাসের দীপ্তি, আসবাবপত্রের অতি মসৃণ কোমলতা জল্লাদের অতি-বিনয়ের মত মর্মান্তিক, এক মুহূর্ত আগের সুখাবাস পরমুহূর্তে আশার সমাধিতে পরিণত। হঠাৎ চোখ পডল দুখানা তৈলচিত্রের উপরে, তার পিতামাতার ছবি, অমনি বান ডাকল চোখে, সে বানের অন্ত নেই, স্মৃতির চির-নীহারস্তূপ দিচ্ছে অফুরান যোগান। সে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

কিন্তু কেঁদে কর্তব্য সমাপ্ত করবার মেয়ে লিজা নয়। মাতার মৃত্যুর পরে সংসারের দায়িত্ব বহন করতে গিয়ে তৈরি হয়ে উঠেছে তার চরিত্র, তাতে থেকে সোনায় লোহায় সম ভাগে মিশে তাকে করে তুলেছে যেমন সুন্দর তেমনি সুদৃঢ়। চোখের জলের প্রথম বন্যা চলে গেলে সে উঠে বসে কর্তব্য স্থির করে ফেলল, মনে মনে বলল, এ ঘরে প্রবেশ করতে দেব না ঐ নেটিভ মেয়েটাকে ! তখনই সে দুপুরবেলা একবার দেখা দেওয়ার অনুরোধ জানিয়ে রেশমীর নামে একখানা চিঠি লিখে পাঠিয়ে দিলে চাকর দিয়ে। তার পর সে আবার প্রফুল্লমনে কাজে লেগে গেল।

রেশমী চিঠি পড়ে বুঝল যে, একবারে 'অদ্য যুদ্ধ ত্বয়া ময়া' ! সে বুঝল যে, এর মূলে আছে নির্বোধ জনের কোন কাজ বা উক্তি, ভাবল এখন আর ফেরবার উপায় নেই, দেখতেই হবে চরম দাঁড়িটানা পর্যন্ত। চাকরকে বলে দিল যে, মেমসাহেবকে জানিও, আমি দুপুরবেলা নিশ্চয় যাব।

ঘটনাগুলো সব সময়ে সমচালে চললে সংসার হয়তো সুখের হত, কিন্তু জীবনের নাটক এমন জমে উঠত কিনা সন্দেহ। ঘটনাগুলো নিয়মিতভাবে চলতে চলতে হঠাৎ মাঝে মাঝে রত্নাকর দস্যুর মত অতর্কিতে ঘাড়ে এসে পড়ে সব লণ্ডভণ্ড করে দেয়,

জীবনের পূর্ব শৃঙ্খলা নষ্ট হয়ে যায়, জীবননাটক অপ্রত্যাশিত অঙ্ক পরিবর্তন করে। এখানেও তাই ঘটল। রেশমী, জন ও লিজার জীবন বেশ চলছিল, এবারে এল অঙ্ক পরিবর্তনের পালা।

দুপুরবেলা, জন তখন আপিসে, রেশমী লিজার বাড়িতে এসে পৌঁছবামাত্র অতিবিনয়ের প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপে লিজা তার অভ্যর্থনা করল ; আগেও করেছে, কিন্তু তাতে এমন ঘাতকের খড়্গের চিক্কণ ভাস্বরতা ছিল না। রেশমী বুঝল, এই অতিভদ্রতা আসন্ন অভদ্রতার ভূমিকা ছাড়া আর কিছু নয়। সে প্রস্তুত হয়েই এসেছিল, এখন মনটাকে ঠেলা দিয়ে জাগিয়ে আরও সচেতন করে নিল।

লিজা বিনা ভূমিকায় বলল, এস রেশমী বিবি, বাড়িঘর সব বুঝে নাও, কেমন দেখছ সব ?

বুঝেও না বোঝবার ভান করে রেশমী বলল, তোমার কর্তৃত্বে কি কিছু খারাপ থাকতে পারে, সব চমৎকার !

আর আমার কর্তৃত্বের কথা কেন তুলছ ? এখন তো সব তোমার।

রেশমী সরাসরি উত্তর না দিয়ে হাসল।

রেশমীর প্রশান্ত অটলতায় লিজা হাড়ে হাড়ে চটে গেল। সে ভেবেছিল রেশমী রাগ করবে, রাগ করলে তার কাজ সহজ হত, ক্ষুরধার ব্যঙ্গ প্রয়োগের পথ অনায়াস হয়ে আসত। সে ভাবল, কি মুশকিল, এ যে রাগে না ! কিন্তু তাই বলে তো চুপ করে থাকা চলে না। তখন প্রকাণ্ড একটা ঝড়ের মত সে ভেঙে পড়ল রেশমীর ঘাড়ে।

লিজা শুধাল, তা শুভ বিবাহটা হচ্ছে কবে ? রেশমী বুঝল, সর্বনাশ ! জন এই কাণ্ডটি ঘটিয়েছে। নির্বোধ ! ভাবল, বোকা সেজে শুনে নিই কতদূর কি গড়িয়েছে।

মুখে কিছু প্রকাশ না করে বলল, বিবাহ ! কার সঙ্গে ?

আহা, কচি খুকিটি আর কি, কিছুই জানে না ! জনের সঙ্গে ! নির্বোধ জনের সঙ্গে !

রেশমী বুঝল, 'সংস্কার অন্তরায়'-এর কি ভাষ্য জন করেছে। সে বলল, জন নির্বোধ হতে পারে, আশা করি মিথ্যাবাদী নয়, তার মুখেই সব শুনতে পাবে।

কেন, তোমার হিন্দু-মুখে বাধছে বুঝি বিধর্মীকে বিয়ে করবার সংবাদটা ?

হিন্দু-মুখ আর খ্রীষ্টান-মুখের প্রভেদ আমার কাছে নেই মিস স্মিথ।

ওঃ, দুই মুখ বুঝি এক হয়েছে ! কতবার ?

মৃদু হেসে রেশমী বলল, অনেকবার।

আর কতদূর গড়িয়েছে, শুনতে পাই কি ?

অনেকদূর। বিশদ বিবরণ মিঃ স্মিথের কাছে শুনে নিও।

তাই বুঝি গড়াতে গড়াতে এখন বিয়ে পর্যন্ত এসে পৌঁছবার উপক্রম... শয়তানী !

এই জন্যেই কি দুপুরবেলা ডেকে পাঠিয়েছিলে মিস স্মিথ ?

না, শুধু এইজন্যে নয়, আরও কিছু আছে। জান, লাট সাহেবকে বলে এ বিয়ে বন্ধ করে দিতে পারি ?

রেশমী শান্তভাবে বলল, যতদূর জানি তেমন কোন আইন নেই কোম্পানির।

ওঃ, আইনও জানা আছে দেখছি ! তবে নিশ্চয়ই জান যে হিন্দুর সঙ্গে খ্রীষ্টানের বিবাহ চলে না !

কিন্তু এও জানি যে হিন্দুর খ্রীষ্টান হতে বাধা নেই।

সত্যকার বিস্ময়ে লিজা বলল, তুমি খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করবে ?

খ্রীষ্টানের ঘর করতে চলেছি, খ্রীষ্টান না হলে চলবে কেন ?

লিজা বলল, শুনেছি তোমরা হিন্দুরা সব করতে, পার কিন্তু ধর্মত্যাগ করতে পার না !

কিন্তু যা শোন নি তা শুনে রাখ, হিন্দু নারী পতির জন্য সবরকম ত্যাগ স্বীকার করতে পারে।

লিজা বলল, দিতে পারবে তার জন্যে তোমার পৈতৃক ধর্ম জলাঞ্জলি ?

ভালবাসার পাত্রকে অদেয় কিছুই নেই। সংসারে এমন কিছু থাকতেই পারে না যা ভালবাসার পাত্রের জন্যে অত্যাজ্য !

ধর্মও ?

ধর্ম, ইহকাল, পরকাল, জীবন, যৌবন—সমস্ত।

লিজা বুঝল, এ মেয়ে অসাধারণ ; আরও বুঝল, এ পর্যন্ত জয় হল রেশমীর। তাতেই তার রাগ গেল বেড়ে। এতক্ষণ ভদ্রতার সীমার মধ্যেই কলহ চলছিল, এবারে বুঝি সে সীমা লঙ্ঘিত হল।

কি দিয়ে নির্বোধ জনকে ভোলালে শুনতে পাই কি ?

নিশ্চয়ই। রূপ দিয়ে মিস স্মিথ, রূপ দিয়ে—সগর্বে বলল রেশমী।

এতখানি স্পষ্টবাদিতা আশা করে নি লিজা।

লিজাকে নীরব দেখে রেশমী বলল, আর তাতে দোষটাই বা কি মিস স্মিথ ? সব নারীই পুরুষকে ভোলাতে চায়, কেউ রূপ দিয়ে, কেউ ধনমান বংশমর্যাদা দিয়ে, আর কেউ বা শুধু বন্ধুত্ব আলাপ-আপ্যায়ন দিয়ে। কেউ পারে, কেউ পারে না।

এই বলে কটাক্ষ নিক্ষেপ করল লিজার দিকে। মেরিডিথ ও রিংলারের সঙ্গে লিজার ব্যর্থ প্রণয়ের ইতিহাস সে শুনেছিল জনের কাছে।

রেশমীর ইঙ্গিতে জ্বলে উঠে লিজা বলল, তুমি কি বাড়ি বয়ে আমাকে অপমান করতে এসেছ ?

তুমি ভুল করছ মিস স্মিথ, আমি স্বেচ্ছায় আসি নি, তুমি আমাকে আমন্ত্রণ করে এনেছ, আর এখন বুঝতে পারছি অপমান করবার জন্যেই এনেছ। এবারে আমি চললাম—

বলে সে প্রস্থানের জন্য উদ্যত হল। লিজা বলল, এক মিনিট দাঁড়াও।

তার পরে বলল, শোন রেশমী বিবি, আমার প্রাণ থাকতে এ বিবাহ আমি হতে দেব না।

রেশমী ফিরে দাঁড়িয়ে উত্তর দিল, বেশ তো, চেষ্টা করে দেখ। কিন্তু মনে রেখো, নির্বোধকে নিবৃত্ত করা অত সহজ নয়—

এই বলে ব্যঙ্গে, গর্বে, স্পর্ধায় পূর্ণ একটি কটাক্ষ নিক্ষেপ করে বেরিয়ে চলে গেল রেশমী।

১৭
কাঠে-কাঠে

রেশমী চলে যাওয়া মাত্র লিজা গাড়ি করে বেরিয়ে পড়ল মেরিডিথের উদ্দেশ্যে। রেশমীর ইঙ্গিত রিংলার সম্বন্ধে সত্য হলেও মেরিডিথের সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সত্য নয়। রিংলার অন্য একটি মেয়েকে বিয়ে করেছিল, বন্ধ হয়েছিল তার আনাগোনা লিজার কাছে। রিংলারকে নিয়ে লিজার সঙ্গে মেরিডিথের মনোমালিন্য ঘটে, সে বন্ধ করে দিয়েছিল আনাগোনা লিজার বাড়িতে। কিন্তু আজ আর এই সামান্য বিষয় নিয়ে সঙ্কোচ করবার ইচ্ছা ছিল না লিজার, বিপদের সময়ে তাকেই বিশেষ করে মনে পড়ল, ভাবল, ভালই হল, এই উপলক্ষে তার সঙ্গে মিটমাট করে নেবে।

গাড়ি গিয়ে পৌঁছল মেরিডিথের বাড়িতে, আর সৌভাগ্যক্রমে তখন সে বাড়িতে বিশ্রাম করছিল। লিজাকে দেখে আনন্দে বলে উঠল মেরিডিথ, এস এস লিজা, তুমি আসবে ভাবি নি।

লিজা বলল, মেরিডিথ, বিষম সঙ্কটে পড়েছি, তাই আগে সংবাদ না দিয়েই আসতে বাধ্য হলাম।

মেরিডিথ তার মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, তাই তো, তোমার মুখ চোখ লাল হয়ে উঠেছে, ব্যাপার কি? ব'স, কি হয়েছে বল তো?

লিজা কোনরকম ভূমিকা না করে শুরু করল, মূর্খ জন রেশমী বলে একটা নেটিভ মেয়েকে বিয়ে করবার সঙ্কল্প করেছে!

বিস্মিত মেডিডিথ বলল—বল কি? আলাপ-পরিচয় ঘটল কোথায়?

ঘটনাচক্রে এই কলকাতাতেই ঘটেছে, বিস্তারিত বিবরণ পরে শুনো, এখন বিয়েটা বন্ধ করবার উপায় স্থির কর।

চিন্তিত মেরিডিথ বলল, জনকে অনুরোধ উপরোধ করা ছাড়া তো উপায় দেখি নে। তাকে বিশেষ ভাবে অনুরোধ করে দেখেছ কি?

সে-সব হয়ে-বয়ে গিয়েছে, নির্বোধ একেবারে ক্ষেপে উঠেছে।

তবে মেয়েটাকে ভয় দেখিয়ে বা প্রলোভন দেখিয়ে প্রতিনিবৃত্ত কর।

সে চেষ্টাও হয়েছে।

কিছু ফল পেলে?

ফল? মাই গড! মেয়েটা আস্ত শয়তানী।

তবে উপায়?

সেইজন্যেই তো তোমার শরণাপন্ন হয়েছি।

মেরিডিথ শুধাল, মেয়েটি কি খ্রীষ্টান?

না।

খ্রীষ্টান না হলে হবে কি করে?

মেয়েটা খ্রীষ্টান হবে স্থির করেছে। কোন রকমে সেটা বন্ধ করতে হবে।

সে কেমন করে সম্ভব?

অসম্ভব কেন ? তোমার সঙ্গে তো পাদ্রীদের পরিচয় আছে। কেউ যাতে ওকে দীক্ষা না দেয় তার ব্যবস্থা কর।

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলল মেরিডিথ, অসম্ভব লিজা, অসম্ভব।

কেন, তোমার সঙ্গে কি পাদ্রীদের পরিচয় নেই ?

পরিচয় আছে বলেই অসম্ভব বলছি।

খুলে বল, আমার মন বড় অস্থির।

এই পাদ্রীদের তো তুমি তো জান না, আমি জানি। তারা সমাজের হাজার হাজার টাকা খাচ্ছে অথচ এ পর্যন্ত একটা নেটিভকে দীক্ষিত করতে পারে নি, একবারে মনমরা হয়ে আছে। এখন কোন একটা নেটিভ দীক্ষিত হতে ইচ্ছা করেছে শুনলে সবাই নেচে উঠবে। নদীর জলধারা রোধ করা সম্ভব হলেও ওদের রোধ করা অসম্ভব।

তুমি বড় বড় সাহেবদের ধরে ওদের উপরে চাপ দাও।

বড় সাহেবদের উৎসাহ যেন কিছু কম।

তবে কি কোন উপায় নেই ?

তাই তো মনে হয়। তা ছাড়া, বড় সাহেবদের প্রভাব খাটিয়ে কোম্পানির মুল্লুকে দীক্ষাদান বন্ধ করলেই যে দীক্ষা বন্ধ থাকবে এমন কি কথা!

কেন ?

কলকাতার আশেপাশে অনেক পর্তুগীজ, ডাচ, দিনেমার উপনিবেশ আছে সেখানে তো পাদ্রীর অভাব নেই; তারাও সমান উৎসাহী। সেখানে গিয়ে দীক্ষা নিলে বন্ধ করবে কি উপায়ে ? ইংরেজ কর্তৃপক্ষের অনুরোধ সেখানে খাটবে না।

অন্তত কলকাতায় দীক্ষা বন্ধ কর—বাধা পেয়ে যদি জনের সঙ্কল্প টলে!

লিজার করুণ অনুরোধে মেরিডিথ সেই চেষ্টা করতে প্রতিশ্রুত হল, বলল, আচ্ছা লিজা, আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করব, কলকাতায় যাতে মেয়েটার দীক্ষা না হয়! কিন্তু কত দূর কি করে উঠতে পারব, জানি নে।

যখন লিজা ও মেরিডিথে এইসব পরামর্শ চলছিল, রেশমী তখন কি করছিল ?

লিজার বাড়ি থেকে বেরিয়ে স্বপ্নচালিতের মত রেশমী ফিরে এল বাড়িতে, হেঁটে এল কি ছুটে এল, কি শূন্যপথে সাঁতরে এল মনে পড়ে না তার। ঘরের মধ্যে পৌঁছে সম্বিৎ ফিরে পেল সে।

সে বুঝল, তার 'সংস্কার অন্তরায়'-এর কি মারাত্মক ভাষ্য করেছে নির্বোধ জন। কিন্তু সত্য কথা বলতে কি, জনের উপরে তার একটুও রাগ হল না, বরঞ্চ একরকম মায়া অনুভব করল সে। নির্বোধের প্রতি বুদ্ধিমতীর মায়া। জন ও রেশমীর মাঝখানে লিজা এসে পড়ে এমন প্রচণ্ড অপমান না করলে খুব সম্ভব বিবাহের প্রস্তাবটাকে পাশ কাটিয়ে যেত সে, কিন্তু এখন আর সে ইচ্ছা বা উপায় ছিল না তার। কতকটা জনের প্রতি আন্তরিক টান, কতকটা লিজার প্রতি দুর্জয় রাগ তার সঙ্কল্পকে পাথরে গেঁথে তুলল, সে স্থির করল যেমন করেই হক জনকে বিয়ে করে ঐ বাড়ির গৃহিণী হয়ে বসবে সে, তখন লিজাকে হতে হবে তার আজ্ঞাপালনকারিণী, নয় তাকে ও-বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে হবে; দেখা যাবে কার প্রতাপ বেশি, বোনের না পত্নীর! নিছক প্রেমের টানে যা সম্ভব না হতেও পারত, প্রতিশোধ গ্রহণের আকাঙ্ক্ষায় তা হয়ে উঠল দুর্বার। দুর্জয় সঙ্কল্প

গ্রহণ করল সে, জনকে বিবাহ করবেই সে, পৃথিবী থাক আর রসাতলে যাক। বিবাহ-সঙ্কল্পিতা নারীর গ্রাস থেকে মুক্তি পৃথিবীতে সবচেয়ে অসম্ভব আশা।

কিন্তু তখনই তার মনে পড়ল, জনটা যে নির্বোধ, হঠাৎ সে না পিছিয়ে যায়! তার মনে হল, লিজা হয়তো কেঁদেকেটে পড়বে, অমনি শান্তশিষ্ট পোষমানা ভাইটি বলবে, তবে থাক গে, আর কাউকে বিয়ে করলেই চলবে। এইরূপ চিন্তা মাত্রে মনে তার ভয়ের সঞ্চার হল। সর্বনাশ, এমন ঘটলে—আর এমনটা ঘটা মোটেই অসম্ভব নয়—মৃত্যু ছাড়া আর কোন পথ থাকবে না তার সম্মুখে। সে স্থির করল, জনের ভার নিজ হাতে গ্রহণ করবে, বিয়ের পর যখন সমস্ত ভারই নিতে হবে তখন না হয় দুদিন আগেই তা গ্রহণ করল। লিজার প্রভাবে জনের সঙ্কল্প যাতে বিচলিত না হতে পারে, সেই উপায় আবিষ্কার করতে হবে তাকে। তখনই জনের উদ্দেশে একখানা চিঠি লিখে বাড়ির এক ছোকরাকে কিছু পয়সা কবুল করে পাঠিয়ে দিল জনের অফিসে—জন যেন বাড়ি ফেরবার আগে তার সঙ্গে অবশ্য অবশ্য সাক্ষাৎ করে, চৌরঙ্গী-বেরিয়াল গ্রাউন্ড রোডের মোড়ের নঙ্গতলাও-এর পুব-দক্ষিণ কোণে।

১৮
রেশমীর 'হাঁ'

অফিস ছুটি হওয়া মাত্র ছুটতে ছুটতে এল জন, নঙ্গতলাও-এর কাছে গাড়ি থেকে নেমে কোচম্যানকে বলে দিল, তুমি গাড়ি নিয়ে এখন বাড়ি যাও, আমি বেড়িয়ে ফিরব, বলে দিও বিলম্ব হবে।

তার পরে সে দিঘিটার ধারে রেশমীকে খুঁজতে শুরু করল। রেশমী স্পষ্ট লিখেছিল যে পুব-দক্ষিণ কোণে থাকবে। জনের সে কথা মনে ছিল না, সে দিঘিটার তিন দিক খুঁজে তাকে দেখতে না পেয়ে বিস্মিত চিন্তিত হয়ে উঠল, তবে সে কি আসে নি, না কোন দুঃখে দিঘিতেই ডুবে মরল! এই সব কথা ভাবতে ভাবতে যখন পুব-দক্ষিণ দিকে এসে পড়েছে তখন দেখল একটা তেঁতুল গাছের আড়ালে একজন কে যেন বসে আছে। রেশমী, তুমি! বলে সে ছুটে গেল কাছে। রেশমীই বটে।

রেশমী, রেশমী, ডিয়ারি!

কিন্তু রেশমী নড়ল না, সাড়া দিল না, যেমন চুপ করে মুখ গুঁজে বসে ছিল তেমনি বসে রইল।

জন তাকে ধরে তুলতে গেল, রেশমী বাধা দিয়ে সরে গেল।

জন বুঝতে পারে না কি হয়েছে, ভাল করে ঠাহর করে দেখে বিস্ময়ে বলে উঠল—রেশমী, কাঁদছ কেন? এই তো আমি এসেছি, আমার কি কোন অপরাধ হয়েছে?

তবু রেশমী নীরব।

অনেকক্ষণ সাধাসাধির পরে, অনেক কাল্পনিক দোষ স্বীকার করবার পরে রেশমী জনের দিকে মুখ তুলে চাইল, কালো চোখ দুটি আষাঢ়ের নব মেঘভারে ঈষৎ আনত।

কি হয়েছে রেশমী, বল!

এবারে রেশমী কথা বলল, কিন্তু কিছুতেই জনকে কাছে ঘেঁষতে দিল না।

রেশমী, কি দোষ করেছি খুলে বল।

তুমি কি আমাকে অপমান করবার জন্যে তোমার বাড়িতে নিয়ে গিয়েছিলে ?

তোমাকে অপমান ! আমার বাড়িতে ! কি বলছ, আমি তো কিছু বুঝতে পারছি না ! খুলে বল, দয়া করে খুলে বল।

রেশমী তার বিচলিত অবস্থা দেখে বুঝল যে এবারে সে যা বলবে সমস্ত বিশ্বাস করবে জন, বোনের বিরুদ্ধে নালিশ করলেও অগ্রাহ্য করতে পারবে না। তখন দুপুরবেলাকার সমস্ত ঘটনা আনুপূর্বিক বিবৃত করল। রেশমী নিতান্ত বুদ্ধিমতী, তাই তথ্যের এদিক-ওদিক না করে, কেবল সুর ও স্বপ্নের হেরফের করে তথ্যের গুরুত্ব দিল বাড়িয়ে।

সমস্ত শুনে জন বলল, এ সব কিছুই আমার অভিপ্রেত নয়, লিজার অত্যন্ত অন্যায় হয়েছে।

রেশমী বলল, চমৎকার বিচার। অন্যায় হয়েছে ! যাও, এখন লিজাকে ক্ষমা করে বাড়িতে গিয়ে ঢোক, আমার সঙ্গে তোমার সম্বন্ধ এখানেই শেষ।

এ কি কথা রেশমী, তোমাকে ছাড়া আমার জীবন শূন্য।

তোমার জীবন শূন্য হলে আমি কি করব ?

তুমি কি করবে ? তুমি আমার গৃহিণী হয়ে আমার জীবন পূর্ণ করবে ! কি বল রেশমী, হবে তো ?

কিন্তু ও গৃহ কি আমার ! সেখানে যা অপমান আজ সহ্য করতে হয়েছে !

বিয়ের পরে তোমার অধিকার জন্মাবে ও গৃহে, তখন সাধ্য কি লিজার যে তোমাকে অপমান করে !

কিন্তু লিজা বলেছে কিছুতেই এ বিয়ে সে হতে দেবে না।

তুমি রাজী থাকলে ঠেকাবে কে ?

বুদ্ধিমতী রেশমী বুঝে নিয়েছিল যে লিজার চক্রান্তে কলকাতায় দীক্ষা গ্রহণ বাধাপ্রাপ্ত হবে। তাই সে গোড়া থেকে শুরু করল—

আমি যে দীক্ষা গ্রহণ করতে চাই, লিজা তা বিশ্বাস করে না।

সে তো তুমিই ভাল জান।

জানিই তো। তোমাকে অদেয় আমার কিছু নেই। প্রাণ মন জীবন যৌবন মায় পৈতৃক ধর্ম সব তোমার পায়ে সমর্পণ করেছি।

তার ত্যাগস্বীকারে অভিভূত হয়ে জন তাকে কাছে টেনে নেয়। রেশমী বাধা দেয় না, বোঝে এবারে জনকে একটু স্পর্শরসে তাতিয়ে তোলা আবশ্যক।

জন বলে, তোমার ত্যাগের তুলনায় কি দিলাম তোমাকে আমি রেশমী !

তুমি তোমাকে দিলে, তার চেয়ে বেশি কাম্য আমার আর কি থাকতে পারে !

পরস্পরের অভাবিত ত্যাগস্বীকারের আনন্দে দুজনে কিছুক্ষণ অভিভূত হয়ে বসে থাকে, তার পর জন শুরু করে—আমি কালকেই ব্যবস্থা করব যাতে তুমি দীক্ষাগ্রহণ করতে পার।

সে সম্ভব নয় জন।

বিস্মিত জন বলে, কেন সম্ভব নয় ?

কলকাতায় দীক্ষা নিতে গেলে বাধা উপস্থিত হবে, লিজা আর-পাঁচজনের সাহায্যে বাধা দেবে নিশ্চয়।

ভুলে যেও না এ কোম্পানির রাজত্ব।

সেইজন্যেই তো ভয়।

কেন ?

কেন কি ? কোম্পানির বড় সাহেবরা রুখে দাঁড়ালে পাদ্রীরা পিছিয়ে যাবে।

বল কি ! কিন্তু তারা রুখে দাঁড়াবে কেন ?

কিছু মনে ক'র না জন, লিজাকে তুমি চেন না, তার অসাধ্য কিছু নয়।

না না, রেশমী, লিজার সাধ্য কি এমন করতে পারে !

পারুক না পারুক একটা অপ্রীতিকর ঘটনা তো ঘটবে।

তাহলে কি করবে বল ?

চল না আমরা দুজনে কোথাও পালিয়ে যাই, সেখানে গিয়ে আমি দীক্ষা নেব।

লিজার অপমানের প্রতিশোধ গ্রহণে রেশমী বদ্ধপরিকর ; সে স্থির করেছে পৈতৃক ধর্ম পরিত্যাগ করবে, কিন্তু এমনভাবে করবে যাতে লিজাকে অপমানের চূড়ান্ত করতে পারে। সে ভাবে, দেখা যাক লিজার বুদ্ধি বেশি কি আমার বুদ্ধি বেশি !

জনকে নীরব দেখে শুধায়, কি বল ?

জন বলে, আমি ভাবছি তেমনি নিরাপদ স্থান কোথায় আছে !

রেশমী মনে-মনে স্থির করে রেখেছিল, বলল, কেন, শ্রীরামপুরে পাদ্রীরা আছে, সেটা কোম্পানীর রাজত্ব নয়, সেখানে গেলে সমস্ত নির্বিঘ্নে হতে পারবে !

চমৎকার আইডিয়া। সত্যি রেশমী, তোমার কি বুদ্ধি !

তার পরে বলে, কাল সকালেই সেখানে চিঠি লিখে লোক পাঠিয়ে দিচ্ছি, তার পর পরশু দুজনে রওনা হয়ে যাব। কি বল ?

রেশমী বলে, কিন্তু এই দু রাতের মধ্যে তোমার মত বদলে যাবে !

কেন বল তো ?

লিজা এসে যেমনি দুটো মিষ্টি কথা বলবে, একটু চোখের জল ফেলবে, অমনি ভাই বলবে, পড়ে মরুক গে রেশমী ! সে তো নেটিভ মেয়ে বই নয় ! আমি তার চেয়ে ডলি কি পলি মলি কাউকে বিয়ে করব—লিজা, তুমি ব্যবস্থা করে দাও !

তীব্র ব্যঙ্গে জনের পৌরুষ সচেতন হয়ে ওঠে। বলে, আমি শপথ করছি—

বাধা দিয়ে রেশমী বলে, থাক, আর শপথে কাজ নেই।

তবে কি করব ?

পারবে ?

বলে দেখ।

এ দুটো রাত তুমি বাড়িতে না-ই গেলে, তোমার অফিসে তো দিব্যি থাকবার ব্যবস্থা আছে, সেখানে এ দুটো রাত কাটাও না কেন !

তোমার যদি তাই ইচ্ছা তবে সেই রকমই হবে।

কিন্তু বাড়িতে একটা খবর দিতে হবে তো ?

সে বরঞ্চ অফিসে গিয়ে পাঠিয়ে দেব।

বিস্ময়ে জন বলে ওঠে, তুমি যাবে আমার সঙ্গে অফিসে ?

শুধু যাব না, থাকব দু রাত তোমার কাছে ওখানে।

আনন্দে জন বলে—কাটাবে দু রাত আমার সঙ্গে ?

যার সঙ্গে সারাজীবন কাটাতে যাচ্ছি তার সঙ্গে অতিরিক্ত দুটো রাত কাটাতে পারব না ?

কিন্তু বিয়ের আগে ? তুমি তো জান রেশমী, আমি কত দুর্বল !

তুমিও তো জান জন, আমি কত শক্ত। এই বলে সে উঠে দাঁড়িয়ে বলে, ওঠ জন, আর দেরি নয়।

দুজনে অফিসের তেতলায় এসে পৌঁছায়। তার পরে রেশমীর পরামর্শে জন লিজাকে চিঠি লিখে জানাল, বন্ধুদের সঙ্গে সে সুন্দরবনে চলল শিকারে, ফিরতে দু-চার দিন বিলম্ব হবে। আর একখানা চিঠি সে লিখল ডাঃ কেরীকে, তাতে খোলাখুলি রেশমীর খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণের আকাঙ্ক্ষা জানাল, জানাল যে ধর্মান্তরের পরে জন তাকে বিবাহ করবে, আরও জানাল পরশু দিন কোন সময়ে তারা দুজনে পৌঁছবে শ্রীরামপুরে। স্থির হয়ে থাকল যে ভোরবেলাতে একজন আরদালি চিঠিখানা নিয়ে শ্রীরামপুরে রওনা হয়ে যাবে।

১৯
ভাঙা পা ও ভাঙা মন

কেরীর মুখে জনের পত্রের মর্ম শুনে রাম বসুর মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল, ঘরে এসে শুয়ে পড়ল সে। এতদিনে সে বুঝল, যে আগুন নিয়ে খেলা শুরু করেছিল, ঐ আগুনের খেলার দক্ষতায় এতকাল ধরে সে দর্শককে তাক লাগিয়ে দিয়েছে ; নীরব নৈপুণ্যে যেন বলেছে, দেখ জ্বলন্ত পাবক, অথচ কোথাও স্পর্শ করে নি আমাকে ; আজ হঠাৎ সে আবিষ্কার করল কখন অজ্ঞাতসারে আগুনের ফুলকি গিয়ে পড়েছে ঘরের চালে, সব দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠবার মুখে। পাদ্রীদের সঙ্গ তার পক্ষে অপরিহার্য হয়ে পড়েছিল সত্য, কিন্তু সে তো তাদের ধর্মপ্রাণতার জন্যে নয়। পাদ্রীদের সাহচর্যে পেত সে পাশ্চাত্ত্য জ্ঞানবিজ্ঞানের, পাশ্চাত্ত্যের উদার সংস্কৃতির আভাস—ঐটুকুই তার কাম্য, তাদের ধর্মোৎসাহ কখনও তাকে বিচলিত করে নি। সেইজন্যেই দীর্ঘকাল তাদের সঙ্গে থাকা সত্ত্বেও কখনও সে ধর্মান্তর গ্রহণ করবার জন্য সত্যকার উৎসাহ বোধ করে নি। সত্য কথা বলতে কি, জ্ঞানে যেমন তার উৎসাহ, ধর্মবিষয়ে তেমনি তার উদাসীনতা। হিন্দুধর্ম ও খ্রীষ্টধর্ম দুয়ের সম্বন্ধেই তার সমান ধারণা—ওগুলো যেন অপরিহার্য আপদ। ওগুলো হচ্ছে রসাল আমের নীরস আঁঠি। মাঝে মাঝে সে বলেছে বটে যে শীঘ্রই ধর্মান্তর গ্রহণ করবে। স্ত্রীর মৃত্যুর পরে কেরীকে বলেছিল এবারে ধর্মান্তর গ্রহণ করার পক্ষে শেষ অন্তরায় দূর হল। এখন একদিন সুপ্রভাতে "খ্রীষ্টের খোঁয়াড়ে" এসে ঢুকবে। এইভাবে দীর্ঘকাল তাদের আশা জীইয়ে রেখেছিল। কেন ? পাদ্রীদের আন্তরিকতা আকর্ষণই একমাত্র উদ্দেশ্য। কেন ? তাহলে তাদের কাছে থেকে পাশ্চাত্ত্য জ্ঞানবিজ্ঞানের তাপ অনুভব করতে বাধ্য হবে না। পাদ্রীরা যুগপৎ বহন করে এনেছিল মধ্যযুগ ও নবযুগের বাণী—নবযুগের বাণীকে গ্রহণ করবার আশাতেই সহ্য করত সে মধ্যযুগের বাণীকে। কিন্তু মধ্যযুগ যে

এমনভাবে প্রতিশোধ নিতে উদ্যত হবে ভাবতে পারে নি সে।

রেশমীকে ভালবেসেছিল রাম বসু। সে প্রেম একটু ভিন্ন জাতের। রেশমীর কাছে প্রত্যাখ্যানের পর সে ভালবাসা যেমন চতুর্গুণ প্রবল হয়েছিল তেমনি কায়িক সীমানা ছাড়িয়ে গিয়েছিল। এ যেন চাঁদের প্রতি মানুষের টান। এখন হঠাৎ সংবাদ এল সেই চাঁদে গ্রহণ শুরু হবে, একসঙ্গে রাহু ও কেতুর গ্রাস, জনের ও খ্রীষ্টধর্মের। চাঁদ যাবে চিরকালের জন্যে নিভে, তার ভুবন হবে চিরকালের জন্যে অন্ধকার। কি করে বাঁচবে সে? এইসব দুরপনেয় চিন্তাজালে যখন সে জড়িয়ে পড়ে ক্লান্ত, তখন প্রচণ্ড উল্লাসে টমাস ছুটতে ছুটতে এসে চীৎকার করে উঠল ঃ মুন্সী, সুসংবাদ শুনেছ? মরুভূমির পথিকের সম্মুখে দয়াময় বিধাতা স্বর্গীয় খাদ্য নিক্ষেপ করেছে, সুন্দরী রেশমী আসছে খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করবার উদ্দেশ্যে।—কি মুন্সী, তোমাকে বিমর্ষ দেখছি কেন?

শরীরটা বড় ভাল নেই ডাঃ টমাস।

বল কি, নাড়ীটা দেখি!

জোর করে তার হাতে টেনে নিয়ে নাড়ী পরীক্ষা করে বলে, কই, এমন কিছু তো নয়।

রাম বসুকে স্বীকার করতে হয় যে সত্যই এমন কিছু নয়।

তবে আর কি, ওঠ, উৎসবের আয়োজন করা যাক। কি বল?

রাম বসু নীরস ভাবে বলে, কিছু করতে হয় বই কি।

বিস্মিত টমাস বলে, কিছু! এমন উপলক্ষ কি আর জুটবে? একে তো প্রথম ধর্মান্তর, তাতে আবার রেশমীর মত সুন্দরী মহিলা! আমি ভেবেছিলাম ঐ ফকিরের মত গোঁয়ার চাষাটাকে দিয়েই বুঝি ধর্মান্তরের অভিযান শুরু হবে। এখন ভাবছি বেটা পালিয়েছে ভালই হয়েছে।

রাম বসু মনে মনে হাসে, হাসবার সঙ্গত কারণও আছে।

ফকিরকে রাম বসুই গোপনে ভাগিয়ে দিয়েছিল, বলেছিল, তুই কেন এখানে মরতে এলি?

ফকির বলেছিল, সাহেব বলেছে খিরিস্তান হলে ভাল খেতে পরতে পারবি।

কিন্তু সে কদিনের জন্যে?

কেন? ব্যাকুলভাবে শুধায় ফকির।

তবে শোন। কঙ্কালীতলার পীঠস্থান মনে আছে?

আছে বই কি, চৈত সংক্রান্তির মেলায় কতবার গিয়েছি!

কঙ্কালীতলার মা জাগ্রত জানিস?

খুব জানি। কতবার মানত করেছি, কোনদিন ফলে নি!

কেন ফলে নি এখন বোঝ! তোর মনে যে পাপ!

পাপ কোথায় দেখলে কায়েৎ মশাই?

এই যে খিরিস্তান হতে যাচ্ছিস। তবে শোন, কাল রাত্রে স্বপ্ন দেখেছি, কঙ্কালী মা বলছেন, ফক্‌রে খিরিস্থান হয়েছে কি তাকে আস্ত গিলে খাব!

সাহেব ঠেকাতে পারবে না?

সাহেবের বাবার সাধ্য নেই ঠেকায়।

তবে কি করব মশাই?

যা এখনই পালিয়ে চলে যা, গিয়ে কঙ্কালীতলায় ভাল করে একটা পূজা দে গে। আর কখনও এমুখো হোস নি।

এই বলে তখনই সে ফকিরকে পথখরচা যুগিয়ে দিয়ে রওনা করে দেয়।

পরদিন ভোরবেলা "খ্রীষ্টের খোঁয়াড়ে প্রবেশেচ্ছু মেষ"-কে পলায়িত দেখে টমাস বিমর্ষ হয়ে পড়ে।

টমাস শুধায়, কি মুন্সী, নীরব কেন?

ভাবছি, রেশমীও যদি ফকিরদের পন্থা অনুসরণ করে তখন তো কৃষ্ণদাস আছেই।

নিরুৎসাহিত টমাস বলে, তা আছে বটে, কিন্তু দুয়ে অনেক প্রভেদ।

হাঁ, একজন পুরুষ আর একজন স্ত্রীলোক।

শুধু স্ত্রীলোক? অপূর্ব সুন্দরী!

তাতে তোমার কি লাভ? সঙ্গে তো মালিক আসছে!

টমাস সংক্ষেপে বলে, মিঃ স্মিথকে আমি পছন্দ করি নে।

আমিও করি নে। আচ্ছা ডাঃ টমাস, প্রথম ধর্মান্তরের ফল তুমিই কেন ভোগ কর না। জনকে তাড়িয়ে দিয়ে রেশমীকে তুমি বিয়ে কর না কেন?

বলা বাহুল্য এটা রাম বসুর মনের কথা নয়। সে চায় জনে টমাসে একটা গোলমাল পাকিয়ে উঠে রেশমীর ধর্মান্তর-গ্রহণ বাধাপ্রাপ্ত হক।

কৃতজ্ঞ হয়ে টমাস বলে, মুন্সী, তুমি সত্যই আমার বন্ধু, কিন্তু তা হওয়ার নয়।

কেন, আমি যতদূর জানি রেশমী তোমার প্রতি বিরূপ নয়।

সে কথা তো আমিও জানি। আমাকে দেখলেই সে লজ্জায় পালিয়ে বেড়ায়।

তবে কেন না হবে?

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে টমাস বলে, মিঃ স্মিথ জানিয়েছে যে বিয়ের পরে ভারী রকম দান করবে আমাদের মিশনে।

টমাস ও রাম বসু দুজনেই বুঝল এর পরে আর যুক্তি নেই।

সময়োচিত কিছু বলা কর্তব্য মনে করে রাম বসু বলল, তাই তো! তবে উপায়?

উপায় তিনিই করবেন যিনি কৃষ্ণদাসকে জুটিয়ে দিয়েছেন, আবার যিনি রেশমীকে জোটাতে যাচ্ছেন।

তা বটে, তা বটে, বলে রাম বসু, আবার দেখ তিনি শুধু কৃষ্ণদাসকে জুটিয়ে দিয়েই ক্ষান্ত হন নি, তার ঠ্যাঙ ভেঙে দিয়ে তোমার কাজের পথ কেমন সুগম করে দিয়েছেন!

এ দুয়ে যোগাযোগের কথা তো ভেবে দেখি নি। বুঝিয়ে দাও দেখি।

রাম বসু আরম্ভ করে।

এ তো অত্যন্ত সহজ বিষয় ডাঃ টমাস, এখনই বুঝিয়ে দিচ্ছি। ফকির পালিয়ে গেল কেন?

টমাস বলে, কেউ তার কান ভারী করে থাকবে।

সেটা অসম্ভব নয়, বলে রাম বসু, কিন্তু পালাল পা দুখানার সাহায্যে। এখন বোঝ পা ভাঙা হলে নিশ্চয় চলে যেতে পারত না।

সে কথা সত্য।

এখন দেখ কৃষ্ণদাস ছুতোর পা ভেঙে পড়ে আছে, তাই না তুমি তাকে নিরাপদে ধর্মতত্ত্ব শোনাবার সুযোগ পেয়েছ।

কিন্তু হাত ভাঙলেও সে সুযোগ পেতাম।

ভাঙা হাত নিয়ে সে-ও পালাবার সুযোগ পেত। এখন পা ভেঙেছে বলেই লোকটা অচল।

তা বটে।

তবে কি এটাকে ভগবানের বিশেষ দয়া বলে মনে করা চলে না?

কিন্তু তার কথাটাও একবার ভেবে দেখ, লোকটা কষ্ট পাচ্ছে।

আর সে ফকিরের মত পালিয়ে গেলে তুমি যে কষ্ট পেতে!

খুব কষ্ট পেতাম মুন্সী, বিশ বছর এদেশে ধর্মপ্রচার করছি অথচ একটা নেটিভকে খ্রীষ্টান করবার সুযোগ পেলাম না।

এতদিন পরে গোড়ায় কোপ মেরে বিধাতা সেই সুযোগ এনে দিয়েছেন।

গোড়ার কোপটা কি?

কৃষ্ণদাসের ভাঙা পা।

টমাস বলে, কিন্তু লোকে কি বলবে জান, আমি ভাঙা পায়ের সুযোগ নিলাম।

হয় ভাঙা মন নয় ভাঙা পা—একটা কিছু না ভাঙলে কেউ ধর্মান্তর-গ্রহণ করবার জন্যে ব্যাকুল হয় না।

ভাঙা মন বলতে কি বোঝায় মুন্সী?

সেটা শুধিও রেশমীকে, ভাঙা মনের ব্যথা নিয়ে আসছে সে।

ঘুরে ফিরে আবার দুজনে রেশমীর প্রসঙ্গে এসে পড়ে।

টমাস শুধায়, রেশমীর মন ভাঙল কিসের আঘাতে?

খুব সম্ভব মিঃ স্মিথের প্রেমের আঘাতে।

জনের নাম শোনবামাত্র টমাস চাপা তর্জন করে ওঠে, আই ডোণ্ট লাইক দি ফেলো! আমি ওকে পছন্দ করি নে!

আর পছন্দ না করে উপায় কি? ও যে মোটা দানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে!

বেশ তো, টাকা দিক, রেশমী খ্রীষ্টান হক, কিন্তু ঐ রাস্কেলটাকে বিয়ে করতে যাবে কেন?

ভুলে যাচ্ছ ডাঃ টমাস, টাকার প্রতিশ্রুতি বিয়ের জন্যে, খ্রীষ্টান করবার জন্যে নয়।

এমন দায়বদ্ধভাবে খ্রীষ্টান করা অনুচিত।

মুন্সী হেসে বলে, ডাঃ টমাস, দায়ে না পড়লে কেউ কখনও অন্য ধর্ম গ্রহণ করে না।

তা হক, আমি রেশমীর জন্যে অন্য বরের চেষ্টা করব।

রাম বসু বাহ্যত অত্যন্ত নিস্পৃহভাবে বলে, দেখ, যদি পাও।

বলা বাহুল্য জনের উপরে সেও হাড়ে-হাড়ে চটে গিয়েছিল অথচ করবার কিছু ছিল না। একে তো রেশমীর নিতান্ত একগুঁয়ে স্বভাব, তার উপরে জন শ্বেতাঙ্গ। এখন সে ভাবল কাঁটা দিয়ে যদি কাঁটা উদ্ধার হয় মন্দ কি? টমাস যদি গোলমাল বাধিয়ে দিতে পারে, তবে হয়তো শেষ পর্যন্ত রেশমীর ধর্মান্তর-গ্রহণও বন্ধ হতে পারে। স্পষ্টত কিছু বলা উচিত মনে করল না, এসব কথা কেরীর কানে যাওয়া অবিধেয়। তাই সে নিস্পৃহ ভাব ধারণ করল।

দুজনে যখন এইভাবে চলতে চলতে একটা কানাগলির মাথায় এসে উপস্থিত হয়েছে,

এমন সময় ফেলিক্স উল্লাসে চীৎকার করতে করতে ভিতরে ঢুকল—ডাঃ টমাস, মুন্সী, তোমরা এখানে চুপ করে কি করছ? চল চল, গঙ্গার ঘাটে চল!

কি হল সেখানে? শুধায় দুজনে।

মিঃ স্মিথ আর রেশমী এসে পৌঁছেছে। প্রকাণ্ড বজরা, নিশান উড়ছে, ডঙ্কা বাজছে—সবাই গিয়েছে, এস এস।

বলে উত্তরের অপেক্ষা না করে, যেমন ছুটে এসেছিল তেমনি ছুটে বেরিয়ে গেল।

চল ডাঃ টমাস, Predigal son-কে অভ্যর্থনা করি গিয়ে।

তার পর বলল, এবারে আর শূন্য হাতে ফেরে নি, বিদেশিনী Ruth-কেও সঙ্গে এনেছে।

অপ্রসন্ন টমাস ও কৌতূহলী রাম বসু ধীরপদে গঙ্গার দিকে এগোয়।

২০
মোতি রায়

মোতি রায় সেকালের কলকাতার একজন দুর্ধর্ষ বাবু। তিনু রায় কাশীবাবু প্রভৃতি যে কজন বিখ্যাত বাবু ছিল, মোতি রায় তাদের অন্যতম। তার বাড়িঘর, জমিদারি, সিন্দুকভরা কোম্পানির কাগজ আর আকবরী মোহর, আট-দশখানা ব্রুহাম ফিটন ব্রাউনবেরি গাড়ি, খান-পাঁচসাত পালকি, বাগানবাড়ি, দশ-বারোজন রক্ষিতা, তিনটি পরিবার—অন্যান্য বাবুদের ঈর্ষার ও অনুকরণের স্থল। বাগবাজারে গঙ্গার ধারে যেখানে এক সময়ে পেরিন সাহেবের বাগানবাড়ি ছিল, তার কাছে একটা মহল্লা জুড়ে মোতি রায়ের বাড়ি, কাছারি ও আস্তাবল। বর্গির হাঙ্গামার ভয়ে হুগলি জেলা থেকে মোতি রায়ের পূর্বপুরুষ কলকাতায় আসে। তার পরে তার যোগাযোগ ঘটে কোম্পানির সাহেবদের সঙ্গে। ১৭৫৬ সালে সিরাজদ্দৌলার তাড়া খেয়ে কোম্পানির সাহেবরা যখন ফলতায় গিয়ে আশ্রয় নেয়, তখন মোতি রায়ের পিতামহ রাম রায় সেখানে রসদ ও টাকা যুগিয়ে কোম্পানির প্রিয়পাত্র হয়ে ওঠে। তার পরে ক্লাইভ যখন পলাশী যাত্রা করে, রাম রায় শতকরা বারো টাকা সুদে প্রচুর টাকা ধার দেয় কোম্পানিকে। পলাশীর যুদ্ধে কোম্পানির শাসন কায়েম হলে রাম রায়ের সৌভাগ্যের দরজা খুলে গিয়ে অচিরকালের মধ্যে সে কলকাতা-সমাজের মাথা হয়ে ওঠে। নবকৃষ্ণ, উমিচাঁদ, রাজবল্লভ, গোবিন্দ মিত্রের ঠিক নীচের থাকেই হল তার স্থান। বর্তমানে দুই পুরুষের অর্জিত বিত্ত ও প্রতাপ লাভ করে মোতি রায় দুর্ধর্ষ বাবুগিরিতে সমর্পিতপ্রাণ।

চণ্ডী বক্সীর সঙ্গে সেকালের কলকাতার যাবতীয় বিত্তশালী ও বাবুর পরিচয় ছিল। এবারে কলকাতায় এসে চণ্ডী মোতি রায়ের কাছে আত্মসমর্পণ করল। কিন্তু তার আগে বাজার থেকে কিছু ভাল ঘি, মানকচু, খেজুরগুড় প্রভৃতি সংগ্রহ করে নিল।

মৃত্যুঞ্জয় বলল, দাদা, একটা বড়লোককে কি এইসব ভেট দেওয়া চলে?

চণ্ডী বললে, যে দেবতা যে ফুলে তুষ্ট। ওদের কি টাকা-পয়সা দিয়ে সন্তুষ্ট করবার সাধ্য আছে? গ্রামজাত এইসব দ্রব্য পেলে কলকাতার লোকে খুশি হয়।

তার পর সেগুলো নিজের বাড়িতে তৈরী বলে মোতি রায়ের পায়ের কাছে রেখে বশংবদ হাসি হেসে হাতজোড় করে দাঁড়াল।

কি খবর চণ্ডী ?

সময়োচিত কিছু ভূমিকা করে সমস্ত বিষয় নিবেদন করল চণ্ডী।

হঠাৎ মোতি রায়ের চাপা-পড়া হিন্দু প্রাণ জাগ্রত হয়ে উঠল, বলল, কি সর্বনাশ ! মেয়েটা শেষে খ্রীষ্টানের হাতে পড়ল ? এমনভাবে চললে হিন্দুধর্ম আর কদিন থাকবে ?

সেইজন্যেই তো হুজুরের কাছে এসেছি।

দেখা যাক কতদূর কি করা যায়। মেয়েটা কোথায় কার কাছে আছে খোঁজ নাও।

চণ্ডী ও মৃত্যুঞ্জয় সাহেবপাড়ায় ঘুরে ঘুরে রেশমীর সন্ধান করে। সে নিশ্চয় জানে, এহেন অমূল্য বস্তু লুকিয়ে রাখার পক্ষে দেশী পাড়া যথেষ্ট নিরাপদ নয়। সাহেবপাড়ার চাপরাসী, আরদালি, সরকার, খানসামার দল হয়ে উঠল তার আরাধনার পাত্র।

ওদিকে মোক্ষদা বুড়ি বলে, বাবা চণ্ডী, মা কালী দর্শন তো হল, এবারে ফিরে চল।

চণ্ডী আসল কথা ভাঙে না, কি জানি কি রকম প্রতিক্রিয়া ঘটে। বলে, আর দুটো দিন সবুর কর মাসি, তার পরেই রওনা হব।

একদিন ভুলক্রমে মৃত্যুঞ্জয় বলে ফেলেছিল যে, তারা রেশমীর সন্ধান করছে ; শুনে বুড়ি ক্ষেপে উঠে বলল, ঐ জাতখেয়ানো হতভাগীর নাম আমার কাছে ক'র না, ও মরেছে।

তার পরে লুকিয়ে লুকিয়ে সারারাত কাঁদল মোক্ষদা।

দিন-পনেরো সাহেবপাড়ায় গবেষণা করে চণ্ডী রেশমীর সাকুল্য সংবাদ সংগ্রহ করে ফেলল, আর তখনই গিয়ে উপস্থিত হল মোতি রায়ের বাড়িতে। মোতি রায় তখন ইয়ার-বন্ধুদের নিয়ে বুলবুলির লড়াই দেখছিল। চণ্ডীকে ইশারায় অপেক্ষা করতে আদেশ করল।

তামাশা শেষ হলে মোতি রায় শুধাল, কিছু খবর পেলে ?

চণ্ডী কাঁদ-কাঁদ স্বরে বলল, হুজুর, আপনার অনুমান যথার্থ, হিন্দুধর্ম এবারে রসাতলে গেল।

কেন, কি হয়েছে বল তো ?

হুজুর, মেয়েটা কেবল সাহেবের ঘরে থেকেই সন্তুষ্ট নয়, একটা সাহেব তাকে বিয়ে করতে চায়। তাই দুজনে পালিয়ে শ্রীরামপুরে পাদ্রীদের কাছে গিয়েছে, খ্রীষ্টান হয়ে সাহেবকে বিয়ে করবে।

কি সর্বনাশ ! বলে বসে পড়ে মোতি রায়।

এখন উপায় ?

উপায় হুজুর, বলে চণ্ডী।

শোন চণ্ডী, আমার ছিপ নৌকোখানা নিয়ে তোমরা শ্রীরাপুরে যাও, যেমন করে পার মেয়েটাকে ছিনিয়ে নিয়ে এস।

শেষে গোলমাল বাধবে না তো হুজুর ?

সঙ্গে চার-পাঁচজন পাইক বরকন্দাজ দেব।

সে তো দেবেনই হুজুর, সে গোলমালের কথা বলছি না। তবে সাহেবের মুখ থেকে ছিনিয়ে আনলে কোম্পানি না রাগ করে।

মোতি রায় বলে, শ্রীরামপুরের পাদ্রীদের সঙ্গে কোম্পানির বনিবনাও নেই। ওরা

ওখানে স্থান পায় নি বলেই শ্রীরামপুরে যেতে বাধ্য হয়েছে। না, কোন গোলমাল হবে না।

চণ্ডী পাদপূরণ করে বলে, আর হলে তো হুজুর আছেনই।

হাঁ,আমি আছি। তোমরা এখনই রওনা হয়ে যাও, আমি সব হুকুম করে দিচ্ছি।

তার পরে চণ্ডীকে কাছে ডেকে জিজ্ঞাসা করে, মেয়েটাকে নিয়ে কি করবে ভাবছ ?

হুজুর, শাস্ত্রে আছে, চিতা থেকে যে পালিয়েছে তাকে চিতায় সমর্পণ করতে হয়।

মোতি রায় বলে, শাস্ত্রে যা খুশি থাকে থাকুক, মেয়েটাকে আমাকে দিতে হবে।

তার পরে একটু থেমে বলে, তোমার কথা শুনে মনে হয়েছে, মেয়েটা খুবসুরত।

তার পরে আবার একটু থেমে বলে. চণ্ডী, শাস্ত্রের মর্যাদা রাখবার জন্যে কেউ এত কষ্ট স্বীকার করে না। তোমার উদ্দেশ্য তুমি জান, আমার উদ্দেশ্যে তোমাকে বললাম। আমার কাশীপুরের বাগানবাড়িটা খালি পড়ে আছে, মেয়েটা সেখানে দিব্যি থাকবে।

হুজুরের কথার উপরে কি কথা বলতে পারি—তাই হবে।

তার পর মৃত্যুঞ্জয়ের দিকে তাকিয়ে বলে, কি বল মিত্যুঞ্জয়, মেয়েটার একটা হিল্লে হয়ে গেল।

কলকাতার বাবুসমাজের সঙ্গে মৃত্যুঞ্জয়ের হালে পরিচয়, সে কি বলবে ভেবে পেল না।

মোতি রায় বলে, যাও চণ্ডী, মেয়েটাকে নিয়ে এসে একেবারে বাগবাজারের ঘাটে নামাবে।

চণ্ডীরা পরদিন ভোরে ছিপযোগে শ্রীরামপুরে রওনা হয়ে যায়, সঙ্গে মোক্ষদা বুড়িকে নিতে ভোলে না ; বলে, চল মাসি, এবারে বাড়ি ফেরা যাক।

২১
রেশমী ও রাম বসু

রেশমী, কি করতে যাচ্ছিস ভাল করে ভেবে দেখ।

কায়েৎ দা, ভাল করে না ভেবে কি এ-পথে পা বাড়িয়েছি ?

না, তুই সব দিক চিন্তা করবার অবকাশ পাস নি। পৈতৃকধর্ম ত্যাগ করা তো কেবল ব্যক্তিগত ব্যাপার নয়, এক মুহূর্তে তোর আত্মীয়স্বজন ধর্ম দেশ সব পর হয়ে যাবে।

আমি পর মনে না করলে পর হবে কেন ?

পাগল, সংসারের তুই কতটুকু বুঝিস ? সংসারে সম্বন্ধ যে দু পক্ষকে নিয়ে, অপর পক্ষ যদি আপন মনে না করে তবে তুই ওর হলি বইকি !

কেন, আমি ঘরে বসে তাদের আপন ভাবব।

পাগল ! কথা শোন একবার—বলে হাসে রাম বসু, তার পর আবার বলে, দশটা ঘর মিলে যে সমাজ। তুই যদি একঘরে হয়ে রইলি তবে তোর সমাজ রইল কোথায় ?

যাদের ঘরে যাচ্ছি তারাই হবে তখন সমাজ। জব চার্নকের কি ব্রাহ্মণী পত্নী ছিল না ?

কথাটা শুনেছিল সে জনের কাছে।

সেই ব্রাহ্মণী পত্নীকে তাদের সমাজ কি স্বীকার করেছিল ? করে নি। দেখ, এদেশের লোকের মধ্যে সবচেয়ে বেশি আমি মিশেছি সাহেব সমাজে। ওরা কখনও আমাদের আপন মনে করতে পারবে না।

বিয়ে করলেও নয় ?

না, বিয়ে করলেও নয়। ওরা জনকে আপন মনে করবে, তোকে মনে করবে অবান্তর।

মিঃ স্মিথ তো অন্যরকম কথা বলে।

বিয়ের আগে অনেকেই অনেক রকম কথা বলে, সে-সব কথার বিশেষ অর্থ নেই।

রেশমী চুপ করে থাকে।

রাম বসুর সংশয় ও প্রশ্ন তার মনের মধ্যেও এ কয়দিনে উঠেছে, মীমাংসা খুঁজে পায় নি। এ কয়দিনে তার মনের অনেকগুলি সূক্ষ্ম প্রচ্ছন্ন শিকড়ে টান পড়ে সমস্ত সত্তা চড় চড় করে উঠেছে। তার অনতিদীর্ঘ অতীত জীবন মোহময় করুণাময় অশ্রু ও সৌন্দর্যময় মূর্তি ধরে বারংবার সম্মুখে এসে দাঁড়িয়েছে। জোড়ামউ পল্লীর সমস্ত দৃশ্য অপূর্ব সৌন্দর্যে ভূষিত হয়ে দেখা দিয়েছে, দেখা দিয়েছে বাল্য-সঙ্গিনীর দল, দেখা দিয়েছে বুড়ি দিদিমা, এমন কি এক-আধবারের জন্য মাল্যচন্দনে সজ্জিত টোপর-পরা একটি কঙ্কালসার মুখও উদিত হয়েছে তার মনের মধ্যে। যখন মনটা বিচলিত হওয়ার মুখে, তখনই মনে পড়ে গিয়েছে লিজার লাঞ্ছনা, ছদ্মবিনয়ের ভর্ৎসনা, এ বিবাহ কিছুতেই হতে দেবে না বলে তার প্রতিজ্ঞা, সেই সঙ্গে মনে পড়েছে, জনের করুণাসুন্দর আর্ত তৃষিত অসহায় মুখ। তখনই সে জোর করে মনকে জপিয়েছে, না না, জন আমার বর, জনের ঘর আমার ঘর।

রেশমীকে নীরব দেখে রাম বসু বলে, না হয় আর দিন দুই সময় নে ভাল করে ভেবে দেখবার জন্যে, কাল না হয় ধর্মান্তর-গ্রহণ স্থগিত থাক।

রেশমী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলে, না কায়েৎ দা, আর বাধা দিও না, যা হওয়ার শীগগির ঘটে যাক।

শীগগির ঘটে যাওয়াটাই কি সব সময়ে কাম্য ? শাস্ত্রে বলে, অশুভস্য কালহরণম্।

কিন্তু এটা কেন অশুভ তা এখনও বুঝতে পারলাম না তো!

সেইজন্যেই তো বলছি, রেশমী, আর দুটো দিন সময় নে।

রেশমী জানে তা অসম্ভব। প্রথম, জন রাজী হবে না। তার পরে অতিরিক্ত দুটো দিন প্রতিহিংসাপরায়ণ লিজার হাতে এগিয়ে দেওয়া কিছু নয়, অনেক কিছু করে ফেলতে পারে সে। কিন্তু এসব কথা রাম বসু বুঝবে না, তাই সে চুপ করে থাকে।

জন ও রেশমী এসে পৌঁছবামাত্র সাহেবের দল এমনভাবে তাদের ছেঁকে ধরল যে একটুখানি নিরিবিলি পায় নি রেশমীকে রাম বসু। অবশেষে কেরীর কৃপাতে জুটল সেই অবসর। কেরী বলল, মুন্সী, তুমি সরল বাংলায় রেশমীকে বুঝিয়ে দাও খ্রীষ্টধর্মের মহিমা।

রাম বসু বলল, সকাল থেকে তো সেইজন্যেই ওকে একলা পাওয়ার চেষ্টা করছি।

তবে আর বিলম্ব ক'র না, ওকে নিয়ে একলা ব'স তোমার ঘরে, কাল দীক্ষা, আজ ওকে তৈরি করে তোল।

রাম বসু রেশমীকে নিজের ঘরে নিয়ে এসে তৈরি করে তুলছিল।

এমন সময়ে এক ব্যক্তি এসে উপস্থিত হল। রেশমী দাঁড়িয়ে উঠে বলল, এ কি মৃত্যুঞ্জয় দাদা, তুমি ?

হাঁ রে রেশমী, আমি।

হঠাৎ এখানে ?

তোর বুড়ি দিদিমা কি স্থির হয়ে থাকতে দেয়, মুখে এক বুলি, নিয়ে চল আমাকে রেশমীর কাছে। কেঁদে কেঁদে বুড়ি দুই চোখ অন্ধ করে ফেলল। বুড়ির তাড়ায় ঠিক থাকতে না পেরে এলাম কলকাতায়, সেখানে এসে অনেক খোঁজাখুঁজি করে জানলাম তুই শ্রীরামপুরে এসেছিস, এলাম বুড়িকে নিয়ে, ভাগ্যে তোর দেখা পেলাম, নইলে আবার...

মৃত্যুঞ্জয়ের বাক্য শেষ হওয়ার আগেই রেশমী বলে ওঠে, দিদিমা এসেছে ? কোথায় ? এতক্ষণ বল নি কেন ?

বলতেই ত যাচ্ছিলাম। গঙ্গার ঘাটে নৌকোয় বসে আছে বুড়ি।

চল আমাকে নিয়ে।

মৃত্যুঞ্জয়ের সঙ্গে চণ্ডীর যোগাযোগের সংবাদ জানত না রেশমী, তাই কোন সন্দেহ এল না তার মনে। আর রাম বসু ভাবল ভগবান বুঝি রক্ষা করলেন, নইলে এমন অপ্রত্যাশিতভাবে বুড়ি এসে উপস্থিত হবে কেন ? কাজেই সে-ও খুব উৎসাহ অনুভব করল, বলল, চল্ রেশমী, একবার দিদিমার সঙ্গে দেখা করে আসবি।

তিনজনে গঙ্গার ঘাটে গিয়ে উপস্থিত হল। তখন ভাঁটার সময়, নৌকা ক-হাত দূরে ছিল, জল ভেঙে গিয়ে তিনজনে নৌকোয় উঠল।

রেশমীকে দেখবামাত্র 'ওরে আমার বুকের ধন' বলে মোক্ষদা বুড়ি কেঁদে উঠে রেশমীকে জড়িয়ে ধরল।

ও দিদিমা, এতদিন তুই আসিস নি কেন, বলে রেশমীও কাঁদতে লাগল।

ইতিমধ্যে নৌকা দিল ছেড়ে।

'নৌকো ছাড়ল কেন—' রাম বসু বলে উঠতেই কার প্রচণ্ড এক ধাক্কায় ছিটকে গিয়ে সে জলে পড়ল।

যাও বসুজা, এটুকু সাঁতরে যেতে পারবে, প্রাণে মরবে না। ফিরে গিয়ে তোমার সাহেব বাবাদের খবর দাওগে যে, বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা বাঁধতে গেলে এমনি হয়।

কণ্ঠস্বর চণ্ডী বক্সীর।

রেশমী চণ্ডীর ষড়যন্ত্র তখনও বুঝে উঠতে পারে নি, তাই ব্যাকুলভাবে বলল, চণ্ডী দা, কায়েৎ দা যে জলে পড়ল !

গঙ্গাবক্ষ প্রকম্পিত করে চণ্ডী গর্জন করে উঠল, চুপ কর হারামজাদী !

রেশমী বলল, আমাকে নিয়ে চললে কোথায় ?

সে খোঁজে তোর দরকার কি ? বেশি ছট্‌ফট করিস তো পাটাতনের সঙ্গে বেঁধে রাখব। ভাল চাস তো চুপ করে থাক।

সমস্ত অভিসন্ধি তখনও সে বুঝতে পারে নি, তাই খানিকটা নির্ভাবনায়, খানিকটা নিরুপায়ে দিদিমার বক্ষ আশ্রয় করে নীরবে পড়ে থাকল। আর মোক্ষদা তাকে জড়িয়ে ওরে কেবলই বলতে লাগল, ওরে আমার বুকের ধন, ওরে আমার বুকের ধন !

একে ভাঁটার টান, তাতে পালে-লাগা উত্তুরে হাওয়া, নৌকো পূর্ণবেগে অন্ধকারের মধ্যে উধাও হয়ে গেল।

২২
তার পরের কথা

রাম বসু সাঁত্‌রে উঠে এসে সমস্ত আনুপূর্বিক জ্ঞাপন করল। ঘটনার অপ্রত্যাশিত পরিণামে এক মুহূর্তের জন্যে সকলে স্তম্ভিত হয়ে গেল। কিন্তু সঙ্কটে দীর্ঘকাল স্তম্ভিত হয়ে থাকা কিংবা অযথা শোরগোল সৃষ্টি করা ইংরেজের স্বভাবসিদ্ধ নয়। তারা মুহূর্তে মন স্থির করতে পারে। তখনই জন, ফেলিক্স, মার্শম্যান ও ওয়ার্ড নৌকা নিয়ে বেরিয়ে পড়ল, সঙ্গে অবশ্যই চলল রাম বসু। কিন্তু বাতিকগ্রস্ত টমাসকে সঙ্গে নিতে কেউ আগ্রহ প্রকাশ করল না, টমাসও পীড়াপীড়ি করল না। সকলের ধারণা হয়েছিল চণ্ডী বক্সীর নৌকো জোড়ামউর দিকে গিয়েছে, কাজেই পাদ্রীদের নৌকাও চলল উত্তরমুখো।

পরদিন বুঝতে পারা গেল কেন টমাস যাওয়ার জন্যে পীড়াপীড়ি করে নি। কেরীর সাহায্যে রেশমীর বদলে কৃষ্ণদাস ছুতোরের দীক্ষাকার্য সে যথারীতি সম্পন্ন করল। তার পরে যা ঘটল টমাসের ক্ষেত্রে তা একেবারে অভাবিত না হলেও আতিশয্যগ্রস্ত সন্দেহ নেই। কৃষ্ণদাসের দীক্ষায় তার কুড়ি বৎসরের আশাতরুতে প্রথম মুকুল ফুটল, কুড়ি বৎসরের চেষ্টায় এই প্রথম সত্যধর্মে দীক্ষা-দান। ভাবে বিভোর হয়ে সারারাত সে নৃত্যগীত করে কাটাল। ভোরবেলা দেখা গেল সে বদ্ধ উন্মাদ হয়ে গিয়েছে। প্রথমটা কেউ বুঝতে পারে নি ; কেননা দিব্যোন্মাদে ও বদ্ধোন্মাদে বাহ্যিক পার্থক্য অতি অল্প। দিনের আলোয় দর্শকের চোখের প্রত্যাশায় তার উন্মত্ততা গেল আরও বেড়ে ; খোঁড়া কৃষ্ণদাসকে টেনে নিয়ে প্রশস্ত চত্বরে টমাস দ্বৈতনৃত্য শুরু করে দিল, সঙ্গে রাম বসু রচিত দ্বৈতসঙ্গীত—

"কে আর তারিতে পারে
লর্ড জিজছ ক্রাইস্ট বিনা গো,
পাতক ঘোর সাগর
লর্ড জিজছ ক্রাইস্ট বিনা গো।"

খোঁড়া পায়ে কৃষ্ণদাসের নাচ তেমন জমে না, সে যেমনি একটু থামে টমাস মারে হেঁচকা টান, কৃষ্ণদাস দেড়খানা পায়ে নাচ শুরু করে।

ভাল করে নাচ বাবা, ভাল করে নাচ, বলে টমাস।

কৃষ্ণদাস যথাসাধ্য নৃত্যভঙ্গী করতে করতে বলে, কর্তা, পায়ে যে লাগে, ওষুধ দিয়ে সারিয়ে দাও, তার পরে দেখবে নাচ কাকে বলে।

তদুত্তরে টমাস উচ্চকণ্ঠে গেয়ে ওঠে, সঙ্গে সঙ্গে মারে হেঁচকা টান—

"সেই মহাশয় ঈশ্বর তনয়
পাপীর ত্রাণের হেতু।
তাঁরে যেই জন করয়ে ভজন
পার হবে ভবসেতু।"

কৃষ্ণদাস বুঝল পার্থিব ঔষধে তার ব্যাধি সারবার নয়, একমাত্র ভরসা খ্রীষ্টের দয়া। পাছে নৃত্যের বৈকল্যে দয়ার অভাব ঘটে তাই সেই খোঁড়া পাখানা ধরে, আলগা করে তুলে এক পায়ে নৃত্য শুরু করে দিল। তখন দুইজনে সে কি নৃত্য! মোটের উপরে

তিনখানা পায়ের নাচে আসর সরগরম হয়ে উঠল। ছাপাখানার লোকেরা দর্শক হয়ে ছুটে এল।

কিন্তু আরও বাকি ছিল। কেরী-পত্নী কিছুদিন থেকে আধ-পাগল অবস্থায় ছিল—হঠাৎ ঐ দৃশ্য দেখে তার পাগলামি মাথা চাড়া দিয়ে জেগে উঠল, জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দিয়ে বলল, নাচ হচ্ছে আর বাজনা নেই এ কি রকম!

এই বলে একখানা প্লেট হাতে করে বেরিয়ে আসরে এসে উপস্থিত হল, প্লেটে মারল বড় একখানা টেবিল-চামচ দিয়ে ঘা, টুংটাং করে শব্দ উঠল, বলল, নাচ নাচ, আজ বুঝি বাঘ-শিকারে যাবে! নাচ নাচ, খুব নেচে নাও, ফিরে আসতে পারবে মনে হয় না, ইয়া বড় বাঘ!

এতক্ষণ কেরী প্রুফ দেখছিল। শোরগোল শুনে বেরিয়ে এসে কাণ্ড দেখে সে অবাক, বুঝল ব্যাপারখানা কি। তখনই আর পাঁচজনের সাহায্যে টমাস ও ডরোথিকে ধরাধরি করে নিয়ে দুটো ঘরে বন্ধ করে রেখে দিল। ভাঙা পায়ের যন্ত্রণা ভুলে কেবলই নৃত্যরস জমে উঠেছিল কৃষ্ণদাসের মনে, অকালে রসভঙ্গ হওয়ায় সে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল, নিজের মনে কেবলই বলতে লাগল, সমে ফিরে আসবার আগে এ কি হল! তারা মা ইচ্ছাময়ী—সবই তোমার ইচ্ছা!

এদিকে চণ্ডীর নৌকা অন্ধকারের মধ্যে দ্রুতবেগে কলকাতার দিকে চলেছে। চণ্ডী বলছে, দেখলে তো মিত্যুঞ্জয়, পারলাম কি না! কি করতে পারল সাহেব বেটারা?

কিন্তু এর পরে কি হয় কে জানে? আমাদের কোন অনিষ্ট না হয়!

শাস্ত্রীয় হাসির ছটায় অন্ধকার দীপ্ত করে তুলে চণ্ডী বলে, কোন ভয় নেই মিত্যুঞ্জয়, গীতায় শ্রীভগবান কি বলেছেন জান, "নহি কল্যাণকৃৎ কশ্চিৎ দুর্গতিং গচ্ছতি তাত।" অর্থাৎ কিনা, ভাল কাজ করলে কখনও অনিষ্ট হয় না।

তার পরেই ভগবদ্‌বচন থেকে ধাপ-কয়েক নেমে এসে বলে, মেয়েটাকে বেঁধে রাখব নাকি?

মৃত্যুঞ্জয় বলে, না, তার দরকার নেই, ঘুমিয়েছে; আর তা ছাড়া নদীর মধ্যে পালাবে কোথায়?

ও বেটী আস্ত শয়তানী, সেবারে নদী সাঁত্‌রে পালিয়েছিল মনে নেই?

তার পরে বলে, আচ্ছা থাক, এখন আর গোলমাল করে কাজ নেই।

এবারে মৃত্যুঞ্জয় চাপা স্বরে শুধায়, আচ্ছা বক্সী মশায়, ওকে সত্যি মোতি রায়ের বাগানবাড়িতে পাঠিয়ে দেবে নাকি?

মৃদু স্বরে চণ্ডী বলে, পাগল নাকি! কালই ওকে চিতায় চাপাব। আর জ্যান্ত রাখা নয়।

সঙ্কটে ইন্দ্রিয়ের শক্তি বৃদ্ধি পায়, সমস্ত আলোচনা গেল রেশমীর কানে। কিন্তু করবার কিছু নেই, কাজেই নিদ্রিতবৎ শুয়ে রইল।

মাঝখানে রেশমী বোধ হয় ঘুমিয়ে পড়েছিল, যখন জাগল, বুঝল যে নৌকা চলছে না, থেমে রয়েছে। মাঝিদের কথাবার্তা এল তার কানে।

একজন বলল, বাগবাজারের ঘাট নাকি?

অপরজন উত্তর দিল, বাগবাজারের ঘাট বুঝি ছাড়িয়ে এলাম, মনে হচ্ছে এটা

মদনমোহন-তলার ঘাট।

তবে উড়িয়ে চল।

একটু থাম্, জোয়ার আরম্ভ হক।

তবে থাক, আর রাতটাও শেষ হয়ে এল, বলে তারা চাদর-মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়ল।

চণ্ডীদের কণ্ঠস্বর রেশমীর কানে এল না, সে বুঝল তারা আগেই ঘুমিয়েছে। রেশমী বুঝল যে হয় এখন, নয় আর কখনও সম্ভব হবে না। নিদ্রিত দিদিমার শিথিল বাহুবন্ধন ছাড়িয়ে সে উঠে বসল, একবার এদিকে-ওদিকে তাকাল, নাঃ, কারও কোন সাড়া নেই। তখন সে অতি সন্তর্পণে শব্দমাত্র হতে না দিয়ে ধীরে ধীরে নৌকা থেকে নেমে পড়ল। নাঃ, কেউ বাধা দিল না। তার পরে আরও দু-চার পা সন্তর্পণে এসে প্রাণপণে দৌড় মারল। কোন্ দিকে যাচ্ছে, কার কাছে যাচ্ছে কোন প্রশ্ন উঠল না তার মনে। একমাত্র চিন্তা—চণ্ডীর কাছ থেকে পালাতে হবে।

চারিদিক অন্ধকার নিঝুম। অদূরে একটা বাড়িতে আলো দেখতে পেয়ে প্রাচীরের দরজায় এসে ঘা মারল রেশমী।

দরজা খুলে গেল, রেশমী দেখল একটি মাঝবয়সী মেয়ে শেষরাত্রে উঠে উঠোন ঝাঁট দিচ্ছে।

রেশমী ঢুকেই দরজা বন্ধ করে দিল, দিয়ে বলল, আমাকে বাঁচাও।

কে তুমি? কি হয়েছে তোমার?

ডাকাতেরা আমাকে চুরি করে নিয়ে যাচ্ছিল, সুযোগ পেয়ে পালিয়ে এসেছি।

এমন ব্যাপার সে যুগে প্রায়ই ঘটত, কাজেই মেয়েটি অবিশ্বাস করল না, স্নেহার্দ্র স্বরে বলল, এস, তোমার কোন ভয় নেই।

তার পর ঝাঁটা রেখে দিয়ে রেশমীর হাত ধরল। রেশমী শুধোল, তোমাকে কি বলে ডাকব?

আমাকে সবাই টুশকি বলে, তুমি না হয় টুশকি দিদি ব'ল। আর তোমাকে কি বলে ডাকব বোন?

রেশমী একটু ইতস্তত করে বলল, আমার নাম সৌরভী।

টুশকি বলল, চল ঘরে চল, এখনও খানিকটা রাত আছে, একটু ঘুমিয়ে নেবে।

দুজনে ঘরে ঢুকল।

চতুর্থ খণ্ড

১
শতাব্দীর মোড়

ইতিমধ্যে শতাব্দীর মোড় ঘুরেছে, অষ্টাদশ শতক নিঃশব্দে আত্মসমর্পণ করেছে ঊনবিংশ শতকে, এমন নিঃশব্দে যে দুয়ের তরঙ্গতালে প্রভেদ বোঝবার উপায় নেই। মহাম্বুধিতে বড় বড় জাহাজগুলো হয়তো তেমন দোল খায় না, কিন্তু আমাদের ক্ষুদ্র কাহিনীটির ডিঙিখানা অসহায়ভাবে দোদুল্যমান, তরঙ্গ-তালের পরিবর্তনে আমাদের কাহিনীর নায়াক-নায়িকারা ভ্রষ্টপদ ও বিচলিত।

অষ্টাদশ শতক ভারতের ইতিহাসে অ্যাডভেণ্চারের যুগ। মারাঠা, ফরাসী ও ইংরেজ পরস্পরকে শিকার করবার চেষ্টায় নিযুক্ত ছিল। শতাব্দী শেষে দেখা গেল অ্যাডভেণ্চারে জয়ী হয়েছে ইংরেজ। ক্লাইভ সকলের সেরা। অ্যাডভেণ্চারার না হলে ক্লাইভ বারো শ মাত্র গোরা সৈন্য নিয়ে পঞ্চাশ হাজার নবাবী সৈন্যের সম্মুখীন হত না। ওয়ারেন হেস্টিংস অ্যাডভেণ্চার যুগের লোক, কিন্তু তার মধ্যেই বোধ করি প্রথম অ্যাডভেণ্চারার ও শাসক সমভাবে মিশেছিল। হেস্টিংসের বিদায়ের সঙ্গে ইংরেজের অ্যাডভেণ্চার যুগের শেষ, তখন স্থায়িত্বের দায়িত্বের প্রসঙ্গ দেখা দিয়েছে। প্রথম লক্ষণ পারামানেণ্ট সেটল্‌মেণ্ট বা জমিদারদের চিরস্থায়ী রাজস্বের বন্দোবস্ত। যুগ-বদলের চিহ্ন সূক্ষ্মরেখায় টানা যায় না—তার জন্যে খানিকটা জায়গার প্রয়োজন। হেস্টিংসের বিদায়ের পর থেকে কর্নওয়ালিসের দ্বিতীয়বার আগমন পর্যন্ত সেই সীমান্তের ব্যাপ্তি, অ্যাডাভেণ্চাব ও রীতিমত শাসনে মিশল। মাঝখানে ওয়েলেস্‌লি। সেকালের ইংরেজ ব্যবসায়ীদের বিদ্রূপ করে বলা হত নবাব। তারা যদি নবাব হয় তবে ওয়েলেস্‌লি বাদ্‌শাহ্। তার মত অপ্রতিহত প্রতাপ—ক্ষমতার চূড়ায় অধিষ্ঠিত থাকাকালে ঔরঙ্গজেবও ভোগ করেছেন কিনা সন্দেহ। তার হাতেই প্রথম যথার্থভাবে বণিকের মানদণ্ড রাজদণ্ড হয়ে উঠল। ওয়েলেস্‌লিই প্রথম নিঃসংশয়ে বুঝেছিল এদেশে ইংরেজের আর অ্যাডাভেণ্চারের নয়, স্থায়ী শাসকের। ক্লাইভের মত নবকৃষ্ণ মুন্সীর সহায়তায় তার আর প্রয়োজন ছিল না ; কোনরকমে কুড়িয়ে-বাড়িয়ে বারো শ গোরা সৈন্য যোগাড় করে দাবা খেলায় 'হারি কি মারি' মনোভাব তার ছিল না ; হেস্টিংসের মত ফার্সি ও লাটিন শ্লোক রচনার ফাঁকে রাজকার্য চালনার সময় তার ছিল না ; সার জন শোর বা কর্নওয়ালিসের মত ক্ষুদে জমিদারের পেট টিপে গুড় আদায় করবার মনোভাবও তার ছিল না ; তার কারবার হাতী ঘোড়া রাজরাণী নিয়ে ; সেগুলোও আবার দাবাখেলার নয়, প্রকাণ্ড বাস্তবের। আনুষ্ঠানিকভাবে ভারত সাম্রাজ্য স্থাপিত হওয়ার আগে সাম্রাজ্যের রস ইংরেজের দেহে চালিয়ে দিয়ে তাদের মাতিয়ে তুলল ওয়েলেস্‌লি। ওয়েলেস্‌লির সময়ে সাম্রাজ্যবাদের সূচনা।

আঠারো শতকের ইংরেজ রাজপুরুষগণ এ রসে বঞ্চিত ছিল বলে দেশী বিদেশী সরকারী বেসরকারী সকলের সঙ্গে অবাধে মিশত। ওয়েলেস্‌লি সকল সম্বন্ধ ছিন্ন করে নবনির্মিত বিপুল প্রাসাদের নিঃসঙ্গ নৈভৃত্যে একাকী বসে রইল, অমনি অন্যান্য

রাজপুরুষরাও বন্ধন ছিন্ন করতে উদ্যত হল। দ্বিতীয়বার আগমন করে কর্নওয়ালিস ওয়েলেস্‌লি-শাসনের রাজকীয় আড়ম্বরের পেখম গুটিয়ে ফেলল, অমনি চারিদিকে খরচ কমাবার সাড়া পড়ে গেল। কিন্তু এ সমস্তর চেয়েও গুরুতর পরিবর্তন ঘটছিল ভিতরে ভিতরে।

ইউরোপের নীতিবর্জিত অষ্টাদশ শতকের অধিষ্ঠাত্রী দেবী ছিল Reason, প্রধান পুরোধা ভলতেয়ার।

নীতিবর্জিত Reason-এর আবহাওয়া এদেশের শ্বেতাঙ্গ সমাজেও পরিব্যাপ্ত ছিল। তাই ছলে বলে কৌশলে ইংরেজের পক্ষে এদেশ জয় করা সম্ভব হয়েছিল ; Cosmopolitan উদার ভাব শ্বেতাঙ্গ সমাজে ছিল বলেই এদেশীয়দের সঙ্গে তাদের মেলামেশার পথ বন্ধ হয় নি, অ্যাডভেঞ্চারের মনোবৃত্তি সে পথ সুগম করেছিল, সাম্রাজ্য-দখলকারের উষ্মা সে পথকে তখনও বিঘ্নিত করে নি। তাই জনের পক্ষে রেশমীকে বিবাহ করবার চিন্তা সহজ ছিল। অষ্টাদশ শতকের শ্বেতাঙ্গ সমাজ ছিল ধর্মবিষয়ে উদাসীন, পাদ্রীরা প্রশ্রয় পায় নি রাজপুরুষদের কাছে। টমাস নিজেই স্বীকার করেছে কুড়ি বৎসরের প্রচেষ্টাতেও একটা নেটিভ দীক্ষিত করতে পারে নি। বস্তুত প্রথম ব্যাপটিস্ট মিশন স্থাপিত হয়েছিল শ্রীরামপুরে, কোম্পানির রাজত্বের বাইরে।

কিন্তু ক্রমে আবহাওয়ার পরিবর্তন দেখা দিল। সাম্রাজ্য-দখলের রস যতই ইংরেজকে মাতিয়ে তুলল ততই তারা দেশীয় সমাজ থেকে পৃথক হয়ে পড়তে লাগল ; এতদিন যা ছিল প্রকাণ্ড অ্যাডভেঞ্চার, তা পরিণত হল রাজাপ্রজা সম্বন্ধে। সেই সঙ্গে দেখা দিতে লাগল ধর্ম সম্বন্ধে গোঁড়ামি। অ্যাডভেঞ্চারারদের যুগ গিয়ে এল রীতিমত শাসক ও পাদ্রীদের যুগ। উনিশ শতকের ফৌজী জেনারেল কর্নেলের সঙ্গে মানবজীবনের উদ্দেশ্য নিয়ে আলোচনা শুরু করল। হিদেন প্রজার আত্মার সদ্‌গতি সম্বন্ধে শাসক ও সৈনিকগণ চিন্তিত হয়ে উঠল। যে-সব কারণে সিপাহী বিদ্রোহ ঘটেছিল এই দুশ্চিন্তা তাদের মধ্যে অন্যতম প্রধান। রাজা ও প্রজায় ধীরে ধীরে যে ব্যবধান ঘটেছিল, সিপাহী বিদ্রোহের পরিণামে তা দুস্তর হয়ে উঠল। শতাব্দীর প্রারম্ভে এসব প্রবণতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে নি বটে, কিন্তু শুরু হয়ে গিয়েছিল তার প্রভাব।

পালা বদল শুরু হয়ে গিয়েছে। পুরনো যুগের বড় বড় ছয় ঘোড়ার গাড়িগুলো রেসকোর্স ও ময়দান থেকে ক্রমে অদৃশ্য হতে লাগল। 'নবাবে'র দল বুঝেছিল তাদের পালা শেষ হল। অবশেষে একদিন সরকারের ডাক পড়ে হিসাব-নিকাশ চুকিয়ে দেবার জন্যে। খরচের অঙ্ক বিপুল, তবু সমস্ত চুকিয়ে দিয়েও যা হাতে থাকে তাতে বিলাতে নবাবী চালে চলা সম্ভব, দু-একটা পার্লামেণ্টা সদস্যপদ ক্রয় করাও অসম্ভব নয়। অতএব জাহাজে স্থানের সন্ধান পড়ে যায়--সুযোগ বুঝে কাপ্তেনরা ভাড়া দেয় বাড়িয়ে, হাজার পাউণ্ড একজনের ভাড়া।

লর্ড কর্নওয়ালিসের কলকাতায় দ্বিতীয়বার পদার্পণ যুগান্তের স্পষ্ট তারিখ। জাহাজঘাটায় লোকজন, গাড়িঘোড়া, হাতী, উট, সৈন্য-সামন্তের মস্ত দঙ্গল। বিভ্রান্ত কর্নওয়ালিস পার্শ্ববর্তী সেক্রেটারিকে শুধায়, রবিনসন, এসব ব্যাপার কি ?

হুজুরকে অভ্যর্থনা করে নিয়ে যাওয়ার জন্যে পাঠিয়েছে লর্ড ওয়েলেস্‌লি।

সৌজন্যের চরম—কিন্তু এত কি আবশ্যক ছিল ? পায়ের ব্যবহার কি আমি ভুলে গিয়েছি ।

কর্নওয়ালিস পদব্রজে এল গভর্নমেণ্ট হাউসে।

নূতন গভর্নমেণ্ট হাউসের (বর্তমান বাড়ি) ইঁট কাঠ পাথরের অরণ্যে দিশেহারা কর্নওয়ালিস সেক্রেটারিকে বলল, আমার শয়নগৃহটা খুঁজে পাওয়া এক সাধনার বিষয়।

পরদিন নূতন লাটসাহেব অশ্বারোহণে একটিমাত্র সোয়ার নিয়ে প্রাতর্ভ্রমণে বের হল। বাদশা ওয়েলেস্‌লির স্থলে গভর্নর কর্নওয়ালিস। নূতন যুগ আরম্ভ হয়ে গিয়েছে।

কিন্তু নব্যবঙ্গ যারা গড়বে তারা কোথায়? রাধাকান্ত দেব ষোল বছরের কিশোর। পঁচিশ-ছাব্বিশ বছরের যুবক রামমোহন পাটনা-ভাগলপুর-কলকাতায় অনিশ্চিতভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে একটু পা রাখবার স্থানের সন্ধানে। মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার বাগবাজারের টোলে অধ্যাপনায় রত। কেরী, রামরাম বসু শ্রীরামপুরে বাইবেলের প্রথম বঙ্গানুবাদের প্রুফ দেখছে। আর বাকি সকলে তখনও দূর ও অনতিদূর ভবিষ্যতের গর্ভে নিহিত।

২
প্রতিক্রিয়া

চণ্ডী ধড়মড় করে জেগে উঠে মৃত্যুঞ্জয়কে ধাক্কা দিল, মিত্যুঞ্জয়, ওঠ ওঠ, ঘাটে এসে নৌকো লেগেছে।

মৃত্যুঞ্জয় জেগে উঠে বলল, কোন্ ঘাট?

বোধ হয় বাগবাজার হবে, বলে চণ্ডী।

ও মাঝি, মাঝি, তোমরা সব ঘুমুলে দেখছি!

ডাকাডাকিতে মাঝিরা জেগে ওঠে। একজন বলে, ঘুমোই নি কর্তা, একটু শুয়েছিলাম।

মাঝিরা ডাকে, ও সর্দার, জাগ।

পাইকরা জেগে ওঠে। সবাই ঘুমিয়ে পড়েছিল।

তখন চণ্ডী ডাকতে শুরু করে, মাসি, আর কত ঘুমুবে, এবার জাগ!

মোক্ষদা জেগে উঠে ধাক্কা দেয়, রেশমী, ওঠ্।

ধাক্কা খেয়ে বালিসটা সরে যায়—কই রে, কোথায় গেলি?

রেশমী নেই। রেশমী মনে করে একটা বালিস জড়িয়ে ধরে নিশ্চিন্তে শুয়ে ছিল মোক্ষদা। মোক্ষদা চীৎকার করে ওঠে, ও চণ্ডী, আমার রেশমী গেল কোথায়?

অ্যাঁ, সে বেটী আবার পালাল নাকি? চমকে ওঠে চণ্ডী।

সত্যই রেশমী কোথাও নেই।

চণ্ডী গর্জে ওঠে, বুড়ি, এ তোর কারসাজি। তুই তাকে পালিয়ে যেতে দিয়েছিস।

বুড়ি পাল্টে গর্জে ওঠে, যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা! কত বছর পরে বুকের ধনকে ফিরে পেয়ে আমি পালিয়ে যেতে দেব! মুখ সামলে কথা বলিস চণ্ডী।

চণ্ডী দমে না, বলে, দাঁড়া ডাইনী, তোর শয়তানি বের করছি। বল্ কোথায় গেল ও বেটী!

নৌকার এ-কোণে ও-কোণে খোঁজ পড়ে যায়—কিন্তু যা নেই তা পাওয়া যায় না।

মোক্ষদা হাউমাউ করে কেঁদে ওঠে, কোথায় গেল আমার বুকের ধন!

তখন চণ্ডী গিয়ে পড়ে মাঝিদের ঘাড়ে। তোরা পাহারা দিস নি কেন?

মাঝিরা বলে, পাহারা দেওয়ার জন্যে আছে তো পাইকরা—আমরা মাঝি, নৌকা ঠিক ঘাটে এনে লাগিয়ে দিয়েছি।

এই তোদের ঠিক ঘাট হল? গর্জায় চণ্ডী।

তখন সকলে মিলে পড়ে পাইকদের ঘাড়ে। পাইকরা বলে, পাহারা দেওয়া আমাদের কাজ নয়, তোমরা জেগে থাকলেই পারতে।

তখন মাঝির দল, পাইকের দল ও চণ্ডীতে মিলে পরস্পরের ঘাড়ে দোষ চাপানোর চেষ্টা শুরু হয়ে যায়।

রেশমীর পরিণাম মৃত্যুঞ্জয় জানত, তাই তার অন্তর্ধানে সে খুব দুঃখিত হয় নি। সে বলল, বক্সী মশাই, জলে গিয়ে পড়ে নি তো?

কুমীর না হাঙর যে জলে পড়বে! বেটী পালিয়েছে। নাঃ, বেটী ছু-মন্তর জানে। তিন-তিনবার পালাল আমার হাত থেকে!

মোক্ষদা কাঁদতেই থাকে।

রেশমীর অন্তর্ধানের দোষ কেউ ঘাড়ে নিতে রাজী না হওয়ায় অবশেষে এক সময়ে কলহ থামল।

চণ্ডী বলে উঠল, ও মাঝি, এ পাড়া তো তোদের চেনা, একবার খুঁজে দেখ না।

এ কি তোমার জোড়ামউ গাঁ নাকি! কোথায় কোন্ দিকে গিয়েছে, কোথায় খুঁজতে যাব আমরা! তারা স্রেফ জবাব দেয়।

তার পরে যে সমস্যা দেখা দেয় সেটা সত্যই গুরুতর।

চণ্ডী হতাশভাবে বলে, তবে এখন মোতিবাবুকে গিয়ে কি বলব?

মৃত্যুঞ্জয় বলে, প্রকৃত অবস্থা বললেই হবে। মাঝি ও পাইকরা সমস্বরে আপত্তি করে ওঠে, ভোগের নৈবিদ্যি পালিয়েছে শুনলে আমাদের মাথা আস্ত থাকবে না।

তা হলেই তোদের উচিত শিক্ষা হয়।

তুমি চুপ কর তো বক্সীমশাই। অমন করলে আমরা সবাই মিলে হলফ করে বলব যে, তোমাদেরই যোগসাজসে মেয়েটা পালিয়েছে। তখন বুঝবে কত ধানে কত চাল।

চণ্ডী মোতি রায়কে চিনত, নরম হল; বলল, তাহলে কি বলা যায় সবাই মিলে স্থির কর।

তখন সকলে মিলে রোমাঞ্চকর এক উপন্যাস রচনা করল। স্থির হল, মোতিবাবুকে বলতে হবে যে, তারা মেয়েটাকে ছিনিয়ে নিয়ে রওনা হয়েছে এমন সময়ে সাহেবদের চার-পাঁচখানা নৌকা এসে তাদের ছিপ ঘেরাও করল। তারা এই ক-জনে আর কি করবে, অন্য পক্ষে যে পঁচিশ-ত্রিশজন লোক, সাহেবই জন কুড়ি-পনেরো। কেড়ে নিয়ে গেল মেয়েটাকে।

সেই কথা বলাই স্থির হল। তখন মৃত্যুঞ্জয় মোক্ষদাকে নিয়ে বাসাবাড়ি চলে গেল, আর সবাই চলল মোতিবাবুর বাড়ির দিকে।

যথাবিহিত সুর, স্বর, অশ্রু, কম্প ও হলফ সহকারে উপন্যাসটি নিবেদিত হল মোতিবাবুর সমীপে।

সমস্ত শুনে কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে মোতিবাবু বলল, এই পাদ্রীগুলোর আস্পদ্দা

খুব বেড়ে উঠেছে দেখছি!

সবাই বুঝল তাদের মাথা এবারের মত বেঁচে গেল।

মোতিবাবু বলল, আচ্ছা তোমরা যাও, দেখি আমি কি করতে পারি।

রেশমী গেল কোথায় চিন্তা করতে করতে চণ্ডী ফিরে চলল।

ওদিকে জন ও রামরাম বসুদের নৌকা জোড়ামউ পৌঁছল। গাঁয়ের মধ্যে ঢুকে তারা রেশমীর সন্ধানে প্রবৃত্ত হল। সাহেব দেখে সবাই মিথ্যার আশ্রয় নিল। সকলে একবাক্যে বলল, রেশমী নামে কোন মেয়েকে তারা চেনে না।

আর চণ্ডী বক্সী?

চণ্ডী বক্সী? ও নামটাও কেউ শোনে নি!

তার বাড়ি কোথায় বলতে পার?

মানুষটার নামই শোনে নি, বাড়ি কেমন করে বলবে?

মোক্ষদা বুড়িকে চেন?

মোক্ষদাকে কেউ চেনে না, তবে মুক্তিদা বুড়িকে কেউ কেউ চিনত বটে, তা তার অনেক কয় বছর হল মৃত্যু হয়েছে।

এ গাঁয়ের নাম জোড়ামউ তো বটে?

পাঁচজনে তাই তো বলে, তবে বামনুডিহি নামেও গ্রামটা চলে।

রাম বসু বুঝল সবাই আগাগোড়া মিথ্যা বলছে। দুর্বলের অস্ত্র মিথ্যা। কিন্তু নিরুপায়। রেশমীর সন্ধান পাওয়া গেল না। রাম বসু জনদের বোঝাল, আমার মনে হচ্ছে ওরা এদিকেই আসে নি, কলকাতায় গিয়েছে।

রাম বসু বলল, তোমরা ফিরে যাও, আমি দু-চার দিন এদিকে থেকে আরও একটু খোঁজখবর করে ফিরব। সেই সিদ্ধান্তই গৃহীত হল।

ফিরে চলল জনদেব নৌকা। আর যথাসময়ে শ্রীরামপুরের ঘাটে এসে পৌঁছল।

জন বলল, আমি কলকাতায় ফিরে যাই। অন্য সবাই বলল, অবশ্যই কলকাতায় যেতে হবে কিন্তু তার আগে একবার এখানে নেমে পরামর্শ করা আবশ্যক।

জন নামল শ্রীরামপুরে। ফেলিক্সের বাহু অবলম্বন করে কোনরকমে ঘরে পৌঁছে সে শুয়ে পড়ল। কেন জানি না হঠাৎ লিজার কথা মনে পড়ে দুই-চোখ জলে ভরে উঠল তার।

৩
ভ্রাতা-ভগ্নী

সেকালের কলকাতা শহর কতটুকু? অবিলম্বে মুখে মুখে সর্বত্র রেশমী-হরণের সংবাদ প্রচারিত হয়ে গেল। কিন্তু বস্তুত যা ঘটেছিল, প্রচার হল তা থেকে ভিন্ন রকম। গুজব শরতের মেঘ—দেখতে দেখতে তার আকৃতি প্রকৃতি যায় বদলে। কেউ শুনল রেশমী নামে মেয়েটা গঙ্গাস্নানে এসেছিল, এমন সময়ে একদল বোম্বেটে (মতান্তরে সাহেব,

মতান্তরে পাদ্রী সাহেব) তাকে ধরে নিয়ে গিয়েছে। গঙ্গার ঘাটে কথাটা প্রচারিত হওয়াতে স্নানার্থীর সংখ্যা বাড়ল সরেজমিনে শোনবার আগ্রহে। কেউ শুনল মেয়েটাকে বাড়ি থেকে ছিনিয়ে নিয়ে খ্রীষ্টান-ধর্মে দীক্ষিত করা হয়েছে, এখন মেয়েটাকে লুকিয়ে রেখেছে গড়ের মধ্যে, খোলা তলোয়ার গোরা সেপাই পাহারা দিচ্ছে। কেউ শুনল মেয়েটাকে জাহাজে করে তুলে নিয়ে বিলেত রওনা করে দেওয়া হয়েছে, সেখানে নাকি রাজবাড়ির দাসী হবে। আবার কেউ কেউ বলল, ওসব কথা শোন কেন, মেয়েটা বড় সহজ পাত্রী নয়, স্বেচ্ছায় গিয়ে সাহেবের নৌকোয় উঠেছে। সকলের কথাই সমান সত্য, কারণ এ সামান্য চোখের দেখা নয়, কানের শোনা—বক্তা সত্যবাদিতায় যুধিষ্ঠির। দু'একজন অসমসাহসিক সব অস্বীকার করল। বলল, যত সব বাজে কথা ; বলল, মেয়েটাকে তারা নিজ চক্ষে দেখেছে, সেটা তিনকালগত বুড়ি, নাতির শোকে গঙ্গায় ডুবে মরেছে। গঙ্গায় ডুবে মরা নৈসর্গিক নিয়ম, উত্তেজনার তাপ নেই তাতে, কাজেই অন্য সকলে অস্বীকার করল ; বলল, আরে যে বুড়িটার কথা বলছিলে, তার নাতিকে তো আমরাই দাহ করে এলাম, আহা রাজপুত্রের মত চেহারা। তারা হলফ করে বলল, এ যার কথা হচ্ছে সে ছুঁড়ি, আমাদের পাড়ার মেয়ে যে। আহা, তার মা কেঁদে কেঁদে চোখ অন্ধ করে ফেলল।

কেউ আর উত্তেজনার আগুন নিভতে দিতে রাজী নয়। একটুখানি নিস্তেজ হয়ে আসবামাত্র সাক্ষ্য-প্রমাণের নূতন ইন্ধন যোগায়, আগুন আবার দপ করে জ্বলে ওঠে। সবাই হাত-পা তাতিয়ে আরাম অনুভব করে।

সংবাদটা লোকের মুখে ঘুরতে ঘুরতে ক্রমে সাহেবপাড়ায় এসে পৌঁছল। সেখানকার চাপরাসী আরদালির দল তাকে নূতন আকার দিল। তাদের মধ্যে ইতিমধ্যেই জানাজানি হয়ে গিয়েছিল যে, স্মিথ সাহেব একটা বাঙালী মেয়েকে নিয়ে কোথায় চলে গিয়েছে। এখন লুটপাটের কথা শুনে তারা অনুমান করল চোরের উপর বাটপাড়ি হয়েছে, স্মিথ সাহেবের ভোগের নৈবিদ্যি চিল-শকুনে ছোঁ মেরে নিয়ে গিয়েছে। কথাটা এই আকারেই লিজার কানে পৌঁছল। সে ভাবল, রেশমীকে আর-একটা সাহেবেই কেড়ে নিক বা কতগুলো নেটিভ লোকে মিলেই ছিনিয়ে নিক, মোট কথা সে জনের হাতছাড়া হয়েছে। ভগবানের সুবিচারে মনে মনে লিজা ভগবানের পিঠ চাপড়িয়ে সুসংবাদ দানের উদ্দেশে তখনই মেরিডিথের বাড়ির দিকে রওনা হল। গত রবিবারে ভগবানের সঙ্গে অসহযোগিতা করে সে গির্জায় যায় নি।

মেরিডিথ, সুসংবাদ শুনেছ?

কৃত্রিম উল্লাসে মেরিডিথ বলল, কি, মিস্টাব আর মিসেস স্মিথ বুঝি এসে পৌঁছেছে ?

আঃ, ঠাট্টা রাখ। মিস্টার স্মিথ শীঘ্রই ফিরে আসবে আশা করছি, কিন্তু নিশ্চয় জেনে রেখ যে, মিসেস স্মিথ আর আসবে না।

এবারে অকৃত্রিম জিজ্ঞাসায় মেরিডিথ শুধাল, ব্যাপার কি ?

তার 'ব্যাণ্ডল অব্ সিল্ক' হাতছাড়া হয়েছে!

ইণ্ডিয়ান সিল্ক খুব দামী জিনিস, এমন হওয়াই সম্ভব, কিন্তু কি ঘটেছে খুলে বল তো।

লিজা যেমন শুনেছিল বলল। মন্তব্য করল, আমি গোড়া থেকেই জানতাম ভগবান এমন অনাচার ঘটতে দেবেন না।

মেরিডিথ বলল, ভগবানের উপর এতই যদি বিশ্বাস তবে এমন মুষড়ে পড়েছিলে

কেন ?

লিজা বলল, ভগবান ও মানুষের মাঝখানে যে মাঝে মাঝে শয়তানটা এসে পড়ে।

সেই শয়তানটাই বুঝি জনকে স্বর্ণ-আপেল দেখিয়ে লুব্ধ করেছিল ?

জনকে নয়, hussy-টাকে।

যাক্, এবার তো তোমার ভগবানের জয় হল।

তার পরে একটু থেমে বলল, সত্যি করে বল তো লিজা আনন্দটা কেন, ভগবানের জয়ে না তোমার জয়ে !

মেরিডিথ, তোমার ঐ বড় দোষ, ভগবানের কথা উঠলেই তুমি পরিহাস শুরু কর।

আচ্ছা, তবে এবার সত্যি কথা বলি। তোমার ভগবান একটি মনোরম ধাপ্পা।

ছি ছি মেরিডিথ, অমন কথা বলতে নেই। আচ্ছা, তুমি বসে বসে ভাব—আমি চললাম, তুমি সন্ধ্যায় আমার বাড়িতে যেতে যেন ভুলো না।

অবশ্যই যাব, যদি ইতিমধ্যে মাঝখানে শয়তানটা এসে উপস্থিত না হয়।

লিজা হেসে বলল, না, সে আসবে না। আমি চললাম।

জনের অকস্মাৎ পলায়নের পর থেকে লিজা মুহ্যমান অবস্থায় ছিল। এতদিন পরে তার মুখে হাসি ফুটল।

সেদিন রাত্রে সে জনের অপেক্ষা করছিল। স্থির করে রেখেছিল পাঁচ কাহনকে সাত কাহন করে রেশমীর কথাগুলো বর্ণনা করবে। বলবে যে রেশমী বাড়ি বয়ে এসে তাকে ন ভূতো ন ভবিষ্যতি করে গালাগালি করে গিয়েছে। পিতামাতা ও জনকেও কটুকাটব্য করতে বাদ দেয় নি। লিজার বিশ্বাস ছিল কথাগুলো যথোচিত অশ্রুসিক্ত করে বলতে পারলে জনের মন ঘুরে যাবে—রেশমীর নেশা কেটে যাবে তার। সঙ্গে সঙ্গে বিয়ের কথাটাও পাড়তে হবে। কয়েকটি সুন্দরী (নিজের চেয়ে নিকৃষ্ট) মেয়ের নামও স্থির করে রেখেছিল। জন যেমন নিষ্ক্রিয়—একেবারে থালায় সাজিয়ে এনে ওর মুখের কাছে না ধরলে ওর পক্ষে খাওয়া অসম্ভব। "ভ্রাতা-ভগ্নী-পুনর্মিলন" অথবা "রেশমী-পরাজয়" নাটকের মহড়া সম্পূর্ণ করে যখন প্রতি মুহূর্তে সে জনের প্রতীক্ষা করছে তখন জনের বদলে এল চাপরাসী। জন লিখছে বন্ধুদের অপ্রত্যাশিত তাগিদে এখনই তাকে সুন্দরবনে রওনা হতে হচ্ছে। শিকার সেরে ফিরতে দু-চার দিন দেরি হবে।

চিঠি পড়ে লিজা হতাশ হলেও দুঃখিত হল না ; ভাবল, ভালই হল, অন্তত ঐ দু-চার দিন রেশমীর প্রভাব থেকে দূরে থাকবে।

কিন্তু দিন-দুয়ের মধ্যেই আসল কথা প্রকাশিত হয়ে পড়ল। অফিসের মুন্সী আরদালির ভাবগতিক দেখে তার কেমন যেন সন্দেহ উপস্থিত হল। তখন সে একজন পুরনো কর্মচারীকে জেরা করে করে সত্য আবিষ্কার করে ফেলল। জন আর রেশমী দুই রাত অফিসে কাটিয়েছে—তৃতীয় দিন ভোরবেলা নৌকাযোগে দুজনে কোন্ দিকে চলে গিয়েছে। কোন্ দিকে কেউ জানে না—লিজাও জানতে পারল না।

তখনই সে ছুটে গিয়ে সংবাদটা দিল মেরিডিথকে।

মেরিডিথ বলল, এ মন্দর ভাল।

কেমন ?

বিয়ে করলে মেয়েটাকে স্বীকার করতেই হত।

আর এখন ?

যতদিন খুশি ভোগ করুক, আমরা স্বীকার করতে বাধ্য নই।

তুমি জান না ঐ ক্ষুদে শয়তানীকে, বিয়ে না হলে ও কখনও জনের অঙ্কগত হবে না।

লিজার কথায় মেরিডিথ হাসল।

হাসলে যে?

মেয়েদের প্রতিজ্ঞা বালির বাঁধ। ওরা মুখে যখন 'না' বলছে মনে তখন ওদের 'হাঁ'।

আমাকেও কি তুমি সেই দলের মনে কর নাকি!

তোমার কথা আলাদা, ডিয়ারি—এই বলে সে মুখ বাড়িয়ে দিল লিজার দিকে, লিজা সরিয়ে নিল মুখ।

মেরিডিথ হাসল।

হাসলে যে বড়?

আমার উক্তিটা স্মরণ করে—মেয়েরা মুখে যখন বলছে 'না' মনে তখন ওদের 'হাঁ'।

লিজা বলল, তুমি ভারি বেয়াদপ।

রাগ ক'র না, শোন। মেয়েটাকে নিয়ে দু-চার দিন থাক জন, তার পরে আশ মিটে গেলেই ফিরে আসবে।

লিজা হেসে বলল, তোমার অভিজ্ঞতা মানতে হয়।

হয় বই কি। তোমার ভগবানকে ধন্যবাদ দাও যে, বিপদ অল্পের উপর দিয়েই কেটে গেল।

মেরিডিথ সর্বদা 'তোমার ভগবান' বলে উল্লেখ করত লিজার কাছে।

লিজা হেসে বলল, আমার ভগবান কৃতার্থ হলেন তোমার মুখে তাঁর নাম শুনে।

রেশমী ও জনের পলায়নে লিজা বুঝল যে আবার পরাজয় হল লিজার। তবু মনটা খানিকটা হাল্কা হল মেরিডিথের কথা শুনে—নেশা অল্প দিনের মধ্যেই কেটে যাবে। যাক, তাই যাক, ভগবান—লিজা প্রার্থনা করে।

তখন সে ভাবতে পারে নি যে ওরা বিয়ের উদ্দেশ্যেই পলায়ন করেছে।

মেরিডিথ আরও বলে দিয়েছিল জন ফিরে এলে লিজা যেন রাগারাগি না করে, মাঝখানের এ কটা দিনে কিছুই যেন ঘটে নি এমন ভাবে যেন তাকে গ্রহণ করে। আর যাই হক, রেশমীর প্রসঙ্গ আদৌ যেন না তোলা হয়। লিজা তার যুক্তি স্বীকার করেছিল, বলেছিল, হাঁ, আমার মনে থাকবে, জনকে অকারণে কষ্ট দেব না।

সেইভাবেই মনটাকে প্রস্তুত করে সে ফিরে এল।

লিজা বাড়ি এসে দেখল যে সন্ধ্যার স্তিমিতপ্রদীপ ড্রয়িংরুমে জন বসে আছে।

জন এত শীঘ্র ফিরবে সে আশা করে নি। জনকে দেখে সে সত্যই খুশি হল।

জন, কখন ফিরলে?

এইমাত্র এসে পৌঁছেছি।

সব ভাল তো? তার পর, শিকার কেমন হল?

শিকার! জন চমকে ওঠে। সে যে শিকার করতে যাচ্ছে বলে জানিয়েছিল, এ কদিনের অভাবিত ঘটনায় সে প্রসঙ্গ ভুলেই গিয়েছিল। সে ভাবল রেশমীর পলায়নের কাহিনীটা নিশ্চয় লিজার কানে পৌঁছেছে—তাই সে ব্যঙ্গ করছে।

রুষ্ট জন কিছু উগ্রকণ্ঠে বলে উঠল, শিকার? এর মধ্যে শিকার এল কোত্থেকে?

তখনও তার মনে পড়ল না পূর্ব প্রসঙ্গ।

লিজা অবাক। রেশমীর কথা তুলবে না বলেই শিকারের কথা তুলেছিল, তাতে উল্টো ফল হল। তবু সে শান্তভাবে বলল, কেন তুমি শিকার করতে যাও নি?

পূর্ব-প্রসঙ্গ-বিস্মৃত জন বলল, নিতান্ত কদর্য তোমার পরিহাস।

কদর্য পরিহাস! এবারে লিজা সত্য সত্যই চটে গেল, ব্যঙ্গবাণ নিক্ষেপ করে বলল, কেন, শিকার ফস্কে গেল বুঝি?

লিজা, তোমার যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা!

আর শিকারটা তার চেয়েও বড়!

লিজা, অযথা অপমান ক'র না!

অপমান আমি করছি না তুমি করছ?

কাকে?

শুধু আমাকে নয়, বাপ-মাকে, শ্বেতাঙ্গ সমাজকে।

বিস্মিত জন শুধায়, কেমন করে?

তা-ই যদি বুঝবে, তবে এমন আচরণ করতে যাবে কেন?

কথার ধর্ম এই যে, নিজের তাপে উত্তাপিত হয়ে উঠে সীমানা ছাড়িয়ে যায়।

লিজা বলে চলল, তোমার মান-অপমান জ্ঞান থাকলে একটা বেহায়া নেটিভ ছুঁড়িকে নিয়ে পালাতে না!

সাবধান লিজা, আমার বাগ্‌দত্তা বধূ সে, অপমান ক'র না।

একশ বার করব—hussy! বেশ্যা!

জন চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠে বলল, আমার বাড়িতে যদি আমাকে এই অপমান সহ্য করতে হয়, তবে এমন বাড়ি ছেড়ে আমি চললাম।

যাও, গিয়ে দেখ, এতক্ষণ তোমার বাগ্‌দত্তা বধূ বড় শিকারীর অঙ্কগত হয়েছে।

নিঃশব্দে জন সশব্দে দরজা খুলে ফেলে প্রস্থান করল।

রাগের বেগ শান্ত না হওয়ায় প্রস্থিত জনকে লক্ষ্য করে রেশমীর পিতামাতা ও সমাজের উদ্দেশে যেসব কথা লিজা বলতে লাগল তার অনেকগুলোই স্বয়ং শেক্সপীয়রেরও ভাষা-জ্ঞানের অতীত।

রাত্রে একাকী শুয়ে লিজা ভাবতে লাগল—কোন সূচনার অকস্মাৎ এ কেমন উপসংহার হয়ে গেল!

এই অবোধ ভাইটিকে নিয়ে লিজার দুশ্চিন্তার অন্ত ছিল না। দুজনের বয়সে খুব বেশি প্রভেদ ছিল না, পিঠোপিঠি ওদের জন্ম। বাল্যকালে ওরা রাগারাগি মারামারি করেছে, যেমন পিঠোপিঠি ভাই-বোন করে, কিন্তু কৈশোরের প্রারম্ভে মায়ের মৃত্যু হতেই লিজা রাতারাতি হয়ে উঠল জনের অভিভাবক। সেই থেকে ওর দুশ্চিন্তার সূত্রপাত। তার পর বাপের মৃত্যুর পরে দায়িত্ব যখন আরও বেড়ে গেল—তখন এল এই অভাবিত ঘটনা। জনকে সস্নেহে গ্রহণ করবে বলেই ও এসেছিল, কিন্তু হঠাৎ মুহূর্তে ঘটে গেল বিপরীত কাণ্ড। লিজা শুয়ে শুয়ে ভাবে, কেন এমন হয়, মনে মুখে আচরণের এমন হেরফের ঘটে কেন? সে সঙ্কল্প করল, কাল সকালে গিয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করে জনকে ফিরিয়ে আনবে। ও জানত, জন অফিসবাড়ি ছাড়া আর কোথাও যাবে না।

জন বাড়ি থেকে বেরিয়ে সোজা অফিসে গিয়ে উঠল। বাপের আমলের বুড়ো মুন্সী কাদির আলী অফিসবাড়িতেই থাকত। সে সস্নেহে জন 'বাবা'কে অভ্যর্থনা করে নিল।

এতক্ষণ পরে একজনের স্নেহস্পর্শ পাওয়ায় অভিমানের বাষ্প অশ্রুতে নির্গত হওয়ার উপক্রম হল জনের চোখে। এই স্নেহস্পর্শটুকু পাবে আশা করেই সে এসেছিল লিজার কাছে।

কাদির আলী লোকমুখে সব ঘটনা শুনেছিল। সে জনকে সান্ত্বনা দিয়ে বলল, 'ডরো মৎ বাবা'—বলল যে, যেমন করেই হক, সে রেশমীবিবিকে খুঁজে বের করবে, এমন কি 'জিনে' হরণ করে নিলেও তাকে নিয়ে এসে হাজির করে দেবে জনের কাছে।

কাদির আলী বৃথা সান্ত্বনা দেয় নি, পরদিনই বিশ্বাসী লোক লাগিয়ে দিল রেশমী বিবির সন্ধানকার্যে।

৪
বিম্ববতী

সৌরভী, সৌরভী ওঠ, বেলা হয়েছে। রেশমী ডাক শুনে জেগে ওঠে। নূতন স্থান, নূতন মুখ এক লহমার জন্যে তার মনে বিভ্রান্তি ঘটায়, বুঝতে পারে না কোথায় এসেছে, সম্মুখে এ কে! পরক্ষণেই গত রাত্রির স্মৃতি মনে পড়ে যায়। বিভ্রান্তির ভাব অপরেও লক্ষ্য করছে ভেবে একবার অপ্রস্তুতের হাসি হাসে। তার পরেই বলে, এত বেলা হয়ে গিয়েছে, ডাক নি কেন দিদি?

টুশকি বলে, শেষ রাতে ঘুমিয়েছ। একবার ডাকতে এসে দেখলাম, অঘোরে ঘুমোচ্ছ; ভাবলাম, থাক্, আর একটু ঘুমোক।

তার পরে বলে, নাও ওঠ, মুখ ধুয়ে খেয়ে নাও, নিশ্চয় খুব খিদে পেয়েছে।

রেশমী সংক্ষেপে বলে, খু-ব।

তার পর হাত মুখ ধুয়ে পাশের ঘরে এসে খেতে বসে। দুধ চিঁড়ে কলার বাটিটা সম্মুখে এগিয়ে দিয়ে টুশকি বলে, নাও খেয়ে নাও।

রেশমী বলে, তুমি?

টুশকি বলে, আমি সকালে কিছু খাই নে।

সত্যি রেশমীর খুব খিদে পেয়েছিল, কাল দুপুরের পরে তার কিছু খাওয়া হয় নি। খেতে খেতে তার দুই চোখ জলে ভরে ওঠে, প্রবল আত্মসংযম সত্ত্বেও জল গড়িয়ে নামে গালে।

কাঁদছ কেন বোন? শুধায় টুশকি।

রেশমী কিছু লুকোনোর চেষ্টা করে না, সরলভাবে বলে, অনেকদিন এমন ভাবে কেউ খেতে দেয় নি, খেতে বলে নি।

এ কথার আর কি উত্তর সম্ভব! তাছাড়া টুশকি বুঝেছিল মেয়েটি অল্প-বয়সে অনেক দুঃখ পেয়েছে। সে চুপ করে থাকে। কিন্তু কিছু বলাও আবশ্যক। বলে, এখন খেয়ে নাও ভাই, পরে এক সময়ে তোমার সব কথা শুনব।

আরও একটা রাত কেটে গেছে রেশমীর এই নূতন আশ্রয়ে। সে আর টুশকি এক শয্যায় পাশাপাশি শোয়। সে বুঝতে পারে না এ কেমন গেরস্তালি! বাড়িতে কোন পুরুষ

নেই, অন্য কোন লোক নেই, মাঝখানে একটা ঠিকে ঝি এসে বাসনকোসন মেজে দিয়ে যায়। ঝি ও টুশকির কথোপকথনের টুকরো তার কানে গিয়েছিল বিকেল বেলায়।

এ মেয়েটি কে মা ?

আমার দূরসম্পর্কের বোন।

চেহারা দেখে আমারও তাই মনে হয়েছিল, কিন্তু আগে তো দেখি নি।

হ্যাঁ, এই প্রথম এল।

কিছুদিন থাকবে বুঝি ?

থাকবে না ! কলকাতা শহরে এসে দু-চার দিনে কে ফিরে যায় বল। এখানে কত দেখবার আছে।

তা থাকুক। বয়স হয়েছে দেখছি, বিয়ে হয় নি কেন ?

আমাদের কুলীনের ঘরে ঐ ধরন—বর জুটতে জুটতে বয়স বেড়ে যায়।

আর বিয়ে হলেই বা কি। বিয়ে করে স্বামীর ঘর করতে না পারলে বিয়ে করা না করা সমান। তোমার অবস্থা দেখে চোখের জল রাখতে পারি না মা।

প্রসঙ্গান্তর সূচনা করে টুশকি বলে, নে এখন হাতের কাজ কর।

টুশকির কথায় রেশমী একসঙ্গে কৃতজ্ঞতা ও করুণা অনুভব করে। রেশমীর নিজের অবস্থার সহজবোধ্য ব্যাখ্যা কৃতজ্ঞতার হেতু, আর করুণা অনুভব করে টুশকির জন্যে—আহা বেচারা, বিয়ের পরেও বাপের ঘর করছে—কুলীন বর কোথায় ঘুরে বেড়াচ্ছে—হয়তো আরও দশ গণ্ডা বিয়ে করেছে। হয়তো কালেভদ্রে একবার আসে—হয়তো তা-ও আসে না।

তার মনে পড়ে যায় গাঁয়ের মুক্তাদিদিকে। বিয়ের রাতের পরে আর বরের দেখা পায় নি সে। সারাটা জীবন কেটে গেল তার বাপের বাড়িতে। দাঁত পড়ে গেল, চুল পেকে গেল—এদিকে সিঁথির সিঁদুর সবচেয়ে চওড়া, সবচেয়ে লাল।

ছোট ছেলেমেয়েরা পরিহাস করলে বলত, আমার যে ঐ সিঁদুর ছাড়া কিছু নেই, তাই ওটাকে খুব করে চোখের সামনে চওড়া করে আঁকতে হয়।

মৃত্যুর কিছুকাল আগে সিঁথির সিঁদুর আরও চওড়া হয়ে উঠল—ছোট ছেলেমেয়েরা বলল, দিদিমা, সিঁদুর যে ক্রমেই চওড়া হয়ে উঠল।

মুক্তাদিদি বলত, প্রদীপের তেল ফুরিয়ে আসছে কিনা তাই উস্কিয়ে দিচ্ছি। কিন্তু এখানেই শেষ মনে করিস না, সিঁদুর একেবারে দাউ দাউ করে জ্বলে উঠবে চিতার আগুনে।

রেশমী ভাবে, কিন্তু এ কেমন হল, টুশকিদিদির সিঁথিতে সিঁদুর নেই কেন, কপালে সিঁদুর নেই কেন, হাতে এয়োতির চিহ্ন নেই কেন ?

ভাবে, হয়তো বরের মারা যাওয়ার সংবাদ পেয়েছে। কিন্তু তখনই মনে পড়ে, তাই বা কেমন করে সম্ভব ? পরনে তার পাড় দেওয়া শাড়ি, মাছ খায় পান খায়। সে ভেবে পায় না টুশকি সধবা না বিধবা না কুমারী ? তখনই মনে পড়ে, আমিই বা কি ? আমার অত বিচার করবার দরকারটাই বা কি ? ভাবে, ও আমাকে আশ্রয় না দিলে আমার এতক্ষণ কি দশা হত !

আসল কথা, দীর্ঘকাল পাদ্রীদের সঙ্গে থাকায় অনেকগুলো সংস্কারের সুতো তার মন থেকে ছিঁড়ে গিয়েছিল। নতুবা টুশকির অভিনব গেরস্তালি যে কি-ভাবে গ্রহণ করত বলা যায় না। কিন্তু আবার স্পষ্ট করে কিছু জিজ্ঞাসা করতেও সাহস হয় না তার।

পরিচয় জিজ্ঞাসা করতে গেলেই পরিচয় দেওয়ার দায়িত্ব এসে পড়ে, তাই চুপ করে থাকে।

রাতের বেলা এক পাশে শুয়ে রেশমী যখন এইরকম চিন্তা করে—আর এক পাশে শুয়ে টুশকির জিজ্ঞাসার ধারা ছোটে সমান্তরাল খাতে।

সে ভাবে, কে এই মেয়েটি ? গাঁয়ের নামধাম, ডাকাতে চুরি করে আনা সবই সম্ভব, কিন্তু তবু কেমন পুরোপুরি বিশ্বাস হতে চায় না। কেবলই মনে হতে থাকে কোথায় কি একটা যেন অনুক্ত রয়ে গিয়েছে। অথচ খোলাখুলি জিজ্ঞাসা করবারও সাহস নেই—নিজের সত্যকার পরিচয়টাও তো দেয় নি।

দিন দুই পরে রেশমী বলে, টুশকিদি, এখানে আর কতদিন থাকব ?

যাবেই বা কোথায় ভাই ?

গাঁয়ে ফিরে যাই।

একবার গাঁ থেকে যারা চুরি করে আনতে পারে দ্বিতীয়বারও সে কাজটা তাদের পক্ষে সম্ভব। তাছাড়া, তোমাদের গাঁ তো কাছে নয়।

তবে কি এখানেই থেকে যাব ?

ক্ষতি কি ?

চিরদিন আমাকে খাওয়াবে পরাবে ?

চিরদিন কে কাকে খাওয়ায় পরায় ? একটা বর খুঁজে বিয়ে দিয়ে দেব।

হাসতে হাসতে রেশমী বলে, তার মানে ডাকাতের হাতে তুলে দিতে চাও ?

টুশকি হেসে ওঠে, বলে, আচ্ছা, না হয় নাই দিলাম ডাকাতের হাতে। এখন থাক তো কিছুদিন, তার পরে সেথো পেলে পাঠিয়ে দেব গাঁয়ে।

টুশকি সত্যই সমস্যায় পড়েছে মেয়েটিকে নিয়ে। সে ভাবে, এই সময়ে কায়েৎ দা থাকলে একটা ব্যবস্থা হতে পারত। কিন্তু সে যে সেই শ্রীরামপুরে গিয়েছে আসবার নাম করে না। একদিন খোঁজ করল ন্যাড়ার, শুনল, কায়েৎদার ছেলেটিকে নিয়ে সে চলে গিয়েছে শ্রীরামপুরে। তখন ভাবল, এখন থাক এখানে, পরে যা হয় করা যাবে।

ওদিকে রেশমী মনে মনে ভেবে স্থির করল যে, জনের নামে একখানা চিঠি লিখে পাঠিয়ে দেবে অফিসের ঠিকানায়। সে নিশ্চয় জানত, জন কলকাতায় চলে এসেছে ; আরও জানত, জন নিশ্চয় সন্ধান করছে তার। কিন্তু পত্র লেখার অনেক বাধা। কাগজ-কলম কোথায় ? যদি বা কোথাও থাকে হঠাৎ চিঠি লিখতে বসলে টুশকির সন্দেহ জাগবে। তার পরে পাঠাবেই বা কাকে দিয়ে ? একবার ভাবল, নিজেই গিয়ে উপস্থিত হবে জনের অফিসে। কিন্তু টুশকিকে কি বলবে ? আর ভাবতেই শরীর শিউরে ওঠে, কাছাকাছি কোথাও যদি চণ্ডী বক্সীর দল থাকে ? সে ভাবত, আহা এই সময়ে একবার কায়েৎ দার দেখা পেলে সব দুশ্চিন্তার ভার তার হাতে সঁপে দিয়ে সে নিশ্চিন্ত হতে পারত। কিন্তু কোথায় কায়েৎ দা ? আর যদি বা কলকাতায় ফিরে আসে তবু তার দেখা পাওয়ার উপায় কি ? তখন ভাবে, যেমন চলেছে চলুক, দেখা যাক কি হয়।

তিন-চার বার সদ্য মৃত্যুর কবল থেকে বেঁচে গিয়ে ঘটনাচক্রে অভাবিত গতিবিধির উপরে তার বিশ্বাস বেড়ে গিয়েছিল।

এখানকার জীবন রেশমীর মন্দ লাগে না। এত অনিশ্চয়তার মধ্যে কেমন একটা আরাম ও স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করে সে। মনে পড়ে তার মদনাবাটির জীবন, মনে পড়ে কলকাতার সাহেবপাড়ার জীবন। সে-সব জায়গায় ছিল নিত্য নূতন অভিজ্ঞতার প্রেরণা,

মনটাকে রেখেছিল চঞ্চল করে, কখনো থিতোতে দেয় নি। সে-সব জায়গায় ছিল সে ঝরনা, এখানে হয়েছে নিভৃত একটি পল্বল। এতদিন ছিল সে গুণ-পরানো ধনুক, আঘাতেই শিরা-উপশিরায় টঙ্কার উঠত ; আজ ঘটনার হস্ত খুলে দিয়েছে গুণ, নীরবে, নিস্তেজে, আরামে পড়ে রয়েছে সে।

সকালবেলা উঠে টুশকির সঙ্গে গিয়ে সে গঙ্গায় স্নান করে আসে, তার পরে সারাদিন তার সঙ্গে মিলে বাড়ির কাজকর্ম করে।

টুশকি বলে, আবার তুমি এলে কেন সৌরভী ?

রেশমী বলে, চুপ করে কি বসে থাকা যায়, হাতে পায়ে যে মরচে ধরে যাবে।

না ভাই, তুমি কষ্ট ক'র না, কতটুকুই বা কাজ !

এতটুকু কাজে আর কষ্ট কোথায়, উত্তর দেয় রেশমী।

না না, তুমি দুদিনের জন্য এসেছ। এর পরে বলবে, দুদিনের জন্য গিয়েছিলাম দিদির বাড়িতে, একদণ্ড বসবার সময় পাই নি।

তখন কি বলব তা তো শুনতে যাবে না, তবে ভয় কি ! তাছাড়া দুদিনের জন্য এসেছি তাই বা কে বলল !

মুখে কথা চলে, সঙ্গে সঙ্গে হাত চলে। টুশকি কিছুতেই কাজ করতে দেবে না— রেশমী কাজ করবেই।

গৃহকার্যে মেয়েরা ব্যক্তিত্ব-বিকাশের সুযোগ পায়, তাই নিতান্ত শ্রমসাধ্য হলেও তারা নিরস্ত হতে চায় না।

দুপুরে খাওয়ার পরে দুজনে সেলাই করতে বসে। টুশকি বলে, তুমি এমন সুন্দর সেলাই করতে শিখলে কোথায় ? এসব তো দেশী নক্সা নয় ?

টুশকি ধরেছে ঠিক—রেশমী বিদেশী ফুল বিদেশী নক্‌শা তোলা শিখেছিল মদনাবাটি থাকতে মিসেস কেরীর কাছে।

সে কথা তো বলা যায় না, বলে, দেশী কি বিদেশী কে জানে ! যা মনে আসে তুলে যাই।

অপরাহ্নে একবার দুজনে যায় গঙ্গার ঘাটে। কত লোকের ভিড়। কেউ স্নান করছে, কেউ কাপড় কাচছে, কেউ সন্ধ্যাহ্নিক করছে, আর কেউ বা শুধু শুধুই ঘুরে বেড়াচ্ছে। ঘাটে কত রকমের নৌকা, কোনটা বোঝাই, কোনটা বোঝাই হচ্ছে, কোনটা খালাস হচ্ছে, কোনটা খালি। উজান-ভাঁটিতে নৌকার যাতায়াতের আর অন্ত নেই। তীরে আর জলে, লোকে আর নৌকায় এ এক চিরন্তন মেলা। কিছুক্ষণ পরে ওপার যখন ঝাপসা হয়ে আসে, আকাশের আলো যখন ঝিমিয়ে আসে, দুজনে চলে যায় মদনমোহনের মন্দিরে আরতি দেখতে।

যেদিন কোন কারণে টুশকি সঙ্গে আসতে পারে না, ও একাই আসে গঙ্গার ধাবে।

একা যাব তো দিদি ?

যাও না ভাই, ভয় নেই।

ভয় নেই জানি, তবু একবার জিজ্ঞাসা করতে হয়।

টুশকি বলে, তাড়াতাড়ি ফিরে এস, তার পরে দুজনে মদনমোহনের বাড়িতে যাব, ততক্ষণে আমার কাজটুকু হয়ে যাবে।

রাতের বেলা দুজনে পাশাপাশি শুয়ে গা বাঁচিয়ে জীবনকথা বলে যায়। দুজনেই

বোঝে, অপর পক্ষ কিছু চাপছে, কিন্তু খুঁটিয়ে জিজ্ঞাসা করতে সাহস হয় না, নিজেও তো কিছু চেপে যাচ্ছে।

তার পরে কখন একই ঘুমের প্রলেপে দুজনের চৈতন্য যায় তলিয়ে। এমনিভাবে চলে ওদের জীবন।

একদিন হঠাৎ দুজনে চমকে ওঠে একসঙ্গে।

বিকেলে গঙ্গায় যাওয়ার আগে আয়নার সম্মুখে দাঁড়িয়ে রেশমী চুল বাঁধছিল। টুশকির ঘরে বড় মাপের একখানি আয়না ছিল। এমন সময় তার মধ্যে ভেসে উঠল আর একখানি মুখ, দুখানি মুখ অবিকল এক ছাঁচে ঢালা। দুজনে একসঙ্গে চমকে ওঠে, চমকটুকু ধরা পড়ে স্বচ্ছ কাঁচে—সেইটুকুর ভঙ্গী অবধি এক ছাঁচের। এক মুহূর্ত কেউ কথা বলতে পারে না। অবশেষে রেশমী বলে, চমকে উঠলে কেন টুশকিদিদি ?

তুমিও তো চমকালে সৌরভী !

তার পরে টুশকি বলে, আমার ঝি রাধারাণী তোমাকে দেখে এমনি চমকে উঠেছিল ; শুধিয়েছিল, মেয়েটি তোমার কে হয় দিদি ? আমি বললাম বোন। সে হেসে বলল, আমি দেখেই বুঝেছি, মুখ ঠিক একরকম।

রেশমী বলে, কথাটা আমাকেও সে বলেছে, কিন্তু আজকের আগে বুঝতে পারি নি, তোমার মুখের সঙ্গে আমার কত মিল।

তার পরে বলে, ছায়া দেখে হঠাৎ মনে হল, আমার দিদি যেন পাশে এসে দাঁড়াল।

তোমার কি দিদি ছিল ?

শুনেছি ছিল, মনে পড়ে না, আমার জ্ঞান হওয়ার আগে মারা গিয়েছিল। দিদিমাকে বলতে শুনেছি, দুজনের চেহারায় নাকি খুব মিল ছিল। হঠাৎ মনে হল, সেই অশরীরী এসে ছায়া নিক্ষেপ করেছে আয়নায়।

টুশকি যেন কি বলতে চায়, কি বলবে ভেবে পায় না। রেশমী যেন কি মনে করতে চায়, কিছু মনে আসে না তার। দুজনেরই মনের তলায় স্মৃতির অগোচরে কি যেন একটা রহস্য চাপা আছে ; আছে সুনিশ্চিত, তবু মনে পড়তে চায় না। জলের নীচে পড়ে আছে বিচিত্র উপলখণ্ড, হাত যতই বাড়িয়ে দেওয়া যাক, নাগালের বাইরে থেকেই যায়। ঐ, আর একটুখানি বাড়ালেই পাওয়া যাবে। নাঃ, তবু ধরা দেয় না হাতে, অথচ ঐ যে ঝলমল করছে।

সেদিন দুজনে পাশাপাশি শুয়ে স্মৃতির সুড়ঙ্গ-পথে ঢুকে পড়ল—দুজনেই বিম্ববতীর রহস্য সন্ধানের নীরব অভিযাত্রী। দুজনেই নীরবে ভাবে, আহা, ও যদি আমার বোন হত।

৫
পুলিসের পরওয়ানা

মোতি রায় যেমন ধনবান, তেমনি বুদ্ধিমান। কখনও কখনও ও দুই গুণ একসঙ্গে দেখা যায়। রেশমী-হরণের ব্যাপারটাকে সে গড়ে-পিটে নিজের সুবিধামত তৈরী করে নিল। তার পক্ষে নারী দুর্লভ নয়, রেশমীর মত সামান্য একটা নারীর অভাব অনায়াসে পূরণ করে নিতে পারত। কিন্তু সেজন্য নয়, অন্য কারণে রেশমীর উদ্ধার আবশ্যক। তার অভীষ্ট শিকার পালিয়েছে বা অন্য কেউ ছিনিয়ে নিয়েছে—এ তার সামাজিক মর্যাদার পক্ষে হানিকর। ইতিমধ্যেই তার জ্ঞাতিভ্রাতা শরিক মাধব রায় ঘটনাকে ফলাও করে প্রচার করতে লেগে গিয়েছে। তাদের লোকে বলে বেড়াচ্ছে, আমাদের আয়ান ঘোষের এবারে বড় বিপদ, সাধের রাধিকাকে কলির কেষ্ট হরণ করে নিয়ে গিয়েছে। আয়ান ঘোষ এখন গলায় দেবার মত দড়ি কলসী খুঁজে মরছে।

মাধব রায়ের লোকে শুধু তিলকে তাল করে রটিয়েই ক্ষান্ত হল না, ঘটনার তাল রক্ষাতেও মনোযোগ দিল। একদিন সকালবেলায় মোতি রায়ের বৈঠকখানার সম্মুখে দড়ি ও কলসী আবিষ্কৃত হল। কলসীর গায়ে আলকাতরায় লেখা—"এই যে আমরা এসেছি, এবারে চল তোমাকে নিয়ে গঙ্গায় যাই।"

মোতি রায় শ্রীরামপুরে লোক পাঠিয়ে খবর নিল। হাঁ, সেখানে কেরী, টমাস, ওয়ার্ড, মার্শম্যান, ফেলিক্স নামে একদল পাদ্রী আছে, আর আছে জন, সঙ্গে রামরাম বসু।

এবারে মোতি রায় মামলা সাজাতে লেগে গেল। সে বুঝল, কেরী ও টমাসকে আসামী করা চলবে না, তারা অনেকদিন এদেশে আছে, কলকাতার শ্বেতাঙ্গ সমাজে তারা পরিচিত, তাদের আসামী করতে সমর্থন পাওয়া যাবে না, তাই তাদের নাম বাদ দেওয়া হল, জনের নামও ঐ কারণে বাদ পড়ল। রাম বসু বাঙালী, সামান্য লোক, সে যে মোতি রায়ের বিরুদ্ধতা করেছে, একথা স্বীকার করায় লজ্জা আছে—তাই রাম বসুও আসামী শ্রেণীভুক্ত হল না। আসামী দাঁড় করানো হল ওয়ার্ড ও মার্শম্যানকে, আর তাদের কল্পিত পাইকদের।

আসামীর নাম স্থির হলে ঘটনা স্থির হতে বিলম্ব হল না। চণ্ডী বক্সী রেশমী আর দিদিমাকে নিয়ে গঙ্গাস্নানে এসেছিল। এমন সময়ে গঙ্গার ঘাট থেকে পাইক বরকন্দাজের সহায়তায় মার্শম্যান আর ওয়ার্ড সাহেব মেয়েটিকে নিয়ে নৌকাযোগে পালিয়ে যায়। ঘটনার সাক্ষীর অভাব নেই—এক ঘাট লোক ব্যাপারটা দেখেছে। বলা বাহুল্য সাক্ষী বলে যাদের উল্লেখ করা হল, তারা সবাই মোতি রায়ের নিজ লোক।

ঘটনা এইভাবে সাজিয়ে নিয়ে মোতি রায়ের দেওয়ান রতন সরকার অভিযোগকারী চণ্ডী বক্সীকে নিয়ে কলকাতায় পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট স্পোকার সাহেবের কুঠিতে গিয়ে উপস্থিত হল।

রতন সরকার সাহেবকে বুঝিয়ে দিল যে, চণ্ডী বক্সীকেই অভিযোগকারী বলে ধরতে হবে, কারণ অপহৃত বালিকার দিদিমা পর্দানশীন জেনানা। সমস্ত অবস্থা নিবেদন করে সে প্রার্থনা করল যে, সাহেবদের গ্রেপ্তারের জন্য এবং মেয়েটির উদ্ধারের জন্য পরোয়ানা

বের করতে এখনই আজ্ঞা হক।

তার পর সে আরও বলল যে, হুজুর, আমার মনিব মোতি রায় বাবুজী হিন্দু সমাজের প্রধান—তাঁর কর্তব্য হিন্দুদের ধর্মরক্ষা ও প্রাণরক্ষা করা। তাই তিনি অভিযোগকারীকে নিয়ে আপনার কাছে আসতে বললেন।

এখন, অভিযোগকারীর পিছনে মোতি রায় থাকাতে অভিযোগের গুরুত্ব শতগুণ বেড়ে গেল। অভিযোগকারী সামান্য লোক হলে আর আসামী শ্বেতাঙ্গ হলে কি ফল হত কে জানে, হয়ত উল্টো ফল হত।

স্পোকার বলল, মার্শম্যান আর ওয়ার্ডকে তো কোম্পানির মুল্লুকে আসতে নিষেধ করে দেওয়া হয়েছে। সুযোগ বুঝে রতন সরকার বলল, তবেই দেখুন হুজুর, পাদ্রীদের সাহস কত বেড়ে উঠেছে।

সাহেব অর্ধব্যক্ত গর্জন করল, হুম্।

তাও আবার দিনের বেলায়!

সাহেব পুনরায় গর্জন করল, হুম্।

রতন সরকার আশ্বাস পেয়ে বলল, তাও কিনা আবার হোলি মাদার গ্যাঞ্জেসে রিলিজিয়াস বেদিং-এর সময়ে—

সাহেব মুখের চুরুট রেখে দিয়ে বলল, মোতি বাবুজীকে আমার সম্ভাষণ জানিয়ে ব'ল যে, আমি যত শীঘ্র সম্ভব ব্যবস্থা অবলম্বন করছি।

রতন সরকার সেলাম করে বিদায় নিল। এতক্ষণ চণ্ডী বক্সী নীরবে দাঁড়িয়ে মোতি রায়ের প্রভাব প্রত্যক্ষ করে ক্রমেই অধিকতর বিস্মিত হচ্ছিল, সে বুঝে নিল যে সাহেব সত্য ও ঘটনাক্রম মোতি রায়ের হাতধরা।

রতন সরকার আগের দিনে এসে স্পোকারকে অনেক টাকা খাইয়ে গিয়েছিল।

মোতি রায় চারদিক রক্ষা করে অগ্রসর হতে জানে। সে জানত যে, অভিযোগকারীদের নিজের হাতের মধ্যে রাখা দরকার, নতুবা তারা বিগ্‌ড়ে বসলে সব মাটি হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা।

বাসস্থানে সুবিধা করে দিচ্ছি অজুহাতে মোতি রায় চণ্ডী বক্সী ও মোক্ষদাকে নিজের একটা বাড়িতে এনে তুলল। কার্যত তারা নজরবন্দী হয়ে পড়ল। গতিক মন্দ দেখে মৃত্যুঞ্জয় আগেই সরে পড়েছিল।

সেদিন বিকালবেলায় গঙ্গার ধারে রেশমী একা গিয়েছিল, 'হাতের কাজটুকু সেরে নিই' অজুহাতে টুশকি বাড়িতে ছিল।

সে বলল, সৌরভী, তুমি ঘুরে এস, এই তো এখানে, ভয় কি।

রেশমী বলল, ভয় আবার কি।

তাহলে যাও, শীগগির করে ফিরে এসো।

রেশমী বসে বসে গঙ্গায় নৌকা যাতায়াত দেখছিল, যেমন নিত্য দেখে থাকে। এমন সময়ে রাস্তার উপরে ঢোলের শব্দ শুনে ফিরে তাকাল। দেখল সে, জনকয়েক কোম্পানির পুলিস, সঙ্গে একটা ঢুলী—আর পিছনে জুটে গিয়েছে একদল লোক। ঢুলীটা মাঝে মাঝে ঢোলে বাড়ি দিচ্ছে আর তার পরে কি যেন আউড়ে যাচ্ছে।

রেশমী আবার গঙ্গার দিকে মন দিল। কিন্তু কানের খানিকটা মনোযোগ পড়ে রইল

পিছনের দিকে। হঠাৎ কানে এত তার নামটা। সে কান খাড়া করে উঠল। এবারে সবটা শুনতে পেল। ঢুলীর আবৃত্তি শুনে তার মুখ শুকিয়ে গেল, হাত-পা কাঁপতে লাগল, মনে হল কাছাকাছি সমস্ত লোক সন্দেহের সঙ্গে তার দিকেই তাকাচ্ছে। কি করা উচিত, সে স্থির করতে পারল না। ঢুলীরা একটু দূরে যেতেই সে উঠে পড়ল, প্রথমে কিছুটা ধীরপদে চলে অবশেষে প্রায় ছুটতে ছুটতে বাড়িতে এসে পৌঁছল। তখনও সে হাঁপাচ্ছিল।

টুশকি শুধাল, হাঁপাচ্ছ কেন ভাই?

একটা ষাঁড়ে তাড়া করেছিল।

যা বলেছ ভাই, মহারাজ নবকৃষ্টের বৃষোৎসর্গের ষাঁড়গুলোর জ্বালায় কলকাতার পথেঘাটে চলা কঠিন হয়ে পড়েছে।

তার পরে বলল, মদনমোহনতলায় যাবে না? আরতির সময় হল যে?

রেশমী বলল, আমার শরীরটা ভাল নেই, তুমিই যাও।

রাতে সে ভাল করে খেল না। তন্দ্রার মধ্যে কেবলই ঢোলের শব্দের সঙ্গে শুনতে পায়, 'রেশমী নামে একটি মেয়েকে উদ্ধার করে দিতে পারলে পাঁচ শ সিক্কা টাকা বকশিশ।' স্বপ্নের মধ্যে দেখে—তাকে যেন বেঁধে নিয়ে চলেছে, আগে আগে মোতি রায়, পিছে পিছে চণ্ডী বক্সী, দূরে জ্বলছে চিতার আগুন। আর জেগে উঠলে রাস্তার প্রত্যেক পদধ্বনিকে নিদারুণ অর্থপূর্ণ বলে মনে হয়। এইভাবে স্বপ্ন, তন্দ্রা ও জাগরণের টানা-হ্যাঁচড়ায় তার রাত্রির প্রহরগুলো কাটে। সে এক সময়ে নিজের অগোচরে বলে ওঠে—মদনমোহন, রক্ষা কর আমাকে!

অনেককাল পরে দেবতার নাম উচ্চারণ করবার সঙ্গে সঙ্গে তার দুই চোখে নামল অতর্কিত জলের ধারা। রাতটা কেটে যায়।

৬
মোতি রায়ের জাল-নিক্ষেপ

পরদিন ভোরবেলা অন্ধকার থাকতে রেশমী ও টুশকি নিয়মিত সময়ে গঙ্গাস্নান করে এল। অন্যদিন তার পরে কিছুক্ষণ সংসারের কাজ করে দুজনে বাজারে যেত। আজ টুশকিকে একাকী যেতে হল, রেশমী কিছুতেই গেল না, বলল, শরীরটা তেমন ভাল নেই।

বিকালবেলায় দুজনে কিছুক্ষণের জন্য গঙ্গার ঘাটে গিয়ে বসত, রেশমী ঐ শরীর খারাপের অজুহাতে গেল না দেখে টুশকিও গেল না। অবশ্য সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে এলে নিয়মিতভাবে দুজনে মদনমোহনতলায় গেল। সেখানে গিয়েও অন্য দিনের মত রেশমী আরতিদর্শনে মন দিতে পারল না, ভিড়ের মধ্যে মিশে গিয়ে নীরবে দাঁড়িয়ে রইল। তার সারাদিনের শঙ্কিত ভাব টুশকির চোখ এড়াল না, বাড়ি ফিরে এসে জিজ্ঞাসা করল, সৌরভী, সত্যি করে বল তো ব্যাপার কি! আজ সারাদিন অমন মন-মরা হয়ে আছ কেন?

রেশমী বলল, এখন থাক, শোবার পরে বলব।

যথাসময়ে শয্যায় এসে টুশকি শুধাল, এবারে বল তো বোন, কি হয়েছে?

রেশমী পুলিসের ঢোল-শোহরতের সংবাদটা চেপে গেল—কারণ সেটা প্রকাশ করতে গেলে অনেক কথা প্রকাশ করতে হয়—নিজের প্রকৃত পরিচয় দিতে সে নারাজ। অথচ টুশকিকে তার ভয়ের অংশ না দিলেই বা চলে কি করে? তাই খানিকটা হাতে রেখে বলল—দিদি, কালকে বিকেলে যখন গঙ্গার ঘাটে বসে ছিলাম, তাদের একজনকে দেখলাম।

টুশকি শুধাল, কাদের একজনকে?

সেই যারা আমাকে চুরি করে এনেছিল।

বল কি!

তার পরে শুধায়, সে লোকটা কি তোমাকে দেখেছিল?

আমি ভিড়ের মধ্যে ছিলাম, দেখে নি বলেই মনে হয়। কিন্তু লোকটা এখনও কাছেই ঘোরাফেরা করছে—তাই ঠিক করেছি দিনের বেলায় আর বের হব না।

তখন টুশকি বলল, এখান থেকে চোরে তোমাকে ধরে নিয়ে যেতে পারবে না।

কেন?

কেন কি! এ যে কোম্পানির রাজত্ব—ধরা পড়লে তার ঘাড়ে কি মাথা থাকবে নাকি?

রেশমী মুখে বলে, যাক, তবে ভয় নেই, কিন্তু মনে মনে ভয় কিছুমাত্র কমে না, কেননা কোম্পানির পুলিসকেই তো সে দেখেছে ঢোল-শোহরতে তার সন্ধান করতে।

টুশকি বলে, তবু না হয় কিছুদিন দিনের বেলায় নাই বের হলে।

আমিও তাই স্থির করেছি দিদি, সকালবেলায় অন্ধকার থাকতে গঙ্গাস্নান সেরে আসব, আর সন্ধ্যার অন্ধকারে মদনমোহনের বাড়িতে গিয়ে আরতি দেখে আসব।

তার পরে শুধায়, আচ্ছা দিদি, মোতি রায় লোকটা কে?

চমকে উঠে টুশকি বলে, মোতি রায়ের নাম জানলে কি করে?

রেশমী বলে, আগে লোকটার পরিচয় দাও, তার পরে সে-কথা বলছি।

মোতি রায় এ পাড়ার মস্ত জমিদার। তার জন্যে পাড়ার ঝি-বউ-এর আত্মসম্মান নিয়ে বসবাস করা কঠিন।

সরলা রেশমী শুধায়, কোম্পানির রাজত্বেও কি এমন সম্ভব?

টাকায় কি অসম্ভব বল? পুলিস ম্যাজিস্ট্রেট সব মোতি রায়ের মুঠোর মধ্যে।

মোতি রায়ের পরিচয় শুনে রেশমীর রক্ত জমে যাওয়ার উপক্রম হয়। সে চুপ করে থাকে।

এবারে টুশকি বলে, কিন্তু তার পরিচয়ে তোমার হঠাৎ দরকার পড়ল কেন?

রেশমী বলে, ওরা যখন আমাকে চুরি করে আনছিল, আমি ঘুমিয়ে পড়েছি মনে করে নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলছিল।

কি কথা?

মোতি রায়ের বাগানবাড়িতে নিয়ে যাবে বলেই ওরা আমাকে নিয়ে আসছে।

টুশকি সংক্ষেপে বলে, সর্বনাশ!

সর্বনাশ তো মোতি রায়ের, বল্লে রেশমী।

কি রকম?

আমি তো পালিয়েছি।

আরে ওর যে পুলিসের সঙ্গে যোগাযোগ।

হক না যোগাযোগ। আমি তো আছি তোমার বাড়ির মধ্যে, খবর রাখবে কে?

খবর রাখাই যে পুলিসের কাজ।

পুলিস কি বাড়ির মধ্যে থেকে ধরে নিয়ে যাবে?

না, সে কাজটা করবে মোতি রায়ের পাইকেরা।

আর পুলিসে?

পুলিসে দেখবে কেউ যেন তাদের বাধা না দেয়।

তবে কোম্পানির পুলিসে আর নবাবের পুলিসে তফাৎ কি হল?

নবাবের পুলিস নিজেরা টেনে নিয়ে যেত—এরা সেটুকু করে না।

তবে বলে যে, এ রাজত্ব কোম্পানির নয়, মোতি রায়ের।

টুশকি বলে, রাজত্ব চিরকালই তাদের।

কাদের?

যাদের টাকা আছে।

এর পর আর তর্ক সম্ভব নয়, তাই প্রসঙ্গ পালটিয়ে নিয়ে রেশমী শুরু করে, কিন্তু খুব সন্তর্পণে, আচ্ছা দিদি, কালকে ঘাটে লোকে বলাবলি করছিল যে, কোম্পানির পুলিস নাকি কাকে খুঁজে পাওয়ার জন্যে ঢোল-শোহরত দিচ্ছে।

উদাসীনভাবে টুশকি বলে, এমন তো প্রায়ই দিয়ে থাকে।

তুমি কিছু শোন নি?

কত আর শুনব—ও-সব আমাদের গা-সওয়া হয়ে গিয়েছে।

রেশমী নিশ্চিন্ত হয়, অন্তত তার প্রকৃত নামটা টুশকির কানে পৌঁছয় নি। কিন্তু তখনই দ্বিগুণ ভয় জাগিয়ে তোলে মোতি রায়ের প্রকৃত পরিচয়। পুলিসের সঙ্গে তার যোগাযোগের সংবাদ শুনে এবারে মনে হল, খুব সম্ভব মোতি রায়ের হাতে সমর্পণ করবার উদ্দেশ্যেই পুলিসের লোকে তার সন্ধান করছে।

সে দেখল টুশকি ঘুমিয়ে পড়েছে, তারও ইচ্ছা ঘুম আসে, ঘুম এলে আপাত-দুশ্চিন্তা থেকে বাঁচা যায। কিন্তু ঘুম আর আসে না।

টুশকি নেহাত মিথ্যা বলে নি। মোতি রায়ের অসীম প্রতাপ। পুলিসের সঙ্গে যোগাযোগ সে প্রতাপ রাজকীয় সর্বশক্তিমত্তায় পৌঁছেছিল। পুলিস যার বশংবদ, নাম তার যাই হক, কার্যত সে ছাড়া আর কি। কিন্তু পুলিসের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা থাকাতেই মোতি রায় জানত পুলিসের দৌড়। পুলিসে মেয়েটিকে খুঁজে এনে তার হাতে দেবে এমন ভরসা তার ছিল না। তবু সে পুলিসে খবর দিয়েছিল, তার বিশেষ কারণ আছে। সে জানত যে ব্যাপারটার মধ্যে কয়েকজন শ্বেতাঙ্গ জড়িত আছে। এখন ব্যাপারটা পুলিসের কানে উঠেছে জানলে পুলিসের সন্দেহভাজন পাদ্রীরা সতর্ক হয়ে যাবে, মেয়েটিকে উদ্ধার করতে আর চেষ্টা করবে না, এই ভরসাতেই মোতি রায় গিয়েছিল পুলিসের কাছে। সে বুঝে নিয়েছিল যে, এবারে পাদ্রীদের আক্রমণের আশঙ্কা আর নেই। এটুকুই আশা করেছিল সে পুলিসের কাছে। নতুবা পুলিসের অপদার্থতা সম্বন্ধে তার কোন মোহ থাকবার কথা নয়—পুলিসের বড় সাহেবের মুখের উপর দুই বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে যে সে জীবনযাপন করে! মেয়েটিকে খুঁজে বার করবার ভার নিল সে নিজে।

যে চারজন পাইক আটজন মাঝি রেশমী-হরণ করে আনতে গিয়েছিল, তাদের ডাকিয়ে মোতি রায় বলল, তোরা তো দেখেছিলি মেয়েটিকে?

সকলেই স্বীকার করল, দেখেছি বই কি কর্তা।

এখন দেখলে চিনতে পারবি ?

তা আর পারব না ! কর্তা যে কি বলেন !

তখন মোতি রায় ঢালাও হুকুম দিল, তবে তোরা মেয়েটাকে খুঁজে বার কর। যেখানে পাবি সোজা নিয়ে যাবি কাশীপুরের বাগানবাড়িতে।

তাদের ইতস্তত ভাব লক্ষ্য করে বলল, না না, থানা পুলিসের ভয় তোদের করতে হবে না। সে-সব আমি ঠিক করে রেখেছি।

তার পরে তাদের উৎসাহের মূলে জল-সিঞ্চন করে বলল, মেয়েটাকে খুঁজে আনতে পারলে একশ টাকা বকশিশ পাবি।

তারা মস্ত সেলাম বাজিয়ে প্রস্থান করল।

সত্য কথা বলতে কি, তারা এখন রেশমীকে দেখলে চিনতে পারত কি না সন্দেহ, রাত্রির অন্ধকারে তাকে দেখেছিল। কিন্তু তারা ভাবল অত খুঁটিয়ে বিচার করতে গেলে নগদ একশ টাকা বকশিশ পাওয়া সম্ভব হয় না। তারা স্থির করল, ঐ বয়সের মেয়ে পেলেই নিয়ে হাজির করবে বাগানবাড়িতে, তার পরে সে ছুঁড়ি রেশমী কি সাদা সুতো বিচার করবে বক্সী মশাই। বিশল্যকরণী যদি খুঁজে না পাওয়া যায়, গন্ধমাদন নিয়ে যেতে বাধা কি ?

মোতি রায় চণ্ডী বক্সীকে প্রহরাধীনে বাগানবাড়িতে রেখে দিয়েছিল ; বলে দিয়েছিল, আমার লোকে মেয়ে খুঁজে নিয়ে আসবে, তুমি সনাক্ত করবে তাদের মধ্যে কোন্‌টি তোমাদের মেয়ে।

চণ্ডীকে স্বীকার করতে হয়েছিল, কারণ সে এই কদিনেই বুঝেছে যে, সে এখন নজরবন্দী—অস্বীকার করলে কি হবে, সে বিষয়ে তার কোন ভ্রান্ত ধারণা ছিল না।

মোতি রায়ের লোকের উপদ্রবে পাড়ার কচি বয়সের ঝি-বউ-এর পথেঘাটে বের হওয়া অসম্ভব হয়ে পড়ল।

এমন না করে মোতি রায়ের উপায় ছিল না। সেকালে কামিনী-কাঞ্চনের তৌলে কৌলীন্য বিচার হত। মহারাজা নবকৃষ্ণ বাহাদুর মাতৃশ্রাদ্ধে নয় লক্ষ টাকা খরচ করেছিলেন, সে কেবল মাতৃভক্তির প্রেরণায় নিশ্চয় নয়। ওটা ছিল তখনকার দিনে ধনের বিজ্ঞাপন। তেমনি বিজ্ঞাপনের আর একটা উপায় ছিল রক্ষিতার সংখ্যা ও কদর। ওর মধ্যে গোপনীয়তা কিছু ছিল না—অপ্রকাশ্যের প্রকাশ্যে যাচাই করে ধনীর মর্যাদা স্থির হত। মোতি রায়ের কামিনী-কাঞ্চনের যুগল-অশ্ববাহিত রথ হঠাৎ হুঁচোট খেল রেশমী-হরণ ব্যাপারে, ছিটকে পড়ল মোতি রায় পথের উপরে, গায়ে এসে লাগল নিন্দার কর্দম।

সেদিন সকালে দেউড়ির সামনে দড়ি ও কলসী দেখে মোতি রায় বুঝল যে, এ হচ্ছে মাধব রায়ের লোকের কাজ। তখনই সে লোক দিয়ে দড়িকলসী জলে ভাসিয়ে দিল। কিন্তু সংসারে তো দড়ি-কলসী একটিমাত্র নয়—প্রতিদিন সকালে ঐ দুটি বস্তু একযোগে তার দেউড়িতে আবিষ্কৃত হতে লাগল। একদিন সকালে মাধব রায়ের লোকেদের দড়ি-কলসী রাখতে দেখে মোতি রায়ের লোকেরা তাদের মাথা ন্যাড়া করে খেদিয়ে দিল। বিকালবেলায় মাধব রায়ের দল সঙ বের করল। একটা লোককে মোতি রায়ের মত সাজিয়েছে, তার গলায় দড়ি-কলসী বাঁধা—আর সকলে খোল করতাল বাজিয়ে কীর্তন করতে করতে লোকটাকে নিয়ে চলেছে গঙ্গায়। সঙের দল মোতি রায়ের দেউড়ির

সম্মুখে আসতেই তার লোকজন লাঠিসোঁঠা নিয়ে পড়ল সঙের দলের উপরে। দুই পক্ষে অনেকগুলো মাথা ফাটল। এই রকম নিত্য নূতন উপদ্রবে পাড়ার শান্তি পাড়া ত্যাগ করল—কিন্তু কারও আপত্তি করবার উপায় নেই। শান্তিকামী লোক দুই পক্ষের লাঠির লক্ষ্য।

ওদিকে বাগানবাড়িতে নূতন করে রঙ আর সাজসজ্জা শুরু হয়ে গেল। মোতি রায়ের ইচ্ছা রেশমীকে পেলে জাঁকজমকের সঙ্গে নাচগানের ব্যবস্থা করবে, যাতে সবাই জানতে পারে যে, মোতি রায়ের সম্মান পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু রেশমী কোথায়?

মোতি রায়ের পাইকেরা যে মেয়েকেই ধরে আনে, চণ্ডী বলে, না, এ আমাদের মেয়ে নয়।

অবশেষে পাইকেরা গেল চণ্ডীর উপরে চটে। তারা বলল, বক্সী মশাই, অত বাছবিচারে কাজ কি? যে-কোন একটা মেয়েকে তোমাদের মেয়ে বলে স্বীকার করে নাও না। তারা বলল, তোমাদের মেয়েরও জাত বাঁচুক, আমরাও ইনাম পাই।

চণ্ডী জিভ কেটে বলল, কি সর্বনাশ! আমার মুখে মিথ্যা বের হবে না!

সংসারে অষ্টমাশ্চর্যের একটি হচ্ছে এই যে, সময়বিশেষে অত্যন্ত মিথ্যাবাদী লোকের মুখেও একটি মিথ্যা বের হতে চায় না।

পাইকেরা গিয়ে মোতি রায়কে বলল, হুজুর, বক্সী মশাই বড় সোজা লোক নয়।

কেন?

নিজেদের মেয়েদের জাত বাঁচাবার আশায় মেয়ে সনাক্ত করতে চাইছে না, নইলে আমাদের চেষ্টায় ত্রুটি নেই।

মোতি রায় গর্জন করে উঠল, কি, যত বড় মুখ নয় তত বড কথা! আমার বাগানবাড়িতে গেলে জাত যাবে! লাগাও বক্সীকে পঁচিশ ঘা জুতো।

পাইকেরা সেই মহদুদ্দেশ্যে এসে দেখল বক্সী কখন সরে পড়েছে। তারা ভাবল, ভালই হল, এবারে যে-কোন একটা মেয়েকে সবাই হলফ করে রেশমী বলে চালিয়ে দেবে।

এদিকে টুশকি আর রেশমীর দিনের বেলাটা কোন রকমে বাড়ির মধ্যে লুকিয়ে থেকে চলে যায়, কিন্তু রাতটা আর যেতে চায় না। নিত্য নূতন নূতন উপদ্রবের কথা তাদের কানে আসে, মুখে মুখে পল্লবিত হয়ে মেয়ে-ধরার সংবাদ তাদের কাছে পৌঁছয়। রেশমী কাঁদ-কাঁদ ভাবে বলে, দিদি, আমার জন্যেই লোকের এই সর্বনাশ হচ্ছে।

টুশকি তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলে, না বোন, তা নয়—এমন সর্বনাশ চিরকাল চলছে, দেখতে দেখতে বুড়ো হয়ে গেলাম।

সেদিন অনেক রাত্রে নারীকণ্ঠের তরুণ আর্তস্বরে দুজনেরই ঘুম ভেঙে গেল।

রেশমী শুধাল, দিদি, ও কি?

টুশকি নিদ্রাজড়িত স্বরে বলল, আবার কি! কোন অভাগিনীকে নিয়ে চলেছে মোতি রায়ের পাইকেরা।

অবুঝ রেশমী বলে, জোর করে?

নইলে আর এমন করে কাঁদে?

কেউ সাহায্য করবে না?

কার ঘাড়ে দুটো মাথা বোন!

অসহায় কণ্ঠ পাড়ার নিদ্রা বিদীর্ণ করে সর্বশক্তিমানের দরবারে আবেদন পৌঁছে দেয়। সর্বশক্তিমানের আসন কি উপলক্ষে টলে কেউ জানে না, তিনি যে দুর্জ্ঞেয়!

ক্ষীয়মাণ আর্তকণ্ঠকে মনে মনে অনুসরণ করে রেশমী ভাবতে থাকে, ঐ মেয়েটা তার বদলে বলিপ্রদত্ত হতে যাচ্ছে। যাওয়ার কথা তো তারই। সে ভাবে, এর কি কোন প্রতিকার নেই? কিন্তু কি প্রতিকার ভেবে পায় না। সে একবার টুশকিকে ঠেলা দেয়—টুশকি ঘুমিয়ে পড়েছে। রেশমীর ঘুম আসে না—সে বিনিদ্র জেগে বসে থাকে।

৭
পথনির্দেশ

নৌকার গতি এমন নিঃশব্দ আর মসৃণ যে আরোহী জানতেও পায় না নৌকাখানা ছাড়ল কিনা কিংবা কতদূর এল—হঠাৎ এক সময়ে সচেতন হয়ে চমকে উঠে দেখতে পায় যে তীরভূমি কতদূর গিয়ে পড়েছে—আবার সেই সঙ্গে দেখে যে অপর তীর কখন অভাবিতভাবে কত কাছে এসে পড়েছে। তেমনি অবস্থা হল রেশমীর। তার ধারণা ছিল তার অবস্থা স্থির নিশ্চল আছে কিন্তু ভিতরে ভিতরে যে পরিবর্তন ঘটছিল তা কি জানত! কিন্তু একদিন যখন এদিক-ওদিক দৃষ্টি পড়ল, বুঝল একটা দিক দূরে গিয়ে পড়েছে, অন্য একটা এসে গিয়েছে কাছে। তার চোখে পড়ল ছায়াপ্রায় পুরাতন তীর, সেখানকার লোকজন কত ছোট হয়ে গিয়েছে—জন, লিজা, রোজ এলমার, কেরী দম্পতি, সব বাষ্প-পুত্তলিকা—আর অন্য তীরের টুশকি, মদনমোহন ঠাকুর সব কেমন প্রোজ্জ্বল, স্পষ্ট। সে চমকে উঠে ভাবল—এ কেমন হল! কিন্তু তখন আর নৌকার হাল তার মুঠোর মধ্যে নেই—অস্পষ্ট অস্পষ্টতর, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্রতর হতেই লাগল, স্পষ্ট স্পষ্টতর, বৃহৎ বৃহত্তর হতেই লাগল, অসহায়ভাবে তীরান্তরের লীলা চলতেই লাগল তার জীবনে। বিমূঢ়ভাবে ঘটনাচক্রের কাছে আত্মসমর্পণ করা ছাড়া তার উপায় রইল না।

বাইরের জগতের সঙ্গে তার দুটি স্থানে মাত্র যোগ ছিল। সেই অন্ধকার থাকতে ভোরবেলা গঙ্গাস্নান, আর সন্ধ্যাবেলায় মদনমোহনের আরতি-দর্শন। এই দুটি ঘটনা তার মনের উপরে পুণ্যস্পর্শের সাদা রঙ বুলিয়ে দিতে লাগল; এতদিন যে-সব ছবি সেখানে ধীরে ধীরে অঙ্কিত হয়ে উঠেছিল, সেগুলো এখন ঢেকে যাওয়ার মুখে। কখন ঢাকা পড়ে গিয়েছে মদনাবাটির জীবন; ঢাকা পড়ে যাচ্ছে কলকাতার সাহেবপাড়ার জীবন; লিজার ঈর্ষামিশ্রিত চক্ষুর্দ্বয়ের একটা ওই বুঝি এখনও দেখা যায়; আর এখনও সবটা ঢাকা পড়ে নি জনের প্রেমাতুর, আর্ত অসহায় চোখ দুটো—তবে তার উপরে পাতলা একপোঁচ রঙ পড়েছে—শরতের স্বচ্ছ মেঘে চাপা পড়া চাঁদের মত তা এখনও মনোহর আর দূরত্বে। চাঁদ তো দূরের বস্তু। অবোধ শিশুর মত তাকে এক সময়ে কাছে মনে করেছিল, সে দূরের চাঁদ দূরেই আছে—রঙের পোঁচ ক্রমে ঘনতর হচ্ছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই মিলিয়ে যাবে মনে করে তার বুকের মধ্যে মোচড় দিয়ে ওঠে। কিন্তু নিরুপায়—ঘটনাধীন মানব।

প্রথম প্রথম গঙ্গাস্নানে কিছুমাত্র বৈশিষ্ট্য অনুভব করে নি সে, তাড়াতাড়ি গোটাকয়েক ডুব দিয়ে বাড়ি ফিরত। কিন্তু কখন যে সঙ্গোপনে সুরধুনীর প্রভাব এসে পড়ল তার

জীবনে সে জানতেও পারে নি। গঙ্গাস্নানে ক্রমে তার সময় বেশি লাগতে শুরু করল। আগে সে স্নান সেরে উঠে কাপড় ছেড়ে অপেক্ষা করত টুশকির জন্যে, দেখত যে টুশকি গলাজলে দাঁড়িয়ে হাতজোড় করে গঙ্গা-স্তব করছে। দেখত সেই ভোরবেলাতেই আরও কতজন স্তব করছে, পূজা-আহ্নিক সারছে, ফুল বেলপাতা এক গণ্ডূষ দুধ গঙ্গায় সমর্পণ করছে। তার পরে সে নিজেও গলাজলে দাঁড়িয়ে থাকত যতক্ষণ না টুশকির স্তব সমাপ্ত হয়। প্রতিদিন শুনে শুনে গঙ্গার স্তব মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল, গঙ্গাজলে দাঁড়িয়ে মনে মনে আবৃত্তি করত স্তব, জোরে উচ্চারণ করতে কেমন লজ্জা অনুভব করত, মনে হত জন বা কেরী শুনতে পাবে।

একদিন স্নান সেরে উঠে টুশকি বলল, সাজিতে আমার ফুল কম ঠেকছে যেন।

রেশমী অপরাধীর মত বলল, দিদি, আমি গঙ্গায় দিয়েছি।

মনে মনে খুশি হয়ে টুশকি বলল, বেশ করেছ, কাল থেকে বেশি করে আনব।

রেশমীর লজ্জার ভাব কাটে নি, বলে, হ্যাঁঃ, আমার আবার দেওয়া! মন্তরই জানি নে!

টুশকি বলল, গঙ্গাপূজোর বুঝি মন্তর লাগে! শোন নি যে কথায় বলে গঙ্গা জলে গঙ্গাপুজো! তার পর বলল, তুমি যা মনে করে দাও না কেন, মা গঙ্গা ঠিক বুঝে নেবেন।

পরদিন থেকে ফুল বেলপাতা ভাগ করে নিয়ে দুজনে গঙ্গাজলে দিতে লাগল।

তখন থেকে গঙ্গায় ডুব দেওয়ার সময়ে রেশমীর দুই চোখে জল গড়াত, জলে জল মিশে যেত, কেউ দেখতে পেত না। এমন কত অসহায়ের চোখের জলেই তো গঙ্গার স্ফীতি, নইলে কতটুকু সম্বল নিয়ে সে রওনা হয়েছিল গোমুখী থেকে!

সেদিন স্নান করে ফেরবার সময় রেশমী হঠাৎ বলে উঠল, গঙ্গাস্নান করলে শরীরটা বেশ পবিত্র লাগে দিদি।

লাগে বইকি বোন, গঙ্গা যে পতিতপাবনী কলুষনাশিনী।

সব পাপ দূর হয়ে যায়, না? শুধাল সরলা রেশমী।

হয় বইকি বোন।

আমার পাপ কি দূর করতে পারেন?

বিস্মিতা টুশকি বলে, শোন একবার কথা, গঙ্গার অসাধ্য কি? তা ছাড়া তুমি আর জীবনে এমন কি পাপ করেছ? সগর রাজার সন্তানরা কপিলের শাপে ভস্ম হয়ে গিয়েছিল, উদ্ধার করলেন তাদের জাহ্নবী।

রেশমীর মনে পড়ে চিতা-পলায়নের স্মৃতি, সে ভাবে তারও তো ভস্ম হয়ে যাওয়ার কথা।

তার পর সারাদিন বাড়িতে থাকে সে আবদ্ধ। টুশকি এখানে-ওখানে যায়, কাজকর্মে তার বের না হয়ে উপায় নেই।

রেশমী বলে, দিদি, সাবধানে চলাফেরা ক'র।

কেন রে?

মোতি রায়ের লোক!

না বোন, আমার ভয় নেই। বলে সে বেরিয়ে যায়।

একাকী বসে থাকে রেশমী।

মাঝে মাঝে আকাশ-ফাটানো সেই অসহায় কণ্ঠ তার স্মৃতিকে বিদ্ধ করে জাগ্রত

হয়ে ওঠে—"ওগো তোমরা তাকে ব'ল, আমাকে জোর করে নিয়ে যাচ্ছে, সে যেন গিয়ে আমাকে কেড়ে নিয়ে আসে।"

এমন সঙ্কটের মধ্যেও সতীর মুখে পতির নাম উচ্চারিত হয় না।

রেশমী ভাবে নামটা জানলে তাকে খোঁজ করে জানিয়ে আসত পত্নীর অসহায় আবেদন। তার মনে হয় এ দায়িত্ব যেন বিশেষ করে তার উপরেই বর্তেছে, তারই জন্যে ঘরে ঘরে এমন বিপদ। লজ্জায় ভয়ে সে এতটুকু হয়ে যায়। যদি একেবারে শূন্যে মিলিয়ে যেতে পারত তবে ঐ আর্ত তীব্র চীৎকারের শূল-বেদনা থেকে বুঝি উদ্ধার পেত—"ওগো, তোমরা সবাই আমাকে রক্ষা কর'।

এমন সময়ে রাধারানী এসে উপস্থিত হয়।

রেশমী শুধায়, হাঁরে রাধারানী, আজকে পাড়ার খবর কি?

রাধারানী এঁটো বাসন মাজতে মাজতে মুখ তুলে বলে—পাড়ার খবর তো এখন একটাই।

বোঝে, তবু না বোঝবার ভান করে রেশমী বলে, কি?

আর কি দিদিমণি, পাড়ার ঝি-বউ-এর ইজ্জৎ আর রইল না।

কেন রে?

কেন আর কি! কচি বয়সের মেয়ে পেলেই টেনে নিয়ে যাচ্ছে মোতি রায়ের বাগানবাড়িতে।

হঠাৎ?

হঠাৎ নয়, এমন চিরকাল চলেছে, তবে এখন যেন বেড়েছে।

তাই তো জিজ্ঞাসা করছি, হঠাৎ বাড়তে গেল কেন?

কি করে বলব দিদিমণি, শুনছি রেশমী বলে কোন্ একটা পোড়ারমুখীর সন্ধানের জন্যেই নাকি এখন গাঁ উজোড়!

তার পরে বাসনগুলো আয়ত্তে এনে বলে, ঐ যে বলে ঠগ বাছতে গাঁ উজোড়, তা-ই হতে চলেছে।

রেশমী একবার দেখে নেয় যে টুশকি কাছে নেই, তখন আবার বলে—রেশমী কে?

সজোরে মাথা-ঝাঁকানি দিয়ে বলে, কেমন করে জানব কে? মেয়েটাকে নাকি মোতি রায়ের পাইকেরা ধরে আনছিল, মেয়েটা পালিয়েছে!

তাই বলে যাকে-তাকে ধরে নিয়ে যাবে?

যাবে না! মুখের গ্রাস পালানোয় বাবুর যে ইজ্জৎ যেতে বসেছে, কি করবে বল!

বিস্মিত রেশমী বলে, তোর কথা শুনে মনে হচ্ছে মোতি রায়ের যেন দোষ নেই?

মোতি রায়ের দোষ কি? বড়লোকে ওরকম করেই থাকে।

তবে কি দোষ যাদের ধরে নিয়ে যাচ্ছে তাদের?

দোষ ঐ পোড়ারমুখী রেশমীর—বলে সজোরে সে ঝামা দিয়ে কড়াইটা ঘষতে থাকে।

রেশমীর মুখ শুকিয়ে যায়, তবু বলে, তার কি দোষ?

মুখ না তুলে আপন কাজ করতে করতে রাধারানী বলে যায়, দোষ নয়? পাদ্রীদের হাত থেকে ছিনিয়ে এনেছিল, তার ধর্ম রক্ষা করেছিল যে মোতি রায়।

আর বাগানবাড়িতে নিয়ে গেলে বুঝি ধর্ম থাকত!

কপালে হাত ছোঁয়াবার ভঙ্গী করে বলে, কপাল আমার! ও সব মেয়ের বুঝি আবার

ধর্ম আছে! কত হাত ঘুরেছে জিজ্ঞেস করে দেখো।

তার সম্বন্ধে লোকের ধারণার আভাস পায় রেশমী।

বাসনগুলো কুয়োর জলে ধুয়ে তুলতে তুলতে রাধারানী বলে—পাড়ার লোকে কি ঠিক করেছে জান? রেশমীকে পেলে চুলের মুঠো ধরে টেনে নিয়ে গিয়ে পৌঁছে দেবে বাগানবাড়িতে।

কেন?

কেন কি? তা নইলে ঝি-বউ বাঁচাবার আর উপায় কি?

হাতের কাজ শেষ করে যাওয়ার আগে রেশমীর মুখের দিকে তাকিয়ে রাধারানী বলে—একটু সাবধানে থেকো দিদিমণি।

রেশমী কি বলবে ভেবে পায় না।

তখন রাধারানী ব্যাখ্যা করে বলে, আয়নায় একবার মুখখানা দেখ, এত রূপ তো হঠাৎ চোখে পড়ে না, একবার মোতি রায়ের লোকের চোখে পড়লে আর রক্ষে নেই!

রেশমীর শুকনো মুখ আরও শুকিয়ে যায়, তার অন্তরাত্মা কাঁপতে থাকে। ভাবে, কাছেই আছেন মা গঙ্গা পতিতপাবনী, কলুষনাশিনী!

রাধারানী চলে যায়। রেশমী দরজা বন্ধ করে ঘরে গিয়ে ঢোকে।

যেদিন টুশকি উপস্থিত থাকে, এত কথা হয় না, ফিস্ ফিস্ করে দু-চার কথা জিজ্ঞাসা করে—একই রকম উত্তর পায়।

রাত্রিবেলা ঘুম ভেঙে হঠাৎ জেগে ওঠে রেশমী, 'ওগো তোমরা আমাকে বাঁচাও' ধ্বনি তার নিদ্রাকে বিদীর্ণ করে। সেদিনকার শ্রুত এই আর্তরব গানের ধুয়ার মত ফিরে ফিরে যেন বাজতে থাকে; দিনের শান্তি, রাত্রির নিদ্রা দুই-ই তার গিয়েছে।

আজকাল টুশকি মাঝে মাঝে তাকে জিজ্ঞাসা করে, সৌরভী, মুখ শুকনো কেন? খুব ভয় পেয়েছ বুঝি?

রেশমী বলে, না, ভয় পাব কেন!

আমিও তো তাই বলি, বাড়ি থেকে না বের হলে ভয় কিসের! তাছাড়া তুমি যে এখানে আছ তা জানছেই বা কে!

রেশমী ভাবে, ভয় কি শুধু বাইরে রাস্তায়? রাস্তার শব্দ যে তার কানে এসে ঢুকছে—তাকে তো থামানো যায় না?

তার পরে তার আরও মনে পড়ে, সেই মেয়েটির আর্তকণ্ঠ মিলিয়ে গেলে অনুচ্চ স্বরে পাড়ার গুঞ্জনও তো কানে এসেছিল, সে সবও তো ঠেকানো যায় নি। সে এখনও কানে শুনতে পায় পাড়ার অভিযোগ। 'কোন্ ঘর-জ্বালানী পাড়ায় এসে বিপদ ঘটাল!' 'একবার দেখতে পেলে তাকে চুলের ঝুঁটি ধরে টেনে নিয়ে গিয়ে মোতি রায়ের বাগানবাড়িতে পৌঁছে দিয়ে আসি!' 'আরে তুমিও যেমন, দেখ গিয়ে এতক্ষণে সে কার বাগানবাড়িতে লীলাখেলা করছে!' 'ছুটে পালিয়ে সতীপনা দেখালেন, এদিকে পাড়ার সর্বনাশ!'

কথাগুলোর স্মৃতি ঘুরে ঘুরে বারে বারে হুল বিঁধিয়ে যায় রেশমীর মনে। রাধারানীও এইভাবে কথা বলে। সে বোঝে চারিদিক থেকে অভিযোগের আঙুল তার দিকেই উত্থিত। এক-একবার তার বিস্ময় বোধ হয়—সব দোষই কি তার? ঐ মোতি রায় লোকটার দোষ তো কেউ দেয় না! সে ভাবে, বিচিত্র বিচার সংসারের।

সে কেমন করে জানবে যে, দুর্বলের ঘাড়ে দায়িত্ব চাপিয়ে নিজেকে দায়মুক্ত অনুভব করাই সমাজের নিয়ম। সমাজ দুর্বল, ব্যক্তি প্রবল।

এক ফালি চাঁদের আলো এসে পড়েছে নিদ্রিত টুশকির মুখে। কি সুন্দর ঐ অনুদ্বিগ্ন মুখখানা, তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে রেশমী। তার পরে কখন আবার মনে মনে মদনমোহনকে প্রণাম করে শুয়ে পড়ে—এবারে ঘুম আসতে দেরি হয় না।

রেশমীর সন্ধ্যাবেলার সান্ত্বনা মদনমোহনের আরতিদর্শন, ভোরবেলার সান্ত্বনা যেমন গঙ্গাস্নান।

প্রথম প্রথম সে সময় কাটানোর উদ্দেশ্যে টুশকির সঙ্গে যেত আরতিদর্শনে। ধূপ দীপ শঙ্খ ঘণ্টা, জনতার ভক্তিগদ্‌গদ ভাব কেমন যেন অবাস্তব মনে হত, তামাশা দেখবার চোখে সব দেখত সে। বাল্যকালে গাঁয়ে থাকতে নিয়মিত ঠাকুর দর্শন করত বটে কিন্তু বয়সের মোড় ঘোরবার সময় এল অবস্থান্তর, পড়ল গিয়ে খ্রীষ্টানদের সঙ্গে, চাপা পড়ে গেল সেদিনকার স্মৃতি। তার পরের কটা বছর কাটল তার দেবতাহীন জীবন। পাদ্রীদের কথা শুনতে শুনতে 'পুতুল-পূজো' সম্বন্ধে একটা—কি বলব—অভক্তি ঠিক নয়, উদাসীনতার ভাব এসেছিল তার মনে। তার মনটা ছিল ফাঁকা অবস্থায়, দেবদেবী অপসারিত হয়েছে, খ্রীষ্টও প্রতিষ্ঠিত হয় নি, এমন সময়ে পদার্পণ করল জন। জন তার জীবনে প্রথম পুরুষ। এমন সময় আবার অবস্থান্তর ঘটল, দেবদেবী এসে পড়ল কাছে, কোথায় গিয়ে পড়ল জন।

পিছিয়ে কেন মা, এগিয়ে যাও না।

রেশমী পিছনে ফিরে দেখে যে বক্তা বর্ষীয়সী বিধবা মহিলা। রেশমীর ধারণা হল যে মহিলাটি এগিয়ে যেতে চায়, বলল, আপনি এগিয়ে যান। বলে সে নিজে পিছোবার উপক্রম করল।

মহিলাটি তাকে বাধা দিয়ে বলল, এগিয়ে যেতেই তো চাই, পারি কই?

আমি সরছি আপনি এগিয়ে যান।

মহিলাটি করুণ হাসি হেসে বলল, সম্মুখে এগোলেই কি এগোনো যায়?

বিস্মিত রেশমী শুধায়, তবে?

ভক্তি চাই। আমার মনে ভক্তি কই!

তবে আসেন কেন?

যদি মদনমোহন দয়া করেন।

এর আর উত্তর কি? রেশমী চুপ করে থাকে।

পরদিন সেই মহিলাকে দেখে রেশমী সরাসরি প্রশ্ন করে, এখানে এলেই কি মদনমোহন দয়া করেন?

তা কেমন করে হবে মা! বেশ্যামাগীরাও তো আসে!

তবে কি মদনমোহন বেছে বেছে দয়া করেন?

আত্মসমর্পণ করলেই তিনি দয়া করেন।

রেশমীর কথায় মহিলা বোধ করি কিঞ্চিৎ বিস্ময়বোধ করে; শুধায়, তুমি কে মা?

রেশমী সংক্ষেপে বলে, আমি দুঃখিনী।

তবে তোমাকে দয়া করবেন মদনমোহন।

কেমন করে জানলেন?

দুঃখিনীর প্রতিই যে তাঁর টান, আমার মদনমোহন যে দুঃখীর দেবতা।

এবারে রেশমী বলে, আমার মনে হয় আপনিও দুঃখিনী।

কোন উত্তর দেয় না মহিলা। রেশমী দেখে তার চোখ জলে ভরে উঠেছে।

রেশমী দেখে যে জনতার পিছনের দিকটায় বুড়ি বিধবাদের ভিড়। যতক্ষণ আরতি চলে তারা একমনে জপ করতে থাকে। এদের দেখে আর রেশমী ভাবে ভাঙা নৌকার বহর ভিড়েছে সংসারের শেষ বন্দরে। তার মনে হয়, যে কারিগর এদের গড়েছিল সে এবারে এদের ভেঙে চেলা কাঠে পরিণত করবে। আঘাত পড়তে শুরু করেছে, ওরা দয়ার ভিখারী। তার মনে হয় সে-ও বুঝি অল্প বয়সেই শেষ বন্দরে এসে ভিড়েছে।

ক্রমে সে মদনমোহনের প্রতি টান অনুভব করতে লাগল, কেমন যেন একটা নেশার মত। আগে টুশকি তাকে তাগিদ করত, চল সৌরভী, আরতির সময় হল! এখন সে তাগদি দেয়, দিদি, যাবে না? আরতি যে শুরু হয়ে গেল?

টুশকি বলে, দাঁড়াও হাতের কাজটা সেরে নিই।

রেশমী বলে, ও এসে হবে, চল এখন। মদনমোহনের মূর্তিতে আগে কোন মাধুর্য দেখতে পেত না রেশমী—এখন সে মূর্তি মধুর মনে হয়। পাদ্রীদের কাছে পুতুল-পুজোর সম্বন্ধে অনেক নিন্দা শ্লেষ সে শুনেছে। তার ধারণা হয়েছিল পুতুল পুজোর অসারতা সে বুঝেছে। বুঝুক আর নাই বুঝুক খ্রীষ্টান হওয়ার জন্য উদ্যত হয়েছিল। আজ সে কথা মনে করে সে কেমন বিস্ময়বোধ করে। সেদিন স্বপ্নেও ভাবে নি কোন পুতুলে এত জীবনরসের সন্ধান সে পাবে। তার মনে হয় সেদিনের রেশমী আর এক মানুষ। যতক্ষণ আরতি হয় একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে সে মদনমোহনের দিকে ; জপতপ জানে না, মনে মনে ঐ নামটি উচ্চারণ করতে থাকে।

রেশমী লক্ষ্য করত, এক বুড়ি প্রতিদিন নিয়মিত এক কোণে বসে থাকে, আসে সকলের আগে, যায় সকলের পরে, কারও সঙ্গে কোন কথা বলে না, নিঃশব্দে আসে, নিঃশব্দে চলে যায়। একদিন সে তার কাছে গিয়ে বলল, বুড়ি মা, তুমি কি ভাব?

বুড়ি এমন প্রশ্ন যেন জীবনে শোনে নি এমনিভাবে তার মুখের দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলল, তুমি কাদের মেয়ে গা?

কি প্রশ্নের কি উত্তর! অন্য স্থান হলে রেশমী হেসে ফেলত—যদিচ আগের মত কথায় কথায় হাসির মুদ্রাদোষ এখন আর নেই।

রেশমী বলল, আমি কায়েৎদের মেয়ে।

বুড়ি সংক্ষেপে বলল, তাই বল।

রেশমী আবার ভাবে, কি প্রশ্নের কি উত্তর!

এবারে রেশমী ঘুরিয়ে প্রশ্ন করল, বুড়ি মা, আমার মনে হচ্ছে মদনমোহন তোমাকে দয়া করেছেন।

দয়া না করে উপায় আছে?

কৌতুক অনুভব করে রেশমী বলে—বাপ্ রে, এ যে দেখছি জুলুম!

জুলুম নয়। আমি সব সমর্পণ করলাম আর তিনি দয়া করবেন না এমন কি হতে পারে?

রেশমী বলে, সমর্পণ করা কি মুখের কথা? তোমার ঘর গেরস্থালি আছে না?

সেই কথাই তো বলছিলাম। ঘর গেরস্থালি তিনি আর রাখলেন কই?

কেন ?

ওলাউঠোয় এক রাতে আমার ঘরের সবগুলো বাতি নিভে গেল। পড়লাম এসে ঠাকুরের পায়ের তলায়, বললাম, এক সার বাতি নিভিয়ে দিয়েছ, আর এক সার জ্বালিয়ে দাও, নইলে রইলাম এই পড়ে।

তার পর ?

তার পর আর কি! ও ছেলে আমার দুষ্টুর শিরোমণি, জুলুম না করলে ওকে ধরতে পারা যায় ? মা যশোদাকে কত কষ্টই না দিয়েছে ও ? শোন নি সে-সব কথা ?

এই সব অভিজ্ঞতার টুকরো কথা শুনতে শুনতে দিনে দিনে ধীরে ধীরে ক্রমে মদনমোহন কেমন যেন সত্য হয়ে ওঠে রেশমীর মনে। সে পরিবর্তনের সূত্র অনুসরণ তার সাধ্য নয়। শুধু এইটুকু বুঝল যে পুতুল হয়ে উঠল মানুষ, মানুষ হয়ে উঠল আত্মীয়। যখন সে মদনমোহনের বাড়ি থেকে ফিরে আসে, মনের কোণে জেগে থাকে অন্ধকার আকাশের কোণে শুক্লা তৃতীয়ার চন্দ্রকলার মত তার মধুর হাসিটুকু। হাসি নাকি এমনি মধুর হয়।

এখন তার এমন হয়েছে যে ঘরের কাজ করতে করতেও সেই হাসি, শ্রীঅঙ্গের সেই ভঙ্গি, আড়বাঁশির সেই বঙ্কিম ইঙ্গিত দেখতে পায়, গুন গুন করে গান ধরে, "ঢল ঢল কাঁচা অঙ্গের লাবণী অবনী বহিয়ে যায়।"

পাশের ঘর থেকে টুশকি হাসতে হাসতে বলে, কি সৌরভী, তোমাকে যে মদন-মোহন পেয়ে বসল!

রেশমী বলে, না দিদি, তোমাদের মদনমোহনের বাহদুরি আছে।

কেমন ?

রেশমীর মুখে প্রায় এসে গিয়েছিল যে, নইলে আমার মত পাদ্রীর হাতে পড়া মেয়েকে—

সর্বনাশ! কথাটা ঘুরিয়ে নিয়ে বলে, নইলে আমার মত পাষাণ মেয়ের প্রাণে—

সৌরভী, তুমি পাষাণ মেয়ে, এই কথা আমাকে বোঝাতে চাও!

তাছাড়া আর কি ?

তা হবে, পাষাণেও তো ঝরনা আছে।

তার পর বলে, বোন, সবটা মন মদনমোহনকে দিও না।

একটুখানি হাতে রাখব কার ভরসায় ?

আর একজন যে আসবে। সে-ও অবশ্য মদনমোহন, কিন্তু ভাই মনটা যেন একটু ফরসা হয়।

রেশমী অনেকদিন পরে কৌতুকের অবকাশ পায়, বলে, হাঁ, ধোপার ইস্তিরি করা কাপড়ের মত, কি বল ?

মন্দ কি ?

কিন্তু কালো রঙটাও তো মন্দ নয়।

টুশকী বলে, দেবতার ভাল, মানুষে একটুখানি ফরসা চায়।

অন্তত তুমি চাও, কি বল টুশকি দি ?

চাই তো বটে, কিন্তু পাই কই ?

রেশমী আর বেশি খোঁচায় না, কি জানি আবার কোন্ চোখের জল উৎস হতে

বের হবে ! এই কদিনের অভিজ্ঞতায় সে বুঝেছে চোখের জলের সমুদ্রের উপরে পাৎলা সর পড়েছে, আর আমরা নির্ভয়ে বিচরণ করছি তারই উপরে। একটুখানি অসতর্ক আঘাতেই নীচের রুদ্ধ জল ছুটে বেরিয়ে আসে। সংসার ধীরপদ-প্রত্যাশী।

বাস্তবিক টুশকির কথাই সত্যি। প্রথমে অজ্ঞাতসারে, তার পরে জ্ঞাতসারে রেশমী এখন মদনমোহনময়। জনের জন্য যে প্রেম সে তুলে রেখে দিয়েছিল, ঘটনার রূঢ় হস্তক্ষেপে কলসী উজাড় হয়ে পড়ে গেল তা মদনমোহনের পায়ে।

রেশমী, আমার বাঁশি লুকিয়ে রেখেছ কেন, দাও !

বাঃ, আমি তোমার বাঁশি লুকোতে গেলাম কেন ?

ফের চালাকি ! সে জন্মের অভ্যাস এ জন্মেও ভোল নি দেখছি !

কোন্ জন্মের ? শুধায় রেশমী।

মদনমোহন বলে, সে জন্মে ছিলে রাধা, এ জন্মে হয়েছ রেশমী ! আমার কিছু অজান আছে নাকি !

আচ্ছা, দেব তোমার বাঁশি। আগে তোমার কুঞ্জের পথটা দেখিয়ে দেবে !

এই কথা ! তাহলে দেবে আমার বাঁশি ?

নিশ্চয়।

তাহলে দেব পথনির্দেশ ; দাও বাঁশি।

ও চালাকি চলছে না, আগে পথ দেখাও।

ঐ দেখ আমার কুঞ্জের পথ।

শোরগোলে একসঙ্গে রেশমী ও টুশকির ঘুম ভেঙে গেল। দুজনে শুনতে পায় অদূরে গঙ্গাতীরে ঢাকের বাজনার সঙ্গে অনেক নরনারীর কণ্ঠ। স্বপ্নের বিবরণ ভুলে গিয়ে রেশমী শুধায়, এত রাতে ও কি হচ্ছে দিদি ?

টুশকি জানলা দিয়ে উঁকি মেরে দেখে বলে, কোন্ পুণ্যবতী স্বর্গে চলল।

মরেছে বুঝি ?

না বোন, পতির চিতায় উঠতে চলল।

বিস্ময়ে রেশমী বলে ওঠে, সহমরণ !

তাই তো মনে হচ্ছে।

চল দেখে আসি।

দুজনে বেরিয়ে গঙ্গাতীরে যায়।

গঙ্গাতীরে জলের ধারে সজ্জিত চিতায় নববস্ত্রপরিহিত যুবকের দেহ শায়িত। রোরুদ্যমান আত্মীয়স্বজনের ব্যূহমধ্যে রক্তাম্বরা মাল্যভূষিতা কিশোরী বধূ দণ্ডায়মান। ইতস্তত দর্শকের ভিড়। রেশমী আর টুশকি গিয়ে একান্তে দাঁড়াল।

রেশমীর সেদিনের কথা মনে পড়ল, যেদিন মৃত্যুভয়ে চিতা থেকে পালিয়েছিল। কিন্তু আজ ঐ কিশোরীর মুখে ভয়ের কোন চিহ্ন দেখতে পেল না সে। রেশমী ভাবল যুবক স্বামীকে ছেড়ে তার বেঁচে থাকা নিরর্থক মনে করেই সে অকুতোভয় ; হয়তো যুবক স্বামী হলে সে-ও এমনি অকুতোভয় হত ; কিন্তু ক্ষণেকমাত্র পরিচিত বৃদ্ধের জন্য কেন যাবে সে মরতে ! মরবারও একটা সার্থকতা চাই তো !

কিশোরী বধূ গুরুজনদের প্রণাম করে, খই আর কড়িবৃষ্টির মধ্যে অবিচলিত পদে অগ্রসর হয়ে চিতায় উঠল। নবোদ্যমে বেজে উঠল শঙ্খ, কাঁসর, ঢাক। চিতায় অগ্নি

স্পৃষ্ট হল। একবার আগুনের হল্কার মধ্যে দেখা গেল তার ঈষৎ আনত মুখ। সেদিকে আর তাকাবার সাহস হল না রেশমীর, সে গঙ্গার দিকে তাকিয়ে থাকল, জলে অগ্নিময় সেতু বিস্তারিত।

তার পর কখন যে টুশকি তার হাত ধরে টেনে বাড়িতে নিয়ে এসেছে তার মনে পড়ে না। শয্যার শুয়ে শুয়ে তার স্বপ্নের কথা মনে পড়ল, মনে হল মদনমোহন স্বপ্নের পথ বুঝি বাস্তবে নির্দেশ করে দিলেন। সে ভাবল ঐ তো তার পথ। তার পর মনে পড়ল পাড়ার মেয়েদের দুর্দৈব। তখন মনে হল তার সম্মুখে দুটো পথ আছে—এক মোতি রায়ের মত লোকের বাগানবাড়িতে আর এক ঐ চিতাগ্নিতে। মনে হল এক-তরফ তার বেছে নিতে হবে। চিতাগ্নি যদি চিরকালের জন্য নিভে গিয়ে থাকে তবে তো ঐ বাগানবাড়ির পথটাই মাত্র উন্মুক্ত। এইরকম এলোমেলো কত কি ভাবতে ভাবতে কখন ঘুমিয়ে পড়ল।

জীবনে সুখ সৌভাগ্য একবার মাত্র আসে। জীবনে সুখের পুনরাবৃত্তি ঘটে না। রেশমী সেই অসম্ভবের আশায় উদ্যত।

পরদিন নীরবে আপনমনে সে কাটিয়ে দিল। বিকালবেলায় আয়নার সম্মুখে দাঁড়িয়ে সে চমকে উঠল। চিতাগ্নির শিখা কি তাকে স্পর্শ করেছে, এমন বিবর্ণ শুষ্ক কেন তার মুখ?

মদনমোহন দর্শন করতে গিয়ে মনে মনে সে কেবলই বলতে লাগল, ঠাকুর, ঠাকুর, হয় শক্তি দাও নয় পথ দেখিয়ে দাও, নইলে মাথা কুটে মরব তোমার পায়ের কাছে।

সেই বুড়িটি তাকে হাত ধরে কাছে বসাল, বলল, কি ভাবছ মা?

রেশমী জল-ভরা চোখে অসহায়ভাবে তাকিয়ে রইল তার মুখের দিকে। কি উত্তর দেবে?

বুড়ি বলল, বুঝেছি মা, তুমি অল্প বয়সে অনেক দুঃখ পেয়েছ। দেবে, দেবে, ঠাকুর শান্তি দেবে, কেবল খুব জোর করে চেপে ধরা চাই।

তার পরে স্নেহের হাসি ঝরিয়ে বলল, ও আমার দুষ্টুর শিরোমণি কিনা। কিন্তু এমন দয়ালও আর নেই।

তার কথার সমর্থনে রেশমীর দুই চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল।

৮
হংসদূত

জনের মুন্সী কাদির আলী জনকে বৃথা সান্ত্বনা দেয়নি। রেশমীকে খুঁজে বের করবার উদ্দেশ্যে অফিসের দারোয়ান, চাপরাসী, ছোকরাদের সে নিযুক্ত করেছিল। সকলেই রেশমীকে চিনত, রেশমী অফিসে দু-তিন দিন কাটিয়েছিল। কাদির আলী তাদের বলে দিয়েছিল, রেশমী বিবির সন্ধান এনে দিতে পারলে জন সাহেবের কাছে ইনাম মিলবে। বকশিশের লোভে তারা সবাই অবসর সময়ে এদিকে ওদিকে ঘুরে বেড়াত। অবশেষে একদিন গঙ্গারাম বলে এক ছোকরা মদনমোহনতলায় টুশকির বাড়িতে রেশমীর দেখা পেল।

সে একগাল হাসি হেসে প্রকাণ্ড এক সেলাম করে দাঁড়াল।

রেশমী তাকে চিনতে পেরে বলল, গঙ্গারাম যে!

গঙ্গারাম বলল, হাঁ মাঈজি।

গঙ্গারাম খুব ভদ্র ও বিনীত ভাবে কথাবার্তা বলতে শুরু করল রেশমীর সঙ্গে। কাদির আলীর কাছে জন সাহেবের সঙ্গে তার সম্বন্ধটা ইশারায় জেনেছিল সে।

রেশমী বলল, হঠাৎ যে? এদিকে কোথায় এসেছিলে?

কোথায় আর আসব, আপনাকে খুঁজতে আমরা চারিদিকে সব বেরিয়েছি।

আমাকে খুঁজতে!

কেমন যেন বিস্ময়বোধ করে রেশমী। তার পরে তার মনে পড়ে এখন সকলেই তার সন্ধান করছে, এদিকে মোতি রায়, ওদিকে জন। বিস্ময়ের সঙ্গে যুক্ত হয় একটু গৌরবের ভাব।

সে বলে, আমাকে কেন খুঁজছ?

কি যে বলছেন মাঈজী, আপনার জন্যে সাহেব যে বাউরা হয়ে গেল!

কে, জন সাহেব?

আর কে, বলে গঙ্গারাম।

রেশমীর মনে শুকনো পাতার তলে ফুল ফোটা শুরু হয়ে যায়। মনের উতলা ভাব দমন করে উদাসীনভাবে শুধায়, সাহেবের হুকুম কি?

আপনার দেখা পেলে পালকি করে নিয়ে যেতে।

রেশমী লঘুভাবে বলে, পালকি এনেছিস নাকি?

আপনার হুকুম হলেই নিয়ে আসি।

রেশমী বলে, এখন তো যেতে পারব না।

গঙ্গারামের মুখ গম্ভীর হয়, ইনাম বুঝি ফসকে যায়। তবু সে আর একবার চেষ্টা করে—তবে কখন পালকি নিয়ে আসব?

তাকে বিদায় করে দেবার আশায় রেশমী বলে, সে কথা পরে জানাব।

গঙ্গারামের বিস্ময়ের অন্ত থাকে না। তারপরে ভাবে, খুব সম্ভব সাহেব ও বিবির মধ্যে প্রণয়-কলহ চলছে। এমন হয়ে থাকে বলে সে শুনেছে। তার মনে পড়ে হরিরামের মাকে বিয়ে করবার আগে সে কতবার তার সঙ্গে ঝগড়া করেছে, গাল দিয়ে বিদায় করে দিয়েছে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত বিয়ে না করে তো পারে নি। নিজের অভিজ্ঞতার সাক্ষে তার মনটা হাল্কা হয়—বুঝতে পারে ইনামটা ফসকে যাবে না। তবে এক্ষেত্রে কিছু যেন বাড়াবাড়ি। ভাবে, বড় ঘরের বড় কথা।

সে বলে, তবে একখানা চিঠি লিখে দিন।

না, চিঠিও দেব না।

গঙ্গারাম মাটিতে মিশে যায়। তার দীন ভাব লক্ষ্য করে রেশমী বলে, কাল ঠিক এই সময়ে এসো, চিঠি লিখে রেখে দেব।

অগত্যা গঙ্গারাম আর একটা দীর্ঘ সেলাম করে প্রস্থান করে।

এই সময়টা টুশকি বাড়ি থাকে না, বাজারে যায়; ভাগ্যে গঙ্গারাম সেই সময়ে এসেছিল।

বহুপূর্বে দৃষ্ট স্বপ্নের মত জনের কথা রেশমীর মনে পড়ে যায়। কদিনের ব্যবধানে

সে স্মৃতি আজ কত যুগ দূরে গিয়ে পড়েছে। মানুষ একই সময়ে হাজার কালের মধ্যে বাস করছে, কোনটা সাপের মত কুণ্ডলীকৃত একটুকু, কোনটা সাপের মত লম্বিত এতখানি! কাল যে নাগ!

গঙ্গারাম চলে যাওয়ার পরে মনের অবস্থা বিচার করবার জন্যে রেশমী গিয়ে নিভৃতে বসল, তখনও টুশকি ফেরেনি। জন তাকে ভোলে নি, তাকে না পেয়ে 'বাউরা' হয়ে গিয়েছে, তাকে খুঁজতে চারদিকে লোক পাঠিয়েছে, সে আঙুল তুললে এখনই জন এসে পায়ে লুটিয়ে পড়ে, চিন্তা করে আনন্দমিশ্রিত গৌরব অনুভব করল। তার মনে পড়ল দ্রৌপদীর ছদ্মবেশে বিরাট-রাজগৃহে অবস্থানের ঘটনা। সে যেন দ্রৌপদী, এদিকে ওদিকে কীচকের অভাব নেই, ওদিকে তার রক্ষাকর্তাও আছে। সে নিরুপায় নয়, নিঃসহায় নয়। আঃ কি সান্ত্বনা, কি আনন্দ! এই কদিনে জনের স্মৃতি দূরে গিয়ে পড়ে ঝাপসা হয়ে গিয়েছিল, হঠাৎ আবার এক ঝাপটায় তা কাছে চলে এল। স্মৃতির আর এক দিগন্তে সে তাকিয়ে দেখতে পেল প্রত্যক্ষের তীর কত দূরায়িত! কে এই টুশকি? কে ঐ মদনমোহন? আর কেই বা মোতি রায়? কোথায় ছিল এরা কদিন আগে? কেরী আর রাম বসুই তো রক্ষা করেছে তাকে নিশ্চিত মৃত্যু থেকে, ভরণপোষণ করে শিক্ষা দিয়েছে, নইলে আজ তার কি গতি হত! আর রোজ এলমার! নিদাঘের গোলাপের মত শুকিয়ে গেল সে। আর জন! বালকের মত অসহায়, যৌবনে দীপ্যমান, শিশুর মত পরনির্ভর, প্রেমে করুণ। তার প্রতিটি কথা প্রতিটি ভঙ্গি স্মৃতির রঙে উজ্জ্বলতর হয়ে চোখে পড়তে লাগল। কথা বলার সময়ে তার ঠোঁটের দুই কোণে দুটি খাঁজ পড়ত, নীলাভ সূর্যের কিরণ কুড়িয়ে নিয়ে ঝলমল করে উঠত তার চোখ, আর রক্তাভ ওষ্ঠাধরে চুম্বনের যে ফুল প্রস্ফুটিত তার সৌগন্ধ ও কণ্টক তাকে উদ্‌ভ্রান্ত করে তুলল। এমন কি সেই কণ্টকটাও!

জন একদিন বলেছিল, রেশমী, তুমি আমার জন্যে সব ত্যাগ করতে চললে?

রেশমী বলেছিল, কি আছে আমার যে ত্যাগ করছি?

পৈতৃক ধর্ম।

আমার ধর্ম তুমি।

আমি! বিস্ময়ে বলে জন।

প্রত্যেক লোকে নূতন করে নিজের ধর্মকে লাভ করে, আমি লাভ করেছি তোমাকে।

কিন্তু পৈতৃক ধর্ম বলে কিছুই নেই?

রেশমী বলে, পৈতৃক ধর্মের চেয়ে স্বধর্ম বড়।

এত কথা রেশমীর জানবার নয়, কিন্তু মনের মধ্যে প্রেমের গীতা অবারিত হয়ে গেলে নিরক্ষরেও প্রজ্ঞা লাভ করে।

রেশমী বলে, ধর্মের চেয়ে প্রেম বড়।

বলে, প্রেমের জন্যই ধর্ম। আমি যদি এক লাফে ধর্মকে ডিঙিয়ে প্রেমকে পেয়ে থাকি, সে তো মস্ত লাভ। তার কথায় বিস্মিত জন বলে, রেশমী, তুমি এমন সব গভীর তত্ত্ব জানলে কি করে? তোমাদের দেশের লোকের কাছে দুরূহ দার্শনিক তত্ত্ব অত্যন্ত সহজ।

রেশমী বলে, তা নয় জন, হৃদয়ে প্রেম প্রবেশ করলে আপনি সব সহজ হয়ে যায়! যার ও অভিজ্ঞতা ঘটে না, তারই জন্যে প্রয়োজন দর্শনের। চক্ষুষ্মান আপনি দেখতে

পায়, অন্ধকে দেখিয়ে দিতে হয়।

এসব কথার উত্তর জনের মাথায় আসে না, সে চুপ করে থাকে।

তখন রেশমী বলে, তুমি আমার জন্যে যা ত্যাগ করতে উদ্যত—

জন বাধা দিয়ে বলে, আমি কি ত্যাগ করলাম?

আমাকে বিয়ে করলে আত্মীয়স্বজন তোমাকে ত্যাগ করবে, হয়তো সমাজেও তোমার স্থান হবে না।

কিন্তু তার বদলে আমি কি পাব ভেবে দেখেছ?

কি এমন পাবে?

জন মুখটা আগিয়ে নিয়ে যায়। রেশমী একেবারে অনুমান করে নি তা নয়, কৌতুকবিলাসে পিছিয়ে যায় সে।

সেদিনকার সেই ব্যর্থ চুম্বন নলের হংসদূতের মত দুই শুভ্র তপ্ত কোমল পক্ষপুটে আচ্ছন্ন করে, শষ্প-মৃদু গ্রীবাটি রাখে রেশমীর গ্রীবায়। রেশমীর সমস্ত দেহ রী রী ঝিম ঝিম করতে থাকে, বেদনাময় আনন্দের নীহারিকায় সে আচ্ছন্ন হয়ে যায়। ব্যর্থ চুম্বন দুর্ভাগ্যের মত নিদারুণ।

সে সঙ্কল্প করে একটু সময় পেলেই জনকে চিঠি লিখে রাখবে। মদনমোহনের ছবি আঁকবার জন্য টুশকিকে বলে সে কাগজ কালি আনিয়ে নিয়েছিল।

অনেক রাতে ভগ্ননিদ্রা রেশমী শুনতে পায় নারীকণ্ঠের সেই পুরাতন আর্তধ্বনি; ভাবে, আঃ এর কি—আর শেষ হবে না! নারীকণ্ঠ মিলিয়ে যাওয়ার পরে প্রতিবেশীদের বাড়ি থেকে ওঠে চাপা গুঞ্জন—'কোন পোড়ারমুখী এল পাড়ায়, সব জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দিল!' 'দেখা পেলে চুলের মুঠি ধরে নিয়ে হাজির করে দিই মোতি রায়ের বাগানবাড়িতে, পাড়ায় শান্তি ফিরে আসে!' ইত্যাদি।

হঠাৎ রেশমীর মনে হল, ঘরে ঘরে আগুন জ্বালিয়ে দিয়ে এখন কি তার জনের কাছে ফিরে যাওয়ার অধিকার আছে? তখনই তার আবার মনে হয়—এ দুষ্কৃতির দায়িত্ব মোতি রায়ের—সে কেন এ দায় বহন করে নিজের সুখ-সৌভাগ্য বিসর্জন দিতে যাবে? জীবনে সুখসৌভাগ্য কত বিরল, আজ যদি তা জনের সঙ্গে হাত বাড়িয়ে দিয়ে থাকে, তবে তা প্রত্যাখ্যান করা কি উচিত হবে? আর মোতি রায়ের এ রকম ব্যবহার তো নূতন নয়, আগেও হয়েছে, পরেও হবে—তার কি দোষ? রেশমী সঙ্কল্প করে, না, আর বিলম্ব নয়, কাল সকালে গঙ্গারাম এলে জনকে চিঠি লিখে জানিয়ে দেবে তাকে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করতে। তখনই ঐ নারীকণ্ঠের স্মৃতি মনে পড়ে। সে কেমন দোমনা হয়ে যায়। অবশেষে পড়ে ঘুমিয়ে।

ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখে রেশমী। সে আর জন পাশাপাশি শয্যায় শুয়ে আছে, সুখসুপ্তিপ্রফুল্ল জনের মুখ। সে মাথা উঁচু করে জনের মুখ চুম্বন করতে যাবে এমন সময় দেখে যে মশারিতে আগুন লেগে গিয়েছে। মুহূর্তকাল স্তম্ভিত থেকে জনকে ধাক্কা দেয়, জন, ওঠ ওঠ, আগুন! জন ওঠে না, নড়ে না। সে তড়াক করে শয্যা পরিত্যাগ করে নামে, জনের হাত ধরে টানাটানি করে, কিন্তু জন নিশ্চল। তার সম্মুখে শয্যাসুদ্ধ জন পুড়ে ছাই হয়ে যায়। কে লাগাল আগুন? ঘরে তো দীপ ছিল না! বাইরে থেকে তবে কেউ এল কি? দরজা খোলা কেন? হঠাৎ দরজায় চোখ পড়ে, সেখানে কে একজন যেন দাঁড়িয়ে। এগিয়ে গিয়ে দেখে যে—মদনমোহন।

আগুন লাগল কেন ?

তুমি কত ঘরে আগুন লাগিয়েছ !

শোন শোন—

আর কোন কথা না বলে রহস্যময় হাসি হেসে অন্তর্হিত হয়ে যায় মদনমোহন।

ঘুম ভেঙে যায় রেশমীর। এ কি দুঃস্বপ্ন ! তখনই মনে হয়, এ কি স্বপ্ন না স্বপ্নময় ইঙ্গিত ? শয্যায় উঠে বসে রেশমী। মদনমোহনের উপরে কেমন একটা বিদ্বেষ অনুভব করে সে। কিন্তু যে দেবতা অদৃশ্য, অর্থাৎ মনের মধ্যে, তার প্রতি বিদ্বেষ ফিরে এসে ঘা দেয় অন্তরে। নিজের চোখে নিজেকে ঘৃণিত বলে মনে হয়। কিন্তু কেন, কি তার দোষ ? চিন্তার সূত্র তাকে বলে দেয় জনের কাছে ফিরে যাওয়া বোধ করি মদনমোহনের অভিপ্রেত নয়। জনকে চিঠি লিখে সম্মতি জানাবার সঙ্কল্প তার শিথিল হয়ে আসে।

সকালবেলায় টুশকি বাজারে বেরিয়ে গেলে জনকে চিঠি লিখতে বসে। রেশমীর সংক্ষিপ্ত চিঠি, শেষ করতে সময় লাগল না। সে লিখল—

"জন,

তুমি আমাকে ভুলে যেয়ো। এতদিনে আমি মদনমোহনকে পেয়েছি। এখন সে-ই আমার সুখ, শান্তি, স্বামী। অন্য কোন লোকের সঙ্গে আর কোন সম্বন্ধ সম্ভব নয়। তুমি বিয়ে করে সুখী হও এই প্রার্থনা করব। অনেক অনেক ধন্যবাদ। রেশমী।"

চিঠি শেষ হওয়ামাত্র গঙ্গারাম এসে উপস্থিত। পাছে শেষ মুহূর্তে নূতন সঙ্কল্প বদলে যায়, তাই রেশমী তখনই চিঠিখানা তার হাতে দিয়ে তাকে বিদায় করে দিল। জন সাহেবের বকশিশ হস্তগত হয়েছে ভেবে একগাল হাসি হেসে গঙ্গারাম ছুটল অফিসের দিকে। আর রেশমী ঘরে প্রবেশ করে গলায় আঁচল দিয়ে প্রণাম করতে গিয়ে কান্নার ভারে ভেঙে লুটিয়ে পড়ল মেঝের উপর।

৯
শক্ত সরাব

কাদির আলীর প্রতিশ্রুতিকে জন গতানুগতিক প্রবোধবাক্য মাত্র মনে করেছিল—তাই তার উপরে বিশেষ আস্থা স্থাপন করে নি। সত্য বলতে কি, কথাটা ভুলেই গিয়েছিল সে। এ কয়দিন সে অফিসেই রাত্রিযাপন করেছে, দিনমান তো বটেই। লিজা তাকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে দু-তিন দিন এসেছে, ক্ষমা প্রার্থনা করেছে, বাড়ি ফিরে যেতে অনুরোধ করেছে, কিন্তু জন সে কথায় কর্ণপাত করে নি।

লিজা বলেছে, জন, তুমি আমার কথা ভুল বুঝেছ।

জন বলেছে, লিজা, আমার ভাষাজ্ঞান মোটামুটি রকম সাধারণের মত, অতএব ভুল বোঝবার সম্ভাবনা কোথায় ?

লিজা বলেছে, ভাষাজ্ঞানের অভাবে নয়, তোমার মনটা বিকল ছিল বলে ভুল বুঝেছ।

মন বিকল থাকবার কথায় তার মনটা অধিকতর বিকল হয়ে গিয়েছে, বলেছে,

মন বিকল কেন হতে যাবে, আর কি করেই বা তা বুঝতে তুমি ?

লিজা বুঝেছে এ পথে তর্ক চললে আবার তা কলহে পরিণত হবে। তাই সে নিজের ত্রুটি স্বীকার করে বলেছে, স্বীকার করছি আমি ভুলে বুঝছিলাম, এখন বাড়ি ফিরে চল, বাড়ি তোমার।

বাড়ি আমার !

বিক্ষুব্ধ হয়ে জন বলে ওঠে, যে বাড়িতে আমি অপমানিত হই সে বাড়ি আমার !

লিজা বলে, ধর তুমি যদি অপমানিত হয়েই থাক, বাড়ির কি দোষ ?

কি মুশকিল, বাড়ির দোষ দিচ্ছে কে ? বাড়ি কি কথা বলে ?

আমার যদি দোষ হয়েই থাকে, আমি তো বারংবার ক্ষমাপ্রার্থনা করেছি।

জন তার ক্ষমাপ্রার্থনার উপর জোর না দিয়ে বলে ওঠে, যদি তুমি দোষ করে থাক !

নিশ্বাসের সবটা জোর গিয়ে পড়ে 'যদি' শব্দটার উপরে। তার পরে সে একটা সিগারেট ধরায়। জ্বলন্ত সিগারেট অনেক সমস্যাকে চাপা দিতে পারে।

সেদিন ঐ পর্যন্ত।

পরে আরও দুইদিন ভাইবোনে এইভাবের কথাবার্তা হয়েছে কিন্তু জনের মন টলে নি।

জনের মন সত্যই বিকল হয়ে গিয়েছিল, নইলে সে এমন কঠোর প্রকৃতির নয়। জন অব্যবস্থিতচিত্ত যুবক। ও গুণটার প্রকৃতি এই যে যখন কঠোর হয় অস্বাভাবিক ভাবেই হয়।

নিরুপায় লিজা মেরিডিথের কাছে গিয়ে পরামর্শ চেয়েছে। মেরিডিথ সব শুনে বলেছে, থাকতে দাও না, দু-চার দিন থাকুক, সে তো আর জলে পড়ে নি।

তাই বলে বাড়ি ছেড়ে থাকবে ?

ক্ষতি কি, অফিসে আরামের সব ব্যবস্থাই তো আছে।

তা অবশ্য আছে। কিন্তু বাড়িছাড়া হয়ে থাকলে লোকে আমাকে বলবে কি ?

জনকে লোকে যা বলছে তার চেয়ে খারাপ বলবে না।

লিজা শুধায়, লোকে জনকে নিয়ে বলাবলি শুরু করেছে ?

করবে না ? এমন একটা সুযোগ পেয়েছে !

কি বলছে বল, এ কদিন আমি কোথাও যেতে পারি নি।

মেরিডিথ বলে, আর গেলেও কি তোমার সম্মুখে কিছু বলত !

তোমার সম্মুখে তো বলেছে। এখন বল আমাকে।

লোকে বলেছে, মেরিডিথ আর লিজা মিলে চক্রান্ত করে জনকে বাড়ি থেকে বিদায় করে দিয়েছে।

চমকে ওঠে লিজা। তোমার সঙ্গে চক্রান্ত করে ? কিন্তু তোমার সঙ্গে চক্রান্ত করতে যাব কেন ?

আমি নাকি তোমাকে বিয়ে করতে উদ্যত হয়েছি, এখন জনকে তাড়াতে পারলেই সম্পত্তিটা দুজনে মিলে ভোগ করতে পারব।

লিজা রাগের মাথায় বলে, যারা এমন বলে তারা নরকস্থ হক।

বিয়ের কথাটা সুদ্ধ ?

লিজা বলে, তুমি তাদের প্রশ্রয় দিয়েছ।

বিয়ের কথায় অবশ্যই প্রশ্রয় দিই নি।

তবে সম্পত্তি ভোগ করবার কথায় দিয়েছ।

বিয়ে না হলে সম্পত্তি ভোগ করবার কথাই ওঠে না।

না মেরিডিথ, এখন লঘু পরিহাস রাখ।

পরিহাস কোন্‌টা ?

সবটাই।

বিয়ের কথাটা সুদ্ধ ? ও মাই গড !

হেসে ফেলে লিজা বলে, তবু ভাল যে, তোমার মুখে গড শব্দটা বের হল !

জান তো লিজা, প্রয়োজনকালে শয়তানও শাস্ত্র আওড়ায়।

তুমি কি শয়তান ?

সে যোগ্যতা কই ! তবে তার চেলা হওয়ার আকাঙ্ক্ষা রাখি বটে !

বিস্মিত লিজা বলে ওঠে, কি বলছ মেরিডিথ ?

মেরিডিথ বলে, শয়নানের চেলারা তোমার ধর্মধ্বজীদের চেয়ে অনেক ভাল।

কেন ?

সবাই জানে তারা মিথ্যা কথা বলে। কিন্তু ধর্মধ্বজীদের মত সময়ে সত্য সময়ে মিথ্যা কথা বলে লোককে বিভ্রান্ত করে না।

যে যা বলে বলুক, এখন জনকে নিয়ে কি করি বল ?

কিছুই ক'র না, সময়বিশেষে সেইটেই শ্রেষ্ঠ পন্থা।

সাময়িক ভাবে মেরিডিথের পরামর্শ লিজা মেনে নিয়েছিল, কিন্তু আবার দিন কয়েক পরেই জনের কাছে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিল।

তাতেও কোন ফলোদয় হয় নি।

জন রেশমীকে খুঁজে পাওয়ার আশা ছেড়ে দিয়েছিল। তার ধারণা হয়েছিল যে রেশমী হয় মারা গিয়েছে নয় এমন স্থানে যেতে বাধ্য হয়েছে যেখান থেকে ফিরে আসা সম্ভব নয়। জন বুঝল যে, সে এখন কলকাতার শ্বেতাঙ্গ সমাজের উপহাসের পাত্র ; বুঝল যে, এমন কৃপার পাত্র হয়ে তার কলকাতায় থাকা সম্ভব নয়। কি করা যায়, ভাবতে ভাবতে তার চোখে পরিত্রাণের একটা উপায় পড়ল। আর্থার ওয়েলেসলির হস্তক্ষেপে মহীশূর যুদ্ধ শেষ হয়ে গিয়েছিল বটে কিন্তু পেশবার সঙ্গে শীঘ্রই যুদ্ধ বেধে উঠবে এমন সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল। যুদ্ধ সত্যই বেধে উঠলে ননকমিশন্‌ড অফিসার হিসাবে যোগদান করা যায় কি না সেই চেষ্টায় সে নিযুক্ত হল। তার মনে হল যুদ্ধ উপলক্ষে কিছুদিন অন্যত্র ঘুরে এলে গ্লানি দূর হতে পারে। আর যুদ্ধে যদি মৃত্যু হয় তবে তো সব আপদ চুকে যায়। তখন তার মনে জীবনের চেয়ে মৃত্যু বাঞ্ছনীয়।

সেদিন সরকারী অফিস থেকে সবে তদ্বির করে সে ফিরেছে. তার প্রার্থনা পূরণ হওয়া অসম্ভব নয় আশ্বাস পাওয়ায় তার মন অনেকটা সুস্থ, এমন সময়ে গঙ্গারামকে নিয়ে কাদির আলী এসে সেলাম করে দাঁড়াল।

কি কাদির আলী, খবর কি ?

প্রশ্নটা নিতান্ত গতানুগতিকভাবেই করল, তার আশ্বাস জন ভুলেই গিয়েছিল।

হুজুর, রেশমী বিবির সন্ধান মিলেছে।

কথাটা শুনেও অর্থবোধ হল না জনের, শুধাল, কি মিলেছে ?

হুজুর, রেশমী বিবিজির পাত্তা মিলেছে।

জন মূঢ়ের মত শব্দগুলোর আবৃত্তি করল, রেশমী বিবিজির পাত্তা মিলেছে!

জী হুজুর।

দু-চার মুহূর্ত গেল জনের শব্দগুলোর অর্থ গ্রহণ করতে, তার পরেই ব্যাকুলভাবে চীৎকার করে উঠল, কোথায় সে? এনেছ তাকে? শীগগির বল কোথায়?

তখন কাদির আলী বিস্তারিতভাবে অনুসন্ধানপর্বের বর্ণনা শুরু করল। সে যে বৃথা সান্ত্বনা দেয় নি, বিবির সন্ধানে কলিঙ্গাবাজার, ডিঙিভাঙা, ডিহি ভবানীপুর, পটলডাঙা, বাগবাজার সব জায়গায় লোক পাঠিয়েছিল তা বলল; বলল, অনেক তকলিফ করেছে তার লোকজন; বলল, আজ কদিন তাদের আহার নিদ্রা বন্ধ।

জন অকালে তার বর্ণনা থামিয়ে দিয়ে বলল, ও সব কথা থাক, এখন বল কোথায় আছে বিবি?

কাদির আলী আবার বর্ণনা শুরু করল। গঙ্গারাম দেখল যে তার কৃতিত্ব মিঞা গ্রাস করবার চেষ্টায় আছে, হয়তো বা বকশিশটাও গ্রাস করবে, তাই সে বলে উঠল, হুজুর, বিবিজি বাগবাজারে আছে।

কে দেখেছে?

কাদির আলী মুখ খুলতেই গঙ্গারাম বলে উঠল, হুজুর, আমি দেখেছি।

তাকে নিয়ে এলে না কেন?

এ প্রশ্নের হঠাৎ কি উত্তর দেবে ভেবে পায় না গঙ্গারাম।

কাদির আলী তার মূঢ়তার সূত্র কুড়িয়ে নিয়ে আরম্ভ করে, হুজুর, অমনি কি বিবিজানকে আনা যায়? সে এখন ডাকুলোকের কাছে নজরবন্দী হয়ে আছে।

জনের কাছে সে শুনেছিল যে ডাকুলোক রেশমীকে জোর করে কেড়ে নিয়ে এসেছে।

ডাকুলোকের কাছে নজরবন্দী!

জনের রক্ত গরম হয়ে ওঠে। টেবিলের দেরাজা থেকে পিস্তলটা বের করে নিয়ে সে বলে, এখনই যাচ্ছি আমি।

কাদির আলী বলে, তাতে দাঙ্গাহাঙ্গামা হবে, ডাকুলোকেও গুলি ছুঁড়বে—

জন গর্জে ওঠে, ননসেন্স!

কাদির বলে, বিবির গায়েও গুলির লাগতে পারে।

জন টেবিলের উপরে পিস্তলটা রেখে দিয়ে বলে, তবে উপায়?

উদ্যতবচন গঙ্গারামকে থামিয়ে দিয়ে কাদির আলী বলে, একটু কৌশল করতে হবে।

কি কৌশল?

সেটা বিবি কাল চিঠি লিখে জানাবে।

চিঠি লিখবে এইটুকু জানিয়েছিল গঙ্গারাম, বাকিটুকু কাদির আলীর মস্তিষ্ক-প্রসূত। দোষ দেওয়া যায় না তাকে। বিবি যখন চিঠি লিখবে বলেছে তখন তাতে পলায়নের ষড়যন্ত্র ছাড়া আর কি থাকবে, ভেবেছিল কাদির আলী।

জন সরাসরি গঙ্গারামকে শুধায়, বিবি আচ্ছা হ্যায়?

গঙ্গারাম বলে, তবিয়ত আচ্ছা হ্যায়, লেকিন—

কি বলবে ভেবে পায় না, কাদির আলী সমস্যা পূরণ করে বলে, লেকিন দিল্

তো বহুত খারাপ হ্যায়।

উজ্জ্বল হয়ে ওঠে জনের মুখ।

জন গঙ্গারামকে বলে, কাল খুব ভোরে গিয়ে বিবির চিঠি নিয়ে আসবে, বকশিশ মিলবে।

বকশিশটা মধ্যপথে লুফে নিয়ে কাদির আলী বলে, হুজুরকে সেজন্য ভাবতে হবে না, আমার হাতে দিলে সব ঠিক ঠিক দিয়ে দেব।

গঙ্গারাম বিদায় নিতে নিতে ভাবে, কি আপদ! সংসারে সুবিচার বলে কিছু নেই। কাজ করে একজন, বকশিশ পায় অপরে।

তারা বিদায় হয়ে গেলে দরজা বন্ধ করে দেয় জন, তার পরে নতজানু হয়ে প্রার্থনা শুরু করে। কিন্তু কি বলে প্রার্থনা করবে সে! জন হচ্ছে মেরিডিথের দলের লোক; গির্জা, ভগবান, প্রার্থনা, ধর্ম এসব তাদের কাছে দূরশ্রুত কিংবদন্তী। সে হঠাৎ আবিষ্কার করে যে প্রার্থনার রীতিপ্রকৃতি তার জ্ঞানের অতীত। বাইবেলখানা খুলে মূঢ়ের মত পাতা ওলটাতে থাকে, হঠাৎ খুলে যায় পরবাসবন্দিনী রুথের কাহিনী।

মূঢ়ের মত আবৃত্তি করে যায় কাহিনীটি, শব্দাবলী মুখে মুখে এগিয়ে যায়, অর্থ খুঁড়িয়ে চলে পিছনে পিছনে, মুখে মনে মিল ভেঙে গিয়েছে জনের। বিদেশে বিয়ে হয়েছিল সুন্দরী রুথের। অল্পদিন পরে স্বামী গেল মারা। শাশুড়ী বলল, বাছা, আমার সাধ্য নেই তোমাকে ভরণ-পোষণ করবার, যাও তুমি স্বদেশে তোমার স্বজনগণের মধ্যে। রুথ বলে, সেখানে কোথায় আমার স্থান? তখন দুজনে কাজ করে অপরের শস্যক্ষেত্রে। ক্ষেত-মালিকের ছেলের ইচ্ছা রুথকে করে বিয়ে।

কোন্ দুর্জ্ঞেয় নিয়মে পৌরাণিক কাহিনী মিলে যায় আধুনিক বাস্তবের সঙ্গে। রুথ হয়ে দাঁড়ায় রেশমী; জন মুখে বলে—রুথ, মনে ভাবে—রেশমী। হঠাৎ কখন মন ছাপিয়ে গিয়ে ওষ্ঠাধর গুঞ্জরণ করে ওঠে—রেশমী। শব্দটি কানে প্রবেশ করবামাত্র সজাগ হয়ে ওঠে জন। বাইবেল রেখে দিয়ে উঠে দাঁড়ায় সে, ছায়া পড়ে আয়নায়।

পোশাকের অবস্থা দেখে শিউরে ওঠে—এতদিন এই বেশে শহরে ঘোরাঘুরি করেছে সে! কোট প্যান্টালুন শার্ট সমস্ত মলিন, সমস্ত দীন, সমস্ত কেমন লক্ষ্মীছাড়া! পোশাক বদলাতে চলে যায় তখনই।

কিছুক্ষণ পরে যখন পোশাক বদলে আয়নার সম্মুখে এসে দাঁড়ায়, মুখে তার হাসি। তাকে দেখলে রেশমীর মুখে যে হাসি ফুটত এ তারই প্রতিচ্ছবি। মনে পড়ে তার রেশমীর কথা।

রেশমী বলত, জন, তোমার হাসিটি বড় মিষ্টি।

তোমার চেয়েও? শুধাত জন।

নিশ্চয়, মেয়েদের চেয়ে পুরুষের হাসি অনেক বেশি মিষ্টি।

এ যে দেখি উল্টো কথা!

মোটেই উল্টো নয়, বলে রেশমী।

সে বলে যায়, মেয়েরা স্বভাবতই মিষ্টি, হাসি আর বেশি মিষ্টি হবে কি করে? স্বভাব-কঠিন পুরুষের মুখে হাসি অপ্রত্যাশিত, তাই মিষ্টি।

আর স্বভাবকোমল মেয়েদের মুখে রাগটি বুঝি বেশি মিষ্টি? শুধায় জন।

ঠিক ধরেছ, ঠিক যেন কোমল আঙুলে হীরের আঙটি।

জনের বিস্ময়ের অবধি থাকে না, রেশমী এতও জানে!

কাল সকালে গঙ্গারাম আনবে রেশমীর চিঠি। অপেক্ষায় দীর্ঘায়িত রাতটা আর কাটতে চায় না জনের। বারে বারে ঘড়ি দেখে, বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হয় না ঘড়ির উপরে, হাজার হক মানুষের তৈরি তো, নির্ভুল নয়; জানালার ফাঁকে তাকিয়ে দেখে আকাশের তারাগুলো, ওগুলোর ভুল হওয়ার কথা নয়। কোথাও সমর্থন পায় না তার মন। মানুষ থেকে শুরু করে গ্রহনক্ষত্র সমস্ত যেন ষড়যন্ত্র করেছে তার বিরুদ্ধে। অবশেষে বিরক্ত হয়ে একখানা বই তুলে নেয়। দু পৃষ্ঠা পড়বার পরে কাহিনীর দেয়ালে ফাটল ধরে, ফাটল ক্রমে চওড়া হয়ে দেখা দেয় করুণা-কৌতুকে সমুজ্জ্বল একখানি মুখ।

কি দেখছ রেশমী?

দেখছি মানুষ কত বোকা হতে পারে।

সারাদিন আমাকে বোকা বলে টীজ কর কেন? এমন কি নির্বোধ আমি সত্যি করে বল তো?

ও বলে বোঝানো যায় না।

তাহলে বুঝিও না। আর বলে যদি খুশি হও তবে না হয় বল, আমি আর বাধা দেব না।

যাক্ এটা তবু বুদ্ধিমানের মত কথা, বলে রেশমী।

তবে তো ভুল হয়ে গেল দেখছি, আবার বোকার মত ব্যবহার করা যাক—

এই বলে সে রেশমীর হাত ধরে টান দেয়, রেশমী পিছিয়ে যেতে চায়, কিছুক্ষণ দুজনের খুব টানাটানি চলে। অবশেষে এক সময়ে রেশমী আত্মসমর্পণ করে। সে ইচ্ছা কিছু কম হলে অনেকক্ষণ আগেই ধরা দিত। বাধা দিয়ে জনের মনকে ফেনায়িত করতে চায় সে।

আঃ কি কর, কি কর, ছাড়!

রেশমী যখন ছাড়া পায়, ঝড়ে দোল-খাওয়া বসন্তের পুষ্পবনের মত তার চেহারা। গাছতলায় বিন্যস্ত রঙ্গন, পলাশ, রক্তকরবী; বিতান-পরিত্যক্ত মাধবীলতা ভূলুণ্ঠিত; পল্লবনিলীন পুষ্পস্তবক দস্যু হাওয়ার করক্ষেপে মর্দিত, পাণ্ডুকপোল চমুকদল ছিন্নভিন্ন, বনানীর পত্রলেখা অবলুপ্ত, বসনাঞ্চল বিস্রস্ত আর তার বক্ষের শিখরিণী ছন্দ তখন শার্দূলবিক্রীড়িতের উৎকট তালে সংস্পন্দিত।

জন ভাবে রেশমী ফিরে এলে কলকাতাতেই হবে তার দীক্ষা, আর লুকিয়ে-চুরিয়ে শ্রীরামপুরে বা অন্যত্র নয়। আর তার পরে বিয়েটা হবে সেণ্ট জনের গির্জায়, কলকাতা শহরের বুকের উপরে, শ্বেতাঙ্গ সমাজ ও দেশী সমাজের চোখের সামনে। সে ভাবে, দেখুক সকলে। দেখি কার সাধ্য বাধা দেয়! আর বিয়ের পরেই দুজনে চলে যাবে রিষড়ায়, আগেই ভাড়া করে রাখবে ওয়ারেন হেস্টিংসের বাগানবাড়িটা, সেখানে গিয়ে কাটাবে হনিমুনের পক্ষকাল।

জেগে জেগে স্বপ্ন সৃষ্টি করে জন। দিবা আর রাত্রির মত স্বপ্ন আর বাস্তবে মানুষের জীবন যে নিত্য ভাগাভাগি।

অবশেষে প্রভাত হয়।

গঙ্গারামের অপেক্ষায় হলঘরে অধীরভাবে পায়চারি করে জন। এমন সময়ে বেলা দশটা নাগাদ গঙ্গারাম ঘরে ঢুকে সেলাম করে একগাল হাসি হেসে দাঁড়ায়।

বিবিজি চিঠ্‌ঠি দিয়া ?

জী হুজুর।

গঙ্গারাম এগিয়ে দেয় চিঠি।

চিঠিখানা লুফে নিয়ে একটা মোহর ছুঁড়ে দেয় জন গঙ্গারামের দিকে, তার পরে দ্রুতপদে ঘরে ঢুকে সশব্দে দরজা বন্ধ করে দেয়।

১০
শক্তু সরাব (২)

মনের গতিবিধি মানুষের সম্পূর্ণ পরিজ্ঞাত হলে সংসার বুঝি এমন দুঃখের উপত্যকা হত না। বিধাতা-পুরুষ যখন বিশ্ব-সৃষ্টি করে আত্মপ্রসাদ অনুভব করছেন, তখন কোন্ শয়তান সকলের অগোচরে তার মধ্যে এক ফোঁটা মন ফেলে দিয়ে অনর্থক জটিলতার সৃষ্টি করে তুলল। সুখের শিখর দেখতে দেখতে দুঃখের উপত্যকায় হল পরিণত।

জনকে চিঠি লিখে দেওয়ার পরে রেশমী খুব একপ্রকার আত্মপ্রসাদ লাভ করেছিল, ভেবেছিল, যাক সব চুকিয়ে দিলাম ; ভেবেছিল, এখন অনন্যমনা হয়ে আত্মসমর্পণ করলাম মদনমোহনের পায়ে।

কিন্তু সেদিন সন্ধ্যায় মদনমোহনের বাড়িতে গিয়ে মনে কেমন খটকা অনুভব করল, দেখল অন্যদিনের মত মন লাগছে না, কেমন যেন ক্ষণে ক্ষণে অবাধ্য মনটা খাঁচার ফাঁক দিয়ে উড়ে উড়ে নায়। তখনও সে বুঝতে পারে নি মনের অবাধ্যতার কারণ। তার চঞ্চলতা লক্ষ্য করে সেই বুড়িটা পিছন থেকে বলল, আজ বুঝি মন লাগছে না মা ?

রেশমী স্বীকার করল, বলল, না মা, মন লাগছে না।

তবে বুঝি মনে এখনও ভাগাভাগি আছে!

রেশমী চমকে উঠল, তবে কি সত্যি মনে এখনও ভাগাভাগি আছে ? কিন্তু কে বসাল ভাগ ? তখন যদি কেউ বলত যে, আর কেউ নয়, জন ভাগ বসিয়েছে তার মনে, তাহলে কিছুতে বিশ্বাস করত না সে।

আরতি শেষ হয়ে গেলে টুশকি বলে, চল সৌরভী, এবারে ফিরি।

পথে আসতে আসতে টুশকি বলল, পুরুষমানুষ বড় নেমকহারাম।

হঠাৎ একথা মনে হল কেন ?

টুশকি বলল, আজ বাজারে গিয়ে ক্ষান্ত দিদির কাছে একটা গল্প শুনলাম, সারাদিন সেই কথাটা মনে পাক দিয়ে উঠছে।

কি গল্প বল না দিদি ?

ক্ষান্তদিদি বাপের বাড়ি থেকে সবে কালকে ফিরেছে, তার কাছে শুনলাম। গল্পটা শুনে বুক ফেটে যাচ্ছে।

খুলে বল দিদি।

গোবিন্দ জোয়াদ্দার গাঁয়ের মধ্যে বর্ধিষ্ণু গৃহস্থ। অনেকদিন আগে একটা ভবঘুরে

ছেলে তার বাড়িতে এসে আশ্রয় নেয়। জোয়াদ্দার তাকে নিজের ছেলের মত মানুষ করে। ছেলেটি বড় হলে জোয়াদ্দার ভাবল যে, তার মেয়ের সঙ্গে ছেলেটার বিয়ে দেবে।—পাল্টি ঘর, কোন বাধা ছিল না। মেয়েটাও মনে মনে স্থির করেছিল, বাপ-মায়ের যখন ইচ্ছা, ওকেই বিয়ে করবে। সব যখন প্রায় ঠিকঠাক, ছেলেটা পালিয়ে গিয়ে পাশের গাঁয়ের এক মেয়েকে বিয়ে করল। জোয়াদ্দারের মেয়ে ঘেন্নায় দুঃখে গঙ্গায় ডুবে মরল।

রেশমী বলল, সত্যি দিদি, ছেলেটা কি নেমকহারাম!

শুধু ঐ ছেলেটা নয় বোন, পুরুষ জাতটাই নেমকহারাম। তোমার ভাগ্য ভাল যে, এমন নেমকহারামদের পাল্লায় তোমাকে পড়তে হয় নি।

ততক্ষণে তারা বাড়ি এসে পৌঁছেছে। গল্প শেষ হয়ে গেল, রেশ বাজতে লাগল রেশমীর মনে। হঠাৎ মনের অবাধ্যতার কারণ পেল সে খুঁজে—জনও তো কম নেমকহারাম নয়। হবেই বা না কেন, পুরুষমানুষ তো বটে। সাধারণভাবে পুরুষমানুষের সূত্রে তখন একটি মাত্র পুরুষ এসে তার মনের রঙ্গমঞ্চে দাঁড়াল। ধিক্কার, ঘৃণা, ক্রোধ, কৃপা—পাঁচমিশেলি ভাব অনুভব করল সে জনের প্রতি। রেশমী যদি মনস্তাত্ত্বিক হত, তবে বুঝত যে, ঐসব প্রতিকূল ভাবের সিঁধকাঠি দিয়েই সুড়ঙ্গ কাটা হয় মনের দেয়ালে। রেশমীর বদ্ধদ্বার মনের সুড়ঙ্গপথে প্রবেশ করল জন। সে স্থির করে রেখেছিল যে জনের সঙ্গে সম্বন্ধ চুকিয়ে দিয়েছে কিন্তু এখন দেখল, কি আপদ—মনের সর্বত্র জন। অনধিকার তার প্রবেশ সন্দেহ নেই, কিন্তু যে দুর্বল, কেমন করে সে ঘোষণা করবে ঐ সত্যটা আততায়ীর কাছে। নিদ্রাভঙ্গে ভীত যেমন নিদ্রিতবৎ পড়ে থেকে চোরের গতিবিধি লক্ষ্য করে, ভাবে দেখা যাক কত দূর কি করে, ভরসা রাখে শেষ পর্যন্ত সিন্দুকের চাবিটা খুঁজে পাবে না, অসহায়ভাবে রেশমী পর্যবেক্ষণ করতে লাগল জনের পদসঞ্চার।

নেমকহারাম, নেমকহারাম!

মনের নীচের তলার অধিবাসী বলে ওঠে, তার দোষ কি, তুমিই তো সব সম্বন্ধ চুকিয়ে চিঠি লিখে দিয়েছ।

কিন্তু চিঠিখানার জবাব দিতেও তো পারত।

ও চিঠির জবাব পেলে কি খুশি হতে? রূঢ় জবাব ছাড়া আর কি সম্ভব ও চিঠির?

কেন, এমন কি রূঢ় কথা আমি লিখেছি!

না, এমন আর কি! মরার বাড়া যে গাল নেই, তা-ই দিয়েছ মাত্র।

সে-ও না হয় তা-ই দিত।

ঝগড়া করা সকলের স্বভাব নয়।

জন বুঝি কম ঝগড়াটে? বোনের সঙ্গে ঝগড়া করে বাড়ি ছেড়ে যায় নি সে?

কার জন্যে ঝগড়া করেছিল? কার জন্যে বাড়ি ছেড়েছিল? নেমকহারাম কে?

জন, জন, জন!

ও তো রাগের কথা হল।

করব না রাগ? কেন ঢুকেছে আমার ঘরে?

জন হয়তো এটাকে নিজের ঘর মনে করে।

নিজের ঘর! দেখছ না দরজা বন্ধ!

আর দরজা বন্ধ হলেই কি মালিক ফিরে যায়?

তাই বলে সিঁধ কেটে ঢুকবে?

অগত্যা। তা ছাড়া হাতের কাছে সিঁধকাঠি যুগিয়ে দিলে কেন ?

সিঁধকাঠি ? কি বলছ ?

ঐ রাগ, দ্বেষ, ঘৃণা—ঐ তো সুড়ঙ্গ খোঁড়বার অস্ত্র।

বেশ করেছি।

তবে ঘরে ঢুকে জনও বেশ করেছে।

রেশমী স-কৌতূহলে লক্ষ্য করছিল যে তার মনটা দুইখানা হয়ে জন সম্বন্ধে সওয়াল জবাব করছে আর সে নিরপেক্ষ বিচারকের মত নির্বিকারভাবে বসে কৌতুক অনুভব করছে। তার ভারি মজা লাগছিল। মনের সূক্ষ্ম গতিবিধি সম্বন্ধে এই তার প্রথম অভিজ্ঞতা। বাদী-প্রতিবাদীর উকিল কিছুক্ষণের জন্য বিতণ্ডা থামালে নিরপেক্ষ বিচারক একটি ছোট্ট প্রশ্ন করল, আচ্ছা, চিঠির উত্তর পাওয়ার সময় কি সত্যই অতিক্রান্ত হয়েছে ? জন চিঠিখানা পেয়েছে, পড়বে, ভাল-মন্দ যা হক একটা উত্তর লিখবে, তার পর তো পাঠাবে।

তার মনের মধ্যে জনের উকিল বলে উঠল, ঠিক কথা। তাছাড়া চিঠি রেশমীর হাতে এসে পৌঁছবার একটা সময় নির্দিষ্ট আছে, টুশকি যখন ভোরবেলা বাজারে যায় সেই সময়, এদিক ওদিক হলেই বিপদ। রেশমী তাকে সমর্থন করে বলল, তবে ? তবে অযথা কেন জনকে দুষছ ?

তখন তার মনটা সবলে জনের অনুকূলে প্রতিক্রিয়াবান হয়ে উঠল, জনকে অন্যায়ভাবে দুষেছে ভেবে অনুতাপ দেখা দিল। জন হঠকারিতা করে অসময়ে চিঠি পাঠিয়ে তাকে বিপন্ন করে নি ভেবে সে কৃতজ্ঞতা অনুভব করল জনের প্রতি। জন সম্বন্ধে প্রতিকূল মনোভাব মুহূর্তে লোপ পেল। আশার পূর্বরাগে মনের দিগন্ত দেখতে দেখতে রাঙা হয়ে উঠল।

মানুষের মন চরাচরের সবচেয়ে আশ্চর্য পদার্থ, ভগবদ্‌-অস্তিত্বের এটাই বোধ হয় সবচেয়ে বড় প্রমাণ।

রেশমী কল্পনায় দেখল তার চিঠিতে মর্মাহত জন যন্ত্রণায় ছট্‌ফট করছে। এই দৃশ্য কেমন যেন তাকে আনন্দিত করে তুলল, শিকারী যেমন আনন্দ পায় স্ব-শরাহত শিকারের যন্ত্রণা দেখে। ঐ যন্ত্রণাই কি প্রমাণ করে না যে জন তাকে কত ভালবাসে। তার পরে সে কল্পনায় দেখল যে, বিনিদ্র জন সারারাত ধরে লিখল সুদীর্ঘ চিঠি ; সে চিঠি অনুনয়ে, অনুরাগে, সাধ্যসাধনায়, প্রতিশ্রুতিতে পূর্ণ। তার পরে দেখল চিঠিখানা গঙ্গারামের হাতে দিয়ে জন বলে দিল, জলদি গিয়ে দিয়ে এস, বিবিজি পুরস্কার দেবে।

রেশমী ভাবল, গঙ্গারামকে কি পুরস্কার দেবে, কিছুই তো নেই তার।

এই ভাবে রাত কেটে গেল। দুঃখের রাতও কাটে, সুখের রাতও কাটে।

টুশকি বাজারে চলে গেলে দরজায় দাঁড়িয়ে সে অপেক্ষা করতে লাগল, গঙ্গারামের আগমন সম্বন্ধে কোন সংশয় ছিল না তার মান।

যথাসময়ে অপ্রত্যাশিতের আবির্ভাব সংসারে বড় ঘটে না, কিন্তু এক্ষেত্রে ঘটল, দেখা গেল পথের মোড়ে গঙ্গারামকে।

সারারাত কেটে গেল, এইটুকু সময় আর কাটে না, কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে গঙ্গারামকে সে বলল, চিঠি কই ?

চিঠি বের করে দিল গঙ্গারাম। চিঠি দিয়েই ফিরছিল, রেশমী বলল, দাঁড়া।

এই বলে ভিতর থেকে কয়েকটা মোয়া নিয়ে এসে তার হাতে দিয়ে বলল, পথে

খেতে খেতে যাস বাবা, আর কাল সকালে একবার নিশ্চয় আসিস।

গঙ্গারাম তো অবাক। কাদির আলীর কাছে শুনেছিল যে পুরস্কার চাওয়া চলবে না, ভাল খবর নেই চিঠিতে। এখন এই অপ্রত্যাশিত আনুকূল্যের অর্থ বুঝতে না পেরে সে ভাবল, কি জানি বাবা, বড়লোকের কথাই আলাদা, তারা যে কিসে চটে আর কিসে খুশি হয় গঙ্গাই জানেন। সে দ্রুত অদৃশ্য হল।

চিঠিখানা বুকের মধ্যে চেপে ধরে রেশমী বিছানায় এসে শুয়ে পড়ে হাঁপাতে লাগল, প্রত্যাশার চাপা আনন্দের উদ্দাম ছন্দে তখন হাতুড়ি পিটছিল হৃৎপিণ্ডটা।

চিঠিখানা মুঠোয় নিষ্পিষ্ট করে সে অনুভব করছিল জনের কোমল হাতখানাকে— অনেক দিন পরে জনের সান্নিধ্য লাভ করল ঐ ক্ষুদ্র পত্রপুটে। মাধুর্যে, করুণায়, প্রেমে, প্রত্যাশায় তার মনের কানায় কানায় গেল ছাপিয়ে, বয়ে গেল অমর্ত্য সুরধুনীর প্রবাহ। এক একবার প্রচণ্ড আগ্রহ হচ্ছিল চিঠিখানা পড়বার, আবার তখনই সংযত করছিল ঔৎসুক্য। কি হবে পড়ে ? জন চিঠি পাঠিয়েছে এই কি যথেষ্ট নয় ? তার পর অনেকক্ষণ পরে যখন চিঠিখানা পড়া মনস্থ করলে, বাইরে পদশব্দ উঠল টুশকির। দ্রুত হস্তে চিঠিখানা খোঁপার মধ্যে লুকিয়ে প্রিয়-সমাগম-সঞ্জাত-রক্তাভ মুখে যখন সে বেরিয়ে এল, টুশকি তার দিকে চেয়ে মুগ্ধভাবে বলল, সৌরভী ভাই, আজ তোমাকে বড় সুন্দর দেখাচ্ছে।

রেশমী অস্বীকার করে বললে, আমি কি আগে কুশ্রী ছিলাম ?

তা কেন, তবে আজ একটু বিশেষ দেখছি।

হবেও বা।

তখন দুইজনে গৃহকার্যে নিযুক্ত হল, প্রসঙ্গটা ঐখানেই চাপা পড়ে গেল।

১১
পত্র পাঠ

রেশমীর চিঠি নিয়ে জন সেই যে ঘরের মধ্যে ঢুকেছিল তার পর সন্ধ্যার আগে বের হয় নি। দুপুর বেজে গেল, জনের অন্তর্ধান অফিসের লোকজনের আলোচনার বিষয় হয়ে উঠল, কেউ কেউ উদ্বেগ প্রকাশ শুরু করল। তখন বৃদ্ধ কাদির আলী ভুলে-যাওয়া যৌবনের হাসিতে পক্ব শ্মশ্রুগুম্ফ আলোড়িত করে বলল, তোমরা বেবাক্ বেআকুফ !

সে বলল যে, প্রিয়জনের চিঠি পেলে অমন মস্তানা দশা হয়েই থাকে। উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ করল নিজের দৃষ্টান্ত। যৌবনে সে যখন 'জরু'র চিঠি পেত, সারারাত কাটিয়ে দিত চিঠিখানা বুকে ধরে ; না খেত খানা, না যেত নিদ্রা।

গঙ্গারাম নিরক্ষর, তার জরুও নিরক্ষর, তাই এমন ঘটনা তার অভিজ্ঞতার বহির্ভূত। সে ভাবল, বাল্যকালে লেখাপড়া শিখলে না জানি জীবনে আরও কত রস পেত। বড়লোকের জীবনে কত রস ভেবে তার বিস্ময় প্রায় চরমে পৌঁছল। কিন্তু সে বিস্ময় একেবারে চূড়া স্পর্শ করল যখন সন্ধ্যাবেলায় হঠাৎ দরজা খুলে বেরিয়ে এল জন, গঙ্গারাম সময়োচিত হাসি দিয়ে করল অভ্যর্থনা। অমনি জন সগর্জনে বলে উঠল, হাস্তা কাহে টল্লু ? সঙ্গে সঙ্গে ছুঁড়ল লক্ষ্যভ্রষ্ট এক লাথি।

পলাতক গঙ্গারাম গিয়ে জানাল ব্যাপারটা কাদির আলীকে। কাদির দাড়িতে হাত বুলিয়ে বলল, বেটা, এমন হয়েই থাকে, সাহেব এখন প্রেমে মস্তানা।

গঙ্গারাম স্থির করল সাহেব মস্তানাই হক আর বাউরাই হক, কাছে না ঘেঁষাই বুদ্ধির কাজ।

জন চিঠিখানা নিয়ে ঘরে ঢুকে একটানে ফেলল খুলে, এক নিমেষে ফেলল পড়ে ; সংক্ষিপ্ত, সুতীক্ষ্ণ ভাষণ শাণিত ছুরিকার মত আমূল বিদ্ধ হয়ে গেল বুকে। সে শয্যা গ্রহণ করল—সন্ধ্যার আগে উঠল না।

তার মনে হল পরিচিত সুবিন্যস্ত জগৎ যেন ভূমিকম্পে ওলট-পালট হয়ে গিয়েছে, প্রবেশ ও বহির্গমনের পথ রুদ্ধ, ভূ-ভারে চাপা পড়েও কোনরকমে সে যেন বেঁচে রয়েছে।

তার মনে হল, এই সেই রেশমী, এই তার চিঠি ! তবে তো লিজার অনুমান মিথ্যা নয় ! লিজা বহুবার তাকে সতর্ক করে দিয়েছে, বলেছে, নেটিভ মেয়ে কখনও আপন হয় না ; বলেছে, প্রথম সুযোগেই সে পালাবে, একবার ছাড়া পেলেই স্বজনগণের মধ্যে গিয়ে উপস্থিত হবে।

জন বলেছে, তা কেমন করে সম্ভব ? বিয়ে যে হল—সে সম্বন্ধ ছিঁড়বে কি করে ?

লিজা বলেছে, ছোঃ, হিদেনদের আবার নীতিজ্ঞান ! দেখ নি ওরা একসঙ্গে দশগণ্ডা বিয়ে করে !

অস্বীকার করতে পারে নি জন এসব যুক্তি। তখন বলেছে, অন্য হিদেন মেয়ে যেমনই হক রেশমী সে দলের নয়। অনেকদিন আছে ও পাদ্রীদের সঙ্গে, ওর মনটা সংস্কারমুক্ত হয়ে গিয়েছে।

পাগলামি রাখ জন। হিদেনের মন কুকুরের লেজের মত, ছাড়া পেলেই বাঁকা হয়। তোমার রেশমী আর দশজনের মতই।

জনের মনে হল, লিজার অনুমান বর্ণে বর্ণে সত্য। নতুবা জনের বাগদত্তা হয়ে কিভাবে সে ত্যাগ করে জনকে, কিভাবে নির্লজ্জের মত গ্রহণ করে মদনমোহনকে স্বামীরূপে ! ইস্ আবার দেখ না, লিখেছে, এখন ঐ মদনমোহনই তার আশ্রয়, শান্তি, স্বামী ! তার নীতিজ্ঞান কানে কানে বলে দিল, বাগ্দত্তার আবার পত্যন্তর হয় কি করে ? মদনমোহন তার উপপতি ! সে ভাবল, আজ মদনমোহন মরে তো বেশ হয়, রেশমীকে চিতায় পুড়ে মরতে হবে, এবারে আর রক্ষা করবার জন্যে কেরী থাকবে না। এইরকম কত কি অসম্ভব, অসংলগ্ন চিন্তা করতে লাগল সে। উদ্‌ভ্রান্ত প্রেমিকের মস্তিষ্ক কুয়াশার জগৎ, সেখানে সমস্তই কিম্ভূত, অবাস্তব, অসম্ভব, সমস্তই কার্যকারণের সঙ্গতিশূন্য।

অনেক কয়বার চিঠিখানা ছিঁড়ে ফেলবার জন্যে উদ্যত হয়েও সে ছেঁড়ে নি। তার পরে সযত্নে রেখে দিল, ভাবল, থাক্ একখানা দলিল, আমার মত বিড়ম্বিত ব্যক্তিকে সতর্ক করে দেবার প্রয়োজন লাগবে। তার পরে সে বসে গেল রেশমীর চিঠির উত্তর লিখতে। অনেক কাগজ ছিঁড়ে, অনেক কাটাকুটি করে, মনের অনেক বিস্তারিত বিদ্বেষকে ঘনীভূত আকার দিয়ে, শাণিত ছুরির ফলার নিক্ষিপ্ত আলোকের ভাস্বরতা অর্পণ করে করে অবশেষে এক সময়ে সমাপ্ত হয় পত্র-রচনা।

সে লিখল—

"ডিয়ার লেডি,

লিজার অনুমান মিথ্যা নয়, হিদেনদের নীতিজ্ঞান বলে কিছু নেই। যদি থাকত

তাহলে তুমি আজ এমন করে একজনকে উপপতিরূপে বরণ করতে না। ভূতপূর্ব স্বামীর চিতায় তোমার পুড়ে মরাই উচিত ছিল। এবারে উপপতির সঙ্গে পুড়ে মরবার সাহস থেকে যেন বঞ্চিত না হও। আশা করি, এবারে আর তোমার মত ঘৃণ্য জীবকে কেউ বাঁচাবে না। কারণ তুমি একটি বাজারের বেশ্যা, আর তোমার উপপতি একটি আস্ত লম্পট। তোমার মত ডাকিনীর কুহক থেকে শেষ মুহূর্তে যে রক্ষা পেয়েছি, সেজন্য ঈশ্বরকে অসংখ্য ধন্যবাদ।

—জন স্মিথ।"

চিঠি লিখবার পরে মনের ভার খানিকটা হাল্কা হলে ঘুমিয়ে নিল সে ঘণ্টা দুই। তার পরে ভোরবেলায় গঙ্গারামকে চিঠি দিয়ে জন বলে দিল, জলদি দিয়ে এস—জবাব আনতে হবে না।

সন্ধ্যাবেলায় শারীরিক অসুস্থতার অজুহাতে রেশমী আরতি দেখতে গেল না, টুশকি একাই গেল। কিন্তু অসুস্থতার কোন লক্ষণ ছিল না রেশমীর শরীরে বা মনে। আজ সারাটা দিন একটি সু-গীত সঙ্গীতের মত তার কেটে গিয়েছে। মাঝে মাঝে খোঁপায় হাত দিয়ে দেখেছে চিঠিখানা লুকোনো আছে কিনা; অদৃশ্য ফুলের গন্ধে বনতল যেমন আমোদিত হয়ে ওঠে, সমস্ত অন্তর তার আজ তেমনি পূর্ণ। বিকালবেলায় চুল আঁচড়াবার জন্যে আয়নার সম্মুখে দাঁড়িয়ে সে চমকে উঠল, মুখে এ কি দিব্য কান্তি! চাঁদ পড়েছে মেঘে চাপা, তবু লাবণ্য টল্‌টল করছে। সেই চাপা চাঁদের স্মরণে আজ শাড়িটি বিশেষ ভঙ্গীতে পরল, কপালে খয়েরের টিপটি আঁকল, তার পরে গোধূলির আলো-আঁধারিতে গঙ্গার পশ্চিম তীর যখন রসিয়ে তুলেছে, শুক্লা তৃতীয়ার চাঁদের ক্ষীণ ওষ্ঠাধর যখন আকাশের প্রান্তে কৌতুক-বর্ষণে উদ্যত, তখন প্রদীপটি জ্বেলে নিয়ে চিঠিখানা কোলের উপরে মেলে ধরল, মিলল কালো-পঙ্‌ক্তির দুই চোখে আর তার সন্নত দুই চোখে। কি বহুপ্রতীক্ষিত মিলন চারি চক্ষুর!

এক নজরে চিঠিখানা পড়ে নিয়ে সর্পদষ্টবৎ অর্ধস্ফুট আর্তনাদ করে উঠল রেশমী। ফুলের মালায় ছিল সাপ, এতক্ষণ যে ফুলের মালাকে সযত্ন প্রশ্রয়ে বহন করছিল সে খোঁপার নিভৃত আশ্রয়ে। কিন্তু নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হয় না রেশমীর, বার বার ফিরে ফিরে সে পাঠ করে; তার পরে কেমন যেন রোখ চড়ে যায় মাথায়, উচ্চস্বরে পাঠ করে চিঠিখানা; এতক্ষণ যা চোখে দেখছিল, এবারে শোনে তাই কানে; কোন কোন কথা আছে যা একটিমাত্র ইন্দ্রিয়ের সাক্ষ্যে বিশ্বাসযোগ্য হয় না—তাই একাধিক সাক্ষীর তলব পড়ে।

'এমন করে একজনকে উপপতিরূপে বরণ করতে না।'....'এবারে উপপতির সঙ্গে পুড়ে মরবার সাহসে যেন বঞ্চিত না হও'...'তুমি বাজারের বেশ্যা'...ছত্রগুলো ছুরির ফলার মত আঘাত করে বুকে। আত্মঘাতপ্রয়াসীর যখন রোখ চড়ে যায় তখন যেমন সে বারংবার নিজেকে আঘাত করে উৎকট উল্লাস অনুভব করে, তেমনি অনুভূতি হতে লাগল ঐসব ছত্র পড়ে পড়ে রেশমীর—সে উপপতি গ্রহণ করেছে, সে যেন পুড়ে মরে, সে বাজারের বেশ্যা!

তার চিন্তাশক্তি এককালে লোপ না পেলে কথাগুলোর সত্যাসত্য বিচার করে দেখত সে, হয়তো তখন বুঝতে পারত যে, এর মধ্যে ভুল-বোঝাবুঝি আছে, জনশ্রুতির হস্তক্ষেপ আছে। কিন্তু বিচারের শক্তি তার ছিল না। পূর্বাপরের সূত্র ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল তার জীবনে,

সে যেন অতর্কিতে অত্যুচ্চ শিখর থেকে অতলস্পর্শ খাদে নিক্ষিপ্ত হয়েছে—দুঃসহবেগে ক্রমাগতই পড়তে পড়তে চলেছে, এর চেয়ে অনেক শ্রেয় ভূপৃষ্ঠে সংঘাত ও মৃত্যু।

কতক্ষণ সে এইভাবে মূঢ়ের মতন বসে ছিল জানে না, যখন সম্বিৎ পেল, শুনল টুশকির কণ্ঠস্বর। তাড়াতাড়ি চিঠিখানা আবার গুঁজল খোঁপার গুচ্ছে, ভাবল, পরীক্ষিতের মত তক্ষককে ধারণ করলাম মস্তকে, তার মতই যেন মুহূর্তে একমুঠি ভস্মমাত্র হয়ে অস্তিত্বের প্রান্তে মিলিয়ে যাই—কোথাও একটুকু চিহ্ন যেন না থাকে যে রেশমী বলে কেউ কখনও কোথাও ছিল।

১২
যেমন কাঠ তেমনি কাঠুরে

একদিন কলকাতার পুলিস সুপারিন্‌টেণ্ডেন্ট মিঃ স্পোকার মোতি রায়ের দেওয়ান রতন সরকারকে ডাকিয়ে বলল, সরকার, বড় বাড়াবাড়ি হচ্ছে, একটু সামলে চলতে হবে।

রতন সরকার বলল, হুজুর, আমরা খুব সাবধানে চলছি, কেবল মেয়েগুলো বে-আক্কেলে, চীৎকার করে পাড়া মাথায় করে।

তাদের কাছে তুমি কি আশা কর ? তাদের পাকড়াও করে নিয়ে যাবে, আর তারা চুপ করে থাকবে ?

রতন সরকার অপ্রস্তুত হওয়ার লোক নয়, জমিদারের নায়েবি করলে মানুষে যমকে ভয় করে না, বলল, তাই তো উচিত হুজুর। খামকা চীৎকার করে লজ্জার কথা প্রচার করে লাভ কি ?

স্পোকার বলল, সে কথা মিথ্যা নয়, তাছাড়া লোকের চীৎকারকে ভয় করা চলে না, কিন্তু ইতিমধ্যে যে বড়লোক এসে জুটেছে।

বড়লোকের হস্তক্ষেপ শুনে রতন সরকারও উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে, কে আবার এল এর মধ্যে ?

মাধব রায়—বলে স্পোকার।

হুজুর, মাধব রায়ের কথা বিশ্বাস করবেন না, লোকটা ঘোর মিথ্যাবাদী।

রতন সরকারের অভিযোগ এমনই সত্যভাষণে পূর্ণ যে, পুলিস সুপারিন্‌টেণ্ডেন্টের মুখেও হাসি ফুটল। সে বলল, অবশ্যই আমি তার কথা বিশ্বাস করি নি। কিন্তু মুশকিল কি জান, লোকটা আমার কাছে আসে নি, লাট কাউন্সিলের মেম্বারদের ধরেছে ; জানিয়েছে যে, মোতি রায়ের দৌরাত্ম্যে পাড়ার মেয়েদের সম্ভ্রম গেল, পুলিস নিষ্ক্রিয়।

স্পোকারকে উত্তেজিত করবার আশায় রতন সরকার বলল, এ যে ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খাওয়া।

শুধু ঘোড়া ডিঙিয়ে নয় সরকার, ঘোড়ার আস্তাবল সুদ্ধ ডিঙিয়ে। কিন্তু নিরুপায়। এবারে বন্ধ কর তোমাদের দৌরাত্ম্য, নইলে আমার সমূহ বিপদ।

রতন সরকার দীর্ঘ সেলাম করে বলল, এই কথা ? এখনই হুকুম দিয়ে দিচ্ছি।

এই বলে চৌকি ছেড়ে উঠতেই স্পোকার কাছে গিয়ে মৃদুস্বরে বলল, একবারে সব থামিয়ে দিতে হবে না, কারণ আমি জানি যে, মোতি রায়ের সম্মান আহত হয়েছে, এখন মেয়েটাকে খুঁজে বার করে সকলের সামনে দেখাতে না পারলে তার গৌরব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবে না, কিন্তু যা রয় সয়, তা-ই কর, বেশি জানাজানি না হয়।

রতন সরকার সেইরূপ প্রতিশ্রুতি দিয়ে বিদায় নিল।

মাঝখানের ঘটনা এখন প্রকাশ করে বলবার সময়। মাধব রায় মোতি রায়কে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে নিরস্ত করতে না পেরে সোজাসুজি রাধাকান্ত দেবের কাছে গিয়ে উপস্থিত হল। রাধাকান্ত দেব তখন নিতান্ত তরুণ যুবক। কিন্তু হলে কি হয়, শোভাবাজারের রাজপরিবারের ছেলে তো—ইংরেজ সরকারে তাঁর অবারিত গতি, প্রচুর সম্মান।

মাধব রায় বলল, হুজুর, আপনি মুখ তুলে না চাইলে তো হিন্দুসমাজ তলিয়ে যায়।

রাধাকান্ত দেব আনুপূর্বিক জানতে চাইলে—যা ঘটেছে, যা ঘটতে পারে এবং যা ঘটা অসম্ভব—সমস্ত একযোগে ঘটে গিয়েছে বলে নিবেদন করল মাধব রায়।

রাধাকান্ত বললেন, তোমাদের পাড়ায় যে এমন পৈশাচিক কাণ্ড চলেছে, তা তো জানি নে। যাক, ভয় ক'র না, আমি কাউন্সিলের মেম্বারকে জানাচ্ছি।

রাধাকান্ত দেবের নালিশ কাউন্সিলের মেম্বারের কানে পৌঁছল এবং তখন টনক নড়ল স্পোকারের। তার পরের ঘটনা হচ্ছে স্পোকার ও রতন সরকার সংবাদ।

রতন সরকার ফিরে গিয়ে সব জানাল মোতি রায়কে। মোতি রায় খেদবৈরাগ্য মিশ্রিত স্বরে বলে উঠল, মাধবটা সংসারে টিকতে দিল না দেখছি!

তার পর বলল, রতন, এখন তুমি যাও, একটু ভেবে দেখি।

পরদিন মোতি রায় বলল, দেখ, ঐ চণ্ডী বক্সীকে খুঁজে বার করতে হবে। এরা কেউ সেই মেয়েটাকে চেনে না, বকশিশের লোভে যাকে-তাকে ধরে গোল বাধাচ্ছে। যাও, খুঁজে বার কর চণ্ডীকে।

চণ্ডী কলকাতা ত্যাগ করে নি। খোঁজাখুঁজির পরে তাকে পাওয়া গেল, মোতি রায়ের লোকজন তাকে হুজুরে হাজির করল।

নিভৃতে চণ্ডীকে ডেকে মোতি রায় জানিয়ে দিল যে, তোমার কোন ভয় নেই, বৃথা তুমি পালিয়েছিলে।

চণ্ডী জিভ কেটে বলল, পালাই নি হুজুর, সম্মুখে একটা যোগ পড়েছিল, তাই শব-সাধনার জন্যে শ্মশানে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিলাম, আমরা তিন-পুরুষের তান্ত্রিক কিনা।

বেশ বেশ, আমি তো এইরকম নির্ভয় লোককেই পছন্দ করি, বলে মোতি রায়।

দেখ চণ্ডী, তোমাদের মেয়ে ম্লেচ্ছের হাতে পড়ে থাকবে, এটা কি উচিত হচ্ছে?

হুজুর, তারই প্রতিকার আশাতেই তো আমার শবসাধনা!

তার পরে সে নিজের মনে বলে ওঠে, এবারে মরবে বেটা ম্লেচ্ছ!

নিশ্চয় মরবে, বিশেষ তুমি যখন ক্রিয়া করেছ; কিন্তু সমস্ত ভার দৈবের উপর ছেড়ে দিলে তো চলে না, পুরুষকারের সাধনাও করতে হয়।

হয় বই কি হুজুর, দুটি চক্র না হলে কি গাড়ি চলে?

কী বলেছ চণ্ডী, গাড়ি চলতে দুটি চক্র চাই। আর মনে কর সে চক্র যদি রজত-চক্র হয়, তবে গাড়ি কেমন চলে!

এই পর্যন্ত বলে হঠাৎ গম্ভীরভাবে বলে ওঠে মোতি রায়, বক্সী, এখানে খামকা বসে থেকে কি করবে, কিছু টাকা রোজগার কর, মেয়েটাকে সনাক্ত করে দাও।

একটু থেমে আবার শুরু করল, আর তা যদি না কর তবে মনে রেখ যে, আমিও শবসাধনায় বসতে জানি, জ্যান্ত মানুষের গর্দান স্বহস্তে কেটে শব প্রস্তুত করে নেওয়া আমার বিধান।

পরমুহূর্তেই হাসিতে মুখখানা প্রসন্ন করে বলল, নাও নাও বক্সী, মেয়েটাকে সনাক্ত করে দাও, একটু আমোদ-আহ্লাদ করা যাক। বুঝতেই তো পারছ, একদিন তোমারও তো ছিল আমার মত বয়স!

এই বলে হাঁক দিয়ে উঠল মোতি রায়, ওরে কে আছিস, ভাল হুঁকোয় করে অম্বুরী তামাক সেজে নিয়ে আয় বক্সীর জন্যে।

কিন্তু হুজুর, মেয়েটা যদি এখানে না থাকে?

এটা কি একটা কথা হল বক্সী? এখানে না থাকলে তুমি এখানে বসে আছ কোন্ আশায়?

মুহূর্তে প্রসঙ্গ পাল্টে বলে, নবাবী আমলের কিরিচ দেখেছ বক্সী? এক কোপে হাতীর গর্দান নামিয়ে দেওয়া যায়। আমার তোষাখানাতে খান-অষ্টেক আছে। দেখবে?

চণ্ডী বক্সী উত্তর দেয় না, কিন্তু তার ভাব-গতিকে স্বীকৃতি প্রকাশ পায় যে, এতদিনে তার জুড়ি মিলেছে। যেমন কাঠ তেমনি কাঠুরে। এ হেন যুগল যেখানে মিলিত হয়, সে স্থান সংসার-রসিকের তীর্থ।

চণ্ডী সবিনয়ে বলে, হুজুর, আমার বাড়ির মেয়েকে আমি ধরিয়ে দেব, লোকে বলবে কি?

নিশ্চয় নিশ্চয়। বলে প্রচুর সুগন্ধি ধূম উদ্‌গিরণ করে মোতি রায়। তার পর অনেকক্ষণ কুণ্ডলীকৃত ধোঁয়ার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে, যেন ওখানে সমাধান আছে এই জটিল সমস্যার। তার পর তাকিয়ার উপরে ভর দিয়ে দেহটাকে ঈষৎ উত্তোলন করে বলে, জানছে কে বক্সী, জানছে কে?

একটু পরে বলে, তাহলে তুমি স্বীকার করলে! বেশ, বেশ। ওরে কে আছিস, বক্সীর স্নানাহারের ব্যবস্থা করে দে। কি বল বক্সী, কোথায় আর যাবে এত বেলায়?

তার পরেই মুখখানায় শাণিত গাম্ভীর্য এনে বলে, নবাবী আমলে একটি সুন্দর রীতি ছিল, আসামীকে ডালকুত্তা দিয়ে খাওয়ানো হত। কর্তাদের আমলে আমাদের বাড়িতেও সে রীতি দেখেছি। কোম্পানির আমলে সেসব সুন্দর প্রথা লোপ পেল। তবে এখনও গোটা দুই ডালকুত্তা আছে আমার। দেখবে নাকি বক্সী?

মোতি রায়ের মেদ-মেদুর মুখমণ্ডলে যুগপৎ স্নিগ্ধ আভা ও খরবিদ্যুৎ কি চমৎকার মানায়, বিস্মিত হয়ে দেখছিল চণ্ডী। সে বুঝল, স্বীকার না করলে নিতান্ত ডালকুত্তার পেটে যদি বা না যেতে হয়, বেঘোরে গুম-খুন হতে কতক্ষণ! সে বলল, হুজুরের কথার অবাধ্য আমি নই, তবে জানাজানি না হয়। ছুঁড়িটার দেখা পেলে আমি দূর থেকে দেখিয়ে দেব—আপনার লোকজন ধরে নিয়ে যাবে—এইটুকু দয়া আমাকে করতে হবে।

সে তো করতেই হবে। তুমি দেখিয়ে দিয়েই খালাস—তার পরে আমার লোকজন আছে।

তবে এখন উঠি কর্তা।

আহা উঠবে কোথায় ? আমার বাড়িতে কি তোমার একটু স্থান হবে না ?

সঙ্গে আবার বুড়িটা আছে কিনা।

সে দায় আমার। তুমি এখানেই থাকবে। এই বলে মোতি রায় খানসামার হাতে চণ্ডীর ভার অর্পণ করে।

চণ্ডী বোঝে যে, আগে ছিল নজরবন্দী, এবারে সত্যকার বন্দী।

তার পরে মোতি রায় রতনকে ডেকে হুকুম দেয়, দেখ মেয়েগুলোকে ধরে শহরের মধ্যে দিয়ে যেন টেনে নিয়ে যাওয়া না হয়, ওতেই চেঁচামেচি করে লোক জানাজানি হয়ে যায়। এবারে ধরেই ঘাটে নিয়ে গিয়ে নৌকায় তুলবে—আর সোজা নিয়ে যাবে কাশীপুরে। নদীর ধারেই বাগানবাড়িটা, জানাজানি হওয়ার ভয় থাকবে না।

রতন সরকার বলে, সেইরকম হুকুম করে দেব হুজুর।

আর বাড়িটা রঙ করা শেষ হয়েছে তো ?

রতন সরকার জানায়, হয়েছে।

তবে আর কি, জলসার সব ব্যবস্থা ঠিক রেখ। মেয়েটা ধরা পড়লে...

কথা শেষ করে না, প্রয়োজন হয় না। না বোঝবার কিছু নেই।

তার পরে শুধায়, নিমন্ত্রণের তালিকা ঠিক করে রেখেছ ?

হাঁ হুজুর।

দেখ, মাধব রায় যেন বাদ না পড়ে। দেখি তার মেম্বর শ্বশুর কি করতে পারে !

এই বলে মুখ থেকে আলবোলার নল সরিয়ে হো হো শব্দে হেসে ওঠে মোতি রায়। ভয় পেয়ে কার্নিসের পায়রাগুলো ঝাঁক বেঁধে আকাশে ওড়ে।

১৩
মুখোমুখি

মানুষের আর সব সম্বল যখন ফুরিয়ে যায়, তখন হাতে থাকে চোখের জল। ওর আর অন্ত নেই, কোন্ দুর্জ্ঞেয় চির-হিমানী-শিখরে ওর উৎস। চোখের জলে ঝাপসা হয়ে সূর্য ওঠে রেশমীর, আবার চোখের জলের কুয়াশাতেই হয় তার অস্ত। চোখের জলের স্রোতে নিঃশব্দ প্রহরগুলো ভেসে চলে যায় রেশমীর জীবন থেকে। ঝরা শ্রাবণের পূর্ণিমার চাঁদের মত ও চোখের জলের বর্ষণ ঠেলে কোনরকমে এগোয়। এতদিনে ও বুঝতে পেরেছে সংসারে কাঁদবার অবসর অপ্রচুর নয়। গঙ্গায় ডুব দিয়ে কাঁদে, জলে জল মিশে যায় ; ধোঁয়ার ছলনা করে কাঁদে, বাষ্পে বাষ্প মিশে যায় ; আয়নার সম্মুখে দাঁড়িয়ে কাঁদে, ছায়াতে কায়াতে বেশ মিশে যায় ; বালিসে মুখ লুকিয়ে কাঁদে, বিছানায় জল মিশে যায় ; কিন্তু স্বপ্নের মধ্যে যখন কেঁদে ওঠে সে, ভাবে, ভগবান কি করলে, নিতান্ত হতভাগ্যকেও তুমি স্বপ্নসুখের বরাদ্দ করে থাক—সেটুকুও কেড়ে নিলে আমার !

এত চোখের জল তো লুকানো থাকে না। টুশকি শুধায়—কি হয়েছে বোন, কিসের এত দুঃখ, বল খুলে আমাকে।

কি বলবে রেশমী ? বলতে হলে আস্ত একখানা রামায়ণ বলতে হয়, ইচ্ছা হয়

না রেশমীর, অথচ চোখের জলের একটা কারণ দর্শানো তো চাই।

সে বলে, দিদি, বাড়ির কথা মনে পড়ছে।

এটা অসঙ্গত কথা নয়।

টুশকি বলে, নিতান্ত যাওয়ার ইচ্ছা হয় তো বল, দেখি সেথো-সঙ্গী পাওয়া যায় কিনা।

রেশমী তো প্রকৃত তথ্য গোপন করেছে, তাই সেথো-সঙ্গীর জন্য আগ্রহ দেখায় না।

টুশকি বলে, আচ্ছা না হয় এখন না-ই গেলে, দেখি তোমার গাঁয়ের দিকে কোন লোক যায় তো তার হাতে একখানা চিঠি পাঠিয়ে দাও।

তাতেও বড় আগ্রহ প্রকাশ করে না রেশমী। দাবানলের হরিণী যেদিকে এগোয় সেদিকেই আগুন।

অবশ্য আত্মসমর্পণ না করে উপায়ও থাকে না। টুশকি বলে, শোন বোন, তোমার চেয়ে আমার বয়স বেশি, সংসারটা দেখলামও বেশি, দুঃখ এমন জিনিস যা ভাগ করে নিলে কমে, আর সুখ এমন জিনিস যা ভাগ করে নিলে বাড়ে।

রেশমী বলে, দিদি, সুখের ভাগ নেবার লোকের অভাব হয় না, দুঃখের ভাগ নেবে কে ?

টুশকি বলে, আরে পাগল, সংসারটা বড় অদ্ভুত জায়গা, দুঃখের ভাগ নেবার লোকেরও অভাব হয় না এখানে।

তার পর একটু থেমে বলে, সে রকম লোক না গড়েই কি দুঃখ গড়েছেন বিধাতা !

নেবে তুমি আমার দুঃখের ভাগ ? শুধায় রেশমী।

যদি দাও।

কেন নিতে যাবে পরের দুঃখ ?

যদি চাও তো আমার দুঃখের ভাগও না হয় তোমাকে দেব।

তার পর হেসে বলে, সংসারে দুঃখের অভাব কি বোন ?

তবে একটা গল্প শোন, বলে পুনরায় আরম্ভ করে টুশকি ঃ সেবার গিয়েছিলাম সুন্দরবনে, তা সে আজ অনেক দিনের কথা হল, গাঁয়ের নাম ন'পাডা, গাঁ আর বন পাশাপাশি, কোথায় গাঁয়ের শেষ আর কোথায় বনের শুরু বোঝবার উপায় নেই। আমি ভাবি, তা উপায় না থাকে না থাক, আমার তো ভালই হল, বন দেখতে এসেছি বন দেখি। এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াই। তাই দেখে বুড়িমা—যে বাড়িতে গিয়েছি সেই বাড়ির কর্ত্রী—বলল, মা, অমন কাজটি ক'র নি, অমন একা একা যেখানে সেখানে যেও নি।

কেন মা ? শুধাই আমি।

এখানে যে প্রত্যেক ঝোপে-ঝাড়ে বাঘ।

দিনের বেলাতেও ?

দিনের বেলাতেও বইকি। দিনের বেলায় বাঘগুলো যাবে কোথায়।

তার পরে টুশকি দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে বলে, সংসারে প্রত্যেক ঝোপে-ঝাড়ে দুঃখ, জাগরণেও দুঃখ, ঘুমন্তেও দুঃখ। লোকে যখন বলে যে, ঘুমোলে দুঃখের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে, তখন আমার বুড়িমার কথা মনে পড়ে—দিনের বেলায় বাঘগুলো যাবে কোথায় ? ঘুমোলে দুঃখগুলো যাবে কোথায় ? তখন তারা স্বপ্নে গুঁড়ি মেরে এসে

নিঃশব্দে ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ে।

হঠাৎ নিজের মনটাকে সবলে ঝাঁকুনি দিয়ে জাগ্রত করে তুলে রেশমী বলে, শুনবে দিদি আমার সব কথা?

টুশকি বললে, শুনব বইকি।

শুনলে তাড়িয়ে দেবে না তো?

বিস্মিত টুশকি বলে, তাড়াতে যাব কেন?

হয়তো বাড়িতে রাখবার অযোগ্য মনে করবে।

টুশকি মনে মনে হাসে। মনে মনে বলে, তুমি এইটুকু জীবনে এমন কি পাপ করেছ জানি না, কিন্তু আমার সব কথা শুনলে এখনই এ বাড়ি ছেড়ে না যাও তো কি বলেছি।

টুশকিকে নিরুত্তর দেখে বলে, কি, তাড়িয়ে দেবে নাকি?

শোন একবার কথা! মামলা না শুনেই রায়?

রায় কি হবে তা বুঝতে পারছি, কিন্তু তবু বলব।

যদি মনে খুঁত থাকে, না-ই বললে।

না দিদি, আর এত ভার একা বইতে পারি নে।

বেশ, এস না তবে, ভাগ দাও। আমিও কিছু ভাগ দেব তোমাকে। তুমি কি ভাব দুঃখ একতরফা?

রেশমী বলে, এতদিন বোনের মত মায়ের মত আশ্রয় দিলে আর তোমার কাছে সত্য গোপন করে বসে আছি, বড় দুঃখ হত। কতবার ভেবেছি, বলব সব কথা তোমাকে। তখনই ভয় হয়েছে, যদি সে সব কলঙ্কের কথা শুনে তাড়িয়ে দাও, যাব কোথায়?

টুশকি বলে, আরে পাগলী, মানুষ কি দোষগুণ বিচার করে ভালবাসে? আগে ভালবেসে ফেলে তার পরে খুঁজে খুঁজে গুণ বের করে। ভালবাসা এমনই যে তাতে দোষকেও গুণ মনে হয়। দেখ নি মাঘের শিশিরে সূর্যের আলো পড়লে মুক্তো বলে মনে হয়!

রেশমী বলে, আজ সন্ধ্যাবেলা খুলে বলব সব, তার পরে যা থাকে কপালে।

বেশ তো, ভাগাভাগি করা যাবে দুঃখের, আমিও নেব দুঃখের ভার। দেখি কার দুঃখের ভার বেশি, কার কলঙ্কের রঙ বেশি গাঢ়।

তখন দুজনে স্থির করে যে, রাত্রে শুনবে তারা পরস্পরের কথা।

সন্ধ্যাবেলা মদনমোহনের আরতি দেখবার জন্যে টুশকি একাকী গেল। ইদানীং কয়েক দিন রেশমী যাওয়া বন্ধ করেছে, তাই টুশকি আর পীড়াপীড়ি করে না। আজকে রেশমীর মনটা অনেকটা হালকা, তবু সে গেল না। তার ইচ্ছা যে, দুজনে মুখোমুখি হওয়ার আগে মনটাকে গুছিয়ে প্রস্তুত করে নেবে। মনের মালখানায় সব স্তূপাকারে অগোছালে পড়ে আছে—একটু সাজিয়ে-গুছিয়ে না নিলে নিজেরই যে পথ করে চলা কঠিন, অপরে ঢুকবে কি উপায়ে?

ভাবতে ভাবতে রেশমী ঘুমিয়ে পড়েছিল। যখন জাগল, দেখল বাতিটা কখন নিভে গিয়েছে, বুঝল রাত নিশ্চয় অনেক। ভাবল টুশকি নিয়মিত সময়ে নিশ্চয় ফিরেছে আর ঘুমের ঘোরে কখন হয়তো ওরা খেয়ে নিয়েছে, মনে না পড়বারই কথা। পাশে হাতড়িয়ে দেখল টুশকির বিছানা শূন্য। শূন্য? কোথায় গেল?

রেশমী উঠে বাতি জ্বালল। দেখল যে, বাড়ির মধ্যে কোথাও টুশকি নেই দেখল রান্নাঘরে দুজনের ভাত ঢাকা পড়ে রয়েছে, দরজা বাইরে থেকে বন্ধ। সে বুঝল টুশকি ফেরে নি। এমন সময়ে মদনমোহনের বাড়িতে ডঙ্কা বেজে উঠল। রেশমী বুঝল যে, রাত শেষ প্রহর। নিঃশব্দ আকাশের তলে প্রদীপ হাতে মূঢ়ের মত সে দাঁড়িয়ে রইল। সে রাত্রে টুশকি ফিরল না।

১৪
রেশমী(?)-হরণ

সেদিন বিকাল থেকে বৃষ্টি শুরু হয়েছিল, সন্ধ্যাবেলায় চেপে এল। টুশকি যখন মদনমোহনের বাড়িতে এসে পৌঁছল, দেখল আঙিনা জনশূন্য, নাট-মন্দিরের মধ্যে সামান্য কয়েকজন মাত্র লোক। আরতি শেষ হওয়াব আগে বৃষ্টিতে আবার জোর লাগল, বৃষ্টি কমবে আশায় অপেক্ষা করে রইল টুশকি। তখন মন্দির প্রায় জনশূন্য। অবশেষে বৃষ্টি কমে এল। রাত্রি অনেক হয়েছে, আর অপেক্ষা করা উচিত নয় মনে করে সে যেমন মদনমোহনের বাড়ি থেকে বেরিয়ে অন্ধকারের মধ্যে রাস্তায় নেমেছে, অমনি নিঃশব্দে তিন-চারজন লোক তার ঘাড়ের উপর এসে পড়ল। একজন একখানা গামছা দিয়ে তার মুখ বেঁধে ফেলল, আর জনদুই মিলে তাকে ধরাধরি করে নিয়ে যাত্রা করল। মুহূর্তের মধ্যে সমস্ত রহস্য পরিষ্কার হয়ে গেল তার কাছে, বস্তুত রহস্যজনক কিছু ছিল না এতাদৃশ ব্যাপারে। টুশকি বুঝল, এরা মোতি রায়ের লোক, বুঝল সেই মেয়েটা মনে করে তাকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে কাশীপুরের বাগানবাড়িতে। গুণ্ডাদের হাত থেকে উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টা সে করল না, সাধ্য ছিল না—ইচ্ছাও বুঝি ছিল না ; নীরবে বিনা আয়াসে সে আত্মসমর্পণ করল ভবিতব্যের কাছে। তাকে নিয়ে একখানা নৌকার উপরে তোলা হল, মুখ তখনও গামছায় বাঁধা, কিন্তু চোখ খোলা, দেখতে বাধা ছিল না। সে দেখল যে আততায়ী তিনজন নৌকায উঠল, চতুর্থ ব্যক্তি তীরে দাঁড়িয়ে রইল। জোয়ারের মুখে নৌকো ছুটে চলল উজানে। আকাশের অসীম অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে সে পড়ে রইল, মনে হল সৌরভী না জানি তার জন্যে কত রাত্রি পর্যন্ত জেগে অপেক্ষা করে থাকবে।

অপস্রিয়মাণ চতুর্থ ব্যক্তি চণ্ডী বক্সী। মোতি রায়ের প্ররোচনায় ও শাসনে রেশমীকে দেখিয়ে দিতে সে সম্মত হয়েছিল। চণ্ডী জানত যে, রেশমী কলকাতাতেই আছে, আর সাহেব-পাড়াতে না গিয়ে এদিকেই কোথাও লুকিয়ে আছে। মদনমোহনের বাড়িতে তার দেখা পাওয়া যাবে বলে তার যে ধারণা হয়েছিল, শেষ পর্যন্ত তা সত্য বলে প্রমাণিত হল। মোতি রায়ের লোকের সঙ্গে আজ দুদিন মদনমোহনের বাড়িতে সে এসেছে, সাক্ষাৎ পায় নি রেশমীর। আজকে বৃষ্টির মধ্যে সে এসেছিল, চণ্ডী জানত দৈবদুর্যোগ এসব কাজের পক্ষে প্রশস্ত। তবে তার একটুখানি ভুল হয়ে গেল, সে ভুল দিনের খর আলোতেও অনেকে করছে, আর এ তো রাতের অন্ধকার। টুশকিকে রেশমী বলে ভুল করেছিল। চণ্ডী বলেছিল যে, সে দূর থেকে মেয়েটাকে ইশারায় দেখিয়ে দেবে, সামনাসামনি উপস্থিত হতে পারবে না ; হাজার হক, গাঁয়ের মেয়ে তো বটে।

রাস্তার উপরে দাঁড়িয়ে থেকে নাট-মন্দিরের আলো-আঁধারির মধ্যে টুশকিকে দেখে সে চমকে উঠল। এই তো রেশমী! তখন একবার ভাবল যে, দূর ছাই, না-ই ধরিয়ে দিলাম, ধরিয়ে দিলে মেয়েটার কি গতি হবে, সে বিষয়ে তার কোন ভ্রান্ত ধারণা ছিল না! তার পরে ভাবল, হুঁ, ওর জন্যে আবার এত চিন্তা কেন; ওকে বাঘে খেলেও খাবে, কুমীরে খেলেও খাবে। তা ছাড়া চিতা থেকে যে পালিয়েছে তার আবার সতীত্ব, তার আবার কুমারীত্ব। চণ্ডীর দৃঢ় প্রত্যয় হল যে, রেশমীর পক্ষে জনের শয্যায় আর মোতি রায়ের শয্যায় কোন প্রভেদ নেই। তবু মনের মধ্যে কেমন খচখচ করতে লাগল। তখনই মনে পড়ল, মোতি রায়ের সুরা-বিঘূর্ণিত চক্ষু আর শাসন। প্রাণের ভয় তুচ্ছ করে সৎ কাজ করতে যারা পারে, চণ্ডী বক্সী সে দলের নয়। রেশমীকে দূর থেকে দেখিয়ে দিয়ে সে আড়ালে গেল, তার পরে নির্বিঘ্নে সে নৌকায় নীত হলে অন্ধকারের মধ্যে সরে পড়ল।

কিছুক্ষণ পরে নৌকা গিয়ে তীরে ভিড়ল। আততায়ীরা টেনে নামাল টুশকিকে, নিয়ে চলল সঙ্গে। দু-চার মিনিটের মধ্যেই তারা এসে পৌঁছল একটা বাগানবাড়িতে। টুশকি বুঝল, এই সেই বহুশ্রুত মোতি রায়ের বাগানবাড়ি। কোন কথা এ পর্যন্ত সে বলে নি, নীরবে সব দেখছিল। তাকে নীচের তলায় দাঁড় করিয়ে একজন উঠে গেল দোতলায়। ফিরে এসে লোকটা ইঙ্গিত করল, সকলে মিলে নিয়ে চলল টুশকিকে দোতলায়। একটা বড় হলঘরের মধ্যে তাকে ঢুকিয়ে দিয়ে দরজা বন্ধ করে তারা সরে পড়ল।

প্রদীপের স্তিমিত আলোতে সে দেখতে পেলে একখানা পালঙ্কের উপরে অর্ধশায়িত অবস্থায় পড়ে আছে মোতি রায়। মোতি রায়কে সে চিনত।

মোতি রায় সুরা-বিজড়িত কণ্ঠে বলল, কি দাঁড়িয়ে রইলে কেন, ঐ চৌকিখানায় বস।

টুশকি বসল না, যেমন ছিল তেমনি দাঁড়িয়ে রইল।

মোতি রায় তাকিয়া আশ্রয় করে একটু নড়েচড়ে উঠে বলল, বস রেশমী।

এবারে টুশকি কথা বলল– এই প্রথম—বলল, আমি রেশমী নই।

গদ্‌গদ কণ্ঠে মোতি রায় বলল, রেশমী নও, পশমী তো?

ওটাও আমার নাম নয়।

আচ্ছা রেশমী না হও, পশমী না হও, সুতী তো?

খুব একটা রসিকতা করা হল মনে করে হেসে উঠল মোতি রায়।

শিউরে উঠে টুশকি ভাবল, কি বিকট হাসি, যেন নরকের দরজার শিকল খোলার ঝনঝন ধ্বনি।

তবে তোমার নাম কি?

টুশকি।

বাঃ, বেশ মিষ্টি নামটি তো! দাঁড়াও দেখি কি কি মিল পাওয়া যায় তোমার নামের সঙ্গে—টুশকি, খুস্কি, ঘুষকি...আজ মাথাটা বেশ খুলেছে, হরু ঠাকুর থাকলে খুশি হত। দেখি আর কিছু পাওয়া যায় কিনা। মুচকি? উঁহু, ওটা চলবে না।

এতক্ষণ মোতি রায় নিজের মনেই বলে চলছিল, এবারে টুশকিকে লক্ষ্য করে বলল, বুঝতে পারছ না নিশ্চয়, ভাবছ লোকটা কি সব বাজে বকছে। তবে শোন, আমি হরু ঠাকুরের কাছে গান-বাঁধা শিখছি। হরু ঠাকুর বলে যে, গান বাঁধতে হলে আগে হাতের

কাছে মিলগুলো গুছিয়ে নিয়ে বসতে হয়। ঠাকুরের উপদেশ এমনি মনে ধরেছে যে, একটা শব্দ শুনলেই মিলগুলো আপনি মনে পড়ে যায়। টুশকি, খুস্কি, ঘুষকি—কিন্তু—উঁহু—মুচকি চলবে না।

তার পরে হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে বলে ওঠে, কেন চলবে না, একশ বার চলবে। হরু ঠাকুর আপত্তি করলে তার মাসোহারা বন্ধ করে দেব না! আলবৎ চলবে, বাপ-বাপ বলে চলবে। শোন না, ইতিমধ্যেই কেমন একটা গান বেঁধে ফেলেছি—

ঐ যে পাড়ার ঘুষকি,
নামটি তাহার টুশকি,
মাথা ভরা খুস্কি,
হেসে চলে মুচকি।

নিজেই নিজেকে উৎসাহিত করে বলে ওঠে, বাঃ বাঃ, বেড়ে হয়েছে! কাল ঠাকুরকে দিয়ে একটা সুর বসিয়ে নিতে হবে। কি বল?

হঠাৎ টুশকিকে লক্ষ্য করে বলে, কি, বসলে না?

এবারে টুশকি সাহস সঞ্চয় করে বলে, আপনি যে মেয়ের সন্ধান করছেন, আমি সে মেয়ে নই।

সে মেয়ে নও? চালাকি ক'র না চন্দ্রবদনী। ঐ কথা শুনতে শুনতে এই কদিনে কান পচে গিয়েছে—আজকে আসল মানুষটিকে পাওয়া গিয়েছে।

তার পর গুনগুন স্বরে গেয়ে উঠল, 'আজু রজনী হাম ভাগে পোহায়নু পেখনু পিয়ামুখ চন্দা'! তার পরে বলল, নাঃ কেবলই মাঝরাত, তা হক, পিয়ামুখ-চন্দা তো মিথ্যা নয়।

টুশকি স্থির কণ্ঠে বলল, আমি রেশমী নই, আমি মদনমোহনতলার টুশকি।

গম্ভীর কণ্ঠে বলে ওঠে মোতি রায়, আলবৎ তুমি জোড়ামউ গাঁয়ের...

স্মৃতির ক্ষীণ পর্দা নড়ে ওঠে টুশকির মনে।

আলবৎ তুমি জোড়ামউ গাঁয়ের রেশমী, চণ্ডী বক্সী তোমায় সনাক্ত করেছে...

স্মৃতির পর্দাখানা সবেগে আন্দোলিত হয় টুশকির মনে।

আলবৎ তুমি জোড়ামউ গাঁয়ের রেশমী, চণ্ডী বক্সী করেছে তোমাকে সনাক্ত। আর এতেও যদি বিশ্বাস না হয়, মোক্ষদা বুড়িকে দিয়েও সনাক্ত করিয়ে দিতে পারি। এবারে বিশ্বাস হল তো যে, ঠিক মানুষটি এতদিনে পেয়েছি?

স্মৃতির পর্দাখানা আদ্যন্ত অপসারিত হয় টুশকির মনে।

আরও শুনতে চাও? খ্রীষ্টানরা তোমাকে শ্রীরামপুরে নিয়ে গিয়েছিল, খ্রীষ্টান করে বিয়ে করবে বলে। আমার লোকের সঙ্গে চণ্ডী বক্সী গিয়ে তোমাকে ছিনিয়ে নিয়ে আসে। তার পরে গঙ্গার ঘাট থেকে সেই যে পালালে—আজ এতদিনে পেখনু পিয়ামুখচন্দা। কি, আদ্যন্ত ইতিহাস জানি কিনা—কি বল?

টুশকির মনের মধ্যে আর একখানা সন্দেহের পর্দা নড়ে ওঠে। ঐ যে মেয়েটি অকস্মাৎ একদিন তার বাড়িতে আশ্রয় নিয়ে নিয়েছিল, নাম বলেছে সৌরভী, বলেছে ডাকাতের হাত থেকে পালিয়ে এসেছে—তবে সেই সৌরভীই কি রেশমী? জোড়ামউ গাঁয়ের রেশমী? মোক্ষদা বুড়ি, চণ্ডী বক্সী, জোড়ামউ গ্রাম—নামগুলি স্মৃতির স্বর্ণময় ঘণ্টা বাজাতে থাকে তার মনে। তবে তো সৌরভী তার আপন বোন। তখনই মনে পড়ে দু-জনার

চেহারার সাদৃশ্য। রাধারানী চেহারার মিল দেখে জিজ্ঞাসা করেছিল, মেয়েটি কে হয় মা তোমার ? ওরা নিজেরাও আযনায় পাশাপাশি দুখানা মুখ দেখে কতবার চমকে উঠেছে। ঐ সৌরভীই তাহলে রেশমী, তার বোন ! তার মনের মধ্যে স্মৃতির বিদ্যুৎ চমকাতে থাকে, দিগন্তের পর দিগন্ত উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। আসন্ন বিপদকে ছাপিয়ে যায় পূর্বস্মৃতির গুরুভার। সে আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না, চৌকিখানায় বসে পড়ে।

মোতি রায় বলে ওঠে, এই তো চাই। আগে দণ্ডায়মান, তার পরে উপবেশন, সবশেষে শয্যাগ্রহণ। সে হাত বাড়িয়ে টুশকির আঁচল ধরে আকর্ষণ করে, টুশকি বাধা দেয় না।

টুশকি পালঙ্কে উঠতে উঠতে ভাবে কতজনকেই তো কতদিন দেহদান করতে সে বাধ্য হয়েছে, আজ না হয় নির্দোষ বোনকে রক্ষা করবার জন্যে দেহদান করল, ক্ষতি কি। হয়তো সব অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত হবে আজ। সে শুয়ে পড়ে। বাতি নিভে যায়।

১৫
প্রভাতচিন্তা

শেষ রাতে টুশকি জেগে ওঠে। দেখে—বিছানা শূন্য, দরজা খোলা, ঘর অন্ধকার। কোথায় আছে মনে পড়ে না তার। খোলা জানালা দিয়ে শরতের ভোর-রাতের শীতল বাতাস, অস্ফুট স্বচ্ছতা তাকে সম্বিৎ দেয়। মনে পড়ে ক্রমে ক্রমে রাতের অভিজ্ঞতা, কাপড় সামলে নিয়ে সে উঠে বসে।

প্রথমে মনে হল পালিয়ে চলে যাওয়ার কথা। কিন্তু তখনই স্মরণ হল মোতি রায়ের সতর্ক নিষেধ, পালাতে চেষ্টা ক'র না, মারা পড়বে। পাহারা তো আছেই, বাড়ির মধ্যে আছে দুটো ডালকুত্তা। তারা রেশমী পশমী বুঝবে না, ছিঁড়ে কুটি কুটি করে ফেলবে। ক্রমে অনেক কথা মনে পড়ে তার। নেশার ঝোঁকের মধ্যেও মোতি রায় মর্যাদার কথা ভোলে নি ; বলেছিল, রেশমী, তুমি পালিয়ে যাওয়ায় আমার জ্ঞাতি-ভাই—লোকটা বরাবর আমার শত্রু—রটিয়ে বেড়াচ্ছিল যে, সাহেবরা তোমাকে লুটে নিয়ে গিয়েছে। এর পরে আমার মানসম্ভ্রম থাকে কেমন করে ? তোমাকে খুঁজে বার করবার জন্যে বিস্তর খরচা করেছি, ঢালাও হুকুম দিয়েছি—যত টাকা লাগে নাও, রেশমীকে খুঁজে বার কর।

টুশকি নীরবে সব শুনে গিয়েছে।

মোতি রায় বলে চলে, আজ তোমাকে পাওয়া গেল। আগামী কাল এখানে মস্ত মাইফেলের আসর বসবে। শহরের গণ্যমান্য লোক সকলকে নিমন্ত্রণ করব, আমার সেই জ্ঞাতি-ভাইটিও বাদ যাবে না। নাচ গান বাজনা কিছু বাদ পড়বে না, নিকি বাইজিকে বায়না দিয়ে রেখেছি একশ মোহর, নূতন চালান বিলিতি মদে নীচের তলার একটা ঘর ভর্তি, আতসবাজিরও ব্যবস্থা আছে। সবই আছে, কেবল ছিল তোমার অভাব—এবারে সে অভাবটাও পূর্ণ হল, বুঝলে ?

টুশকি চুপ করে শোনে।

একবার সকলে এসে দেখে যাক যে, বাঘের মুখের শিকার ছিনিয়ে নিলেও নেওয়া

যায়, কিন্তু মোতি রায়ের মেয়েমানুষেকে ছিনিয়ে নেয় এমন কার সাধ্য! বুঝলে তো, বড়লোকের মান-মর্যাদা রক্ষা করা কত কঠিন। তা পরদিন ইচ্ছা করলে তুমি চলে যেও জোড়ামউ, চণ্ডী আর মোক্ষদা বুড়ি তো কাছেই রইল।

এমন কত কথা মাতালটা বলে যায়। নিরুত্তরে শোনে টুশকি, উত্তর দেয় না। কেবল এইটুকু বোঝে নিদারুণ ভবিতব্যের শেষ ধাপ পর্যন্ত না গিয়ে তার নিস্তার নেই।

এখন শেষরাতে জেগে উঠে মনে পড়ে সেই সব কথা—আর মনে পড়ে পূর্বস্মৃতির ছিন্ন টুকরোগুলো। সেগুলোকে গুছিয়ে নেওয়ার উদ্দেশ্যে বিছানা ছেড়ে খোলা জানালার কাছে এসে বসে।

শরৎপ্রাতের প্রদোষান্ধকারে প্রায়স্ফুট শিউলিফুলের গন্ধে স্মৃতির মলমল অবারিত হয়ে যায়, মাতৃঅঞ্চলের মত তার প্রান্ত এসে স্পর্শ করে টুশকির গায়ে। সারা গা ওঠে কাঁটা দিয়ে। মোতি রায়ের মুখে রেশমীর যে পরিচয় পেয়েছে, তাতে এখন সে নিঃসন্দেহ যে, সৌরভীই রেশমী, আর তারা দুইজনে সহোদরা। চাপাপড়া অতীতের ঢাকনা খুলে যায় তার মনে। বাল্যকালে বাড়ির বাগানে শিউলিফুল কুড়োতে যেত সে, পিছন পিছন চলত স্খলিত-পদে শিশু রেশমী। মা পিছন থেকে নিষেধ করত—ওরে এত ভোরে ঘাসের মধ্যে যাস নি, নিওর লেগে অসুখ করবে। কে কার কথা শোনে। আঁচল ফুলে ভরে উঠলে রেশমীকে ভাগ দিতে হত, নইলে সে কিছুতেই ছাড়ত না। বারান্দার উপরে ছোট্ট ভাইটি হামা দিত, ফুল দেখলেই খিল খিল করে হেসে তার উপরে এসে পড়ত। আরে রাখ্ রাখ্—রেশমী, ওকে টেনে সরিয়ে নে, এ যে পূজোর ফুল।

দূর থেকে মা হাসত। বলত, টুনি খুব ধার্মিক হবে, ঠাকুর বলে এত টান।

আজকের ভোরের শেফালির গন্ধ—কেন কে জানে—টান দিল মনের কোন্ নিভৃতে, সেদিনের স্মৃতি অবারিত হয়ে পড়ল। গন্ধে গন্ধে এ কি নিগূঢ় যোগাযোগ!

টুনি তার আসল নাম, জীবনস্রোত নূতন খাতে এসে পড়লে নামটা বদলে নেয়, করে টুশকি, কেবল আদ্যক্ষরটুকু মাতৃ-আশীর্বাদী নির্মাল্যের মত মাথায় গুঁজে রাখে।

নূতন জীবন আরম্ভ করবার পর মায়ের ভবিষ্যদ্বাণী স্মরণ করে কাঁদত সে, 'মেয়ে আমার ধার্মিক হবে, ঠাকুর বলে এত টান!' আজ আবার বুক ফেটে কান্না এল, দুই চোখ গেল ভেসে। দূর আজ যে হঠাৎ নিকটে এসে পড়েছে।

সেদিনটার কথা আজও স্পষ্ট মনে পড়ে টুশকির, যেন এই সেদিন মাত্র ঘটেছে। কত আগে—তবু কত কাছে। সময়ের বাঁধা মাপে কি মানুষের মন চলে।

শীতের শেষরাত্রে গঙ্গাসাগরে স্নানের জন্য নৌকা করে রওনা হয়েছিল তারা—বাপ মা, টুনি আর ছোটভাই নাড়ু। রেশমীকে কিছুতেই দিদিমা ছাড়ল না ; বলল, ঐ রোগা মেয়ে পথেই মারা পড়বে। টুশকির বাপের বাড়ি আর মামার বাড়ি এক গ্রামেই। সঙ্গে গাঁয়ের আরও কয়েকজন লোক ছিল। টুশকি এতদিন এসব কথা ভাবতে চায় নি, মনের অতীতের দরজাটা জোর করে বন্ধ করে রেখেছিল। আজ স্মৃতির উত্তুরে হাওয়ায় হঠাৎ দরজা খুলে গিয়ে হু-হু করে বেরিয়ে আসছে চাপা ঘটনার প্রবাহ। গঙ্গাসাগরে স্নান করে ফেরবার পথে সন্ধ্যাবেলা নৌকা তোলপাড়। সবাই একসঙ্গে জেগে উঠে ভাবল, এ কি, হঠাৎ বান এল নাকি? বান নয়, বোম্বেটে। তার পর দু-চার মুহূর্তের মধ্যে কোথা দিয়ে যে কি হয়ে গেল, অন্ধকারের মধ্যে বুঝতে পারা গেল না। হাত-পা-মুখ-বাঁধা অবস্থায় পড়ে রইল সে বোম্বেটের নৌকার এক কোণে। দুদিন বাদে কলকাতার কলিঙ্গাবাজারে

একটা লোকের বাড়িতে তার স্থান হল। শুনল এখানেই নাকি তাকে থাকতে হবে। সেই লোকটা—উঃ কি বিষম কালো আর মোটা—বলে দিল, পালাবার চেষ্টা ক'র না—কেটে দু টুকরো করে ফেলব। তার আগে সে কলকাতাও দেখে নি, কলিঙ্গাবাজারের নামও শোনে নি। কি হল তার বাপ-মায়ের, কি হল নাড়ুর জানতে পেল না। বোম্বেটেদের চাপা কথাবার্তা থেকে মনে হয়েছিল তারা সবই ডুবে মারা গিয়েছে, গাঁয়ের যে তিনজন লোক সঙ্গে ছিল তারাও মারা পড়েছিল বাধা দিতে গিয়ে। সেদিনের কথা মনে পড়ে চোখ জলে ভেসে যায়, যেমন সেদিন চোখ ভেসে যেতে জলে। চোখের জলের উপরে কালের চিহ্ন পড়ে কি?

তার পরে তার আরম্ভ হল দুঃখের জীবন, দুঃখের আর লজ্জার। লোকটা তাকে বিক্রী করে দিল চিৎপুরে এক বাবুর কাছে। বাবুটি তাকে তৈরি করে দিয়েছিল এই বাড়িটা, দিয়েছিল কিছু টাকা আর এই টুশকি নামটা। টুনি চাপা পড়ে গেল টুশকির তলায়। ভালই হল। টুনি তো মরেছে। কিছুদিন পরে বাবুটি মারা গেল। তখন টুশকি হল স্বাধীন। ইচ্ছা করলে জোড়ামউ গাঁয়ে ফিরে যেতে পারত, কিন্তু সে ইচ্ছাকে প্রশয় দিল না সে। মৃত টুনির আর পুনর্জীবন লাভ সম্ভব নয়। এমন সময় পরিচয় হল রাম বসুর সঙ্গে—বসু হল তার কায়েৎ দা। কলকাতায় এসে এই প্রথম স্নেহের স্বাদ পেল, স্নেহের মিশ্রণ ঘটেছিল বলেই তাদের যৌন সম্পর্কটা বিকৃত হয়ে ওঠে নি। মেয়েরা স্নেহ-ভালবাসা অবশ্যই চায়, কিন্তু সবচেয়ে বেশি চায় এমন লোক যার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করতে পারে—তেমন পুরুষকে অদেয় কিছু থাকে না নারীর। তার পরে সৌরভীর ছদ্মবেশে এল রেশমী, তার বোন। সে ভাবে তাদের ভাইবোন সকলেরই কি এক দুঃখের ভাগ্য!

আবার দ্বিগুণ বেগে কান্না চেপে আসে। জলে গাল ভেসে গিয়ে কাপড় ভিজে যায়। কিন্তু যে দুঃখ স্তম্ভিত হয়ে আছে মনের মধ্যে, তার তুলনায় এ কতটুকু! হিমালয়ের সব তুষার গললে কি এক ছটাক জমিও জেগে থাকত!

তার মনে পড়ে—অদৃষ্টের কি নিদারুণ পরিহাস! আজ সন্ধ্যাতেই সৌরভী তার পরিচয় দেবে বলেছিল, সে-ও স্থির করেছিল নিজের পরিচয় দেবে। আর দু ঘন্টা সময় পেলেই দুই বোন মুখোমুখি হত ভিন্ন পরিবেশে। আর এখন? আর কি সে ফিরে যেতে পারবে ঘরে? মোতি রায়ের শাসন যেমন দুর্লঙ্ঘ্য, বাসনা তেমনি দুর্জয়।

শিউলির গন্ধ প্রবলতর হয়ে উঠেছে। সে ভাবে, ফুটেছে এতক্ষণে সব ফুলগুলো। তাকিয়ে দেখে, তাই তো, আলোতে গিয়েছে আকাশ ভরে। ভোরের আলোর সম্মুখে সে লজ্জায় এতটুকু হয়ে যায়। সে ভাবে যে, এর চেয়ে রাত্রির অন্ধকার ভাল ছিল। রাত্রিটা মোতি রায়ের কামনা দিয়ে তৈরি সত্যি, কিন্তু সে লজ্জাকে ঢেকে দেবার জন্যে অন্ধকারেরও তো অভাব হয় না। হঠাৎ মনে পড়ে সৌরভীর কথা—না জানি কি করছে সে এতক্ষণ!

বিনিদ্র রেশমীর চোখের উপরে দিনের আলো ফুটে ওঠে। সে ভাবে, কাকে জিজ্ঞাসা করবে, কোথায় সন্ধান করবে টুশকি-দির।

বেলা আটটা নাগাদ আসে রাধারানী।

তার শুকনো মুখ দেখে রাধারানী শুধায়, কাল রাতে ঘুমোও নি দিদিমণি?

না।

অসুখবিসুখ হয়েছিল ?

টুশকি-দি আরতি দেখতে গিয়েছিল, এখনও ফেরে নি।

বল কি ! ভয়ে বিস্ময়ে বলে রাধারানী।

কোথায় গেল বলতে পারিস ?

রাধারানী কপালে হাত ঠেকিয়ে বলে, কপাল পুড়লে যেখানে যায়, বোধ করি সেখানেই।

গম্ভীরভাবে শুধায় রেশমী, তার মানে ?

আরও খুলে বলতে হবে নাকি ? বোধ করি মোতি রায়ের লোকের হাতে পড়েছে।

অবিশ্বাস করবার কিছু নেই। রেশমী বোঝে যে, এতদিন যে আগুনে পাড়াপড়শীর ঘর পুড়ছিল, এবারে তার ফুলকি এসে পড়েছে নিজেদের ঘরে। সে একদণ্ড নিশ্চল গম্ভীর হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, তার পরে বেরিয়ে যেতে উদ্যত হয়।

ওকি, কোথায় চললে ? শুধায় রাধারানী।

উত্তর না দিয়ে, পিছনে ফিরে না তাকিয়ে, অবিচলিত পায়ে রেশমী চলতে থাকে উত্তর দিকে।

১৬
রাম বসুর প্রত্যাবর্তন

যেদিন রেশমী টুশকির বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে গেল, সেদিনই খুব ভোরবেলা রাম বসু জনের অফিসে এসে উপস্থিত হল। সে আগেই খোঁজ নিয়ে জেনেছিল যে, জন এখন অফিসে থাকে।

তাকে দেখে জন বিস্মিত হয়ে শুধাল, একি, মুন্সী যে ! এক যুগ পরে কোথা থেকে এলে ! তোমার আশা তো একরকম ছেড়েই দিয়েছিলাম !

রাম বসু বলল, এক যুগ না হলেও মাসখানেক হল নিশ্চয়।

কোথায় ছিলে এতদিন, কি করলে এতদিন ?

রাম বসু বলল, দাঁড়াও, একে একে সব উত্তর দিই। তার পর আরম্ভ করল, তোমরা তো চলে এলে, আমি কিন্তু আশা ছাড়লাম না রেশমীর। যেখানে যেখানে তার যাওয়ার সম্ভাবনা, গেলাম সব জায়গায়—এমন কি মদনাবাটি অবধি যেতে ত্রুটি করি নি। কিন্তু নাঃ, সব বৃথা ; পেলাম না তাকে।

জন বলে, যেখানে নেই সেখানে পাবে কি করে ? কিন্তু মুন্সী, রেশমী সম্বন্ধে আমার আর কোন আগ্রহ নেই।

সেটা আশ্চর্য নয়। যাকে পাওয়া গেল না তার সম্বন্ধে আগ্রহ পরিত্যাগ করাই শ্রেয়।

পাওয়া গেল না একথা সত্য নয়। পাওয়া গিয়েছে রেশমীর সন্ধান।

আনন্দে বিস্ময়ে বসু বলে ওঠে, পাওয়া গিয়েছে রেশমীর সন্ধান ! কোথায়, কোথায় সে ? কি করে পেলে সন্ধান, সব খুলে বল ?

জন বলে, তার আগে বল মদনমোহন কে ?

হতবুদ্ধি রাম বসু বলে, মদনমোহন ! কেমন করে জানব কে সে ?

এবারে সে ভাল করে জনের মুখ দেখে বলে, তোমাকে এমন ক্লিষ্ট দেখাচ্ছে কেন ? কি হয়েছে বল দেখি ?

জন রুষ্টভাবে বলে, আগে বল মদনমোহন নামে কোন রাস্কেলকে তুমি জান কি না !

রাম বসু কিছুক্ষণ চিন্তা করে বলে, কই না, ও নামে কোন লোক তো মনে পড়ছে না। কিছু হঠাৎ এর মধ্যে মদনমোহন এল কেন ? রেশমীর কি জান বল ?

জন দাঁড়িয়ে উঠে পায়চারি করতে করতে বলে, রেশমী আস্ত একটি বেশ্যা। আর ঐ মদনমোনহ আস্ত একটি লম্পট।

কিছু বুঝতে না পেরে রাম বসু নীরবে দাঁড়িয়ে থাকে। জন বলে যায়, তবে শোন, অনেক সন্ধান করে রেশমীর সন্ধান পাই, কিন্তু না পেলেই বোধ করি ভাল ছিল।

বসু কিছু বলতে যাচ্ছিল, বাধা দিয়ে জন বলল, থাম, আগে সবটা শোন. বুঝতে পারবে কি শয়তানী সেই মেয়েটা।

আরও বারকয়েক পায়চারি করে সে আরম্ভ করে, রেশমীর সন্ধান পেয়ে তাকে যখন আনবার ব্যবস্থা করছি, তখন সেই চাপা শয়তানী লিখে পাঠাল যে সে আসবে না, মদনমোহনকে বিয়ে করবে। লিখে পাঠাল, এখন মদনমোহনই তার আশ্রয়, তার শান্তি, তার স্বামী। চিতাতে ওর পুড়ে মরাই উচিত ছিল, ওকে বাঁচিয়ে তোমরা অন্যায় করেছ। এমন জঘন্য জীবের বেঁচে থাকবার অধিকাব নেই। শুনলে তো। হল তো ? দেখলে তো তোমাদের রেশমী কি বস্তু ?

রাম বসু বলল, দেখ জন, মানুষের পক্ষে সবই সম্ভব. তবু রেশমীর ক্ষেত্রে এসব বিশ্বাসযোগ্য মনে হচ্ছে না।

কেন বিশ্বাসযোগ্য মনে হচ্ছে না ? ওর মুখটা সুন্দর বলে ?

না, ওর মনটা সরল বলে।

ওর সরলতা সাপের সরলতা, বড় মারাত্মক। কিন্তু তোমার যখন এতই বিশ্বাস সেই কুলটার উপরে, নাও পড়ে দেখ এই চিঠিখানা।

এই বলে সে টেবিলের কাছে গিয়ে সযত্ন-রক্ষিত রেশমীর চিঠিখানা ঘৃণাভরে দুই আঙুলে তুলে রাম বসুর দিকে ছুঁড়ে দিল।

চিঠিখানা পরম আগ্রহে এক নজরে পড়ে বসু বলে উঠল, জন, এ চিঠির উত্তর দিয়েছ ?

নিশ্চয় দিয়েছি।

তা জানি। কি লিখেছ ?

যা লেখা উচিত। লিখেছি, তুমি বাজারের বেশ্যা, তোমার উপপতি মদনমোহন একটি লম্পট। লিখেছি. এবারে যেন উপপতির সঙ্গে পুড়ে মরতে পার। এর আগেই তোমার পুড়ে মবা উচিত ছিল।

হতবুদ্ধি বসু বলে, লিখেছ এইসব মর্মান্তিক কথা !

লিখব না !

কি সর্বনাশ করেছ জন !

কেন ?

কেন কি ! এ চিঠির অর্থ তুমি ভুল বুঝেছ !

বসুর অটলতায় জনের বিশ্বাসে টোল খায়, বলে, চিঠিখানা তো খুব দুরূহ নয়।

তোমাদের মত শ্বেতাঙ্গের কাছে দুরূহ বই কি।

কি ব্যাখ্যা তুমি করতে চাও এ চিঠির ! তুমি দেখছি শয়তানের উকিল !

জন, আমি শয়তানের উকিল নই, নির্বুদ্ধিতারূপ শয়তান ভর করেছে তোমার ঘাড়ে। মদনমোহন কোন মানুষ নয়, এক দেবতার নাম, মদনমোহন একটা deity, কলকাতার যে-কোন হিন্দু তার নাম জানে। মদনমোহন শব্দটি বললে যে কোন হিন্দু মিত্র জমিদারদের সেই deity বা দেবতাকে বুঝবে।

জনের মন বিচলিত হয়, তবু ভাঙে না ; বলে, তুমি হয়তো ভুল বুঝেছ। আচ্ছা, মদনমোহন যদি deity হবে তবে তাকে বিবাহ করবার কথা বলে কি করে ?

ও সমস্ত রূপক, অ্যালিগরি। ভগবানকে আমরা কখনও পিতা বলি, কখনও মাতা বলি, আবার কখনও স্বামীরূপে কল্পনা করি। এ ভাবের কথা কি কখনও শোন নি ?

শুনেছি বটে। বলে জন।

তোমার চিঠি কি পৌঁছেছে রেশমীর হাতে ?

গঙ্গারাম গিয়ে তার স্বহস্তে পৌঁছে দিয়ে এসেছে।

বেশ করেছে, খুব করেছে। নির্বোধ, নির্বোধ, তুমি কি করেছ জান না।

জন এবারে বোঝে যে, প্রকাণ্ড ভুলে করেছে সে।

কোথায় আছে সে ?

গঙ্গারাম জানে।

ডাক গঙ্গারামকে।

গঙ্গারাম আসে।

রাম বসু শুধায়, কোথায় আছে রেশমী ?

আজ্ঞে মদনমোহন-তলায়।

মদনমোহন-তলায় ! চমকে ওঠে রাম বসু। চল এখনই আমার সঙ্গে, দেখিয়ে দেবে।

জন বলে, মুন্সী, আমিও যাব, ক্ষমা প্রার্থনা করব তার কাছে।

ক্ষমা প্রার্থনা করবে ! ভারি উদারতা দেখানো হচ্ছে ! কিন্তু তোমার ক্ষমাপ্রার্থনা শোনবার জন্যে সে এতদিন বেঁচে আছে কিনা সন্দেহ।

কেন ?

আবার জিজ্ঞাসা করছ 'কেন' ? ও রকম চিঠি পেয়ে কোন মেয়ে কি আর বেঁচে থাকে ? বিশ্বাস না হয়, জিজ্ঞাসা করে দেখ তোমার বোন লিজাকে ?

এই বলে সে গঙ্গারামকে নিয়ে বেরিয়ে যায়।

জন ঘরের মধ্যে ঢুকে কান্নায় ভেঙে পড়ে বিছানার উপরে। কি আনন্দময় দুঃখ !

মদনমোহন-তলায় একটা বাড়ির সম্মুখে এসে গঙ্গারাম দাঁড়াল।

রাম বসু চমকে উঠল, একি, এ যে টুশকির বাড়ি !

গঙ্গারাম বলল, টুশকি কি খুসকি জানি নে, এই বাড়িতেই মেয়েটা আছে।

দরজা খোলা—'টুশকি, টুশকি' ডাকতে ডাকতে রাম বসু ঢুকে পড়ল !

রাধারানী সম্মুখে এসে দাঁড়াল, একি, আপনি ? এতকাল পরে ?

রেশমী বেরিয়ে যাওয়ার অল্পক্ষণ পরেই রাম বসু এসে উপস্থিত হয়েছে, তখনও রাধারানী ঘরের কাজ সারছিল। আর কি করা উচিত তা ভেবে পায় নি সে।

ভাল আছিস রাধারানী ? কই টুশকি কই ?

বসুন, সব বলছি। আজ সকালে এসে শুনলাম যে, তিনি সেই কাল কোথায় আরতি দেখতে বেরিয়ে গিয়েছিলেন, আর ফেরেন নি।

ফেরেন নি ! বলিস কি রে ? রেশমী কোথায়।

রেশমী আবার কে ?

সেই যে-মেয়েটি এ বাড়িতে থাকত ?

ও, সৌরভী দিদিমণি ?

ক্ষিপ্রবুদ্ধি রাম বসু বুঝলে যে, ঐ নামের পরিচয় দিয়েছিল রেশমী।

বলল, হাঁ, কোথায় গেল সৌরভী ?

তিনি তো এখনই বেরিয়ে গেলেন।

বেরিয়ে গেলেন ! কোথায় গেলেন ?

তা কেমন করে বলব্। সকালবেলায় কাজ করতে এসে দেখি যে, দিদিমণি শুকনো মুখে দাঁড়িয়ে আছেন। শুধালাম, কি দিদিমণি, এমন অবস্থা কেন ? তিনি বললেন যে, টুশকি দিদি কাল সন্ধ্যেয় গিয়েছেন, এখনও ফেরেননি।

তাই খুঁজতে বেরিয়ে গেল ?

মনে তো হল তাই।

কিন্তু কোথায় গেল কিছু বলে গেল না ?

সে অনেক কথা কায়েৎ দা, আপন বসুন বলছি।

না, আমি বেশ আছি, তুই কি জানিস বল্।

তখন সে মোতি রায়ের দৌরাত্ম্যের কথা যেমন জানত বলল। কিন্তু রেশমীই যে তার লক্ষ্য না জানায় পরিষ্কারভাবে বোঝাতে পারল না টুশকির অন্তর্ধান ও রেশমীর অকস্মাৎ গৃহত্যাগের রহস্য।

রাম বসু বুঝল যে রাধারানীর কাছ থেকে আর বেশি কিছু জানবার সম্ভাবনা নেই। সে স্থির করল, অন্যত্র সন্ধান নিতে হবে। তখন সে বলল, রাধারানী, তুই ঘরের কাজ সেরে দরজা বন্ধ করে চলে যা। আমি পরে আবার ফিরব।

এই বলে গঙ্গারামকে সঙ্গে নিয়ে রাম বসু বেরিয়ে এল।

টুশকির বাড়ির পাশে রাম পণ্ডিতের মুদির দোকান। রাম পণ্ডিত চাণক্যশ্লোক, দাতাকর্ণ উপাখ্যান, শুভঙ্করী, এবং প্রকাণ্ড টাক ও সুদীর্ঘ নাকের মাহাত্ম্যে মুদির দোকানের একান্তে পাঠশালা খুলে পণ্ডিতি করেন। রাম পণ্ডিত জাত্যংশে ব্রাহ্মণ ও রাম বসুর দীর্ঘকালের আলাপী। রাম বসু জানত, পাড়ার সাকুল্য বিবরণ রাম পণ্ডিতের মুদির দোকানে এসে জমে। তাই সে রাম পণ্ডিতের মুদির দোকানে এসে উপস্থিত হল।

প্রাতঃপ্রণাম পণ্ডিত মশাই।

আরে মিতে যে ! এস, এস, অনেকদিন পরে, এতদিন ছিলে কোথায় ?

তার পর, সব মঙ্গল তো ?

রাম বসু আসন গ্রহণ করতে করতে অবান্তর প্রশ্নের যথাসম্ভব উত্তর দিল।

ওরে ঐ কায়স্থের হুঁকোটা দিয়ে যা। একজন পোড়ো প্রজ্বলন্ত কল্কে বসিয়ে হুঁকো এগিয়ে দিল রাম বসুর কাছে।

তার পর—পাড়ার খবর কি বল তো মিতে।

আর খবর! এখন পাড়ায় সুভদ্রা-হরণ পালা চলছে! বলে হো হো করে হেসে ওঠে রাম পণ্ডিত। নাকটা তাল রক্ষা করে হাসির সঙ্গে সঙ্গে কাঁপে।

কি রকম, সব শুনি?

এদিক ওদিক তাকিয়ে নিয়ে গলা খাটো করে রাম পণ্ডিত বলে, সমস্তর মূলে ঐ মোতি রায়। জান তো লোকটাকে।

বসু বলে, ওকে না জানে কে। অতবড় পাষণ্ড ভূভারতে নেই।

তবে তো জানই। মাসখানেক আগে রেশমী নামে একটা ছুঁড়িকে কোত্থেকে নিয়ে আসে ওর লোকজন।

রাম বসু কান খাড়া করে শুনে যায়। শুধায়, কোত্থেকে কি জান?

নিশ্চয় করে জানি নে, তবে শুনলাম যে শ্রীরামপুরের পাদ্রীরা নাকি ওকে খ্রীষ্টান করবার জন্যে চুরি করে নিয়ে যাচ্ছিল, এমন সময় মোতি রায়ের লোকজন চুরির উপরে বাটপাড়ি করে তাকে ছিনিয়ে নিয়ে আসে।

ঘটনাগুলো ক্রমে শৃঙ্খলিত হয়ে দেখা দেয় রাম বসুর মনে।

তার পরে?

মেয়েটা গঙ্গার ঘাট থেকে পালিয়ে যায়।

মনে মনে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে রাম বসু, বাহবা দেয় রেশমীর সাহসকে।

এ যে সত্যি সুভদ্রা-হরণের কাহিনী। তার পরে কি হল বল?

এদিকে মেয়েটা পালাল, ওদিকে মাধব রায় দুয়ো দিয়ে বলতে লাগল, মোতি রায়ের আর সেদিন নেই, নইলে মেয়েটা পালাবার পথ পায় কি করে? তাই না মোতি রায় গর্জে উঠল।

মোতি রায়ের কাল্পনিক গর্জনের অনুকরণে রাম পণ্ডিত হঠাৎ এমন বাস্তব গর্জন করে উঠল যে পোড়োর দল আঁতকে উঠল, গোটা দুই ছেলে তো ডুকরে কেঁদে উঠল।

না রে না, তোদের বলি নি, তোরা পড়—বলে আশ্বাস দিয়ে বলে যেতে লাগল রাম পণ্ডিত।

বুঝলে কিনা মিতে, সেই থেকে পুলিসের সঙ্গে যোগসাজসে আরম্ভ হল পাড়ায় অত্যাচার।

পাড়ায় অত্যাচার আরম্ভ হতে যাবে কেন?

আরে মেয়েটাকে খুঁজে বার করতে হবে তো!

পাড়ার লোকে কি জানে রেশমীর?

নইলে আর অত্যাচার বলছি কেন? কচি বয়সের মেয়ে দেখলেই ধরে নিয়ে যায় সেই ছুঁড়িটা মনে করে।

রাম বসু বলে, এ যে দেখছি বিশল্যকরণী না পেয়ে গন্ধমাদন-বহন!

ঠিক তাই ভায়া, বলে রাম পণ্ডিত। তার পরে বলে, কাল রাত থেকে নাকি তোমার টুশকিও উধাও হয়েছে।

আমিও তাই শুনলাম।

তবে আর সন্দেহ নেই, ধরে নিয়ে গিয়েছে কাশীপুরের বাগানবাড়িতে।

এখন উপায় ? নিরুপায় ভাবে জিজ্ঞাসা করে রাম বসু।

আর যাই কর মিতে, ঝোঁকের মাথায় কাশীপুরের বাগানবাড়ির দিকে যেয়ো না, সঙীন খাড়া করে পাহারা দিচ্ছে মোতি রায়ের বরকন্দাজের দল।

যতদূর যা জানবার জেনে নিয়েছে রাম বসু, তাই সে এবারে বিদায় নিয়ে উঠে পড়ল, আর গঙ্গারামকে নিয়ে দ্রুত রওনা হল জনের অফিসের মুখে।

সে বুঝল যে, সৌরভীই রেশমী, ঘটনাক্রমে রেশমী পালিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল টুশকির বাড়িতে। আরও বুঝল যে, কাল রাতে মোতি রায়ের লোকে ধরে নিয়ে গিয়েছে টুশকিকে কাশীপুরের বাগানবাড়িতে। সে ভাবল যে, রেশমী ব্যাপার অনুমান করে রওনা হয়ে গিয়েছে কাশীপুরে, কিংবা হয়তো খোদ মোতি রায়ের কাছে গিয়েই উপস্থিত হবে সে। রেশমীর চরিত্র ও সাহস, তার চেয়ে বেশি কেউ জানে না। সে বুঝল যে, এখন টুশকি ও রেশমীকে রক্ষা করা তার সাধ্যের অতীত—এক ভরসা জন, সে যে শ্বেতাঙ্গ।

হেঁটে যেতে বিলম্ব হবে দেখে একটানা ফিটন গাড়িতে দুজনে চেপে বসল, জলদি চল কসাইটোলা।

১৭
রেশমী আবির্ভাব

মোতি রায়ের খাস কামরায় মোতি রায় আলবোলার নল মুখে তাকিয়ার উপরে ভর দিয়ে উপুড় হয়ে শুয়ে আছে। পাশে নীচু একটা জলচৌকির উপরে চণ্ডী বক্সী উপবিষ্ট। চণ্ডী বক্সী ইতিপূর্বে দেশে ফিরে যাওয়ার আবেদন পেশ করেছে, সঠিক উত্তর পায় নি; এবারে আবার প্রসঙ্গটা উত্থাপন করল, বলল, হুজুর, এবারে দেশে ফিরে যাওয়ার হুকুম করে দিন।

মোতি রায় বার দুই নড়ে-চড়ে বলল, সে কি কথা বক্সী, আজ তো যাওয়া হতেই পারে না। আজ বাগানবাড়িতে নাচ-গান আছে, শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তি সব আসবে, আমাদের মেধোটাকেও নিমন্ত্রণ করেছি, তার পরে আড়াই হাজার টাকার বাজি পুড়বে। এসব না দেখে কোথায় যাবে ? তা ছাড়া তোমার পারিতোষিকের কথাটাও ভেবে দেখতে হবে, কি দেওয়া যায় না যায় এখনও স্থির করি নি।

চণ্ডী সবিনয়ে বলল, কিন্তু হুজুর, অনেককাল দেশছাড়া, ওদিকে সব নষ্ট হয়ে যাওয়ার উপক্রম হল বলে খবর পেয়েছি।

তা বটে, কিন্তু আর একটা দিন বই তো নয়, এর মধ্যে আর কত কি হবে।

তার পরে প্রসঙ্গ পাল্‌টে আরম্ভ করল, যাই বল বক্সী, তোমাদের রেশমী মেয়েটা খুব তোয়ের মেয়ে। প্রথমে খানিকটা গুঁই-গাঁই করেছিল, বুঝলে না বক্সী, প্রথমে অমন একটু আপত্তি না করলে দর বাড়ে না, কিন্তু শেষে...এই বলে গতরাত্রির অভিজ্ঞতার যে বাস্তব ও বিস্তারিত বিবরণ দিতে লাগল, তাতে বক্সীর মত পাষণ্ডও অধোবদন হয়ে গেল, সে নীরবে বসে ঘরের কার্পেটের নক্সাগুলো পর্যবেক্ষণ করতে লাগল।

হঠাৎ সচেতন হয়ে উঠে মোতি রায় বলল, ওঃ, তোমার বুঝি আবার লজ্জা করছে!

তখনই সান্ত্বনা দিয়ে বলল, আরে তোমার সঙ্গে তো রক্তের সম্বন্ধই নেই, তা এত লজ্জা কিসের!

চণ্ডী কি বলতে যাচ্ছিল, মোতি রায় থামিয়ে দিয়ে বলল, আচ্ছা, ও প্রসঙ্গ না হয় থাক। এখন বল তো বক্সী, কি পারিতোষিক চাও? শাল-দোশালা আর টাকা—না খানিকটে ব্রহ্মত্র জমি?

চণ্ডীর উপযুক্ত শিক্ষা হয়ে গিয়েছে, এখন সে পালাতে পারলে বাঁচে, তাই সে সংক্ষেপে বলল, হুজুরের যা ইচ্ছে হয় দেবেন।

এ অতি উত্তম কথা, না হয় দুই-ই পাবে, কিন্তু রেশমীকে পাচ্ছ না, মেয়েটা থাকবে আমার কাছে, অমন মেয়ে কালে-ভদ্রে মেলে।

চণ্ডী চুপ করে বসে রইল, হাঁ না বলবার সাহস তার নেই, কোন্ কথার কি অর্থ হবে বুঝতে পারে না সে।

এমন সময় দেউড়ির কাছে একটা শোরগোলের মত শ্রুত হল—হাঁ রোখো, রোখো, অন্দর যানা মানা হ্যায়; একেলা নেহি, ক্যায়সে যায়গা?

সক্কালবেলাতেই কি আবার হাঙ্গামা, বলে অত্যন্ত বিরক্তির সঙ্গে উঠে বসবার চেষ্টা করল মোতি রায়, কিন্তু সম্পূর্ণ সফল হওয়ার আগেই স্খলিতকেশ, স্রস্তবসন আবেগে ও রৌদ্রে রক্তিম মুখমণ্ডল রেশমী এসে সম্মুখে দাঁড়াল, দুঃখে কশাহত হয়ে তার সৌন্দর্য যেন সহস্রনয়নে জেগে উঠছে। রৌদ্রপ্রতিফলিত হীরকের দীপ্তির মত বিচ্ছুরিত হচ্ছে সৌন্দর্যের সূচীমুখ, চেয়ে থাকা কঠিন, চোখ ফিরিয়ে নেওয়া কঠিনতর।

হাঁ করে তাকিয়ে রইল মোতি রায়।

আমি জোড়ামউ গাঁয়ের রেশমী। আমার সন্ধান করছেন আপনি, কি চান বলুন? আমি এসেছি।

বাক্যস্ফূর্তি হল না মোতি রায়ের। সে দুই চোখ দিয়ে গিলতে লাগল সেই অগ্নিসম রূপের মদিরা।

ক্রোধে, অপমানে, লজ্জায়, পরিশ্রমে খুন চেপে গিয়েছিল রেশমীর মাথায়। চরিত্রের সমস্ত শক্তি তাকে ঠেলে নিয়ে এসেছে এই প্রচণ্ড দুশ্চেষ্টায়। এখন ঐ নির্বাক লুব্ধ দৃষ্টি তার শক্তির শেষ অঞ্জলিকে তরঙ্গিত করে তুলল. সে বলে উঠল, নারীর রূপ কি কখনও দেখেন নি? তবে এই দেখুন! এই বলে, কি করছে ভাল করে বোঝবার আগেই সে অপসারিত করল বক্ষের অঞ্চল। স্বেদাভাসমসৃণ মাণিক্যকঠিন সবুর্ণচিক্কণ, স্তনাগ্রযুগলের সেই সহজ স্বর্গীয় কান্তিতে এমন একটা সপ্রতিভ পবিত্রতা ছিল যে, পাষণ্ডটাও তাকিয়ে থাকতে পারল না। চোখ নামিয়ে নিল।

রেশমীর ঘরে প্রবেশ করবার পরে মিনিট দুই কালের মধ্যে এই সব কাণ্ড ঘটে গেল। ক্রমে সম্বিৎ ফিরে এল মোতি রায়ের, এতক্ষণ ঘটনার আকস্মিকতায় সে বিগতসম্বিৎ ছিল। মোতি রায়ের কিছুমাত্র সন্দেহ রইল না যে, যে মেয়ের সন্ধান সে করছিল এ-ই সেই মেয়ে। কিন্তু এখন কি কর্তব্য স্থির করবার অবকাশ পেল না সে, তার চিন্তা বারে বারে শিথিল হয়ে যায় রেশমীর কথার তোড়ে।

বিস্মিত হয় মোতি রায়। তবে কাল রাতে কাকে উপভোগ করল সে রেশমী ভেবে?

অধিকতর বিস্মিত হয় চণ্ডী বক্সী। তবে কাল রাতে কাকে সে ধরিয়ে দিয়েছিল

রেশমী বলে ?

কিন্তু বেশিক্ষণ তারা চিন্তা করতে পারে না, রেশমীর অনর্গল বাক্যে ছিন্ন হয়ে যায় চিন্তার সূত্র।

এই নারীদেহটা ভোগ করতে চান, এই তো ? পাবেন। কিন্তু তার আগে আমার বোনকে মুক্তি দিন। কোথায় রেখেছেন তাকে বলুন। কেমন আছে সে বলুন। তার বদলে তৃপ্ত হবে আপনার রাক্ষসী ক্ষুধা।

মোতি রায় পাষণ্ড, আর পাষণ্ড বলেই নির্বোধ নয়। ক্ষণকালের জন্য সে হতবুদ্ধি হয়ে গেলেও বেশিক্ষণ সে ভাব থাকল না তার। সে বুঝল যে, চণ্ডী বক্সী বাজে মাল দিয়ে তাকে ঠকিয়েছে, আর বাড়ি যাওয়ার আগ্রহটার অর্থও স্পষ্ট হল এতক্ষণে, ধরা পড়বার আগেই সে সরে পড়তে চায়।

মোতি রায় গর্জন করে উঠল, বুধন সিং!

দরজায় এসে সেলাম করে দাঁড়াল বুধন সিং।

এই হারামজাদকো লাগাও পঞ্চাশ জুতি। আর শালালোগকো মৎ ভাগনে দেও।

জী হুজুর।

বুধন সিং টেনে নিয়ে গেল চণ্ডী বক্সীকে।

এই প্রথম রেশমী সচেতন হল যে, ঘরে অপর ব্যক্তি ছিল আর সে স্বয়ং চণ্ডী বক্সী।

ইতিমধ্যে রেশমীরও মরীয়া ভাব ক্রমে কমে এসেছে। সে বুঝেছে যে, হঠকারিতায় প্রবেশ করেছে পিঞ্জরে, বিষফল গলাধঃকরণ না করে আর উপায় নেই। বুকের আঁচল তুলে দিয়ে শিলামূর্তির মত সে দাঁড়িয়ে রইল।

মোতি রায় ডাকল, খুদিরাম!

কালো, খোঁড়া, কুৎসিত একটা বুড়ো লোক এসে দরজায় দাঁড়াল। খুদিরাম মোতি রায়ের খাস খানাসামা, সমস্ত দুষ্কার্যের সহায়ক ও সাক্ষী।

খুদিরাম বলল, বাবু!

এই মেয়েটাকে পালকি করে বাগানবাড়িতে নিয়ে যা। সেখানে স্নানাহারের বন্দোবস্ত করে দিবি, কড়া পাহারা রাখবি। দেখিস পালাতে না পারে, ভারি শয়তান।

তার পরে রেশমীকে লক্ষ্য করে বলল, পালাতে চেষ্টা করলে ডালকুত্তায় ছিঁড়ে ফেলবে, সে চেষ্টা ক'র না। আর তোমার বোনকে ব'ল—তার দেখা ওখানেই পাবে—বাজে মাল দিয়ে মোতি রায়কে ঠকালে মোতি রায় সহজে ভোলে না। শুনছ তো বাজে মাল সরবরাহ করলে কিরকম ব্যবস্থা হয়।

অদূরে কোনখানে চণ্ডী বক্সী আর্তনাদ করছে।

আজ সন্ধ্যাবেলায় দেখা হবে, তখন যাচাই করে নেব তোমাদের দুজনের মধ্যে কে রেশমী আর কে সুতী!

তার পরে খুদিরামের উদ্দেশে আর একবার সতর্কবাণী উচ্চারণ করে মোতি রায় গৃহান্তরে প্রস্থান করল।

১৮
জনের যুদ্ধোদ্যম

রাম বসুর মুখে আদ্যন্ত বৃত্তান্ত শুনে জন বলে উঠল, তবে কি তুমি বলতে চাও যে ঐ মোতি রায় নামে লোকটা অসদুদ্দেশ্যে রেশমীকে বন্দী করে রেখেছে?

রাম বসু বলল, সদুদ্দেশ্যে কে কবে বন্দী করে রাখে। তার পরে বলল, তবে রেশমী যে তার আশ্রয়দাত্রীকে উদ্ধার করতে গিয়েছে আর গিয়ে বন্দী হয়েছে এ একপ্রকার নিশ্চিত।

তবে আমি চললাম, বলে টেবিলের দেরাজ থেকে পিস্তল বের করে নিয়ে জন উঠে দাঁড়াল।

ওকি, কোথায় চললে?

রেশমীকে উদ্ধার করতে।

দেখ জন, এ গোঁয়ার্তুমির সময় নয়, ধীরেসুস্থে ভেবেচিন্তে কাজ করতে হবে।

আর ইতিমধ্যে রেশমী অসম্মানিত হক!

না, আজ রাতের আগে সে আশঙ্কা নেই।

কিন্তু ততক্ষণ আমি অপেক্ষা করতে রাজী নই, বলে সে অধীরভাবে পায়চারি করে।

রাম বসু বলে, আমিও রাজী নই, কিন্তু একা তুমি কি করতে পার?

মোতি রায় লোকটাও তো একা।

না, সে একা নয়, তার অনেক বরকন্দাজ অনেক লাঠিয়াল আছে।

তা থাক, জেনে রেখো, আমি শ্বেতাঙ্গ, আর এটা কোম্পানির মুলুক।

তাতে কি লাভটা হবে? তুমি একা গেলে তোমাকে সে হত্যা করে ফেলবে। তার পরে তাকে বিচার করে ফাঁসি দিতে পারবে কোম্পানি; যেমন ফাঁসি দিয়েছিল নন্দকুমারকে। কিন্তু রেশমী কি তাতে রক্ষা পাবে?

জন যুক্তির সারবত্তা বোঝে, পিস্তলটা টেবিলের উপরে রেখে দিয়ে বলে, তবে কি করতে হবে বল?

অস্ত্রশস্ত্র দলবল নিয়ে বাগানবাড়ি ঘেরাও করে রেশমী আর তার আশ্রয়দাত্রীকে উদ্ধার করতে হবে।

রাম বসুর পরামর্শ শুনে জন বলে ওঠে, রাইট! এ অতি উত্তর পরামর্শ। তবে আমি সেই চেষ্টা দেখি।

এই বলে সে কাদির আলীকে ডেকে হুকুম দিল, আমার অফিসের আর বাড়ির যে-সব লোক ঘোড়ায় চড়তে পারে তাদের ডেকে বলে দাও, সব যেন তৈরী থাকে, আমি ঘোড়ার ব্যবস্থা করছি।

কাদির আলী গঙ্গারাম ও রাম বসুর মুখে ঘটনা শুনেছিল, এখন ঢালাও হুকুম পেল, 'জী হুজুর' বলে সেলাম করে সে বেরিয়ে গেল।

জন বুঝেছিল যে, দু-চারজন শ্বেতাঙ্গ সঙ্গে থাকলে আক্রমণের গুরুত্ব বাড়বে, তার মনে পড়ল, মেরিডিথের নাম। তখনই সে মেরিডিথকে চিঠি লিখে পাঠিয়ে দিল, জানাল

যে, তোমার লোকজনদের মধ্যে যারা ঘোড়ায় চড়তে পারে তাদের নিয়ে যত শীঘ্র সম্ভব আমার অফিসে এস—এখনই একটা অ্যাডভেঞ্চারে বের হতে হবে। আরও জানাল যে, উদ্দেশ্য অতিশয় মহৎ, কাজেই দ্বিধা ক'র না।

কিছুক্ষণের মধ্যেই মেরিডিথের উত্তর হাতে এসে পৌঁছল। মেরিডিথ লিখেছে—"জন, যুদ্ধযাত্রার আহ্বান পেলাম। টিপু সুলতান তো পরাজিত, কার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা? পেশবার বিরুদ্ধে নাকি? না, স্বয়ং দিল্লীর বাদশার বিরুদ্ধে? যার বিরুদ্ধেই হক, আমি আহ্লাদের সঙ্গে প্রস্তুত আছি। মনে হচ্ছে যে, জন-পঞ্চাশেক লোককে ঘোড়ায় চাপাতে পারব। তবে আশঙ্কা হচ্ছে, পঞ্চাশটা ঘোড়া যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়ে পৌঁছলেও পঞ্চাশজন সওয়ার যুদ্ধক্ষেত্রে না পৌঁছতেও পারে, অনেকেই মাঝপথে পড়ে আহত হবে; তবে তাদেরও যুদ্ধে আহত বলে ধরতে হবে, রণশাস্ত্রের এই হচ্ছে বিধি। যাই হোক, তুমি নিশ্চিন্ত হও, অপরাহ্নের আগেই তোমার অফিসে গিয়ে পৌঁছব। মেরিডিথ।"

পরে 'পুনশ্চ' দিয়ে লিখেছে—"যদি দু-চারজন উদ্যমী শ্বেতাঙ্গ পাই, তাদের সঙ্গে নেব।"

মেরিডিথের পত্র পেয়ে জনের ভরসা বাড়ল, বুঝল সে একা নয়।

ইতিমধ্যে জনের লোকজন জমায়েৎ হতে শুরু করেছে। বাড়ি থেকে আরদালি, চাপরাসী, ভিস্তি প্রভৃতিদের ডেকে আনা হয়েছে। সকলকে প্রচুর বকশিশ কবুল করা হয়েছে। জনদের গোটা-পঁচিশেক ঘোড়া ছিল, আরও গোটা-পঁচিশেক ভাড়া করে আনবার ব্যবস্থা হয়েছে। ঢাল, তলোয়ার, শড়কিও স্তূপীকৃত হল, বন্দুকগুলো জন নিজের হেফাজতে রাখল, বাছা বাছা লোকের হাতে দেবে।

রাম বসু খবর পাঠিয়ে ন্যাড়াকে জানিয়ে দিল। সমস্ত খবর শুনে ন্যাড়া মস্ত এক পাগড়ি বেঁধে ঢাল-তলোয়ার হাতে প্রস্তুত হল।

ন্যাড়াকে খুঁজতে গিয়ে রাম বসু আবিষ্কার করল যে, ন্যাড়া ও গঙ্গারাম দুজনে যথারীতি সুসজ্জিত হয়ে তলোয়ার নিয়ে যুদ্ধের মহড়া দিচ্ছে, তাদের দুজনেরই দৃষ্টিতে অপরে মোতি রায়।

রাম বসু বলল, ওরে এখন থাম, সে সময়ে দেখা যাবে কে কত বড় ওস্তাদ!

দুজনেই একসঙ্গে বলে উঠল, দাঁড়াও কায়েৎ দা, আগে মোতি রায় বেটাকে নিকেশ করে ফেলি।

এমন সময়ে অদূরে অনেকগুলো ঘোড়ার পায়ের শব্দ উঠল। ব্যাপার কি?

সকলে ছাদে উঠে দেখল চৌরঙ্গির পথ দিয়ে একদল ঘোড়সোয়ার আসছে—সকলের আগে মেরিডিথ ও জন-দুই শ্বেতাঙ্গ। তাদের দেখে জনের লোকজন আনন্দে চীৎকার করে উঠল। ও পক্ষ থেকেও উঠল আনন্দধ্বনি—দুই পক্ষে বিউগল্ উঠল বেজে। দু-চার মিনিটের মধ্যেই সদলবলে মেরিডিথ এসে পৌঁছল।

জন এগিয়ে গিয়ে মেরিডিথের করমর্দন করল।

মেরিডিথ সঙ্গী দুজনের পরিচয় করিয়ে দিল, মিঃ প্রেস্টন, মিঃ অগলার—আর এ হচ্ছে মিঃ স্মিথ, এই যুদ্ধের কম্যাণ্ডার-ইন-চীফ।

ব্যাপার কি জন?

চল ভিতরে চল, সব খুলে বলছি। এই বলে জন তিনজনকে নিয়ে তার খাস কামরায় গিয়ে বসল; আবদার দু বোতল ব্র্যাণ্ডি আর চারটে গেলাস টেবিলের উপর

রেখে সেলাম করে বেরিয়ে গেল।

মেরিডিথ বলল, বল এবার সব খুলে।

জন বলল, দাঁড়াও, আগে বোতলের মুখ খুলি, তার পরে খুলছি নিজের মুখ।

১৯
পরিচয়

অপ্রত্যাশিত মিলনের প্রথম বিস্ময় কাটলে রেশমী আগে কথা বলল। বলল, দিদি, অবশেষে তোমাকেও ঋণশোধ করতে হল, সেই রেশমী নামে মেয়েটার জন্যে!

টুশকি বুঝল যে রেশমী এখনও তার যথার্থ পরিচয় পায় নি। সে ভাবল কিভাবে আসল পরিচয় দেওয়া যায়। হঠাৎ ভেবে পায় না, তার পরে ভাবে, যাক গে, কথার মুখে আপনি বেরিয়ে পড়বে, আগে থেকে চেষ্টা করে লাভ নেই।

সে বলে, সংসারে কার ঋণ কে শোধ করে বোন, মানুষের এমন সাধ্য কি যে অপরের ঋণ শোধ করে!

ও সব তত্ত্বকথা জানি নে দিদি, কিন্তু এ নিশ্চয় জানি তুমি যেভাবে ঋণশোধ করলে রেশমীর আপন দিদিও তা করতে পারত না।

টুশকি দেখল আসল কথা পাড়বার এই হচ্ছে সুযোগ, কিন্তু মুখে কথা আসবার আগে চোখে যে জল আসে, ভেসে যায় দুই গাল।

রেশমী ভাবে, গতরাত্রের অভিজ্ঞতা অশ্রুর হেতু। তারও চোখ ভরে ওঠে জলে, ভাবে তার জন্যেই এই অপমান টুশকির। ভাবে আর আত্মগোপন করে লাভ কি, এমন উপকারীর কাছে কি আত্মগোপন করতে আছে। ভাবে কাল রাতে পরিচয় দেবে বলেই তো স্থির করেছিল, তবে আর বাধা কি। তবু শেষ বাধাটুকু ঘুচতে চায় না।

তাকে দায়িত্ব থেকে মুক্তি দেয় টুশকি, বলে, কি করে জানলে যে তোমার আপন বোন থাকলে এমনভাবে ঋণশোধ করত না?

কেমন করে জানব বল, থাকলে কি হত!

কখনও কি ছিল না?

রেশমী দ্বিধামাত্র না করে বলে, না, ছিল না। টুশকি স্থির করেছিল ধীরে ধীরে কথার মোড়ে মোড়ে আঘাত সইয়ে সইয়ে আত্মপরিচয় দেবে। কিন্তু রেশমীর অস্বীকৃতিতে তার সমস্ত ধৈর্য ভেঙে পড়ল, কীটদষ্ট মহীরুহ একমুহূর্তে হল ভূমিসাৎ। মানুষ বোধ করি আর সব সহ্য করতে পারে, কেবল বেনামী কৃতজ্ঞতা ছাড়া।

সে একেবারে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

রেশমী বলল, কাঁদ কেন টুশকি-দি?

ওরে টুশকি নয়, টুশকি নয়, বল্ টুনিদি।

টুনি! রেশমী আমূল কেঁপে ওঠে, কি বলবে ভেবে পায় না, ও নাম কেমন করে জানল টুশকি?

দুর্লঙ্ঘ্য বাঁধে প্রথম রন্ধ্র দিয়ে এক অঞ্জলি জল যখন নির্গত হয়, কারিগরে ভাবে

মেরামত করে নিলেই হবে, কিন্তু তখনই এখানে ওখানে ফাটল দেখা দেয়, ক্রমে ফাটলের সংখ্যা আর বিস্তার বাড়ে, কিছুক্ষণ পরে বাঁধের আর অস্তিত্ব থাকে না।

এবারে বাঁধের প্রকাণ্ড এক চাঙড় ভেঙে পড়ে। টুশকি বলে, ওরে আর ভাঁড়াস নে। কাল যখন পাষণ্ডটা ধরে আনল, ভাবলাম, ভগবান, এ কি পরীক্ষায় ফেললে! কিন্তু যখন শুনলাম যে, আমাকে রেশমী মনে করে এনেছে,—

সকলকেই তো তাই মনে করে আনে—

কিন্তু সকলে তো তার আপন বোন নয়—

কি বলছ তুমি!

এবারে চীৎকার করে টুশকি বলে ওঠে, ওরে রেশমী রেশমী, এতকাল কেন সৌরভী নাম নিয়ে ভাঁড়িয়ে ছিলি, কেন বলিস নি তুই আমার আপন বোন, তুই রেশমী!

রেশমীর মনে অভাবিতের চমক লাগে। বলে, এসব কি বলছ, খুলে বল, খুলে বল!

কিন্তু খুলে বলা কি সহজ! এ যে লজ্জার কথা, দুঃখের কথা। যে জীবন মাটির তলে চাপা পড়ে ছিল তা তুলে বলবার কথা! তবু বলতে হয়।

ওরে রেশমী, তোর টুনি নামে বোন ছিল মনে পড়ে?

বিদ্যুৎভরা নৈঃশব্দ্য নামে রেশমীর মুখে চোখে।

টুশকি সংক্ষেপে বলে, আমি সেই টুনি।

তুমি টুনি! আর কিছু বলতে পারে না রেশমী।

আমি টুনি, জোড়ামউ গাঁয়ের টুনি; তুমি রেশমী, জোড়ামউ গাঁয়ের রেশমী।

ঐ কথাগুলো বারংবার সে আবৃত্তি করে করে যায়, জীবন্মৃত ব্যক্তি যেমন বারে বারে দেহে আঘাত করে দেখে সত্যই জীবনের অনুভূতি আছে কি না।

বিস্ময় কাটে না রেশমীর। সে বলে, তুমি টুনিদি! তবে বাবা মা নাড়ু কোথায়? মনে পড়ে না তাদের কথা সত্য কিন্তু বাল্যকাল থেকে শুনে শুনে সমস্ত যেন পরিষ্কার দেখতে পাই।

কেউ নেই রে বোন। আমি না থাকলেও বোধ করি ভাল ছিল।

সুগভীর খাদের ধারে দাঁড়িয়ে পা পিছলে পড়বার ঠিক আগের মুহূর্তে এ কি অন্তিম রহস্যময় পরিচয়! আর দু'দণ্ড পরিচয়টা না হলে এমন কি ক্ষতি ছিল! আশ্চর্য এই জীবন!

এতদিন দুজনের জীবন এক বাড়িতেই সমান্তরালভাবে চলছিল, কোথাও দুই জলধারায় যোগাযোগ ঘটে নি। আজ দুঃখের বন্যায় তীর ছাপিয়ে দুই নদী একাকার হয়ে গেল।

তখন দুই বোনে নিরিবিলি বসে নিজ নিজ জীবন-বৃত্তান্ত বলে যায়। টুশকি আগে বলে গঙ্গাসাগর যাত্রা, বোম্বেটের আক্রমণ, আর সকলের মৃত্যু, টুশকির কলকাতায় আগমন। কলকাতার অভিজ্ঞতা বর্ণনার সময়ে বড় বড় ফাঁক রয়ে যায়, সে ফাঁকগুলো পূরণ করে নিতে কষ্ট হয় না রেশমীর, জীবনের সঙ্গে তারও ঘটেছে পরিচয়।

ওদিকে রেশমী বলে তার জীবন বৃত্তান্ত। মুমূর্ষুর সঙ্গে বিয়ে, চণ্ডী বক্সীর লোভ, চিতা থেকে পলায়ন, কেরীর আশ্রয়, মদনাবাটির অভিজ্ঞতা, কলকাতায় প্রত্যাবর্তন, রোজ এলমার—সব বলে যায়। জনের সঙ্গে তার সম্বন্ধটা খসড়ায় আঁকে, বাদ দেওয়া চলে

না, বাদ দিলে শ্রীরামপুরের কথা বাদ দিতে হয়, মোতি রায়ের কথাও বাদ পড়ে যায়।

টুশকি আর রেশমী আবিষ্কার করে যে, তাদের পরিচয় হওয়ার অনেক আগে থেকেই দুটো সুতোয় তারা বাঁধা পড়ে গিয়েছে—রামরাম বসু আর ন্যাড়া।

দুজনেই মনে মনে ভাবে, মুখেও শেষ পর্যন্ত বলে, কায়েৎ দা থাকলে এর বোধ হয় একটা বিহিত হত, কিন্তু কোথায় যে গেল সে!

আর ভাবে, আহা, ঐ ন্যাড়া যদি তাদের হারানো ভাইটি হত! কিন্তু কেমন করে তারা জানবে যে, উপন্যাসে যেমন করে সমস্ত ছিন্ন সূত্রগুলো অনায়াসে জোড়া লেগে যায়, জীবনে তেমনটি যায় না। দু-চারটে ছিন্নসূত্র শেষ পর্যন্ত অবলম্বনহীন হয়ে ঝুলতেই থাকে।

লজ্জায় আর দুঃখে ভরা দুজনের জীবনকাহিনী কখন একসময়ে শেষ হয়ে আসে, তখন সম্মুখে থাকে ভবিষ্যতের চিন্তা।

দুজনে কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে, তার পর হঠাৎ টুশকি বলে ওঠে, আচ্ছা রেশমী, তুমি জনকে বিয়ে কর না কেন?

রেশমী কৃত্রিম বিস্ময়ে বলে, সে যে খ্রীষ্টান!

সত্যকার বিস্ময়ে টুশকি বলে, তাতে কি? খ্রীষ্টান জন কি খাঁটি হিন্দু মোতি রায়ের চেয়ে খারাপ?

আসল কথা রেশমী বলতে পারে না; জনের সঙ্গে তার বিয়ের আভাস দিয়েছিল সে, কিন্তু পরে জন যে তাকে ত্যাগ করেছে, অকথ্য দোষারোপ করেছে সে কথাটুকু বলে নি। ও কথা প্রকাশ করতে চায় কোন্ মেয়ের মন!

কিন্তু এখন জনের প্রসঙ্গে সঙ্কটমুক্তির একটা উপায় যেন সে দেখতে পেল। এতক্ষণ কথাবার্তার তলে তলে টুশকিকে মুক্ত করবার উপায় অনুসন্ধান করছিল। কাল রাত্রে টুশকি তার পরিচয় স্বীকার করে নিয়ে তাকে বাঁচিয়েছে—আজকে কি তাকে বাঁচাতে পারবে না রেশমী?

জনের প্রসঙ্গে মনে হল, এবারে বোধ করি উপায়টা পাওয়া যাবে, তাই বলল, এতদিনে আমার খোঁজ না পেয়ে জন বোধ করি বিয়ের ইচ্ছা পরিত্যাগ করেছে।

টুশকি বলল, আবার খোঁজ পেলেই সে ইচ্ছা প্রবল হয়ে উঠবে।

কিন্তু খোঁজ পাবে কেমন করে দিদি, কেমন করে জানবে যে আমরা এখানে বন্দী হয়ে আছি?

তা বটে। চুপ করে টুশকি, ভেবে পায় না জনকে সংবাদ দেওয়ার উপায়।

তখন রেশমী বলে, তুমি এক কাজ কর না দিদি, জনের ঠিকানা দিচ্ছি, তাকে গিয়ে সংবাদটা দাও না, তাহলে নিশ্চয় সে একটা উপায় করবে।

রেশমী জানত যে, জনের মনের যে অবস্থা তাতে কিছু আশা করা চলে না— আর সে উদ্দেশ্যেও এ প্রস্তাব করে নি সে। তার ইচ্ছা ঐ ছুতোয় টুশকিকে বাইরে যেতে রাজী করা। তার নিজের কর্তব্য সে একপ্রকার স্থির করে ফেলেছে।

রেশমীর কথা শুনে টুশকি বলল, কিন্তু এখান থেকে বাইরে যাওয়ার পথ যে বন্ধ।

সে কি একটা কথা! যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ। উপায় করতেই হবে, বাঁচতে হবে তো।

কিন্তু তুমি?

জন যদি তোমার কাছে খোঁজ পেয়ে আসে তো ভালই, আর না এলেও আমি পালাতে পারব।

টুশকির মুখে সংশয়ের ছায়া দেখে সে বলে, পালাতে আমি খুব অভ্যস্ত। চিতা থেকে পালিয়েছি, মোতি রায়ের গুণ্ডাদের হাত থেকে একবার পালিয়েছি—আবার পালাব।

সরল বিশ্বাসে কথাটা গ্রহণ করে টুশকি, তবু শুধায়, কিন্তু উপায় ?

ঐ যে উপায় আসছে।

এমন সময়ে খুদিরাম প্রবেশ করে বলে, কি, নাওয়া-খাওয়া হবে নি ? না খেয়ে চোখ মুখ বসে গেলে কর্তা আমাকে যে বকবে ? সন্ধ্যাবেলা আবার যে দুজনে জুড়ি মিলবে ভাল।

এই বলে সে হেসে ওঠে।

টুশকি ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নেয় কিন্তু রেশমীর ভাব অন্য রকম। সে সস্নেহে হেসে বলে, তোমারও নাওয়া-খাওয়া হয় নি খুদিরাম দাদা ?

খুদিরাম দাদা একটু নরম হয়, বলে, আমার আর নাওয়া-খাওয়া! তোমাদের পাহারা দিয়ে বসে আছি।

আহা, তোমার তবে তো বড় কষ্ট।

এই রকম চলেছে আজ কুড়ি বছর।

কি বল খুদিরাম দাদা, কুড়ি বছর খাও নি তুমি ? তবে তো লক্ষ্মণকেও ছাড়িয়ে গিয়েছ—সে তো কেবল বারো বছর না খেয়ে ছিল।

হেসে ওঠে খুদিরাম।

টুশকি এতক্ষণ নীরবে দেখছিল খুদিরামকে। তার মনে হল, উঃ, কি বীভৎস লোকটা! আগাগোড়া ঘোর কালো, একটা পা খোঁড়া—কিন্তু কালো রঙটা ঘনতর দেখায় মাথার সাদা সাদা চুলে, সাদা ভুরুতে, সাদা দাঁতগুলোয়--আর চোখের সাদা সাদা অংশ দুটোতে। ঐ সাদার আলোটুকু ফেলে কালো রঙকে দেদীপ্যমান করে তুলেছে।

টুশকি ভাবে, এই বীভৎস পাষণ্ডটার সঙ্গে রেশমীর এ কি সদয় ব্যবহার!

খুদিরাম রসিকতার উত্তর দেয়, বলে, লক্ষ্মণ না হয় বারো বছর না খেয়ে ছিল, সীতা তো না খেয়ে ছিল না ; এখন ওঠ, স্নান কর, খাও। ওদিকে আবার রাবণ আসছে।

রেশমী হেসে বলে, রাবণের জন্য প্রস্তুত হয়েই আছি।

এই তো চাই। কিন্তু এ রাবণ আবার মুখ-চোখ-বসা সীতা পছন্দ করে না। তা ছাড়া তোমাকে দেখবার জন্যে শহরের বড়লোকদের আজ ভিড় লেগে যাবে—সকলকে নিমন্ত্রণ করা হয়েছে যে।

রেশমী সাগ্রহে বলে, তবে তো নাওয়া-খাওয়া করতে হয়। এতগুলো বড়লোকের সামনে শুক্‌নো মুখে বের হলে কর্তা বোধ হয় তোমাকে মন্দ বলবে।

শুধু মন্দ বলা! চাবুকে হাড়েমাসে আলাদা করে দেবে না! এই দেখ—বলে পিঠে কয়েকটা দাগ দেখায়।

এবারে সত্যই দুঃখ হয় রেশমীর।

খুদিরাম বলে, আমাকে কেন রেখেছে জান দিদিমণি, এই কালো রঙটার জন্যে। কালো রঙ যে চাবুকের দাগ লুকিয়ে রাখে।

এ কাজ ছেড়ে দাও না কেন!

সাধ করে কে এমন কাজ করে ?

তবে ?

ছাড়তে গেলে কুকুরের মত গুলি করে মারবে।

কেন ?

কেন কি ! আমি যে বাগানবাড়ির অনেক রহিস্যি জানি। যতদিন এখানে আছি, মুখ বন্ধ আছে, কাজ ছেড়ে অন্যত্র গেলেই মুখ খুলব বলে ভয় করে কর্তাবাবু।

সত্যি তোমার বড় দুঃখ, দীর্ঘশ্বাস ফেলে রেশমী।

নররাক্ষস মোতি রায়ের সহকারী খুদিরামও কম রাক্ষস নয়। কিন্তু এ সংসারে কোন রাক্ষসই নিরেট রাক্ষস নয়। তাকে তৈরি করবার সময়ে সৃষ্টিকর্তার আঙুলের স্পর্শ যে লাগে রাক্ষসের দেহে—ঐটুকুতে বাঁধন আল্‌গা থেকে যায়। রেশমীর সদয় ব্যবহার ঐ বাঁধনগুলোকে আর একটু আল্‌গা করে দিল।

রেশমী বলল, উঠে নাওয়া-খাওয়া করতে হয়, নইলে আবার তোমার উপরে মারধোর হবে। কিন্তু এক কাজ কর না কেন খুদিরাম দাদা—এই টুশকিদিকে ছেড়ে দাও না কেন ?

সে কেমন করে হয় ?

কেন হবে না ? কর্তার নিজের মুখে তো শুনেছ যে, আমি হচ্ছি আসল রেশমী !

তা শুনেছি বই কি।

তবে আর একে আটকে রাখা কেন ?

ছাড়তে তো বলে নি।

না ছাড়তেও বলে নি—ওটা বুঝে নিতে হবে। বুঝলে না খুদিরাম দাদা, অন্য লোক হলে খুলে বলত, তোমার মত বুদ্ধিমান লোককে খুলে বলা বাহুল্য মনে করেই বলে নি।

বুদ্ধির প্রশংসায় খুশি হয়ে সে বলল—তা বাহুল্যি বটে।

তবে আর কি, ছেড়ে দাও। নাও এখন কোথায় স্নানের জায়গা দেখিয়ে দাও।

কি কারণে জানি না, দীনতম মানুষের মনও প্রাজ্ঞতম ব্যক্তির দুরধিগম্য, টুশকিকে ছেড়ে দিতে খুদিরাম সম্মত হল।

তবে তুমি এস টুশকিদিদি, বলে খুদিরাম এগিয়ে গেল।

শেষ মুহূর্তে টুশকি বেঁকে বসে, বলে, না, তোমাকে ছেড়ে আমি একা যাব না।

রেশমী বোঝায়, দুজনের একসঙ্গে যাওয়া সম্ভব নয়। তুমি যাও, গিয়ে জনকে সব খবর দাও, কায়েৎ দার সন্ধান পেলে তাকেও সব জানিও—আমার মুক্তি পাওয়ার এ ছাড়া উপায় নেই। নাও ওঠ, শীগগির কর, আবার কে কোথা থেকে এসে পড়বে, তখন সব মাটি হয়ে যাবে।

অনেক কষ্টে তাকে বুঝিয়ে পড়িয়ে জনের ঠিকানা বলে দিয়ে বিদায় করে দেয় টুশকিকে। সে কাঁদতে কাঁদতে বিদায় হয়ে যায়, বলে যায়, আমি এখনই ওদের নিয়ে ফিরে আসছি বোন, ততক্ষণ একটু সাবধানে থেকো।

রেশমী হেসে বলে, আমার জন্যে ভয় ক'র না দিদি, আমার কর্তব্য আমি স্থির করে ফেলেছি।

তার শেষ কথাগুলোর অর্থ তলিয়ে দেখে না টুশকি, রেশমীকে উদ্ধার করতে হবে এই সঙ্কল্প নিয়ে দ্রুত অনুসরণ করে খুদিরামের।

২০
রেশমীর সঙ্কল্প

রেশমী স্থির করেছে মরবে। বাঁচবে কেন ? বাঁচে আশায়। কোন আশা আছে রেশমীর ? মৃত্যুর সাক্ষী বা সঙ্গী করতে চায় না টুশকিকে—তাই তাকে কোন ছুতায় বিদায় করে দিয়েছে সে। জনের কাছে সাহায্যের আশা যে নেই, তার চেয়ে বেশি কে জানে। দীর্ঘকাল পরে, অপ্রত্যাশিত ভাবে ফিরে পেল হারানো বোনকে, কিন্তু এ যে না-পাওয়ারই সামিল। আর দুদিন, না, একদিন আগে ফিরে পেলেও পাওয়া হত। গতকাল পরস্পরের পরিচয় দানের কথা ছিল, তখন পেলেও পাওয়া হত। কিন্তু এ যে খাদের মধ্যে পতনশীল ব্যক্তির পাওয়া। সে-পাওয়া কি না-পাওয়া নয় ? আর মদনমোহন ! সে যে এমন করে দুঃসময়ে ফাঁকি দেবে কে জানত ? সেই বুড়ি-মা বলেছিল, ও আমার দুষ্টুর শিরোমণি, ফাঁকি দিতে ওর জুড়ি নেই, সব ছেড়ে ওকে না ধরতে পারলে ও ধরা দেয় না। সব ছেড়ে ওকে ধরতে পারে নি রেশমী, ও জনের সন্ধান পাওয়া মাত্র আলগা হাত ফস্‌কে মদনমোহন পালাল। জন, টুশকি, মদনমোহন—তিন কূল গিয়ে তার কোন্ আশাটা রইল বাকি ? বাঁচবে কেন ? মৃত্যুর দিকেই যে হাতের পাঁচটা আঙুলের নির্দেশ।

মৃত্যুর কথায় তার ফুলকিকে মনে পড়ে। সে বলেছিল যে, মরতে চাই নে, আবার মরতে ভয়ও পাই নে। সে আকাশের দিকে দেখিয়ে বলেছিল যে, ঐ মেঘখানার মত কখন্ মিলিয়ে যাব—ভয়টা কিসের ?

রেশমী বলেছিল, মৃত্যুর পর কি হবে ভেবে ভয় কর না ?

ফুলকি হেসে বলেছিল, মৃত্যুর আগে কি আছে দেখলাম তো সব। মৃত্যুর পরে এর চেয়ে আর খারাপ কি হবে ? না রেশমী, আমার ভয় করে না।

ফুলকির প্রসঙ্গে ওর আরও অনেক কথা মনে পড়ে। ফুলকি বলেছিল, পুরুষগুলো বড় লোভী, সন্দেশ দেখলেই খাই-খাই করে। কত আর পাহারা দিয়ে বসে থাকা যায়। দিই একটু হাতে তুলে, খুশি হয়ে বাড়ি ফিরে যায়।

রেশমী ভাবে, এমন করে তো সন্দেশ যার-তার হাতে তুলে দেওয়া যায় না, এ যে একজনের উদ্দেশে নিবেদন করা। আর অনিবেদিত হলেই কি যাকে-তাকে দেওয়া যায় ? ফুলকির সঙ্গে এখানে মেলে না তার।

স্নানের ঘরে বসে বসে টবের জলের সঙ্গে চোখের জল মিলিয়ে ভেবে যায় রেশমী। এমন সময়ে দরজায় ঘা পড়ে।

ও রেশমী দি, হল ? বেলা যে বয়ে গেল !

কাপড় ছেড়ে বেরিয়ে আসে রেশমী। খুদিরাম বলে, এবারে দুটো খেয়ে নাও।

রেশমী বলে, না, এবেলা আর খাব না।

আরও দু-একবার অনুরোধ করে ফিরে যায় খুদিরাম। দোতলার ঘরটা থেকে নীচেকার কর্মচাঞ্চল্যের আভাস পায় সে। ঘরে ঘরে ঝাড়লণ্ঠন জ্বালাবার ব্যবস্থা হচ্ছে, নাচ-ঘরটার যে অংশটা চোখে পড়ে, সেখানে সাদা জাজিম, জরির তাকিয়া, ফুলের ছড়াছড়ি ; একপাশে বারান্দার উপরে স্তূপীকৃত আতসবাজি ; পাশের ছোট ঘরটায় দেখতে

পেল কাঠের বাক্স থেকে বের করা মদের বোতলের সার। জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে দেখল যে গাড়িবারান্দার কাছে ফিটন, ব্রাউনবেরি জুটতে আরম্ভ করেছে—হঠাৎ সমস্ত বাগানবাড়িটা যেন প্রকাণ্ড একটা বিলাসের দুঃস্বপ্ন দেখতে আরম্ভ করেছে।

এত আয়োজন রেশমীর জন্যে! মনে মনে সে হাসে, কিন্তু বুঝতে পারে না যে, তার অগোচরে একটুখানি গর্বের আভাস মিশ্রিত রয়েছে সেই হাসিতে।

এমন সময়ে খুদিরাম এসে একটা পেটরা রাখে তার সম্মুখে।

কি আছে ওতে?

খুদিরাম বলে, পেশোয়াজ, কাঁচুলি, ওড়না, ঘুঙুর, আর যেমন মানায় সোনার গহনা।

এসব কেন?

শোন কথা একবার! তুমি কি এই পুরনো শাড়ি পরে আসরে বের হবে নাকি? আজ শহরের বড়লোক সব ভেঙে পড়বে যে তোমাকে দেখতে!

সংক্ষেপে রেশমী বলে, তা বটে।

তবে আর কি, এগুলো নিয়ে সাজতে আরম্ভ কর।

তার পরে বলে, অবশ্য এখনও দেরি আছে, আগে নিকি বাইজীর গান হবে, তার পরে পড়বে তোমার ডাক, সে রাত দশটার আগে নয়।

রেশমী বলে, আচ্ছা তুমি এখন যাও, আমি ঠিক সময়ে সেজে বের হব।

এই বলে পেটরা নিয়ে সে ঘরের দরজা বন্ধ করে।

২১
যুদ্ধযাত্রা

অপরাহ্নে বিউগল্ বেজে উঠল। অমনি দেখতে দেখতে জনের অফিসের সম্মুখে শ্বেতাঙ্গে, কৃষ্ণাঙ্গে শতাধিক লোক সমবেত হল। ঘোড়াও শতাধিক, এ সৈন্যবাহিনীতে পদাতিক হতে কেউ রাজী নয়, সকলেই অশ্বারোহী। জন, মেরিডিথ, প্রেস্টন, অগলার ও রাম বসু মিলে সকলকে সারবন্দী দাঁড় করাবার চেষ্টায় নিযুক্ত হয়। জন, মেরিডিথ, প্রেস্টন, অগলার চারজন পাশাপাশি, রাম বসু তাদের ঠিক পিছনেই। তার পরে দুই সারিতে শ'খানেক অশ্বারোহী—দলের মধ্যে ন্যাড়া আর গঙ্গারামও বর্তমান।

এমন বিচিত্র সৈন্যবাহিনী চালনা করবার সৌভাগ্য ক্লাইভ বা নেপোলিয়নের ঘটে নি। জাত্যাংশে, শিক্ষায়, পোশাকে, অস্ত্রে, অশ্বের উৎকর্ষে বৈচিত্র্যের চরম। ইংরেজ, বাঙালী, হিন্দুস্থানী, খ্রীষ্টান, হিন্দু, মুসলমান—সাহেবী কাটা পোশাক, ধুতি, পাজামা—বন্দুক পিস্তল লাঠি শড়কি—রেসের ঘোড়া, দামী আরবী, ফকিরের টাট্টু ঘোড়া। এমন কত বৈচিত্র্যের উল্লেখ করব। পাড়ার লোক অবাক, পথের কুকুরগুলো অবধিও ডাকতে ভুলে গেল বৈচিত্র্যের জলুসে।

কাদির আলীকে পাগড়ি বেঁধে প্রস্তুত হতে দেখে সবাই বলল, মিঞা সাহেব, তুমি আবার কেন, বয়েস হয়েছে ঘরে বসে থাক।

উত্তরে কাদির আলী একটি সামরিক হাসি হেসে বলল, ভাইজান, রুস্তম বুড়ো হলেও রুস্তম, যুদ্ধের দামামা শুনে কি সে ঘরে বসে থাকতে পারে?

ঘোড়া পেয়েছ তো?

পেয়েছি একটা যেমন-তেমন।

যথাসময়ে দেখা গেল কাদির আলী একটি গাধার পিঠে চেপে প্রস্তুত।

এ কি রকম ঘোড়া মিঞা সাহেব?

আরে ভাইসাহেব, ঘোড়া আর গাধা একই জাত।

সকলে বলে, তা বটে, তা বটে।

কিন্তু পড়লে যে একবারে সকলের পিছনে!

ফেরবার বেলায় রইব সকলের আগে। বুঝলে না ভাই, আল্লা দুনিয়া সৃষ্টি করেছেন, মানুষে সৃষ্টি করেছে আগু আর পিছু। আল্লার চোখে সব সমান।

এমন তত্ত্বজ্ঞানীর প্রতিবাদ সম্ভব নয়, সকলে চুপ করে থাকে। বিজয়ী কাদির আলী আবার সামরিক হাসি হাসে।

ন্যাড়া আর গঙ্গারামের বয়স অপেক্ষাকৃত অল্প। সাজপোশাক পাওয়ার পক্ষপাতিত্ব হবে আশঙ্কা করে পরিচিত এক যাত্রাওয়ালার কাছে গিয়ে দুজনে বর্মচর্ম অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে এসেছে। যোদ্ধা বলতে যেমনটি বোঝায় ঠিক সেই রকম, চোখ ঝলসে যায়।

বাহিনীকে পর্যবেক্ষণ করে নিয়ে জন সঙ্কেত করতেই বিউগল্ বেজে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে ঘোষিত হল মার্চিং অর্ডার। একযোগে গোটা পঁচিশেক বন্দুকের আওয়াজ হল—যাত্রা করল সৈন্যদল কাশীপুরের উদ্দেশে।

জন, মেরিডিথ, প্রেস্টন, অগলার সম্মিলিত কণ্ঠে গান ধরল—

"None but the Brave,
None but the Brave,
None but the Brave deserves the Fair."

সাহেবরা গান ধরেছে, কাজেই অন্য সকলের কিছু গাওয়া চাই। তখন নানা কণ্ঠে নানা সুরে গান উঠল; সৈন্যবাহিনীর মত সঙ্গীত-বাহিনীও সমান বিচিত্র।

পলাশীর যুদ্ধ সম্বন্ধে একটা গান মুখে মুখে ছড়িয়েছিল, অনেকে আরম্ভ করল সেটা—

"ছোট ছোট তেলেঙ্গাগুলি
লাল কুর্তি গায়
হাঁটু গেড়ে মারছে তীর
মীরমদনের গায়।
পড়ে যদি মীরমদন
খাড়া মোহনলাল,
জাফর আলির বেইমানিতে
নবাবের হল কাল।"

কেউ আবার পলাশীর যুদ্ধের ইতিবৃত্তে সন্তুষ্ট না হয়ে ক্লাইভের সময় থেকে ওয়ারেন হেস্টিংসের কালে চলে এল। গান ধরল,

"হাতী পর হাওদা, ঘোড়া পর জিন,
জলদি যাও জলদি যাও ওয়ারেন হস্তিন।"

গানও চলে, পা-ও চলে, সৈন্যদল কসাইটোলা পেরিয়ে চিৎপুর রোডে পড়ে। পথের ধারের দরজা-জানলা খুলে যায়—কোথায় চলেছে এরা সব ?

কেউ বলে, সাহেবরা শিকার খেলতে যাচ্ছে, কেউ বলে, সুখচরে সাহেবদের ছাউনি পড়বে। অধিকাংশ কিছুই বলে না, চুপ করে তাকিয়ে থাকে।

এমন সময়ে তারস্বরে গঙ্গারাম গেয়ে উঠল,

"পামকিন লাউ কুমড়া, কোকোম্বর শসা।
ব্রিঞ্জেল বার্তাকু, প্লাউমেন চাষা।"

গানটাকে ঠিক সামরিক সঙ্গীত বলা যায় না, কিন্তু সে বুঝে নিয়েছিল যে দেশকালপাত্র বিবেচনায় ইংরেজী গান কর্তব্য। তার ভাণ্ডারে এই গানটিই ইংরেজির নিকটবর্তী জ্ঞাতি। তার ইংরেজী জ্ঞানে আর-সকলে যতই বিস্মিত হয়, তার কণ্ঠস্বর তত উচ্চ থেকে উচ্চতর হতে থাকে—

ব্রিঞ্জেল বার্তাকু, প্লাউমেন চাষা

ইংরেজী-অনভিজ্ঞরা ঈর্ষায় কানাকানি করে—মুখস্থ করে এসেছে রে, নতুবা ওর বিদ্যের দৌড় তো আমাদের অজানা নেই!

বিশুদ্ধ ইংরেজী বা বাংলা গানের চেয়ে গঙ্গারামের মিশ্র-সঙ্গীত মিশ্র-বাহিনী কর্তৃক অধিকতর সংবর্ধিত হল দেখে ন্যাড়া ঠুংরি তালে খাম্বাজ রাগিণীতে গান ধরে দিল—

Nigh কাছে, Near কাছে,
Nearest অতি কাছে।
Cut কাট্, Cot খাট,
Following পাছে।"

বাঃ ভাই, বেশ, বেশ!

তোমরা না থাকলে কি এমন জমত!

চলুক দুজনে উতোর চাপান।

সার ভেঙে সবাই প্রায় দাঁড়ায় ওদের দুজনকে ঘিরে, যুদ্ধযাত্রা যাত্রাদলে পরিণত হওয়ার মত আর কি। এমন সময় জন এসে গর্জন করে ওঠে, চাবুক চালায়—তাতে আসর ভেঙে গেলেও গান চলতে বাধা থাকে না।

জন ফিরে গিয়ে বন্ধুদের বলে, জোড়া ফলস্টাফ খুব জমিয়েছে।

জন বলে, মুন্সী, তুমি চুপ করে আছ কেন, একটা কিছু গাও!

আমি তো তোমাদের মত জঙ্গী গান জানি নে, কি গাইব ?

বল কি, তুমি জঙ্গী গান জান না! তোমাদের গডেস কালী হচ্ছে গ্রেটেস্ট ওয়ারিয়র। গডেস কালীর একটা গান ধর।

বেশ, তবে তাই হক, এই বলে বিশুদ্ধ রামপ্রসাদী সুরে সে গান—

"আয় মা সাধন সমরে
দেখি মা হারে কি পুত্র হারে।"

বাস্তব সমরসজ্জার সঙ্গে আধ্যাত্মিক যুদ্ধের সুর মিলে গিয়ে সে এক অপূর্ব আবহাওয়ার সৃষ্টি হয়। একশ ঘোড়ার চারশ পা তাল দেয় সেই সঙ্গীতে, সকলে তন্ময় হয়ে শোনে, 'আয় মা সাধন সমরে।'

জন, অনুবাদ করে বুঝিয়ে দেব নাকি ?

মেরিডিথ বলে ওঠে, অমন চেষ্টাও ক'র না মুন্সী। এসব দৈব সঙ্গীত অনুবাদেব ধোপে টেঁকে না।

কেমন করে জানলে? শুধায় প্রেস্টন আর অগলার।

তবে একটা অভিজ্ঞতা বর্ণনা করি শোন।

দেশে থাকতে হে-মার্কেট থিয়েটারের এক অভিনেত্রীর রূপে আমি মুগ্ধ হয়েছিলাম। নাটকে সাজত সে গ্রীক পুরাণের দেবী। কি রূপ, কি পোশাক! অনেক অনুনয়-বিনয় ও অনেক বেশি অর্থব্যয় করে এক রাত তার কাছে থাকবার অধিকার পেয়েছিলাম।

থাক, থাক। বলে ওঠে জন।

থাকবে কেন! অনুবাদ মানে ভাষার পোশাক খুলে নেওয়া—এই তো? সেই গ্রীক দেবীর অনুবাদ করতে পেলাম কঙ্কালসার এক বুড়ি। আক্কেল-সেলামী রেখে সরে পড়লাম। সেই থেকেই অনুবাদের উপব আমার বিষম বিতৃষ্ণা, বিশেষ দেবদেবী সম্পর্কিত হলে।

সকলে হো হো করে হেসে ওঠে।

রামরাম বসু বলে—তবে না হয় থাক, কিন্তু সুরটা লাগছে কেমন?

খুব সামরিক। প্রত্যেক গিটকিরিতে সঙ্গিনের খোঁচা মারছে।

"আয় মা সাধন সমরে,
দেখি মা হারে কি পুত্র হারে!"

জনের সৈন্যদল জোড়াসাঁকোর একটি গলির মুখে এসে পড়তে একখানা সুদৃশ্য ব্রুহাম গাড়ির বাধা পেল। গাড়িখানা গলি থেকে বেরিয়ে রাস্তায় পড়ছিল। সৈন্যদের হল্লায় ব্রুহাম থেকে মুখ বার করে দিল দুইজন সুবেশ সুপুরুষ যুবক।

দ্বারিকবাবু, ব্যাপার কি?

কেমন করে বলব দেওয়ানজী!

তা বটে। কলকাতায় এ তোমাদের নিত্যকার ব্যাপার।

তা হলেও আজ কিছু বাড়াবাড়ি দেখছি, দেওয়ানজী।

যাই বল দ্বারিকবাবু, আমরা রংপুরে বেশ আছি, এমন নিত্য অশান্তি সেখানে নেই।

দেওয়ানজী, সাহেবগুলোর স্পর্ধা বেড়ে উঠেছে।

তার প্রতিকার কি জান? আমাদের স্পর্ধা তার চেয়েও বেশি বাড়িয়ে তোলা।

তেমন আশা করবার মত বুকের পাটা নেই।

হবে হবে, কালে সব হবে দ্বারিকবাবু, একটা পাখী যখন ডেকেছে, হাজার পাখী ডাকবে। ভোর হতে আর বিলম্ব নেই।

সৈন্যবাহিনী চলে যায়, গাড়িখানা বড় রাস্তায় পড়ে একটা গলিতে মোড় ফিরে চলে যায় পূর্বদিকে।

কিছুক্ষণের মধ্যে জনরা সকলে মদনমোহন তলায় এসে পৌঁছয়।

রাম বসু জনকে মদনমোহনের মন্দিরের পরিচয় দিতে উদ্যত এমন সময় ন্যাড়া চীৎকার করে ওঠে, কায়েৎ দা, ঐ যে টুশকি দি!

টুশকি জনের অফিসের উদ্দেশে রওনা হয়েছিল, এমন সময়ে জনতার বাধা পেয়ে পাশ দিয়ে দাঁড়িয়েছিল, আর ঠিক সেই সময়ে পড়ে গেল ন্যাড়ার চোখে।

সে উচ্চস্বরে হাঁকল, ব্যাটেলিয়ন, হ—ল্ট।

ঘোড়া থেকে নেমে রাম বসু যায় টুশকরি কাছে। রেশমীর আশ্রয়দাত্রী টুশকির নামটা শুনেছিল জন রাম বসুর মুখে, কাজেই জন বুঝল যে, ঘটনা এবার চূড়ান্ত পরিণামের দিকে ঘনিয়ে উঠেছে।

মাধব রায় জলসার নিমন্ত্রণ-চিঠি পেয়ে ছুটে উপস্থিত হল শোভাবাজারে, রাধাকান্ত দেবের কাছে। বলল, হুজুর, আজ কাশীপুরের বাগানবাড়িতে মেয়েদের উপর অত্যাচার হওয়ার আশঙ্কা আছে, দেখুন চিঠি।

রাধাকান্ত দেব চিঠিখানা পড়ে বললেন, লোকটার আস্পর্ধা তো কম নয়! একবারে রোঘো ডাকাতের মতন নোটিশ দিয়ে অত্যাচার করে! আচ্ছা তুমি এক কাজ কর, আমার চিঠি নিয়ে যাও লাট কাউন্সিলের সেক্রেটারি ম্যাকার্থির কাছে।

রাধাকান্ত দেবের চিঠি নিয়ে মাধব রায় গেল ম্যাকার্থির কাছে। ম্যাকার্থি তখন স্পোকারের নামে চিঠি লিখে মাধব রায়ের হাতে দিল। চিঠিতে লিখে দিল যে, সে যেন অবিলম্বে পুলিস নিয়ে কাশীপুরের বাগানবাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হয়, মেয়েছেলের উপর অত্যাচার নিবারণ করতে হবে।

স্পোকারের তলে তলে সহানুভূতি ছিল মোতি রায়ের সঙ্গে। কিন্তু হলে কি হয়, লাট কাউন্সিলের সেক্রেটারির চিঠির মূল্য মোতি রায়ের গোপন অর্ঘ্য নিবেদনের চেয়ে অনেক বেশি। সে তখনই জন-পঁচিশেক পুলিস নিয়ে রওনা হল কাশীপুর অভিমুখে।

এতক্ষণে মাধব রায়ের দৌত্য সফল হল। এবারে সে ফিরে গেল নিজের বাড়িতে।

সবাই বলল, যাবে না আজ কাশীপুরের বাগানবাড়িতে?

মাধব রায় বলল, বাপ্ রে, মোতিদার নিমন্ত্রণ, না গেলে রক্ষে আছে!

তবে এত পাইক-বরকন্দাজ সঙ্গে নিচ্ছ কেন?

আরে বাপু, রাজার নিমন্ত্রণে রাজার মত যেতে হয়। তার পরে হেসে বলে, রাজা না হই রাজার ভাই তো বটি!

মাধব রায় জনপঁচিশেক পাইক-বরকন্দাজ নিয়ে ব্রুহাম গাড়ি চড়ে রওনা হয় বাগানবাড়ির দিকে।

সমস্ত কলকাতা শহর আজ কাশীপুর-অভিমুখী।

টুশকি রাম বসুর কাছে সংক্ষেপে গত একমাস কালের ঘটনা বর্ণনা করল। সৌরভী যে রেশমী, রেশমী যে তার সহোদরা, সে যে জোড়ামউ গাঁয়ের মেয়ে, সমস্ত খুলে বলল, কিছুই গোপন করল না, আর গোপন করবার কারণও ছিল না।

স্বাভাবিক অবস্থা হলে এসব বর্ণনা ও ব্যাখ্যায় কিছু সময় লাগত, কিন্তু তড়িঘড়ি অবস্থা, তাই সমস্ত দ্রুত নিঃশেষ হল। সঙ্কটকালে মানুষ এক পদক্ষেপে দশধাপ অতিক্রম করে।

রাম বসু ও ন্যাড়া স্তম্ভিত হয়ে শুনল, কাহিনী শেষ হয়ে গেলেও কথা সরল না তাদের মুখে। ন্যাড়া প্রথমে কথা কইল, বলল, এ যেন একটা রূপকথা, কেবল সেই হারানো ভাইটিকে পাওয়া গেলেই 'আমার কথাটি ফুরোল নটে গাছটি মুড়োল' হত।

বহুদর্শী রাম বসু দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলল, সংসারের রূপকথা অত শীঘ্র ফুরোয় না, আর সংসারের নটে গাছের ডালপালাগুলোও খুব জটিল।

তার পর বলল, চল্, তোকে জন সাহেবের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই।

ইতিপূর্বেই জনের পরিচয় ও তাদের সদলবলে আগমনের উদ্দেশ্য বর্ণনা করেছে রাম বসু। টুশকিও বলেছে যে, সে জনকে খবর দেবার উদ্দেশ্যেই রওনা হয়েছিল, তবে রাম বসুর সাক্ষাৎ যে পাবে এমন আশা ছিল না।

রাম বসু জনকে বলল, জন, এই মহিলাটি হচ্ছে রেশমীর আপন বোন। এদের জীবনে অনেক কমেডি অব্ এররস্, অনেক রোমান্স আছে, সে-সব এক-সময়ে খুলে বলব, আপাতত এইটুকুতেই সন্তুষ্ট থাক।

তার পরে সংক্ষেপে জানাল যে, টুশকি তাকে রেশমীর সন্ধান দেবার জন্যেই যাত্রা করেছিল।

জন টুশকিকে অভিবাদন করে জানাল যে, তার মুখে রেশমীর সঠিক সংবাদ পেয়ে অনেকটা নিশ্চিন্ত হল, কিন্তু সশরীরে তাকে পাষণ্ডটার কবল থেকে উদ্ধার না করা পর্যন্ত সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হতে পারছে না।

তার পরে জন মেরিডিথ, অগলার ও প্রেস্টনকে সব খুলে বলে জানাল যে, এই মহিলাটি রেশমীর সহোদরা।

মেরিডিথ প্রেস্টন ও অগলারকে একান্তে ডেকে বলল, উষার সৌন্দর্য প্রভাতের সৌন্দর্যের সূচনা দিচ্ছে, জন ঠকে নি।

প্রেস্টন বলল, এরকম মেয়ের জন্যে লড়াই করে আনন্দ আছে।

অগলার বলল, শুধু লড়াই কেন, মরতেও আনন্দ, নইলে ইলিয়াড কাব্য লেখা হত না।

রাম বসু বলল, আর দেরি নয়।

জন বলল, নিশ্চয়।

তার পর সে হাঁকল, ব্যাটেলিয়ন, 'টেনশন—ব্যাটেলিয়ন, মা—র্চ!

মদনমোহনতলা ও বাগবাজার বিস্মিত উচ্চকিত করে বিচিত্র বাহিনী আবার যাত্রা শুরু করল—সম্মুখে বাগবাজারের খাল।

রাম বসু বলল, টুশকি, তুই সঙ্গে যাবি?

বাঃ, সঙ্গে যাব না তো কি এখানে থাকব!

তুই যে ঘোড়ায় চড়তে পারিস না।

হেঁটেই যাব।

হেঁটে যাবি কি রে, ঘোড়ার সঙ্গে হেঁটে পারবি কেন?

তখন সমস্যার সমধান করে দিল কাদির মিঞা। সে বলল, বিবিজান যদি তার 'ঘোড়ায়' চাপে তবে সে 'ঘোড়াটা' দিতে পারে।

টুশকি বলে উঠল, কায়েৎ দা, এ কিরকম ঘোড়া!

কাদির আলী একগাল হেসে বলল, সোয়ারের গৌরবে বেটার গাধাজন্ম ঘুচে যাবে। মেহেরবানি করে চাপতে হুকুম হক।

রাম বসু বলল, মিঞাসাহেবের যৌবন যেন এখনও যায় নি।

বহুৎ আচ্ছা মুন্সীজি! বাহাদুর আদমীর যৌবন আর বীরত্ব কখনও যায় না।

অগত্যা টুশকি 'ঘোড়া'য় চাপল।

রাম বসু বলল, যাঃ, বেটার গাধাজন্ম ঘুচে গেল, পরজন্মে উচ্চৈঃশ্রবার বাচ্চা হয়ে কার্তিক-গণেশকে পিঠে করে ছুটোছুটি করে বেড়াবে।

টুশকি বলল, কায়েৎ দা, এমন দুঃখের সময়েও এমন সব হাসির কথা মনে আসে তোমার !

ঐ যে শুনলি না কাদির আলীর কথা। বাহাদুর আদমীর রস আর রঙ্গ কখনও যায় না।

পথ শেষ হয়ে এল, সূর্যও ডোবে-ডোবে, অদূরে কাশীপুরের বাগানবাড়ির প্রকাণ্ড সৌধ।

২২
অগ্নিদেব

বাগানবাড়িতে একতলার প্রকাণ্ড নাচঘরের পাঁচটা ঝাড়ের আলোয় শুভ্র জাজিমে আসীন, শয়ান, অর্ধশয়ান "বাবু"দের সোনার চেন, হীরার আঙটি, কোঁচানো চাদর, গিলে-করা জামা, কুঞ্চিত কেশদাম, মসৃণ টাক, নিমীল-উন্মীল রক্তাভ নেত্র অপূর্ব শোভা বিস্তার করছে। সেই সঙ্গে ফুলের মালার, আতর-গোলাপের আর সুরার গন্ধ টানাপাখার বাতাসের তালে তালে হিল্লোলিত। অদূরে উপবিষ্ট নিকি বাইজী তানপুরা নিয়ে গান করছে "বাজে পাঁয়োরিয়া ঝনন নন।" অনেক বাবু ইতিমধ্যেই স্থান-কাল-পাত্র সম্বন্ধে গতসম্বিৎ ; যাদের চৈতন্য এখনও মহাপ্রলয়ে নিমজ্জমান নয়, তাদের কেউ কেউ তাকিয়ার উপরে টোকা মেরে গানের সঙ্গে তাল দেবার চেষ্টায় নিযুক্ত, কেউ কেউ তাল রক্ষার চেষ্টায় 'সমে' পৌঁছবার আগেই ঢুলে পড়ছে ; কোন কোন বাবু স্খলিতবচনে কিছু বলবার চেষ্টা করছে, কিন্তু সুরাবিকল বাগ্‌যন্ত্র অন্তরায়। এই বাবুসমাজের মাঝখানে উচ্চাবচ গিরিশৃঙ্গসমাজে কাঞ্চনজঙ্ঘার ন্যায় মোতি বিরাজমান। লোকটা সুরার নীলকণ্ঠ, সকলের চেয়ে বেশি পান করেও এখনও পুরোপুরি সজ্ঞান। তার হাতের গোটা আষ্টেক আঙটিতে, হীরের বোতামে, সোনার চেনে, সুচিক্কণ টাকে বিদ্যুৎ খেলছে, রক্তাভ চক্ষুর্দ্বয় মঙ্গলগ্রহের মত নির্নিমেষ ; ছয় রিপু তার সমস্ত মুখে অসংখ্য ছাপ মেরে দিয়েছে—হাত-ফিরতি চিঠিতে যেমন হয়ে থাকে। রাত্রি প্রথম প্রহর।

এমন সময়ে বেচারামবাবু বলে উঠল, রায়মশায়, এইসব পায়োরিয়া-টায়োরিয়া এখন থাকুক, এবারে বাঘের খেলা আরম্ভ করতে হুকুম দিন।

বাঘ শব্দটা জনৈক বাবুর সুপ্তচৈতন্যে সুড়সুড়ি দেওয়াতে সে জেগে উঠল। বাঘ শব্দটা তখনও তার মগজে ঘুরছে, চীৎকার করে বলে উঠল, "বাঘের বিক্রম সম মাঘের হিমানী।" তার সুরাজড়িত হুঙ্কারে অনেক বাবুর নিদ্রাভঙ্গ হল, বেচারামের দাবির সমর্থনে সবাই বলে উঠল, হাঁ হাঁ, বাঘের খেলা আরম্ভ হক, নিকি বাইজীর গান শুনতে আমরা আজ আসি নি।

বাঘের খেলা সার্কাসের শেষ খেলা। বর্তমান প্রসঙ্গে আসরে রেশমীর আগমন।

মোতি রায় বলল, আপনারা আর একটু অপেক্ষা করুন, মাধব রায় আগে আসুক।

বেচারাম বলে উঠল, কেন বাবা, মাধবের চেয়ে কি আয়ান ঘোষের দাবি কম ?

আবার সকলে একযোগে বলে উঠল, হাঁ হাঁ, মাধবের চেয়ে আয়ান ঘোষের দাবি বেশি।

বেচারামবাবু গান ধরল, "রাধা তুই রেশমী হলি কল্‌কেতাতে, জীবনে সুখ কি বল্‌ না পড়লি যদি আমার পাতে।"

সমবেত ঐকতানে সকলে গেয়ে উঠল, "রাধা তুই রেশমী হলি কল্‌কেতাতে।"

বেড়ে ভাই, বেড়ে হয়েছে!

বলিহারি যাই!

তখন বাবুগণ রেশমীর রূপ, গুণ, বয়স ও আনুষঙ্গিক অন্যান্য বিষয় নিয়ে আলোচনা আরম্ভ করল।

কেউ বলল, এ চীজ মিলল কোথায়?

কেউ বলল, চোরের উপরে বাটপাড়ি আর কি!

কেউ বলল, মেয়েটা খাঁটি ফিরিঙ্গী, চন্দনগর থেকে চুরি করে আনা।

সকলে একসঙ্গে বলে উঠল, রায় মশায়, এবার আর সবুর সয় না, এবারে বের করুন আপনার রেশমী পুতুল।

মোতি রায় বলল, আর একটু সবুর করুন, মাধব এসে পড়ুক।

এমন সময়ে বাইরে বন্দুকের আওয়াজ উঠল।

দোতলার ঘরটায় দরজা বন্ধ করে রেশমী বসে ছিল। খুদিরাম বারে বারে দরজায় ধাক্কা দিয়ে বলে গিয়েছে, শীগগির সাজপোশাক সেরে নাও, বাবুরা বসে আছে।

রেশমী বারে বারে বলেছে, এই হল আমার। ততক্ষণ সবাই নিকি বাঈজীর গান শুনুক না।

কেন যে সে দেরি করছে নিজেই তা ভাল করে জানে না। বলা বাহুল্য, সাজপোশাক সে করে নি, নিজের শাড়িখানা মাত্র পরেছিল।

ঘরটার দক্ষিণ-পশ্চিম খোলা। দক্ষিণের জানলা দিয়ে কলকাতার দিকটা দেখা যায়, পশ্চিমের জানলা দিয়ে দেখা যায় ঠিক সম্মুখে গঙ্গা।

দক্ষিণের জানলার ধারে সে দাঁড়িয়ে আছে। কোনও আশা-ভরসা মনে পোষণ করছিল কি? টুশকি গিয়ে খবর দেবে, দলবল নিয়ে উদ্ধারের জন্য আসবে জন, এমন আশা-পোষণ বাতুলতা মাত্র। তবু সেরকম ক্ষীণ আশা হয়তো ছিল মনে, সময়-বিশেষে মানুষ বাতুল। লতার বেয়ে ওঠবার জন্যে সরু একখানা কঞ্চির আবশ্যক হয়; আশা-লতার পক্ষে সেটুকুও আবশ্যক। কিন্তু দক্ষিণদিকে দলবল কেন, একটা মানুষ পর্যন্ত নেই। সে ভাবল, ভালই মল, টুশকি বেঁচে গেল। আর জন! জনের কথা মনে হতেই দু চোখ জলে ভরে উঠল। এ হেন সময়ে, এ হেন লোকের স্মরণে অশ্রূদ্‌গম! ভালবাসা যে একমুখী পথ।

এবারে সে পশ্চিমের জানলায় এসে দাঁড়াল। ওপারে জনশূন্য তরুশূন্য দিগন্তে মহাসমারোহে সূর্য অস্তায়মান। স্তরে স্তরে মেঘপুঞ্জ রচনা করেছে বিরাট সৌধ। সূর্য তাকে স্পর্শ করবামাত্র বর্ণবিপর্যয় শুরু হল পাথরগুলোয়। কালো হয়ে উঠল সাদা, সাদা হয়ে উঠল ভাস্বর, ক্রমে সমস্ত উজ্জ্বল, প্রোজ্জ্বল, সমুজ্জ্বল। ধীরে ধীরে আগুন ছড়িয়ে পড়ল মহল থেকে মহলে, শিখর থেকে শিখরে, এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্তে। কোন্‌ রূপকথার রাজপুরী পুড়ে যাচ্ছে দৈবীশিখায়। খান খান হয়ে, চুর চুর হয়ে ভেঙে ভেঙে পড়ছে প্রাসাদ, বলভি, অলিন্দ, বাতায়ন, গম্বুজ, শিখর, কার্নিস। গঙ্গাবক্ষে বিস্তারিত হয়ে গেল স্বর্ণময় সেতু, ঠেকল এসে এপারে ঠিক বাগানবাড়ির ঘাটে। অবাক চোখে তাকিয়ে আছে

রেশমী। ক্রমে সব ম্লান, নিস্তেজ, নিষ্প্রভ হয়ে গেল। তবু সে তাকিয়েই রইল। এ কি মহান্ ইঙ্গিত ভাস্করের! এ কি পথনির্দেশ মৃত্যুর, মুক্তির!

এমন সময়ে চমকে উঠল সে বন্দুকের শব্দে ; যে-শব্দে নীচতলায় বাবুর দল চমকে উঠেছিল, এ সেই আওয়াজ।

মোতি রায় একজন মোসাহেবকে বলল, মাধব এসে পৌঁছল বোধ হয়, যাও তাকে অভ্যর্থনা করে নিয়ে এস।

লোকটা যেতে না যেতেই বাইরে বিষম কোলাহল উঠল, বেশ একটু চড়া রকমের কোলাহল। ভিতরে বাবুরা বলে উঠল, মাধব রায়ের এ কি রকম আচরণ, যেন ডাকাত পড়ল!

বাইরে ঘোড়ার হ্রেষা, কোচম্যান আর্দালী সিপাহী বেহারার হাঁক-ডাক অন্ধকারকে যেন গুলিয়ে ঘেঁটে দিল।

ব্যাপার কি হে?

বাবুরা চঞ্চল হয়ে উঠল, কেউ কেউ অতি কষ্টে দেহটা টেনে দরজায় এসে দাঁড়াল। এতক্ষণ চণ্ডী বক্সী নজরবন্দী হয়ে এক কোণে বসে ছিল, এখন প্রথম সুযোগেই গৃহত্যাগ করে অন্ধকারে গা-ঢাকা দিল।

বাইরে মাধব রায়ের দল আর স্পোকারের সিপাহীদের সঙ্গে বাগানবাড়িতে আগত বাবুদের আর্দালী চাপরাসী বেহারা বরকন্দাজদের সংঘর্ষ বেধে গিয়েছে। সমস্ত সংঘর্ষেরই সূচনার ইতিহাস অন্ধকারাচ্ছন্ন। কুরুক্ষেত্রের মহাহব থেকে পাড়ার বেলগাছটা নিয়ে হাঙ্গামা কোনটাই পূর্বপরিকল্পনা-প্রসূত নয়। যুযুধান দুটো দল মুখোমুখি হওয়াটাই আসল, তার পরে লাঠালাঠি কাটাকাটি সে তো নিশাবসানে দিবাসমাগমের মত সুনিশ্চিত।

মাধব রায় আর স্পোকারের জনপঞ্চাশেক লোক—তার মধ্যে অনেকগুলোই অশ্বারোহী—বাগানবাড়িতে এসে পৌঁছলে একটা শোরগোল পড়ে যায়। এরা আবার কারা এল? হয়তো ঘোড়াগুলো ক্ষেপে উঠেছিল, হয়তো দু পক্ষের বরকন্দাজ "তেরি মেরি" হয়েছিল, হয়তো আর্দালী চড়া মেজাজে কথা বলেছিল, অমনি ব্যস্ শুরু হয়ে গেল। বন্দুক ছুঁড়ল স্পোকার।

মোতি রায়ের বরকন্দাজেরাও ছুঁড়ল বন্দুক। তারা জানত না যে, কোম্পানির সিপাহী এসেছে। তখন দু পক্ষের বন্দুক ছোঁড়বার পাল্লা পড়ে গেল। সৌভাগ্যবশত সবগুলোই ফাঁকা আওয়াজ। বন্দুকের আওয়াজে ফিটন ব্রুহামের ঘোড়াগুলো ক্ষেপে উঠে এদিকে ওদিকে ছুটে চলে গেল, পালকির বেহারাগুলো মুক্তিদায়িনী গঙ্গায় ঝাঁপিয়ে পড়ল—চারিদিকে ব্যবস্থা ও অবস্থা লণ্ডভণ্ড হওয়ার মত।

এমন সময়ে অনেকগুলো ঘোড়ার পায়ের দড়বড়িতে সকলে চমকে উঠল, আবার কারা আসে?

জনের দলবল এসে পৌঁছল।

রেশমী এসব কাণ্ডের মর্ম বুঝতে পারল না। গোলমালটা তার কানে প্রবেশ করল, কিন্তু তার অর্থটা নয়। নিমজ্জমান ব্যক্তির বিশ্বাস করতে সাহস হয় না যে, তার উদ্ধারের আয়োজন চলছে। বিশেষ তখন রেশমী নিজের সঙ্কল্প সাধনের জন্য দোতলার সে ঘরটি পরিত্যাগ করে বেরিয়ে গিয়েছিল।

টুশকি জনকে ইঙ্গিতে দোতলার ঘরটা দেখিয়ে দিল—ঐ ঘরে রেশমী আছে।

তখন জন, মেরিডিথ, অগলার, প্রেস্টন, রাম বসু ও ন্যাড়া ছুটল দোতলার ঘরটা লক্ষ্য করে, পথপ্রদর্শিকা টুশকি।

বেচারামবাবুর দল যে যেখান দিয়ে পারল বেরিয়ে ছুটল গঙ্গার দিকে, গঙ্গা হিন্দুর শেষ আশ্রয়। অন্ধকারে ছুটতে ছুটতে বেচারাম বলে উঠল, "ওরে. আয়ান এল ভীষণরূপে দড়বড়িয়ে ঘোড়া, কলির কেষ্ট পালা এবার নইলে হবি খোঁড়া।" বেচারাম জাত-কবি, সঙ্কটকালেও ছড়া আওড়ায়।

সবাই গেল, গেল না কেবল মোতি রায়। মুহূর্তে গোলমালের অর্থ বুঝল সে। বলে উঠল, ওহো, সে হারামজাদা মেধোটা এসেছে আমার শিকার ছিনিয়ে নিতে! রহো পাজি!

এই বলে সে ছুটল দোতলার ঘরটার দিকে। মোতি রায ও জনেরা ঠিক একই সময়ে ঘরটায় ঢুকল—বিপরীত দুই দিক থেকে।

সবাই দেখল—ঘর শূন্য।

পরমুহূর্তে টুশকি চেঁচিয়ে বলে উঠল, ঐ মোতি রায়!

মোতি রায়! জন ছুটে এসে মারল তাকে এক লাথি।

রেশমী কোথায়, বল্?

কে দেবে উত্তর? ধরাশায়ী মোতি রায় তখন সিঁড়ি দিয়ে গড়িয়ে পড়ছে।

আগুন! আগুন!

চারিদিক থেকে নানা কণ্ঠে চীৎকার উঠল, আগুন! আগুন! বেরিয়ে এস, বেরিয়ে এস!

ক্ষণকালের জন্য জনেরা হতভম্ব হয়ে গেল, তার পরে দেখল যে, সত্যই নীচতলায় আগুন লেগেছে।

সকলে তখন বাড়ি ছেড়ে বের হয়ে যাচ্ছে; জনেরা ভাবল, রেশমীও নিশ্চয় বেরিয়ে গিয়েছে, তারাও দ্রুত বেরিয়ে এল।

মোতি রায়ের লোকজন মোতি রায়কে টেনে বের করল।

কিন্তু রেশমী কোথায়? কোথাও তো নেই! কিংবা প্রকাণ্ড জনতার মধ্যে অন্ধকারে কোথাও থাকলেও খুঁজে পাওয়া সহজ নয়। রাম বসু, টুশকি, ন্যাড়া "রেশমী", "রেশমী দি" বলে চীৎকার শুরু করল, কিন্তু জনতার কোলাহল ছাপিয়ে সে ডাক রেশমীর কানে পৌঁছবার কিছুমাত্র সম্ভাবনা ছিল না।

আগুন! আগুন!

সমস্ত নীচতলাটা আগুনে ছেয়ে ফেলেছে। শত্রু-মিত্র ভুলে তখন সবাই তাকিয়ে আছে প্রবর্ধমান অগ্নিকুণ্ডের দিকে।

কেমন করে লাগল? কে লাগাল? মদের ভাঁড়ারে আগুন, নাচঘরে আগুন, আতসবাজিগুলোয় আগুন। সমস্ত দাউ দাউ করে জ্বলছে। জানালা দিয়ে, দরজা দিয়ে, ফাঁক-ফুকর দিয়ে শত শত অগ্নিময় জিহ্বা লক লক করে বের হচ্ছে, আকাশ আচ্ছন্ন ধোঁয়ায়।

তুবড়িগুলো যেটা যে-ভাবে ছিল অগ্নি-প্রস্রবণ ছোটাচ্ছে। হাউইগুলো পাগলের মত হুস্‌হাস করে অন্ধকারকে ঢুঁ মেরে ছুটছে। ঝাড়লণ্ঠন, আয়না, দেয়াল-জোড়া ছবিগুলো খান্ খান্ হয়ে ঝন্ ঝন্ শব্দে ভেঙে ভেঙে পড়ছে।

ক্ষণকালের জন্য বৃহৎ জনতা স্তব্ধ হয়ে গেল, জনেরা ভুলে গেল রেশমীর প্রসঙ্গ। আগুনের সুযোগ নিয়ে রেশমী পালিয়েছে, কাছেই কোথাও আছে—ভেবে জনেরা নিশ্চিন্ত হয়েছিল।

এমন সময়ে আকাশের দিকে ইঙ্গিত করে ন্যাড়া বলল, দেখ টুশকি দি, লকেট বাজিগুলোর কি বাহার!

একটা লকেট বাজি ফেটে গিয়ে আকাশে আগুনের অক্ষরে লিখে দিল 'রেশমীমিলন'। আর একটা, আর একটা, আর একটা! আকাশ অগ্নিময় 'রেশমী' নামে গেল ভরে।

সেই অগ্নিময় প্রভায় তেতলার ছাদ লক্ষ্য করে টুশকি চীৎকার করে উঠল, কায়েৎ দা, ঐ যে রেশমী!

সত্যিই তো রেশমী।

ওরে রেশমী, নেমে আয়!

রেশমী, নেমে আয়, নেমে আয়!

এতক্ষণে রেশমী দেখতে পেল—যে আলোয় ওরা দেখেছিল তাকে, সেই আলোতেই সে দেখল ওদের—দেখল যে রাম বসু, টুশকিরা এসেছে।

ঠিক সেই মুহূর্তে তার কানে প্রবেশ করল জনের করুণ মিনতি—রেশমী, নেমে এস! রেশমী, নেমে এস!

এ পর্যন্ত রেশমী ছিল নিশ্চল, নির্বিকার, পাষাণবৎ। জনের কণ্ঠস্বর কানে যেতেই পাষাণ গলল, সে বলে উঠল, জন, জন, তুমি এসেছ?

রেশমী, আমি ভুল বুঝেছিলাম, ভুল করেছিলাম, নেমে এস।

রেশমী বলল, জন, তুমি এসেছ? আবার আমার বাঁচতে ইচ্ছা করছে, আবার আমার তোমার বুকে ফিরে যেতে ইচ্ছা করছে, কিন্তু তা বুঝি হবার নয়।

জন আর্তস্বরে বলে উঠল, এখনও সময় আছে, নেমে এস নেমে এস!

না জন, আর সময় নেই, নিজের হাতে লাগিয়েছি আমি আগুন, এ আগুন এখন আমার সাধ্যের অতীত।

তবে দাঁড়াও আমি যাচ্ছি, বলে জন ছুটল সেই অগ্নিকাণ্ডের দিকে।

I say, John—পাগলের মত আচরণ ক'র না। এ অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশ করলে বাঁচবে কে!

আমি বাঁচতে চাই না, আমি রেশমী চাই, বলে জন এগিয়ে গেল।

তখন অগলার, প্রেস্টন ও মেরিডিথ তিনে মিলে জনকে আটকে রাখল। ওদের হাত ছাড়াবার উদ্দেশ্যে ধস্তাধস্তি করতে করতে জন বলল, তোমরা বুঝছ না, রেশমীকে ছাড়া আমার জীবন নিরর্থক। ছাড়, ছাড়।

জনের প্রচেষ্টা লক্ষ্য করে রেশমী বলল, জন, এখানে প্রবেশ করলে মরবে। মরে কি লাভ? আমিও আর মরতে চাই না, কিন্তু এখন আর বাঁচবার পথ নেই।

সবাই দেখল, রেশমী অত্যুক্তি করে নি। একতলা দোতলা ভয়াবহ অগ্নিকুণ্ডে পরিণত। পলায়নের পথ বন্ধ করে আগুনের শিখা তেতলার ছাদে রেশমীর পায়ের কাছে পৌঁছেছে।

ন্যাড়া আগুন টপকাতে গিয়ে জখম হল, তাকে সবাই সরিয়ে নিয়ে এল। আর জন কিছুতেই ছাড়া পেল না বন্ধুদের হাত থেকে।

পাগলের মত সে বলতে লাগল, মেরিডিথ, প্রভুর দোহাই দিয়ে বলছি, একটিবার আমাকে ছেড়ে দাও, আমি ওকে নামিয়ে নিয়ে আসি, না হয় দুজনে এক শিখায় প্রাণ বিসর্জন করি।

রেশমী ধূমনিরুদ্ধ কণ্ঠে বলল, জন, বড় দুঃখে মরতে যাচ্ছিলাম, এখন বড আনন্দে মরছি। কখনও ভাবতে পারি নি, জীবন-পেয়ালার শেষ চুমুকে এমন অক্ষয় অমৃত ছিল। মরবার আগে জেনে গেলাম যে, তোমার ভালবাসা হারাই নি। এর চেয়ে আর কি বেশি পেতাম বেঁচে থাকলে।

তখনও ছাড়া পাওয়ার আশায় জন ধস্তাধস্তি করছে। টুশকি মাথা কুটছে। ন্যাড়ার দৈহিক যাতনাকে ছাড়িয়ে গিয়েছে মানসিক দুঃখ, সে লুটিয়ে লুটিয়ে কাঁদছে। কেবল নিশ্চল কাষ্ঠপুত্তলিকাবৎ দণ্ডায়মান রামরাম বসু।

তখন শত্রু-মিত্র ভেদাভেদ ভুলে সেই প্রকাণ্ড জনতা অসহায় ভাবে তাকিয়ে রইল তেতলার ছাদের দিকে। মৃত্যুর অগ্নিনাগিনীর বলয়-বেষ্টন ক্রমে সংকীর্ণতর হতে হতে স্পর্শ করেছে রেশমীর অঙ্গে। তার পায়ের নখ থেকে মস্তকের প্রতি কেশ দেদীপ্যমান, তার তরুণ মুখচ্ছবির প্রত্যেকটি রেখা দৃষ্টিগম্য, মৃত্যুর রক্ত-পদ্মের মধু কোষের উপরে দণ্ডায়মান সে মূর্তির কি দিব্য কান্তি। আকাশজোড়া অন্ধকারের পটে ঐ ভাস্বতী মূর্তিটি আজ যেন সমগ্র চরাচরের একমাত্র দর্শনীয় সামগ্রী।

সমগ্র জনতার সমবেত হায় হায় ধ্বনির মধ্যে অগ্নিবলয় গ্রাস করল রেশমীকে। এমন বহ্নিবয়ন বিবাহের দিব্য দুকূলে তার দিব্য অঙ্গ মণ্ডিত, অগ্নিশিখার বলয় তার বাহুতে, অগ্নিশিখার কুণ্ডল কর্ণে, অগ্নিশিখার সিঁথি সীমন্তে, অগ্নিশিখার স্বর্ণহার তার কণ্ঠে, অবশেষে স্বয়ং অগ্নিদেব স্বর্ণোজ্জ্বল কিরীটী পরিয়ে দিলেন তার শিরে।

একবার সে চীৎকার করে বলল, জন, সেদিনের সেই কথাটা—

আর কিছু শোনা গেল না, শেষ হল না সেই কথাটা।

মানুষের শেষ কথাটা আর শেষ হল না।

অগ্নিশিখা নিস্তেজ হয়ে আসবার সঙ্গে সঙ্গে তারাগুলোর জ্যোতি উজ্জ্বলতর হয়ে উঠতে লাগল। জগতে ওদের ভাষাটাই সত্য।

আগুন নিভে আসতেই চারদিক গাঢতর অন্ধকারে আচ্ছন্ন হল। তখনও শেষ দু-একটা লকেট কর্তৃক নিক্ষিপ্ত 'রেশমী' অক্ষরের আঁচড় একবারে মিলিয়ে যায় নি আকাশের পট থেকে।

পঞ্চম খণ্ড

১
ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ

কি, চারদিক যে বড় নীরব, পাখানগুলো সব গেল কোথায়—বলতে বলতে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার বিপুল দেহ টেনে নিয়ে ঘরে প্রবেশ করে।

মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের প্রথম পণ্ডিত। বিপুল তার দেহ, বিপুল তার পাণ্ডিত্য, লোকে বলে ঐ প্রকাণ্ড পেটটা বিদ্যায় ঠেসে ভর্তি করা। বিদ্যালঙ্কার ঘরের কোণে নিয়মিত স্থানে হাতের মোটা লাঠিটা রেখে দেয়, তার পরে বিস্তৃত ফরাসের উপরে বসে পড়ে পাঙ্খাপুলারদের উদ্দেশে বলে ওঠে, একটু জোরে টান বাবা, ঘামটা মরুক।

দ্বিতীয় পণ্ডিত রামনাথ বাচস্পতি নস্যের ডিবেটা সরাতে সরাতে বলে, এস ভায়া, তোমার তো আবার এর গন্ধটা পর্যন্ত সহ্য হয় না।

সহ্য হয় না সাধে! ও বস্তু নাসাতে গ্রহণ করলে পুষ্পের ঘ্রাণ পাওয়া কঠিন হয়ে পড়ে।

পড়লেই বা, ক্ষতি কি? এর ঘ্রাণটাও তো মন্দ নয়?

চাদরের প্রান্ত দিয়ে কপালের ঘাম মুছতে মুছতে বলে বিদ্যালঙ্কার, দেবতার নির্মাল্যের গন্ধ যদি না পেলাম, তবে তো জীবন বৃথা!

তার পরে প্রসঙ্গ পালটিয়ে বলে, আজ যে সব নীরব, ব্যাপার কি?

ব্যাপার তো আমিও বুঝতে পারছি না, এসে দেখি সব ভোঁ ভোঁ, জনপ্রাণী নেই।

এসব রহস্য জানা তোমার আমার কর্ম নয় রামনাথ। বসুজা কোথায়? রাজীবলোচনকেও তো দেখছি না!

রামনাথ বলে, রাজীবলোচনের কথা বলতে পারি না, তবে বসুজা পাদ্রী কেরী সাহেবের ঘরে। সে এলেই সব জানতে পারা যাবে, ততক্ষণ ধৈর্য অবলম্বন কর।

মন্দ বল নি, যেমন গরম পড়েছে—এই বলে মৃত্যুঞ্জয় চাদরের প্রান্ত দিয়ে হাওয়া করে পাখার হাওয়াকে প্রবলতর করে তুলতে চেষ্টা করে।

এবারে রামনাথ বলে, এখানকার ফিরিঙ্গী পড়ুয়াদের তোমার ঐ হেস্তালের লাঠিটাকে বড় ভয়।

সশব্দে হেসে উঠে মৃত্যুঞ্জয় বলে, হেন্তালের লাঠিই বটে! এই লাঠি দিয়ে গোখরোর বাচ্ছাদের শাসন করে রেখেছি।

কাজটা ভাল কর না হে বিদ্যালঙ্কার। দুদিন পরে এরা সব জজ-ম্যাজিস্টর হবে, তখন যে ওদেরই হাতে উঠবে হেন্তালের লাঠি।

এ তোমার ভুল বাচস্পতি। ছাত্রজীবনের শাসন উত্তরকালে ছাত্ররা মনে রাখে না। এই দেখ না কেন, সেদিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে কসাইটোলা থেকে ফিরছিলাম, হঠাৎ সামনে

এক ফিটন গাড়ি থেমে গেল। গাড়ি থেকে নামল এই কলেজের—তুমি যাকে বল বিরাট রাজার গোশালা—এক প্রাক্তন ফিরিঙ্গী ছাত্র—আমাকে সশ্রদ্ধ অভিবাদন জানাল।

কে হে লোকটা ?

নামটা হচ্ছে থ্যাকারে, ছোকরাকে আমি বেশ চিনতাম। শ্রীহট্টের যে হাতীধরা থ্যাকলে ছিল, সে ওর কাকা কি জেঠা, বা ঐ রকম কি একটা।

হ্যাঁ, ফিরিঙ্গী বেটাদের কাকা-জেঠা, মামা-মেসো-পিসে সবাই 'অঙ্কেল'। যেমন জাত, তেমনি সম্বন্ধ-বিচার।

জিজ্ঞাসা করলাম, এখন কি করছ ? বলল, চব্বিশ পরগণার রাজস্ব-সংগ্রাহক, কলেক্‌টার। তবেই দেখ, মনে রেখেছে ! একদিন ওকেই এই কলেজে-ঘরে খুব ভর্ৎসনা করেছিলাম—অথচ কেমন বিনয়ের সঙ্গে কথা বলল।

যাক ভাই, চাঁদ সওদাগরের হাতেই হেন্তালের লাঠি শোভা পায়। আমার বোধ হয় কি জান, কেরী সাহেবও মনে মনে ভয় করে তোমার ঐ লাঠিগাছাকে। ঐ যে কেরী সাহেব ও বসুজা আসছে।

কেরী ও বসুজা প্রবেশ করে। রামনাথ উঠে দাঁড়ায়, বিদ্যালঙ্কার তক্তাপোশের উপরেই নড়ে-চড়ে বসে সম্মান জানায়।

কেরী দুজনের উদ্দেশে বলে, নমস্তে।

আগে সে গুড মর্নিং বলে অভিবাদন করত, এখন বিদ্যালঙ্কারের পরামর্শে দেশীয় অভিবাদনবাক্য উচ্চারণ করে।

বিদ্যালঙ্কার বলে, আজ সব নীরব কেন ? ছাত্রেরা সব গেল কোথায় ?

কেরী আসন গ্রহণ করতে করতে বলে, আজ ওরা আমাদের ছুটি দিয়েছে।

বিস্মিত বিদ্যালঙ্কার বলে, কেমন ?

কেরী বলে, আজ ওরা সব ধর্মঘট করেছে।*

সে বস্তু আবার কি ? শুধায় বিদ্যালঙ্কার।

কেরী বুঝিয়ে বলে, কর্তৃপক্ষের কোন আদেশ বা ব্যবস্থা পছন্দ না হলে হাত-পা গুটিয়ে বসে থেকে আপত্তি জানানোকে স্ট্রাইক করা বা ধর্মঘট করা বলে।

সে তো বুঝলাম, বলে মৃত্যুঞ্জয়, কিন্তু এখানকার পাখানদের অপছন্দ কোন্‌ ব্যবস্থা ?

তবে পূর্ব ইতিহাস বলতে হয়। আগে সিভিলিয়ান রাইটাররা শহরের যত্রতত্র বাড়ি ভাড়া করে থাকত। তার ফলে কামিনীকাঞ্চন-সংক্রান্ত দুর্নীতি বেড়ে যাচ্ছিল দেখে লর্ড ওয়েলেস্‌লি ব্যবস্থা করে যে, সকলকে এই রাইটার্স বিল্ডিং-এর দোতলায় থাকতে হবে। এই ব্যবস্থার ফলে রাইটারদের মধ্যে দুর্নীতি অনেক কমে যায়।

মৃত্যুঞ্জয় বলে, সে তো অনেক দিনের কথা। এতদিন পরে হঠাৎ ওরা সচেতন হয়ে উঠল কেন ?

ছোকরার দল অনেকদিন থেকেই ভিতরে ভিতরে সচেতন হয়ে উঠেছিল, কিন্তু প্রশ্রয়ের অভাবে সেটা প্রকাশ পায় নি।

* পাঠক, এটি লেখকের কল্পনা নয়। সেকালে কলকাতার শ্বেতাঙ্গ-সমাজের ইতিহাসে একাধিক Strike-এর দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় ; অবশ্য ধর্মঘট নামটি তখন ব্যবহৃত হত না।

প্রশ্রয় দেবে কে ? এ যে রাজার শাসন।

পণ্ডিত, রাজার উপরেও রাজা আছে। এখানে সর্বসময় কর্তা গভর্নর জেনারেল, কিন্তু বিলাতের বোর্ড অব ডিরেকটর্‌স্ তারও উপরে।

তাতে কি হল ?

হল এই যে, কলেজের জন্য প্রভূত ব্যয় হচ্ছে দেখে বোর্ড এটা উঠিয়ে দেবার মতলবে আছে। ওয়েলেস্‌লির মত জবরদস্ত লোক না থাকলে কোন্‌দিন উঠিয়ে দিত এই কলেজ। এখানকার বড়লাট তেমন তেজস্বী নয়, বিলাতের বোর্ড আবার কলেজ উঠিয়ে দেবার উপায় সন্ধান করছে।

তার সঙ্গে এই ধর্মঘটের সম্বন্ধটা তো বুঝতে পারছি না।

ধৈর্য অবলম্বন কর পণ্ডিত, বুঝিয়ে দিচ্ছি। এখানকার লাট কাউন্সিলের মধ্যেই কোন কোন মেম্বার বোর্ডের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন। এখন তাদের ইঙ্গিতেই এই ধর্মঘট।

কেন কি ! একটা অশান্তি হক, গোলযোগ হক, তাহলে কলেজ উঠিয়ে দেবার পথ সুগম হয়।

ছাত্রেরা কি এত কথা জানে ?

স্পষ্ট জানে না, আভাসে জানে, ইঙ্গিতে জানে যে, গোলমাল করলে প্রভুরা অসন্তুষ্ট হবে না।

কিন্তু তাদের কি লাভ এতে ?

লাভ ষোল আনা। এখানকার কলেজের ঘরে পড়াশুনার সুবিধা হচ্ছে না, আলো-হাওয়ার অভাব ইত্যাদির ছুতো তুলে তারা আবার রাণীমুদিনীর গলি, ম্যাঙ্গো লেনে বাড়িভাড়া করে স্বাধীনভাবে থাকতে চায়। তাদের লাভ যথেচ্ছাচার, বোর্ডের লাভ কলেজ উঠে গেলে বিস্তর খরচা বাঁচে। তাই তো বলছিলাম লাভ ষোল আনা।

আর ষোল আনা ক্ষতি আমাদের। বাঙালীর ছেলের চাকরি গেলে আর থাকে কি !

না মুন্সী, ক্ষতি সমস্ত দেশের, ক্ষতি ইংরেজ-শাসনের। আর বাঙালীর ছেলের কথা বলছ ? তাদের থাকে কি জিজ্ঞাসা করছ ? এখানে আমরা মিলিত হয়ে আজ দশ বছর ধরে বাংলা ভাষার ব্যাকরণ অভিধানগ্রন্থ রচনা করে যে ভিত্তি পত্তন করেছি—একদিন সেই মহাসৌধ হবে ভবিষ্যতের বাঙালীর ছেলের শ্রেষ্ঠ আশ্রয় ; তা ঝড়ে টলবে না, ভূমিকম্পে নড়বে না, আগুনে পুড়বে না, মহামন্বন্তরেও বিচলিত হবে না। বাঙালীর ছেলের এই লাভ। এ লাভের চেয়ে বড় লাভ আর কি হতে পারে জানি না।

বলতে বলতে উৎসাহে দাঁড়িয়ে উঠে কেরী ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে থাকে।

লোকমুখের শব্দ, বিদেশী শব্দ, সংস্কৃত শব্দ তিনে মিলিয়ে সেই সৌধের গাঁথুনি চলেছে। সংস্কৃত এর ভিত্তি, লোকমুখের শব্দ এর ইষ্টক আর বিদেশী শব্দ চুন-সুরকি। আর এর কারিগর হচ্ছে খ্রীষ্টান, মুসলমান, হিন্দু। দিনে দিনে দিব্য সৌধ উঠছে আকাশের দিকে। তুচ্ছ কিছু ক্ষুদ্র কিছু গ্রাম্য কিছু অশোভন অকিঞ্চিৎকর কিছু থাকবে না ভাষায়। অবশেষে একদিন এর স্বর্ণময় চূড়া রবির আলোকে ভাস্বর হয়ে উঠবে। সেদিন দেশ-বিদেশের লোকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকবে, ভাববে কোন্ সে ময়-দানবের অক্ষয় কীর্তি এই অক্ষয় মন্দির।

এবারে সে রামরাম বসুর কাছে এসে বলে ওঠে, মুন্সী, এই থাকবে বাঙালীর ছেলের।

তার পরে বিদ্যালঙ্কারের কাছে এসে বলে ওঠে, যতই দিন যাচ্ছে সংস্কৃত ভাষার মহিমা বুঝতে পারছি, তুলনা নেই এর—তুলনা নেই, ডিভাইন, সিম্‌প্লি ডিভাইন্‌।

পরদিন আবার অধ্যাপক, পণ্ডিত ও শিক্ষকগণ যথাসময়ে কলেজ হলে মিলিত হয়, কিন্তু ছাত্রগণ দেখা দেয় না।

রাম বসু বলে, আজও দেখছি ছাত্রেরা আমাদের ছুটি দিল।

মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার বলে, তা যেন দিল, কিন্তু পাখানগুলো গেল কোথায়? দোতলায় আছে বলে তো মনে হচ্ছে না, সমস্ত নীরব নিঝুম।

কেরী বলে, সব ঘুমোচ্ছে।

ঘুমোচ্ছে! এখন! বিস্মিত হয় বিদ্যালঙ্কার।

কেরী বলে, ঘুমোবে না? কাল সারারাত হুল্লোড় করেছে!

কেমন? শুধায় বিদ্যালঙ্কার।

কেরী বলে, কাল রাত্রে ইয়ং রাস্কেলরা মদ আর মেয়েমানুষ নিয়ে এমন তুমুল কাণ্ড করে যে, শেষ পর্যন্ত দারোয়ানরা গিয়ে আমাকে ডেকে আনে।

কেরীর বাস চৌত্রিশ নম্বর বউবাজার স্ট্রীটে।

আমি এসে দেখি দোতলায় নারকীয় কাণ্ড চলছে। আমাকে দেখেও লজ্জা হল না ওদের। আমি বললাম, এমন কাণ্ড করলে তোমাদের তাড়িয়ে দেওয়া হবে এ বাড়ি থেকে। তাই শুনে একজন বলে উঠল, আমরাও তো তাই চাই। কেন আমাদের এখানে রেখেছ? দাও তাড়িয়ে, আমরা প্রেম ব্যানার্জীর বাড়ি ঠিক করে রেখেছি।

তখন আমি ঐ গির্জাটা দেখিয়ে বললাম, গির্জার এত কাছে থেকেও তোমাদের এই রকম নির্লজ্জ ব্যবহার! তা শুনে একজন কি বলল জান? বলল, নীয়ারেস্ট টু চার্চ ইজ ফার্দেস্ট ফ্রম হেভ্‌ন্‌। নির্লজ্জ যত সব!

এই পর্যন্ত বলে কেরী থামে।

তখন মৃত্যুঞ্জয় বলে, তবে এখন ঘুমোবে তাতে আর বিস্ময়ের কি আছে!

তখন কেরী বলল, কালকে আমি লাট কাউন্সিলের একজন মেম্বারকে সব খুলে বলেছি। সে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে যে, কাউন্সিলে ব্যাপারটা আজ তুলবে। তার পরে কেরী বলে, আশা করি আপাতত সব মিটে যাবে। কিন্তু রোগটার মূল খুব গভীরে।

রামরাম বসু বলে, যে রোগের মূল স্বভাবে তার নিরাময় সহজ, কিন্তু যে রোগের মূল চরিত্রে তা দুঃসাধ্য।

কথাটা ঠিক, বলে কেরী।

তার পরে প্রসঙ্গত মনস্তত্ত্ব, ধর্মতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব এসে পড়ে।

কেরী বলে, কুসংস্কার সব দেশেই আছে, আমাদের দেশে আছে, তোমাদের দেশেও আছে। এই কলেজের একটা উদ্দেশ্য, সেই সব কুসংস্কার দূরীকরণ।

মৃত্যুঞ্জয় বলে, কিন্তু এ যে রোজাকে ভূতে পেয়ে বসল! এখানকার ছাত্ররা যদি এমন দুর্বৃত্ত হয়ে ওঠে, তবে তো চারদিক অন্ধকার!

অন্ধকার বলেই তো জ্ঞানের আলোর দরকার পণ্ডিত, স্বর্গে পাঠশালা অনাবশ্যক।

ঠিক বলেছ ডাক্তার কেরী—মৃত্যুঞ্জয় ডক্টর শব্দটাকে ডাক্তার উচ্চারণ করে—কিন্তু সর্বাঙ্গে ক্ষত, ওষুধ লাগাবে কোথায়?

মনের মধ্যে, পণ্ডিত, মনের মধ্যে—ঐ জায়গায় ওষুধ পড়লে তার গুণ সর্বাঙ্গে ছড়িয়ে পড়বে। এই উদ্দেশ্যেই কলেজ স্থাপন করেছিল ওয়েলেস্‌লি। আবার ক্ষতস্থানের বিবরণ সংগ্রহের জন্যেও ওয়েলেস্‌লি আমার উপর ভারার্পণ করেছিল। গঙ্গাসাগরে সন্তানবিসর্জন, সতীদাহ প্রথা প্রভৃতির প্রকৃত বিবরণ সংগ্রহের জন্য আমি আদিষ্ট হয়েছিলাম। চারজন সহকর্মী নিয়ে ১৮০৪ সালে কলকাতার ত্রিশ মাইলের পরিধিতে সন্ধান করে আমার ধারণা হয় যে, বছরে প্রায় পঁচিশ হাজার প্রাণীকে হত্যা করা এয় এইভাবে। তার পরে আমার অনুরোধে তোমারই শাস্ত্র থেকে প্রমাণ করে দেখিয়েছি যে, সন্তানবিসর্জন, সহমরণ প্রভৃতি শাস্ত্রানুমোদিত নয়।

রামনাথ বাচস্পতি একান্তে বসে নিম্নস্বরে বলে, আরম্ভ হল পাদ্রীগিরি! শাস্ত্রানুমোদিত নয়! কত শাস্ত্রই না পড়েছ!

বিদ্যালঙ্কার বলে, কিন্তু তাতে অবস্থার উন্নতি হল কই? তার পরেও তো পাঁচ-ছ বছর অতিবাহিত হল!

হত না অতিবাহিত, জোরের সঙ্গে বলে কেরী, ওয়েলেস্‌লি আমাদের রিপোর্ট আর তোমাদের বিধান পেয়ে স্থির করেছিল যে, আইন প্রণয়ন করে নিষিদ্ধ করবে সতীদাহ। সমস্ত প্রস্তুত, এমন সময়ে কাজে ইস্তফা দিয়ে লাটসাহেব চলে গেল বিলাতে।

তাই তো বলছি ডাক্তার কেরী—যথা পূর্বং তথা পরং। এখনও অবাধে চলছে সতীদাহ দেশের যত্রতত্র।

ব্যাকুলভাবে রাম বসু বলে ওঠে, এর কি কোন প্রতিকার নেই?

তুমিই তো এইমাত্র বললে চরিত্রের মধ্যে যে রোগের মূল নিহিত, তা দুঃসাধ্য।

দুঃসাধ্য, কিন্তু অসাধ্য নয়।

কে বলল অসাধ্য মুন্সী, তবে কঠিন। কিন্তু একথাও বলছি, তোমার আমার জীবনকালেই অবসান ঘটবে এই পাশবিক সংস্কারের। ওষুধ পড়তে শুরু করেছে।

কি ওষুধ?

ইংরেজী শিক্ষা।

আবার স্বগতভাবে বলে রামনাথ বাচস্পতি, ব্যাধির চেয়ে ঔষধ উৎকটতর।

কেরীর অভয়দানে রাম বসু যে উৎসাহ পেল এমন মনে হল না, বিষণ্ণমুখে বসে রইল সে।

কলেজে অনধ্যায়, কাজেই সকলে বাড়ি রওনা হয়।

রাম বসু বলে, বিদ্যালঙ্কার, চল তোমাকে একটু এগিয়ে দিই।

বেশ তো চল, দুটো কথা বলতে বলতে যাওয়া যাবে।

লালবাজার দিয়ে এগিয়ে গিয়ে ওরা একটা সরু গলিপথে চলে, আগে মৃত্যুঞ্জয় পিছনে রাম বসু। রাম বসু লক্ষ্য করে বিদ্যালঙ্কারের চলবার ভঙ্গীটি। বাঁ পাখানা তার কিঞ্চিৎ বিকল, তাই লাঠি আর ডান পার জোরে বাঁ পা সুদ্ধ দেহটাকে হেঁচকা টান মেরে চালিয়ে নিয়ে যায় সে। রাম বসু দেখে, মেদবহুল দেহ সাদা আঙরাখার খাঁজে খাঁজে নিবিষ্ট; কাঁধের উপরে বিষ্ণুপুরী তসরের চাদর। মাথার চারপাশ কামানো, মাঝখানে গুচ্ছবদ্ধ চুল। তখন তার মনে পড়ে প্রশস্ত গড়ানে কপালে লিপ্ত আছে প্রাতঃকালের সন্ধ্যাহ্নিকের চন্দনের ছাপ, সেই কপালের নীচে কাঁচা-পাকা ভুরুর তলায় জ্বলন্ত টিকার

মত দুটি চোখ, জ্ঞানের একটুখানি হাওয়া লাগতেই উজ্জ্বলতর হয়ে ওঠে—আর দুই চোখের মাঝখানে বিন্ধ্যপর্বতের ব্যবধান সৃষ্টি করেছে মস্ত একটা শুকনাসা। প্রকাণ্ড চিবুক অদৃষ্টের উদ্যত ঘুঁষির মত সংসারকে যেন প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আহ্বান করছে। রাম বসু মনে মনে ভাবে, আশ্চর্য এই লোকটি! তখনই মনে পড়ে এ বিস্ময়বোধ কেরীর মনেও জেগেছে। কেরী অনেকদিন বলেছে যে, পণ্ডিতকে দেখলে, তার পাণ্ডিত্য, বিপুল দেহ, স্থূলযষ্টি, রাশভারী চালচলন দেখলে—বিখ্যাত ডাক্তার জনসনকে মনে পড়ে যায়, যাকে বাল্যকালে একাধিকবার দেখেছে কেরী। কেরী বলত যে, ডাক্তার জনসনকে লোকে নিজেদের মধ্যে সশ্রদ্ধভাবে 'ভালুক' বলে অভিহিত করত। আর পণ্ডিত হচ্ছে হস্তী, একেবারে রাজহস্তী। রাম বসু আবার ভাবে, আশ্চর্য এই লোকটি!

ততক্ষণে তারা চিৎপুর রোডে পড়ে পাশাপাশি চলতে শুরু করে।

হঠাৎ রাম বসু জিজ্ঞাসা করে. বিদ্যালঙ্কার, সহমরণ সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় বিধান কি?

বিদ্যালঙ্কার বলে, দেখ বসুজা, শাস্ত্রে সবরকম কথাই আছে। ভিন্ন ভিন্ন যুগ অভিপ্রায় অনুসারে মনোমত উক্তি বেছে নেয়।

তার পরে সে বলে, এতদিন যুগ ছিল সতীদাহ-সমর্থক, এবারে যে যুগ পড়তে চলেছে তাতে বদল হবে ব্যাখ্যার, সতীদাহ আর চলবে না।

আগ্রহভরে জিজ্ঞাসা করে বসুজা, কিন্তু কবে বিদ্যালঙ্কার—কবে?

যুগের হাওয়া প্রবল হয়ে উঠলেই।

তুমি তো হিন্দুশাস্ত্র মন্থন করেছ, গোটা সুবে বাংলা জানে তোমাকে, মানে তোমাকে। ওঠাও হাওয়া।

না ভায়া, যার যা কাজ নয় তাকে দিয়ে তা হবার নয়। আমি জ্ঞানের কথা জানি, তা বলতে পারি। কিন্তু শুধু জ্ঞানে হাওয়া ওঠানো যায় না, তার জন্যে চাই শক্তি, চাই উদ্যম, চাই যুগযন্ত্রকে চালনা করবার কৌশল।

কোথায় পাব তেমন লোক? জিজ্ঞাসা করে বসুজা।

যাও তবে মানিকতলায়, খোঁজ করে দেখ দেওয়ানজী কলকাতায় আছেন কি না—ঐ রকম লোকের উপরেই যুগের মতি-গতি নির্ভর করছে।

বেশ, তাই যাব, আগামীকাল রবিবার। তার পরে কতকটা স্বগতভাবেই যেন রাম বসু বলে ওঠে, জ্ঞানের কথাও শুনলাম, শক্তির কথাও শুনলাম—কিন্তু হৃদয়েব কথা?

স্বগত উক্তির স্বগত উত্তর দেয় মৃত্যুঞ্জয়, বলে—হৃদয়ের কথা হৃদয় জানে, অপরে কি জানবে!

কথাটির উত্তর দেয় না রাম বসু।

মৃত্যুঞ্জয় বলে, ভায়া, আর নয়, অনেকদূর এসে পড়েছ, এবারে ফেরো।

তখন দুইজন দুই ভিন্ন পথ অবলম্বন করে।

২
দশ বছরের কথা

রামরাম বসু বাড়ি ফিরতেই নরু বলে উঠল, বাবা, দেখ'সে কে এসেছে!

এই ভরসন্ধ্যায় আবার কে এল রে—বলে গৃহান্তরে গিয়ে চমকে ওঠে সে, বলে, একি টুশকি, তুই কখন এলি, কার সঙ্গে এলি, তোর দিদিমা কই রে?

টুশকি হেসে বলে, দাঁড়াও কায়েৎ দা, আগে প্রণাম করে নিই, তার পরে একে একে তোমার সব প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছি।

প্রণামাদির পরে দুজনে বসল, রাম বসু বলল, এবারে সব খুলে বল্ তো, আগে বল্ মোক্ষদাবুড়ি কোথায়?

টুশকি চোখ মুছতে মুছতে বলল, গোবিন্দজী তাকে পায়ে ঠাঁই দিয়েছেন।

বলিস কি রে! এ কতদিনকার কথা?

তা চার-পাঁচ মাস হল বইকি। তখন ভাবলাম, গোবিন্দজীর চরণে ঠাঁই পাব এমন ভাগ্য কি করেছি! ভাবলাম, পাই আর না পাই পা দুখানা জড়িয়ে ধরেই পড়ে থাকব। কিন্তু তার আগে একবার কায়েৎ দাকে, নরুকে আর ন্যাড়াকে শেষ দেখা দেখে আসি।

তা এসেছিস বোন বেশ করেছিস। কিন্তু এলি কার সঙ্গে?

গোবিন্দজী সেথো জুটিয়ে দিলেন, নইলে শ্রীধাম বৃন্দাবন থেকে কলকাতায় কি একা আসতে পারি!

তার পরে সে বলে, কিছুদিন হল ভেঙে পড়েছিল দিদিমার শরীর। আর শরীরের কি দোষ বল, দিবারাত্রি ধ্যান-জ্ঞান রেশমী, দিবারাত্রি মুখে রেশমী নাম। নাওয়া নেই খাওয়া নেই, ঐ চিন্তা আর ঐ নাম। আমি বলি, দিদিমা, একবার গোবিন্দজীর নাম কর, রাধাকৃষ্ণর কথা ভাব, মহাপ্রভুকে স্মরণ করতে বললে দিদিমা কি বলে জান? বলে, কেমন করে করব দিদি, ঐ সর্বনাশী যে সব ভুলিয়ে দিল। বলে যে, রাধাকৃষ্ণের নাম করব বলে বসি—ঐ নামটা মুখে বেরিয়ে পড়ে, ঐ মুখ মনে ভেসে ওঠে। তার পরে ডুকরে কেঁদে ওঠে, সর্বনাশী, সর্বনাশী, এমন করে সর্বনাশ করে যেতে হয়!

টুশকি বলে যায়, ভেঙে পড়ল শরীর, অবশেষে নাম জপতে জপতে—বিশ্বাস কর কায়েৎ দা—কান পেতে শুনেছি—রাধাকৃষ্ণ নাম নয়, রেশমী রেশমী জপতে জপতে গোবিন্দজীর পাদপদ্মে দেহরক্ষা করল দিদিমা।

তার পরে হঠাৎ বলে ওঠে, অন্তিম কালে রেশমী নামে কি সদ্‌গতি হবে?

কেন হবে না রে পাগলী! শুনিস নি ভগবানের অসংখ্য নাম, ভালবাসার লোকের নামও যে তাঁর নাম। শোন বোন, অনেক বয়স হল, এখন বুঝেছি এই যে নদী পার হওয়াটাই আসল কথা, কে কোন্ নৌকায় পার হল তাতে কি আসে যায়! বিল্বমঙ্গল ঠাকুর মৃতদেহ আঁকড়ে নদী পার হয়েছিল।

কিন্তু যার ভাগ্যে মৃতদেহটাও জোটে না?

রাম বসু বুঝল, কত গভীর নৈরাশ্য টুশকির ঐ উক্তিতে।

বসুজা বলল, সে চোখ বুজে ঝাঁপ দিক নদীতে, মনে ভক্তি থাকলে নদীর ঢেউ

মায়ের কোলের মত দোলাতে দোলাতে তাকে নিয়ে যাবে ওপারে।

রাম বসুর কথা শুনে টুশকি বলে ওঠে, কায়েৎ দা, তোমার খুব পরিবর্তন হয়েছে।

হবে না তো কি! দশ বছর কি কম সময়! তার পরে বলে, যা এখন খেয়ে শো গে। খুব ক্লান্ত হয়েছিস, রাতও হয়েছে অনেক।

বিছানায় শুয়ে রাম বসুর নিজের কথাটা মনে পড়ে। ভাবে, হবে না পরিবর্তন, দশ বৎসর কি কম সময়?

সত্যই দশ বৎসর কম সময় নয়, তার উপরে যদি আবার ঘটনার গুরুত্ব চাপে, তবে দশ বৎসর শতাব্দীর ব্যবধান লাভ করে। দশ বৎসর অদৃষ্ট রাম বসুকে ঢেলে সেজেছে—মালমশলা সেই আগেরই, সজ্জাটা নূতন।

সেদিনের কথা কি সে কখনও ভুলবে? এ জন্মে তো নয়। জন্মান্তরে কি হবে জানে না সে। খুব সম্ভব জন্মান্তরের দিগন্তকে মাঝে মাঝে হঠাৎ-আলোয় চমকে দেবে রেশমীদাহের উল্কার-শিখা। এখনও চোখ মুদ্রিত করলেই সে দেখতে পায় অসহায় বীরের মত জনের প্রচণ্ড প্রচেষ্টা, দেখতে পায় ন্যাড়ার আকুলিবিকুলি, টুশকির মাথা কুটে মরা, আর উদ্‌ভ্রান্ত জনতার হায় হায় ধ্বনি। সকলে অবাক হয়ে গিয়েছিল—সে নিজেও কম অবাক হয় নি—নিজের পুত্তলিকাবৎ স্থাণুতায়। অল্প দুঃখেরই প্রকাশ সম্ভব, মহৎ দুঃখ অপ্রকট। সানুদেশের তুষার গলে, শিখরের তুষার অটল।

রাম বসু ভাবে, ওদের আর কি গেল, কতটুকু ক্ষতি হল ওদের! জনের প্রিয়া গেল, টুশকির ভগ্নী গেল, ন্যাড়ার রেশমীদি গেল—কিন্তু তার নিজের? তার জীবনের সমস্ত আশা, স্বপ্ন, কল্পনা ঘূর্ণ্যমান হয়ে কেন্দ্রীভূত হয়েছিল যে সুমেরুশিখরে, সেই সোনার লঙ্কা যে পুড়ে নিঃশেষ হয়ে গেল। তার আর থাকল কি? ক্ষতির দুঃসহতা বোঝবার জন্যে থাকল কেবল সে নিজে। রাম বসু অনেক দিন মনে মনে বিচার-বিশ্লেষণ করে দেখতে চেষ্টা করেছে রেশমীর সঙ্গে তার সম্বন্ধটা। তার মনে হয়েছে যে, সে সম্বন্ধটা কামজ নয়, প্রেমজ নয়, রক্তের বা সমাজের নয়—এ যেন একটা দিব্য অলৌকিক ভাব। এ যেন চাঁদের সঙ্গে সমুদ্রের আকর্ষণ-বিকর্ষণের যোগাযোগ। চাঁদের টানে সমুদ্র উদ্বেল হয়ে ওঠে, জোয়ারের ধাপে ধাপে এগিয়ে চন্দ্রলোকের দিকে হাত বাড়িয়ে দেয়, কিন্তু সে হাত কখনও স্পর্শ করতে পারে না চন্দ্রমাকে। অপ্রাপ্যতার উচ্চাকাশে বসে রসিয়ে তোলে সমুদ্রের মন রহস্যময় সুধাকর। রেশমী চন্দ্রমা, রাম বসু পারাবার। দশ বৎসর আগে তার গগন ভুবন জীবন চির-অন্ধকারে ডুবিয়ে দিয়ে সে চাঁদ অস্তমিত হয়েছে অগ্নিশিখার দিগন্তে। তার পর থেকে অনুদ্বেল নিস্তরঙ্গ একটানা সমুদ্র জনান্তিকে প্রলাপরত, তার ধ্বনি এখন চিন্তার মত নীরব, নিজের কানেই পৌঁছতে চায় না।

মদনাবাটির সেই ব্যর্থ অভিসারের অভিজ্ঞতায় রাম বসু বুঝেছিল যে, ও মেয়ে হাতে পাওয়ার নয়। দুষ্প্রাপ্যতার কুয়াশায় সে হয়ে উঠল আরও লোভনীয়, আরও রমণীয়, আরও রহস্যময়। তার পর থেকে তাকে কেন্দ্র করে ঘুরে মরছে রাম বসুর জীবন। গ্রীক পুরাণের কাহিনী সে পড়েছিল, বুঝেছিল যে, গ্রীসের সমস্ত কল্পনা সংহত হয়ে জ্বলে উঠেছিল একটি পাবকশিখারূপে, সে হচ্ছে হেলেন। গ্রীসের কাব্য পুরাণ জীবন ঐ পাবকশিখার চারদিকে মুমূর্ষু পতঙ্গের মত ঘুরে মরেছে। ঘুরে মরেছে এই দশ বছর রাম বসুর জীবন রেশমীর চারদিকে। যখন সে বেঁচে ছিল তখন তার আকর্ষণ প্রবল

ছিল, মৃত্যুর পরে সে আকর্ষণ হয়েছে প্রবলতর। রূপজ কামজ সম্বন্ধের এ প্রকৃতি তো নয় এমন কি প্রেমজ সম্বন্ধেরও বুঝি নয়। এ আর কিছু। ভাল করে বুঝতে পারে না সে কি এ। কতদিন বুঝতে চেষ্টা করেছে, পারে নি। আজ যখন টুশকি এল সেই পুরনো দিনের হাওয়া পালে নিয়ে, তখন সেই দমকা বাতাসে তার মনের গুটানো নিশান খুলে গিয়ে বিস্ফারিত হল অতীতের দিকে, ইঙ্গিতপরায়ণ চেলাঞ্চলের একমাত্র লক্ষ্য রেশমী। সে মনে মনে জপ করতে থাকে—রেশমী, রেশমী, রেশমী। তার পরে কখন ঘুমিয়ে পড়ে।

রাম বসু বলে, টুশকি এসেছিস, আর তোর বৃন্দাবনে ফিরে গিয়ে কাজ নেই, আমার কাছে থেকে যা।

সে বলে, কায়েৎ দা, এ কেমন বিচার ? লোকে শেষ বয়সটা তীর্থে কাটায়, আর আমি কিনা মাঝবয়সটা তীর্থে কাটিয়ে শেষ বয়সে মরব কলকাতা শহরে !

কেন রে, কালীঘাট, গঙ্গাতীর, এ কি তীর্থ নয় ?

অমন কথা কি মুখে আনতে আছে, ছি ! এই বলে মাথায় হাত ঠেকিয়ে সে বলে, কার তীর্থ কোন্‌খানে কে বলতে পারে ? গোবিন্দজী যে আমাকে টেনেছেন।

না রে পাগলী, গোবিন্দজী নয়, মোক্ষদা বুড়ি টেনে রেখেছিল তোকে। যেমনি সে মরেছে অমনি টান ছুটে গিয়েছে, ছুটে এসেছিস কলকাতায়।

টুশকি বলে, সত্যিকার পাপ মনেরও অগোচর। তোমার কথাই বুঝি সত্যি !

তবে আর কি, এখানে থেকে যা। আমারও তো সংসার দেখবার জন্যে একটা লোকের দরকার।

আবার বাঁধবে আমাকে সংসারে ? কেন, তোমার লোকের অভাব কি ? নরুর বিয়ে দাও, লোকেব অভাব দূর হবে।

আরে সেজন্যে তো একটা লোকের দরকার। আমার কি পাত্রী দেখে বেড়াবার সময় আছে !

তোমার কথা কবে ঠেলেছি কায়েৎ দা, কিন্তু তার আগে একবার জোড়ামউ যেতে চাই যে।

কেন রে, সেখানে কেন ?

বল কি, জন্মগ্রাম, দেখতে ইচ্ছা যায় না ?

অমনি চণ্ডী বক্সীর হুড়োটাও খেতে ইচ্ছা যায়, কি বলিস ?

চণ্ডী খুড়ো কি এখনও জীবিত আছেন ?

শুধু জীবিত ! বেশ বহাল তবিয়তে আছে। দুষ্ট লোক দীর্ঘজীবী হয়, জানিস না ?

টুশকি বলে, তা খুড়ো বেঁচে থাকে থাকুক, আমি একবার গাঁয়ে গেলে তার আপত্তি হবে কেন ?

আলবৎ হবে। তোদের বিষয়-সম্পত্তি ভোগ করছে, আর তুই গেলে তার আপত্তি হবে না ? কি যে বলিস ! না, ও মতলব তুই ছেড়ে দে।

তখন টুশকি সাময়িকভাবে পরাজয় স্বীকার করে বলে, না হয় না-ই যাব, কিন্তু তুমি এত সকালে কোথায় চললে, আজ ত তোমাদের ছুটি।

রাম বসু সংক্ষেপে বলে, কলেজ নেই, কিন্তু অন্য একটা কাজ আছে, একবার মানিকতলার দিকে যাব একজন ভদ্রলোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে।

ফিরতে খুব দেরি ক'র না। তোমার স্বভাব, মনের মতন লোকের দেখা পেলে নাওয়া-খাওয়া ভুলে বসে থাক!

রাম বসু দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে, মনের মতন লোকের দেখা দশ বছরের মধ্যে পাই নি রে, নাওয়া-খাওয়ার আর ভুল হয় না।

এই বলে সে হাসল। সে হাসিতে টেনে বের করল টুশকির হাসি। কিন্তু দুটি হাসিই বড় ম্লান, ওর চেয়ে চোখের জলের উজ্জ্বলতাও বুঝি বেশি।

শীগগির ফিরে আসছি, বলে ছাতা আর চাদর নিয়ে বেরিয়ে পড়ল রামরাম বসু।

জানবাজার সড়ক ধরে খানিকটা পুব দিকে চলে মারাঠা খাল বোজানো বাহার সড়ক নামে নূতন যে রাস্তা তৈরি হয়েছে তাই ধরে বরাবর উত্তরমুখে চলতে শুরু করল রাম বসু। দেখতে পেল রাস্তার ডানদিকে খালের মধ্যে বড বড় সব নৌকা বাঁধা ; সেগুলো আসছে সুন্দরবন থেকে, জ্বালানী কাঠ, হরিণের চামড়া আর মধুর জালায় ভর্তি। এসব তার চোখে পড়লেও মনটা ছিল অন্য বিষয়ে নিমগ্ন। সে সিদ্ধান্ত করেছিল যে রেশমীর মৃত্যুর মূল কারণ সহমরণ প্রথা। সহমরণ প্রথা এমন নিষ্ঠুর ব্যাপকতা লাভ না করলে রেশমীর জীবন স্বাভাবিক খাতে প্রবাহিত হত। সে ভাবে, রেশমী না হয় অকালে বিধবা হয়েছিল, কিন্তু তাই বলে স্বামীর চিতায় উঠতে বাধ্য হবে কেন? অবশ্য চিতা থেকে সে পালিয়েছিল সত্য, কিন্তু কোথায় তার মনের কোন অগোচরে অগ্নি তার জ্বালাময় দাবির স্বাক্ষর রেখে গিয়েছিল। শেষ পর্যন্ত অগ্নিই তার গ্রাস পুনরায় গ্রহণ করল। কিন্তু কেবল অগ্নিই সক্রিয় আর রেশমী নিষ্ক্রিয় ছিল, একথা আর সে ভাবতে পারে না। রাম বসুর ধারণা হয়েছিল যে অগ্নির দাবিই রেশমীকে প্ররোচিত করেছিল বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দিতে। যেদিন সে কাষ্ঠপুত্তলিকাবৎ দাঁড়িয়ে সেই অগ্নিদাহ লক্ষ্য করেছিল, সেইদিনই কথাটা তার মনের মধ্যে ঝলক দিয়ে উঠেছিল। তার পরে দশ বৎসর ধরে সেই নিদারুণ শোক লালিত হয়েছে স্মৃতিতে। স্মৃতি থেকে এসেছে চিন্তায়, চিন্তা থেকে চেষ্টায়—সহমরণ প্রথা উঠিয়ে দিতে হবে, রেশমীর মত আর কেউ যেন চিতায় মরতে না বাধ্য হয়। সে জানে রেশমী আর ফিরবে না, কিন্তু সহমরণের চিতানল দেশ থেকে নিভে গেলে রেশমীর আত্মা শান্তি পাবে—এমনিধারা একটা ধারণা গড়ে উঠেছিল বসুজার মনে। কত পণ্ডিতের কাছে যাতায়াত করেছে মীমাংসার আশায়, কেউ প্রশ্রয় দেয় নি ; কেউ খ্রীষ্টান বলে তাড়িয়ে দিয়েছে, বলেছে, তোমার কথা শুনলেও পাপ। শেষ পর্যন্ত সহায় পেল মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারকে। বিদ্যালঙ্কার বলল, এ প্রথা শাস্ত্রানুমোদিত নয়, কিন্তু—ঐ কিন্তুতে এসে সব ঠেকে গিয়েছে। 'কিন্তু', 'যদি' এরা সব রত্নাকরের অনুচর, সমস্ত শুভ সঙ্কল্পের মোড়ে দাঁড়িয়ে দুঃসাহসী পথিককে লাঠির ঘায়ে ধরাশায়ী করে ফেলে। কিন্তু ধরাশায়ী হওয়ার লোক রাম বসু নয়। এখন চলেছে সে দ্রুতপদে অনেক আশা নিয়ে রামমোহনের কাছে, দেখা যাক তার কাছে 'কিন্তু'র প্রতিষেধক পাওয়া যায় কিনা।

অবশেষে মাইলদেড়েক পথ চলবার পরে মানিকতলায় এসে উপস্থিত হল রাম বসু। রাস্তার বাঁ-ধারে গেটওয়ালা প্রকাণ্ড বাড়িটা সহজেই চিনতে পারল, প্রবেশ করল বাড়ির বিস্তৃত হাতার মধ্যে।

একজন চাপরাসধারী জিজ্ঞাসা করল, কাকে চান?

দেওয়ানজীর সঙ্গে দেখা করতে চাই।

সে সসম্ভ্রমে বলল, আসুন আমার সঙ্গে।

দেওয়ানজীর দ্বার অবারিত।

৩
দেওয়ানজী

দারোয়ানের সঙ্গে চলল রাম বসু। প্রকাণ্ড হাতার মধ্যে ফলের বাগান, বাগানের মাঝখানে একতলা ছড়ানো মস্ত বাড়ি। বাড়ির পিছন দিকে পৌঁছে রাম বসু দেখল যে সেখানেও নানাজাতীয় ফলের গাছ। এমন সময়ে নজরে পড়ল মাঝারি আয়তনের একটা পুকুরের পাশে বড় একটা লিচু গাছের ছায়ায় শ্বেতপাথরের জলচৌকির উপরে আসীন রামমোহন, দুজন পশ্চিমে বেহারা তৈল মর্দন করছে তাঁর গায়ে। এর আগে সে বার-কয়েক রামমোহনকে দেখেছে, সামান্য মুখচেনাও ছিল। তখন দেখেছে তাঁকে বাইরের পোশাকে, শালের চোগা-চাপকানে মণ্ডিত। এখন খালি গায়ে, খাটো তেলধুতি-পরা অবস্থায় দেখে তার ভারি মজা লাগল। দূরে থেকেই চোখে পড়ে দেহের বিপুল পালোয়ানী আয়তন। আবার মনে পড়ল রঘুবংশে পড়া দিলীপের চেহারার বর্ণনা। মনে মনে সে বলে উঠল, এ'কেই ব্যূঢ়োরস্ক, বৃষস্কন্ধ বলে বটে।

রামমোহনের কাছে গিয়ে প্রণাম করতে উদ্যত হলে তিনি বলে উঠলেন, না না, তৈলাক্তদেহে প্রণাম গ্রহণ করতে নেই। ব'স বেরাদার ওখানে।

এই বলে তিঁনি একখানা জলচৌকি দেখিয়ে দিলেন।

রাম বসু বলে উঠল—বড় অসময়ে এসে পড়লাম।

কিছু না, কিছু না, সব সময়ই সুসময়। তাছাড়া অতিথি যদি সময় বিচার করে আসবে, তবে আর তাকে অতিথি বলেছে কেন ?

একটু থেমে শুধালেন, কেমন, আর গীত রচনা করলে ?

সলজ্জ হাসিতে বসুজা বলল, আজ্ঞে না, আর নূতন কিছু রচনা করি নি।

কয়েক বছর আগে একটা স্বরচিত "যীশু-সঙ্গীত"-কে "ব্রহ্ম-সঙ্গীত" বলে শুনিয়ে গিয়েছিল সে। বিশেষ আয়াস করতে হয় নি, "যীশু" শব্দের বদলে "ব্রহ্ম" শব্দটি বসিয়ে দিয়েছিল মাত্র। রামমোহন খুব প্রশংসা করেছিলেন গীতটির।

এবারে রামমোহন বললেন, বসুজা, তোমার প্রতাপাদিত্য-চরিত বইখানা পড়েছি।

সে ভয়ে ভয়ে শুধায়, কেমন লাগল ?

বসুজা জানে, বাংলা ভাষায় আঁচড় কাটলেই ইংরেজ পাদ্রী প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে ওঠে। কিন্তু এ ইংরেজ পাদ্রী নয়, শিক্ষিত বাঙালী, তাও আবার একেবারে বাঘ-ভালুক।

রামমোহন বলেন, ও বই তুমি ছাড়া আর কেউ লিখতে পারত না—ওর মধ্যে কাহিনীর আকর্ষণ সঞ্চারিত করে দিতে পেরেছ। ওটা মস্ত গুণ। কিন্তু কি জান, ওটা জীবনচরিত হয় নি, হয়েছে ইতিহাস।

পাছে বসুজা নিরুৎসাহিত হয়, তাই শুধরে নিয়ে বললেন, তা হক, বাংলা গদ্যের প্রথম রচনা হিসাবে বইখানা স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

তার চেয়ে আর বেশি কি আশা করতে পারি দেওয়ানজী!

তোমরা ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে যে-কাজ করছ তার তুলনা নেই। কোম্পানি

ভাবছে রাইটারদের বাংলা ভাষা শেখানোর ব্যবস্থা হচ্ছে, পাদ্রীরা ভাবছে বাইবেল-অনুবাদের যোগ্য ভাষা তৈরি হয়ে উঠেছে, কিন্তু হচ্ছে তার চেয়ে অনেক বেশি।

রামমোহন বলে যান, বেহারারা সশব্দে উদার বক্ষে, প্রশস্ত পৃষ্ঠে, যুগন্ধর স্কন্ধে সশব্দে তৈল মর্দন করে আর রাম বসু লক্ষ্য করে রামমোহদের দেহের সৌষ্ঠব ও বৈশিষ্ট্য। সে লক্ষ্য করে মুখমণ্ডলের অনুপাতে চোখ দুটি ছোট, কিন্তু উজ্জ্বল, অথচ কেমন একটি স্নিগ্ধ ভাব তাতে, রৌদ্রভাস্বর জলের উপরে স্নেহপদার্থ বিস্তারিত। সরল নাসিকাটির মাঝখানে একটুখানি অতর্কিত উচ্চতা, উপরের পাটির সম্মুখের একটা দাঁত ঈষৎ ভগ্ন, চিবুকের নীচে চওড়া কাটা দাগ।

বসু বোঝে, মনে মনে হাসে—বাল্যকালে খুব শান্তশিষ্ট ছিল দেওয়ানজী!

রামমোহন যোগ্য শ্রোতা পেয়ে বলে যান, আর যোগ্য দর্শনীয় পেয়ে রাম বসু লক্ষ্য করে যায়—ছোট ছোট কান দুটো দেহের সঙ্গে সংলগ্ন, তৈলচিক্কণ লম্বিত বাবরি, রোমশ বক্ষস্থল, আর হাঁ, যুগের অর্গল উন্মুক্ত করবার উপযুক্ত সুস্পষ্ট সুদীর্ঘ.বাহুদ্বয়, আর সেই বাহুর প্রান্তে রক্তাভ করতলের সঙ্গে যুক্ত সুঠাম সুডৌল অঙ্গুলিগুলি। ডান হাতের অনামিকায় উজ্জ্বল রক্তিম পলার আঙটি ; বাম হাতের অনামিকায় অঙ্গুরীয়টি শাঁখার। গলায় মালাকারে দোদুল্যমান শুভ্র সূক্ষ্ম উপবীত।

আশ্চর্য ঐ লোকটি কেরী! জ্ঞান, কর্ম, হৃদয়বত্তার এমন শুভ যোগাযোগ বিরল। বলে যান রামমোহন, বিধাতা কাকে দিয়ে কোথায় যে কি কাজ করিয়ে নেন, মানুষের সাধ্য কি বোঝে! বিধাতা এক হাতে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন ক্লাইভকে আর এক হাতে পাঠিয়ে দিলেন কেরীকে, এক হাতে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন হেস্টিংসকে, আর এক হাতে পাঠিয়ে দিলেন হেয়ারকে, দুই হাত লাগিয়েছেন তিনি এদেশকে জাগাবার কাজে। ক্লাইভ, হেস্টিংস এদেশকে বাঁধছে শাসনের জালে, আর কেরী, হেয়ার এদেশকে মুক্তি দিচ্ছে আত্মার অধিকারে। বন্ধনে আর মুক্তিতে কেমন সহযোগিতা করে চলেছে, লক্ষ্য করেছ কি ?

এত কথা রাম বসু ভাবে নি, তখনকার দিনে কেউ ভাবত না—তাই সে চুপ করে থাকল।

দেখছ না, বাংলা ভাষা গড়ে উঠছে, ইংরেজী শিক্ষার বিস্তার হচ্ছে, আবার চাই কি! দেখতে দেখতে যাবতীয় কুসংস্কার, গঙ্গাসাগরে সন্তানবিসর্জন, সতীদাহ, পৌত্তলিক হিন্দুধর্ম প্রাচীন যুগের ভূতের মত দূর হয়ে যাবে। নিশ্চয় যাবে বসুজা, নিশ্চয় যাবে ; দেখছ না, চারিদিকের সব দরজা-জানলা যে খুলে গিয়েছে, পশ্চিমের হাওয়া ঘরের মধ্যে ঘুম ভাঙিয়ে মাতামাতি শুরু করে দিয়েছে। পালে লেগেছে হাওয়া, এবারে হাল ধরে লক্ষ্য স্থির করে ধৈর্য ধরে বসে থাকা আবশ্যক। ধৈর্য চাই বসুজা—ধৈর্য চাই।

রাম বসুর মনটা দমে যায়,—বিদ্যালঙ্কার বলেছিল ধৈর্য চাই, এখানেও সেই কথা—ধৈর্য চাই--ধৈর্য চাই। কিন্তু মানুষের আয়ু যে পরিমিত, আর কতদিন বাঁচব, ভাবে রাম বসু। রেশমীর আত্মার তৃপ্তি না দেখেই কি তবে তাকে মরতে হবে! সে ভাবে—ধৈর্য দেবতার, ত্বরা মানুষের।

কিন্তু মনের কথা মনে চেপে রেখে রামমোহনকে সমর্থন করে সে বলে, আপনি যা বললেন তা সত্য। কেরী, হেয়ার প্রভৃতি পাঁচজন গোরাকে স্মরণ করে 'পঞ্চকন্যা' শ্লোকের আদর্শে লোকে এখন বলে থাকে—

"হেয়ার কম্বিন পামরশ্চ
কেরী মার্শমেনস্তথা
পঞ্চগোরা স্মরেন্নিত্যং
মহাপাতকনাশনং।"

রামমোহন বিস্ময়ে বলে ওঠেন, বাঃ বাঃ, বেশ লিখেছে তো, বলে তিনি শ্লোকটার পুনরাবৃত্তি করেন।

রাম বসু অবাক হয়ে যায় রামমোহনের স্মৃতিশক্তি দেখে।

তার পরে রামমোহন বলেন, তুমি একটা শ্লোক শোনালে, আমি তবে একটা শোনাই শোন—

"সুরাই মেলের কুল,
বেটার বাড়ি খানাকুল,
ওঁ তৎসৎ বলে বেটা
বানিয়েছে এক স্কুল!
ও সে জেতের দফা করলে রফা,
মজলে তিন কুল।"

শ্লোকটা যে রামমোহন সম্বন্ধে—শুনেই বুঝল রাম বসু, কিঞ্চিৎ অপ্রস্তুত হয়ে সে বলল, ও সব বাজে লোকের কথা ছেড়ে দিন দেওয়ানজী।

মিছে লজ্জা পাচ্ছ মুন্সী, আমি কি ও সব লোকের কথার মূল্য দেওয়ার বান্দা! তুমি একটা শ্লোক শোনালে তাই আমিও শুনিয়ে দিলাম—এই আর কি। তবে কি জান, আমার সঙ্গে বহু বিশিষ্ট লোক আছেন যাঁরা আমার ডান হাত বাঁ হাত। আছেন দ্বারিক ঠাকুর, কালীনাথ রায়, রামকৃষ্ণ সিংহ, তেলিনীপাড়ার অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়—আরও কতজন।

তার পরে তিনি বলেন, আশার কথা হচ্ছে এই যে, নূতন যুগের হাওয়া উঠেছে, একে থামায় এমন সাধ্য কারও নেই। প্রথমেই লাগতে হবে সহমরণ প্রথার বিরুদ্ধে।

আবেগের সঙ্গে মুন্সী বলে ওঠে, লাগুন দেওয়ানজী লাগুন, বুকের মধ্যে নিত্য আগুন জ্বলছে।

এই তো চাই মুন্সী, দেশের আগুন বুকের মধ্যে অনুভব করলে আর ভাবনার কারণ থাকে না। আমারও বুকে আগুনের জ্বালা বড অল্প নয, এই ক'মাস আগে আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃবধূ সহমৃতা হয়েছেন।

বিদ্যালঙ্কারের কথার প্রতিধ্বনি করে রাম বসু বলে, দেশব্যাপী এ প্রথা দূর করতে হলে চাই উদ্যম, কর্মকৌশল, চাই যুগযন্ত্রটাকে চালনা করার পারদর্শিতা, শুধু জ্ঞানে কিছু হবে না। তেমন লোক তো আপনাকে ছাড়া দেখি নে।

দাঁড়াও, আগে কলকাতায় এসে স্থায়ী হয়ে বসি, তার পর লড়াই শুরু করব নারীভুক্ দানবটার সঙ্গে।

এমন সময়ে একজন চাকর শ্বেতপাথরের থালায় মিষ্টি ও ফল আর শ্বেতপাথরের বাটিতে তরমুজের শরবৎ নিয়ে এসে দাঁড়াল।

রাম বসু বলে উঠল, এ সব আবার অসময়ে কেন, অসুখ হবে যে।

রামমোহন বললেন, আর মিষ্টিমুখ না করে গেলে গেরস্তর অকল্যাণ হবে না?

নাও, তুমি ওগুলো মুখে দিয়ে মুখ চালাও, আমি বকতে বকতে মুখ চালাই।

রাম বসু খেতে শুরু করে, রামমোহন তাঁর ভবিষ্যৎ সমাজসংস্কার-পরিকল্পনা সম্বন্ধে বলে যান।

রাম বসু খেতে খেতে লক্ষ্য করে রামমোহনের নগ্নকান্তি। সে ভাবে, পোশাক-পরিচ্ছদ খুলে নিলে অধিকাংশ মানুষকে পালক-ছাড়ানো মুরগীর মত দেখায়। অথচ এঁকে! পোশাক-পরিচ্ছদে যেন এঁর প্রকৃত বিভূতি আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। তার মন বলে ওঠে, বিনা ভূষণে যাকে মহৎ মনে হয় মহাপুরুষ বলি তাকে।

বুঝলে বসুজা, রংপুরের কালেক্‌টার ডিগবি সাহেব ছাড়তে চান না আমাকে; বলেন, দেওয়ান, তুমি গেলে আর একজন দেওয়ান অনায়াসে পাব কিন্তু আর একজন রামমোহন তো মিলবে না। তিনি বলেন, সমাজ-সংস্কার করতে চাও, বেশ তো, রংপুরে আরম্ভ কর না কেন, এখানকার প্রয়োজন তো অল্প নয়। বুঝলে বসুজা, আমি তাঁকে অনেক বলে-কয়ে রাজী করেছি, আর বড়জোর তিন-চার বছর থাকব ওখানে। তার পরে চলে এসে স্থায়ীভাবে বসব কলকাতায়। তখন তোমাদের নিয়ে শুরু করে দেব লড়াই।

নৈরাশ্য চেপে শোনে রাম বসু। রামমোহন বলেন, আমাদের একদিকে শত্রু পাদ্রীর দল আর একদিকে শত্রু ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের দল। দো-হাত্তা লড়াই করতে হবে আমাদের। ধৈর্য ধর বসু, ধৈর্য ধর, সময়ে সব হবে।

সময়ে সব হবে কিন্তু এ জীর্ণ খাঁচাটা কি আর ততদিন টিকবে, ভাবে বসুজা।

অবশেষে বিদায় নিয়ে উঠে পড়ে রাম বসু। রামমোহন বলেন, মাঝে মাঝে এসো হে, তোমাদের মত উৎসাহী লোক আছে জানলে মনে বল পাওয়া যায়। আর বাংলা লেখার অভ্যাসটা ছেড়ো না। ফিরে এসে বসি না, আমিও শুরু করব বাংলা রচনা। আরবী-ফারসীতে মনের কথা প্রকাশ করে তৃপ্তি হয় না।

রাম বসু বাহার সড়ক ধরে বাড়ি ফেরে। এবারে তার গতি মন্থর, পদক্ষেপ ক্লান্ত। অনেক আশা-ভরসা নিয়ে এসেছিল সে, অপেক্ষা করার উপদেশ পেয়ে মন গেল ভেঙে। জ্ঞানের প্রেরণা যার, কর্মের প্রেরণা যার সে পারে অপেক্ষা করতে, কিন্তু মনে যার আগুন জ্বলছে তার পক্ষে সময়ক্ষেপ যে অসহ্য। দীর্ঘনিশ্বাসে বেরিয়ে আসে বুকের তাপ।

এমন সময়ে সে শুনতে পেল কে যেন ডাকছে, হ্যালো মুন্সী, হ্যালো মুন্সী!

কে ডাকে? পিছনে ফিরে দেখল মেরিডিথ আসছে ফিটন হাঁকিয়ে।

ফিটন কাছে এসে পড়লে মেরিডিথ বলল, মুন্সী, উঠে ব'স, অনেক কথা আছে। সম্প্রতি জনের চিঠি পেয়েছি।

জনের নাম শুনে আগ্রহে ফিটনে চাপে মুন্সী।

তারপর মুন্সী, অনেককাল তোমাকে দেখি নি। কিন্তু এ কি, একেবারে যে ভেঙে পড়েছ!

মুন্সী হেসে বলে, বয়স তো হল।

এমন আর কি বয়স হয়েছে তোমার?

তা মন্দ আর কি, পঞ্চান্ন পেরিয়েছে।

পঞ্চান্ন এমন কিছু বেশি নয়, কিন্তু এ যে হঠাৎ বুড়িয়ে গিয়েছ, মুখ-চোখের চেহারা

আগুনে ঝলসানো গাছের মত।

রাম বসু ভাবে, আগুনে ঝলসানো গাছই বটে। প্রকাশ্যে বলে, এখন জনের খবর বল, কোথায় আছে, কেমন আছে, কবে ফিরবে খুলে বল। আহা, বেচারার জন্যে বড় দুঃখ হয়।

এবারে আবার পূর্বকথা উত্থাপন করতে হল। রেশমীর মৃত্যুর পরে জন কোম্পানির চাকরি নিয়ে বোম্বাই প্রেসিডেন্সিতে চলে গেল। লিজা অনেক কাকুতি-মিনতি, অনেক উপরোধ-অনুরোধ করেছিল, চোখের জলও কম ফেলে নি—কিন্তু জনের সঙ্কল্প টলল না।

লিজা বলল, জন, বিয়ে করে সংসারী হও।

জন বলল, বার বার তিনবার তো পরীক্ষা হল, আর কেন ? বিয়ে আমার জন্যে নয়।

লিজার মনে পড়ে কেটি, রোজ এলমার, রেশমীর কথা।

এ সব বিষয়-সম্পত্তি ভোগ করবে কে ?

লিজা, তুমি ভোগ করবে, আর কখনও যদি আমি ফিরে আসি, আমিও ভোগ করব।

নির্বোধ জন বোম্বাই যাত্রার আগে একটি বুদ্ধির কাজ করল, মেরিডিথের সঙ্গে লিজার বিয়ে দিয়ে দিল। সে মেরিডিথকে বলল, ফেণ্ড, আমার বোনটিকে তোমাকে দিয়ে গেলুম, এর চেয়ে মূল্যবান আমার আর কিছু নেই, ওর অযত্ন কর না, এমন নারীরত্ন বিরল।

মেরিডিথ কোন কথা না বলে সজোরে তার করমর্দন করে প্রত্যুত্তর দিল।

জন পুনার ইংরেজ রেসিডেন্টের এডিকং।

এখানে একটু এগিয়ে পরের কথা আগে সেরে নিই।

১৮১৮ সালে তৃতীয় মারাঠা যুদ্ধে জনের মৃত্যু ঘটে। পুনার উপকণ্ঠে এখনও তার সমাধিস্তম্ভ দেখতে পাওয়া যায়। সমাধির প্রস্তরফলকে শুধু তার নাম লেখা আছে—জন স্মিথ। আর লেখা আছে—"এখানে তার দেহ সমাহিত, যার আশা-আকাঙ্ক্ষা অনেক আগেই সমাহিত হয়েছে।" এইভাবে কঠিন পরীক্ষাময় করুণ জীবন সমাপ্ত হল হতভাগ্য জনের।

বসু শুধায়, জন কি আর ফিরবে না ?

তেমন সম্ভাবনা আছে বলে তো মনে হয় না।

মিসেস মেরিডিথ একবার ভাল করে অনুরোধ করে দেখুন না।

সে চেষ্টা হয় নি বুঝি ?

কি বলে জন ?

সে বলে, কলকাতার ক্ষতচিহ্ন থেকে দূরে এসে স্বস্তিতে আছে, যদিচ শান্তি আর এ জীবনে মিলবে না তবু স্বস্তিটাই বা কম কি ! সে লিখেছে, কলকাতায় ফিরে গেলে বেশিদিন আর বাঁচবে না, তাই ও অনুরোধ যেন তাকে না করা হয়।

রাম বসু বলে, এর পরে আর কথা কি ! তা যেখানে থাকলে স্বস্তিতে থাকে থাকুক।

লিজাও সেই কথা বলে, মুন্সী, একদিন বিকেলে আমাদের বাড়িতে যেও। লিজা প্রায়ই তোমার কথা বলে। বলে যে, মুন্সী যতটা বুঝত জনকে—এমন আর কেউ নয়।

মুন্সী মনে মনে বলে, দুজনেই যে এক আগুনে ঝলসানো।

প্রকাশ্যে বলে, মিসেস মেরিডিথকে আমার বহুৎ বহুৎ সেলাম দিও, আমাকে মনে রাখবার জন্যে অসংখ্য ধন্যবাদ জানিও।

গাড়ি জানবাজার রোডে এসে পড়লে মুন্সীকে নামিয়ে দিয়ে ফ্রি স্কুল স্ট্রীট ধরে চলে যায় মেরিডিথ বেরিয়াল গ্রাউণ্ড রোডের দিকে, বলে যায়, সময় পেলে যেতে ভুলো না মুন্সী।

মুন্সী আবার ধন্যবাদ জানায়। তার পরে মনে মনে ভাবতে ভাবতে চলে, রেশমী অনেকের অনেক পরিবর্তন সাধন করে গিয়েছে—তাদের মধ্যে এই পরিবারটিও। নইলে এরা সেধে নেটিভ জেণ্টুকে বাড়ি নিয়ে যেতে চাইত না। মেরিডিথ যেতে যেতে ভাবে মুন্সী দেহেমনে একবারে ভেঙে পড়েছে, বোধ করি আর বেশিদিন বাঁচবে না ; ভাবে, জনের মতই তার অবস্থা। তখন হঠাৎ বিদ্যুৎ-ঝলক দিয়ে যায় তার মনে, জনের মত তবে কি মুন্সীও ভালবাসত রেশমীকে ? তার মন বলে, অমন অপূর্ব লাবণ্যময়ী নারীকে ভাল না-বাসাই যে আশ্চর্য!

৪
একটি নীরব অধ্যায়

লর্ড ওয়েলেস্‌লি বাদশাহী মেজাজ নিয়ে এসেছিল এদেশে। সে বুঝেছিল যে ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অ্যাডভেঞ্চারের যুগ অবসিত, এবারে আরম্ভ হবে বাদশাহী যুগ ; মুঘল বাদশাহীর পরবর্তী অধ্যায় ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির বাদশাহী। গোড়া ঘেঁষে সাম্রাজ্যপত্তনে মনোনিবেশ করল ওয়েলেস্‌লি। পাঠান ও মুঘল বাদশাহেরাও একদিন বুঝেছিল যে, রাজকীয় স্বার্থের অনুরোধে দেশীয় ভাষার সঙ্গে পরিচয়-সাধন আবশ্যক। ভাষার ঐতিহাসিকগণ বলে থাকেন যে, পাঠান শাসকদের সময়েই বাংলা ভাষার চর্চা বাড়ল, বাংলা সাহিত্যের উন্নতি আরম্ভ হল। ওয়েলেস্‌লির সিদ্ধান্তেও অনুরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। সেকালে পনেরো-ষোল বছরের নাবালক ইংরেজ রাইটার (পরবর্তীকালের সিভিলিয়ান) ছোকরার দল এদেশে আসত ; তারা না জানত দেশের ভাষা, না জানত দেশের ইতিহাস, আইন প্রভৃতি। ইংরেজী ভাষা ও পাঁচ টাকা বেতনের দোভাষীর সাহায্যে যেভাবে দেশ শাসন করত তারা—তা কুশাসন, অত্যাচার ও খামখেয়ালির নামান্তর। ওয়েলেস্‌লি বুঝল, এভাবে আর যাই হক, বাদশাহী শাসনের উত্তরাধিকার গ্রহণ চলে না। প্রজার মুখে রাজার সুনাম রাজগীর পক্ষে অত্যাবশ্যক। তাই ওয়েলেস্‌লি সিদ্ধান্ত করল যে, রাইটারগণকে দেশী ভাষা শিক্ষা করতে হবে, তবে তারা পাবে শাসনকার্যের ভার। তখন দু-একজন ইংরেজ হিন্দুস্থানী ভাষা শিক্ষা দেওয়ার জন্যে সেমিনার খুলেছিল। ওয়েলেস্‌লি দেখল যে অভিলষিত কাজের কোন ব্যবস্থা নেই। তখন এই উদ্দেশ্যে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ নামে এক কলেজের প্রতিষ্ঠা হল। সেটা ইংরেজী ১৮০০ সালের কথা। এই কলেজে সংস্কৃত, আরবী, ফারসী, হিন্দুস্থানী, মারাঠী, বাংলা প্রভৃতি ভাষা শিক্ষাদানের ব্যবস্থা হল। বর্তমান প্রসঙ্গে কেবল বাংলা ভাষার কথাই বলা হবে।

গার্ডেনরীচে কলেজের নিজস্ব বাড়ি তৈরি না হওয়া পর্যন্ত রাইটার্স বিল্ডিং-এ

কলেজের কাজ চলবে স্থির হল। নীচের তলায় কলেজ ও গ্রন্থাগার, দোতলায় ছাত্রাবাস। বিলাতের বোর্ড অব্ ডিরেক্টর্সদের নিষেধের ফলে গার্ডেনরীচে কলেজের নিজস্ব বাড়ি তৈরির পরিকল্পনা ওয়েলেস্‌লির স্বপ্নমাত্র রয়ে গেল। যতদিন কলেজ ছিল, রাইটার্স বিল্ডিঙেই চলেছিল তার কাজ। ১৮৫৪ সালে কলেজ বাতিল হয়ে যায়। কলেজের শেষ অবস্থায় স্বয়ং বিদ্যাসাগর যুক্ত হয়েছিলেন কলেজের সঙ্গে।

১৮৮১ সালে কেরী বাংলা ভাষার প্রধান অধ্যাপকরূপে যোগদান করে কলেজে। প্রধানত তার সুপারিশে কয়েকজন পণ্ডিত ও মুন্সী কলেজের চাকুরিতে নিযুক্ত হয়। খ্যাতি ও ভাষাকর্মের দিক দিয়ে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার ও রামরাম বসু তাদের মধ্যে প্রধান।

একদিন পাঠান শাসনকর্তার উৎসাহে বাংলা পদ্য নূতন উজ্জীবন লাভ করেছিল। এবারে ইংরেজ শাসনকর্তার উৎসাহে বাংলা গদ্য লাভ করল নূতন উজ্জীবন; সত্যের খাতিরে বলা উচিত যে, বাংলা ভাষায় সাহিত্যিক গদ্যের হল যথার্থ ভিত্তিপত্তন। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠায় ইংরেজ সুশাসনের কতটা উন্নতি হয়েছিল সে বিচার করুক ঐতিহাসিকের দল; ভাষাবিচারকের রায় হচ্ছে এই প্রতিষ্ঠান নূতন বাংলাসাহিত্যের সূত্রপাত করে দিল। শাসন-সৌকর্যের উপলক্ষ্যকে ছাড়িয়ে গেল ওয়েলেস্‌লির আকাঙ্ক্ষা। আমাদের কাহিনীর পক্ষে কলেজের বিস্তারিত ইতিহাস অবান্তর। কেরী ও তার মুন্সীর নূতন কর্মক্ষেত্ররূপে যেটুকু প্রয়োজন তা-ই বলা হল।

মদনাবাটিতে বাংলা গদ্যসৃষ্টিতে কেরীর ব্যক্তিগত প্রয়াস, শ্রীরামপুরের মিশনে পাদ্রীদের সঙ্গে মিলিত প্রয়াস আর ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে এসে সেই প্রয়াস পেল রাজকীয় সমর্থন ও সাহায্য। তিন জায়গাতেই রামরাম বসু তার মুন্সী, তার প্রধান সহায়।

কিন্তু কেরী দেখল যে, তার মুন্সীর কোথায় যেন পরিবর্তন ঘটে গিয়েছে। আগের সে উৎসাহ, কর্মশক্তি আর নেই; নেই সে অসাধারণ বাক্‌পটুতা ও ক্ষিপ্রবুদ্ধি, যা দীর্ঘকাল মুগ্ধ করে রেখেছিল পাদ্রীদের। এখন সে কেমন যেন নিস্তেজ, অন্যমনস্ক। খান-দুই বই লিখে সেই যে তার কলম নেতিয়ে পড়ল, হাজার উৎসাহ-উদ্দীপনাতেও আর তা সরল না। কেরী দেখে যে, কলেজের কাজে মুন্সীর আগ্রহ নেই, সব দিন নিয়মিত আসে না, অনেক সময়েই আগে চলে যায়।

একদিন সে শুধাল, মুন্সী, তোমার কি শরীর অসুস্থ?

না, তেমন কিছু নয়, বলে প্রশ্নটাকে পাশ কাটিয়ে গেল রামরাম বসু।

কিছুদিন বিশ্রাম নাও না কেন!

কেরীর অশ্রুত স্বরে সে বলল, এবারে একবারেই বিশ্রাম নেব।

কেরী ঠিক বুঝতে পারে নি বসুর আঘাতটা ঠিক কোথায়, আর তার গুরুত্ব কতখানি। নিজের জীবনেও সে কম আঘাত পায় নি; কিন্তু ভেঙে পড়ে নি কখনও।

এমন লোকের পক্ষে পরের মনোভঙ্গের কারণ বা গুরুত্ব বোঝা সহজ নয়।

কেরী ও রামরাম বসুর গড়ন কেবল ভিন্ন নয়, ওরা ভিন্ন ধাতুতে গঠিত। মধ্যযুগীয় জীবনের ভিত্তি ভগবদ্‌বিশ্বাস। তা বিচলিত হলেও একবারে ভেঙে পড়ে না। নব্যযুগের জীবনের ভিত্তি আপন ব্যক্তিত্বে বিশ্বাস। বিচলিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তা ভেঙে পড়ে, আপনার উপরে আপনি দাঁড়াতে পারে না। কেরীর জীবন বেঁকে পড়েও দাঁড়িয়ে থেকে আজ পর্যন্ত বিস্ময় উদ্রেক করছে। রামরাম বসুর আমূল-ভেঙে-পড়া জীবন করুণা জাগায় দর্শকের মনে।

৫

শেষ অধ্যায়

টুশকি বলে, কায়েৎ দা, আজকে কলেজ না-ই গেলে, শরীরটা তেমন ভাল নেই দেখছি।

বেশ আছি, বলে চাদর কাঁধে ফেলে বেরিয়ে যায় সে।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেলেও যখন সে ফেরে না, ন্যাড়া বের হয় সন্ধানে। অনেক খোঁজাখুঁজি করে গঙ্গার ধার থেকে তাকে ফিরিয়ে নিয়ে আসে। এমন ঘটনা এখন প্রায় নিত্য ঘটে।

কখনও কখনও গভীর রাতে দরজা খুলে বেরিয়ে পড়ে সে। খোলা দরজা দেখে ন্যাড়া আর টুশকি বোঝে যে কখন বেরিয়ে গিয়েছে তাদের কায়েৎ দা। তখন নবু আর ন্যাড়া অন্ধকারের মধ্যে খুঁজতে বেরিয়ে পড়ে।

এমন দিনের পর দিন, রাতের পর রাত চলে। আবার যখন ঘরে থাকে, না ঘুমোয় সে দিনে, না ঘুমোয় রাতে। হয় চুপটি করে বসে থাকে, নয় আপন মনে গুনগুন করে গান করে।

টুশকি বলে, এমন করে কদিন চলবে কায়েৎ দা! চল না, কোথাও থেকে ঘুরে আসি!

কখনও কোন উত্তর দেয় না সে, কখনও বলে, কি হবে? মনের আগুন যে সঙ্গে যাবে।

মনের আগুন কি আর নিভবে না?

কেন নিভবে রে টুশকি, কেন নিভবে!

তার পরে একটু ভেবে বলে, যে আগুনে সে পুড়ে মরেছে, এর জ্বালা কি তার চেয়েও বেশি! তারপর হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে বলে ওঠে, দেব না নিভতে এ আগুন, কখনও দেব না।

হঠাৎ হেসে উঠে সে বলে, সহমরণে পুড়ছি রে, তার সঙ্গে সহমরণে পুড়ে মরছি!

টুশকি ভাবে, পাগল হতে আর দেরি নেই। টুশকি বোঝে তার জ্বালা, তাই তারই কাছে কখনও কখনও মনের কথা প্রকাশ করে বসুজা, আর সকলের কাছে সে নির্বাক।

সকলে ভাবে, বুড়ো পাগল হয়ে গিয়েছে; টুশকি জানে তার জ্বালা কোথায়, সে-ও যে ঐ জ্বলুনির সঙ্গী।

অনেক রাত্রে ন্যাড়াকে ঠেলে জাগিয়ে টুশকি বলল, ওরে কায়েৎ দা তো এখনও ফিরল না, একবার বেরিয়ে খুঁজে দেখ!

তখনই বেরিয়ে পড়ল ন্যাড়া আর নবু। তারা জানত গঙ্গার ধারটা তার বড় প্রিয়, সেই দিকেই চলল দুজনে।

সেদিন সন্ধ্যার সময়ে গঙ্গার ধারে বেড়াচ্ছিল রাম বসু। এমন সময়ে একটা ভিড় দেখে এগিয়ে গেল; দেখল যে, ছোট একটি কচি মেয়েকে, কচি রেশমীর বয়সী হবে,

চিতায় তোলবার আয়োজন হচ্ছে।

ওরে রাখ্ রাখ্, বলে চীৎকার করে উঠল বসুজা। মেয়েটি প্রাণভয়ে জড়িয়ে ধরল তাকে। সকলে মিলে তাকে ছিনিয়ে নিয়ে ঠেলেঠুলে চিতায় উঠিয়ে দিল। চিতা থেকে নামানোর উদ্দেশ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ল রাম বসু। সকলে মিলে তাকে নিবারিত করল। কতক আগুনের ঝলসানিতে, কতক মানুষের ঠেলাঠেলিতে অর্ধচৈতন্য অবস্থায় পড়ে থাকল সে গঙ্গাতীরে।

ন্যাড়া আর নরু সেই অবস্থায় তাকে দেখতে পেল সেখানে। একখানা গাড়িতে চাপিয়ে তারা নিয়ে এল তাকে বাড়িতে। তখন সে অজ্ঞান।

পরদিন বৈদ্য এল, নাড়ী দেখে বলে গেল সান্নিপাত, অর্থাৎ কিনা যার আর ঔষধ নেই।

ন্যাড়া গিয়ে খবর দিল কেরীকে। কেরী সাহেব-ডাক্তার নিয়ে এল তখন। ডাক্তার বলল, অবস্থা ভাল নয়।

বিকালবেলা আবার এল কেরী। অনেকক্ষণ শয্যার পাশে বসে থেকে বিষণ্ণ মুখে প্রস্থান করল, বলে গেল আগামীকাল সকালেই আবার আসবে।

সারা দিন-রাত অচৈতন্য অবস্থায় কাটে রামরাম বসুর। মাঝে মাঝে ঠোঁট নড়ে।

নরু বলে, বাবা, কি বলছ?

ন্যাডা বলে, টুশকি দি, কি বলছে দাদা!

টুশকি চুপ করে থাকে, সে জানে কি বলছে মুমূর্ষু।

শেষরাত্রে স্তিমিত দীপ হঠাৎ প্রোজ্বল হয়ে ওঠে, পূর্ণজ্ঞান পায় রাম বসু।

চারদিকে তাকিয়ে দেখে সবিস্ময়ে শুধায়, কই—নেই সে?

কে?

কাকে খুঁজছ?

আবার কাকে! এইমাত্র এসেছিল যে!

হঠাৎ জোরে চীৎকার করে ওঠে—ঐ যে, ঐ যে! রেশমী, রেশমী, রেশমী—

ঐ নামের অন্তিম উচ্চারণে জীবনের যাবতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষা, করুণা, মাধুর্য নিঃশেষ করে দিয়ে এক ফুৎকারে নির্বাপিত হয়ে গেল দীপ।

টুশকি ডুকরে কেঁদে উঠল—কায়েৎ দা, তোমার নরুকে ন্যাড়াকে কার হাতে দিয়ে গেলে!

প্রভাত হল। পরম শোকের পরদিবসেও সূর্য তেমনি উজ্জ্বল, বাতাস তেমনি মধুর, আকাশ তেমনি নির্মল। আশ্চর্য এই জীবন! আশ্চর্য এই পৃথিবী!

১৮১৩ সালের ৭ই আগস্ট।

সমাপ্ত